জার্মান সাম্রাজ্যবাদ অতীত ও বর্তমান

আরকাদি ইয়েরুসালিমস্কি
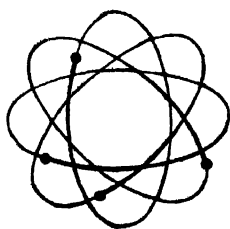
বিংশ শতাব্দী

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৯৬৪

প্রকাশক :
মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়
বিংশ শতাব্দী
২২/এ, শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৫

German Imperialism : Its Past and Present
সোভিয়েত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ :
জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী
শঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ :
চিত্রাভাস

মুদ্রাকর :
বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন

মুদ্রণ প্রমাদবশতঃ ৩৩৪ পৃষ্ঠার শিরোনামে 'জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার ষড়যন্ত্র'-এর স্থলে ভুল ক্রমে 'নতুন সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার ষড়যন্ত্র' ছাপা হইয়াছে।

ভূমিকা

এই পুস্তকটি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সুবিন্যস্ত ইতিহাস নয়। এতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যার কালক্রমিক বিশ্লেষণ নেই। এটি হচ্ছে বিংশ শতাব্দীতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের উপর, তার স্বরাষ্ট্রীয়, বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক নীতি, আদর্শবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কীত নির্বাচিত রচনাবলী। বহুকাল ধরে এটি লিখিত হয়েছে, বিশ দশকের মধ্যবর্তীকালে শুরু ও বর্তমান কালে শেষ। প্রতিটি প্রবন্ধেরই নিজস্ব বক্তব্য আছে, যা মাঝে মাঝে সীমিত। কতকগুলি হচ্ছে সোভিয়েত, জার্মান, ব্রিটিশ ও ফরাসী দলিলপত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান ডেমোক্র্যাটিক সাধারণতন্ত্রের মহাফেজখানার দলিলপত্র ও উইয়েমার সাধারণতন্ত্রের বিজ্ঞানী সংস্থার দলিলপত্রের উপর স্বাধীন আলোচনা। অন্যগুলি হচ্ছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ ও ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারার গবেষণা। আবার কতকগুলি 'ঘটনা প্রবাহকালে'র মধ্যে লিখিত এবং সাংবাদিকতার ধরনে।

সংক্ষেপে, কিছু প্রসঙ্গকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তুর মত আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলির দলিলপত্রের উপর দৃঢ়ভিত্তি আছে, আবার কতকগুলিতে সাংবাদিকসুলভ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। শেষোক্তগুলি এখন অতীত ইতিহাসের প্রতিধ্বনি, এমন কি যেখানে লেখক সমকালীন ঐতিহাসিক রূপে সফল হয়েছেন ঘটনাবলীর কিছুটা নির্ভুল বিচারে।

লেখকের বরাবরই ইতিহাসসুলভ সাংবাদিকতার প্রতি ঝোঁক ছিল এবং এই কাজেই আত্মনিয়োগ করেন যুদ্ধের আগে ও পরে এবং বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সংবাদদাতারূপে। তিনি প্রচুর পরিমাণে 'নোট' সংগ্রহ করেন (দুঃখজনকভাবে অনিয়মিত) মস্কোয় থাকাকালে, সীমান্তে ও বিদেশে, যাতে আছে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাৎসীবিরোধ সংস্থার সদস্যদের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের ইঙ্গিতবহ ঘটনাবলী। নোটগুলির অধিকাংশই হিটলারের জার্মানীর সামরিক ও রাজনৈতিক দিক নিয়ে, নাৎসী প্রচারের বিষয় ইত্যাদি নিয়ে। এগুলি ছিল *ক্রাশনায়া জভেজদা, প্রাভদা* ও *ইজভেস্তিয়া* এবং বেতারে প্রচারিত (প্রধানতঃ বিদেশের জন্য) প্রবন্ধাবলীর সারাংশ।

জার্মান—১

লেখক আশা করেন যে এগুলি নাৎসী জার্মানীর প্রতি সোভিয়েত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভংগির এক দলিল হিসাবে পাঠকের কাছে আগ্রহকর হবে।

রচনাবলীকে সাজানো হয়েছে বিষয়বস্তুর সময়ানুযায়ী। এইভাবে বিভিন্ন রচনাকে চারটি খণ্ডে ও অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। কয়েকটি মৌলিক রচনা আছে, কয়েকটির পরিমাণ করা হয়েছে, কিন্তু কোন সংশোধন বা সংযোজন করা হয়নি, এমন কি নতুন দলিলপত্র বা মালমশলা হাতে আসা সত্ত্বেও, কারণ লেখকের ইচ্ছা যে ঘটনাবলীর আদি ব্যাখ্যাই সংরক্ষিত হোক, শুধু সেই ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সেগুলি বর্তমান কালের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিরোধী অন্যদিকে কোন কোন অধ্যায় বেশ পরিবর্তিত ও কিছুটা পরিমার্জিত করা হয়েছে। তা ছাড়া কিছু নতুন অধ্যায়ও যোগ করা হয়েছে।

প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত তারিখটি বোঝায় আদি রচনার সময়কাল। যেখানে পরবর্তীকালে রচনাটিকে বর্ধিত বা আধুনিক করা হয়েছে, সেখানে দুটি তারিখ দেওয়া হয়েছে।

এই রচনাসংগ্রহে যে বৎসরগুলি বিধৃত হয়েছে-তার মধ্যে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। লেখকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। যা হোক, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় সচেতন জীবনের বৃহৎ অংশ ব্যয় করে তিনি বিশেষভাবে মনোসংযোগ করেছেন জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরনীতির সমস্যার উপর। নির্মল ঘটনাবলীই তাঁকে এতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাস্তবিক, বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না এইজন্য যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরে, দ্বিতীয়ের পঁচিশ বছর ও নাৎসী সাম্রাজ্যের পতনের বিশ বছর পরে ইউরোপের রাজনৈতিক দিগন্তে জার্মান যুদ্ধবাদের মেঘ আবার ঘনিয়ে উঠছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক শক্তির অভিজ্ঞতা হয়েছে খুবই দুঃখজনকভাবে মাত্র বিশ বছরের বিরতি দেওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। এই যুদ্ধ দুটি বিশেষ করে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। উত্তর পুরুষরা ও আমাদের সমসাময়িকরা এই যুদ্ধের ধ্বংসের কথা দীর্ঘকাল চিন্তা করবে, বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিবাসী, সমগ্র মানব সমাজের উপর যে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের রাত্রি নেমে এসেছিল তার কথা ভাববে।

সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি এই বিশ্বযুদ্ধগুলির অন্তর্নিহিত কারণ এখনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাকর সমস্যা, যদিও ঐতিহাসিকরা সেগুলিকে সীমাবদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট করেছেন, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে। যদিও দুটি যুদ্ধেরই দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদী সকল শক্তির উপরই সমভাবে পড়ে প্রধান প্ররোচক জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদীদের সংগে সংগে, যারা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের প্রধান শক্তি প্রকৃত ঘটনাকে রাজনৈতিক কারণে লুকিয়ে

রাখতে ইচ্ছুক। যাহোক, প্রগতিশীল শক্তিগুলিরও যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত ঘটনাবলী জানার সমানভাবে প্রচুর আগ্রহ আছে। বিষয়টির কেবল শিক্ষণীয় দিকই নেই। নতুন এক যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান এতে লাভ করা যাবে।

তরুণদলের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। শত সহস্র যুবক যারা জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার জন্য দেশভ্রমণ করে তারা স্থাপত্য ও শিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন হিসাবে স্মৃতিস্তম্ভগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। লেনিনগ্রাদের পিসকারেভস্কি সমাধিতে, অসউইজের চুল্লীর পাশে, ওয়ারশর ঘেটো অভ্যুত্থানের স্মৃতিস্তম্ভে, লিডিসে বুকেনওয়াল্ডে ও অন্যান্য মৃত্যুশিবিরে তারা বয়স্কদের চেয়ে বেশি বিচলিত হয়, তাদের মনে জাগে জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা যে এই দানবীয় যুদ্ধাপরাধের জন্য কে দায়ী, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ছাপিয়ে গেছে। তারা শুধু নীতিগত-ভাবে এর জবাব খোঁজে না, যদিও সেটাও প্রয়োজন। তারা অবাক হয়ে অন্ত-নির্হিত কারণ খোঁজে, সামাজিক মূল ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করে। আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য তারা জানতে চায়, উপযুক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত করতে চায়। ইতিহাসের সেই পথ তারা খুঁজে বের করতে চায়, যা জার্মান যুদ্ধবাজদের প্রতিহিংসার পরিকল্পনার নামে তৃতীয় যুদ্ধ শুরু করা থেকে বিরত রাখবে।

তৃতীয় যুদ্ধ। এর সম্ভাবনার কথা আমাদের কখনও ভোলা উচিত নয়। তার মানে এই নয় যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় বা এটি বৃত্তাকার। এও নয় যে, আণবিক আদর্শবাদীরা যে ধ্বংসের কথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার সংগে জড়িত বলে প্রচার করেন তাকে মেনে নেওয়া। অতীতের সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবন বলে কোন ব্যাপার ইতিহাসে নেই। এমন কি নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতনের পরে বুরবোঁদের পুনরুত্থানও যথার্থভাবে পুনরুজ্জীবন নয়। জার্মান সমরতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনও ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ চক্র নয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের প্রুশিয়ান সমরতন্ত্রের সময় থেকে বা মোলৎকে ও লুডেনডর্ফের সামরিক ব্যবস্থা থেকে হিটলার, কাইটেল ও হাউসিংগারের ফ্যাসিস্ত যুদ্ধ যন্ত্রের কাল পর্যন্ত সকল স্তরের ও অংগের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি নয়। তবুও অতীত ঐতিহ্য, বিশেষ করে অতীত অভিজ্ঞতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। জার্মান সমরতন্ত্রের পুনর্জন্ম, এমন কি **'ন্যাটো'**র কাঠামোর মধ্যে আধা গণতান্ত্রিক নবীকরণের ভেক ধারণও বিশ্ব শান্তির পক্ষে চরম ভয়াবহ। তাছাড়া, এটা প্রকৃতপক্ষে নবীকরণ নয়। এটা হচ্ছে জার্মানী ও পৃথিবীর নতুন অবস্থায় খানিকটা ভোল বদল।

বাস্তবিকই অবস্থা বদলে গেছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পিছু ফিরে তাকানো যাক। শেষের দিকের সংগে তুলনা করো। দেখবে যে পরিবর্তনটা এসেছে পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সৃষ্টি হওয়ার জন্য,

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজতান্ত্রিক দলগুলির উন্নয়নে নিয়মিত বাস্তবানুগ নিয়ন্ত্রণ কারণে, উপনিবেশগুলির অবলুপ্তির কারণে এবং সর্বশেষে কিন্তু সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে ঐতিহাসিক ধারাকে প্রচুর বেগবান করে তুলেছে এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও নতুন নতুন যন্ত্রবিদ্যা এই ধারার উপর দ্বিগুণ সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

আমরা এই বিষয়টিকে তাচ্ছিল্য করতে পারি না, যে জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মনোবৃত্তিরও পরিবর্তন সাধন করেছে, শান্তি সম্পর্কে ধারণা, শান্তির জন্য সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। পারমাণবিক ও মহাকাল যুগ অনাবিষ্কৃত দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, কিন্তু তা আবার নতুন বিপদেরও সৃষ্টি করেছে, যা আমাদের যথাযথ বিচার করতে হবে ও ভবিষ্যৎ পুরুষের স্বার্থে বিদূরিত করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানীতেও বহু দূর প্রসারী পরিবর্তন হয়েছে। উইমার সাধারণতন্ত্র বা হিটলারের রাইখের ইতিহাসকালের পর বহু সময় কেটে গেছে। যদি সারা জার্মানীতে একচেটিয়া পুঁজির ও জঙ্গীবাদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পটাসডাম সম্মেলনের মূলনীতিগুলি কার্যকর করা হতো, তাহলে দেশের শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত হতো। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিসমূহের দ্বারা এই নীতি পরিত্যাগ ও পশ্চিম জার্মানীতে একচেটিয়া পুঁজির পনরুজ্জীবন দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং মধ্য ইউরোপে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

জার্মানীর মাটিতে উদ্ভূত হয়েছে দুটি স্বাধীন জার্মান রাষ্ট্র—জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। প্রথমটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য থেকে জঙ্গিবাদকে জাগিয়ে তুলেছে ও 'ন্যাটো'র মধ্যে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দলভুক্ত ও ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা'র সদস্য হয়েছে। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের কোন সীমানাগত দাবী নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্থগিত ওডার-নাইসে ও অন্যান্য সীমানা সে জেনে নিয়েছে। ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্য রাষ্ট্রগুলির সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সে মেনে চলেছে। অন্যদিকে ফেডারেল রিপাবলিকের আক্রমণাত্মক পদার্থগুলি সমানে সীমানার পরিবর্তন দাবী করছে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টি ও নতুন যুদ্ধের বীজ বপন করছে।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরে, যাতে জার্মান জঙ্গীবাদ আশা করেছিল বিশ্ব-কর্তৃত্ব লাভ করবে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছে—এবং

সমকালীন জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবিদরা অবশেষে স্বীকার করেছে যে, তাঁদের বিশ্ব-অধিকার বাসনা অবাস্তব এবং শক্তিগুলির ভারসাম্যের যুক্তিতে পরিত্যাগ করা উচিত। ঐতিহ্যের ধারা অনুগামী *ওয়েলটপলেটিক*-এর যুগ শেষ হয়ে গেছে। পুরানো স্লোগান 'সমুদ্রেই আমাদের ভবিষ্যৎ' এখন আর খাটে না। বিগত শতাব্দীতে জার্মান রাইখের গঠনকালে 'জার্মান মিশনে'র যে ধারণা করা হত নতুন অবস্থায় তা সংশোধিত হয়েছে। জার্মান জঙ্গীবাদের সম্বল সংকুচিত হয়েছে। তবু এখনও "ইউরোপীয় সংহতির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রসারের নতুন রূপ, কমন-মার্কেট ও নয়া উপনিবেশবাদের কাজে লাগিয়ে জার্মান জঙ্গীবাদ পশ্চিম ইউরোপে আবার বড় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে এবং **ন্যাটো**র মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার করছে। তাছাড়া, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে তারা সীমানা বিস্তারে আগ্রহী। তাদের প্রধান মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন যে, প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ১৯৩৭ সালের সীমানার পুনরুদ্ধার, ১৮৭১ সালের বিসমার্কীয় সাম্রাজ্যের সীমানা। আর সব বিষয়ের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া বিভক্তকারী হিটলারের মিউনিখের ব্যাপারটির আইন-সিদ্ধতার জন্য তাঁরা জেদ ধরেন।

সীমানা বিস্তারের এই কার্যসূচী কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ফলাফল ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে না, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের যুদ্ধোত্তর বিকাশের বাস্তবতাকেও উড়িয়ে দেয়। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর প্রতিশোধমূলক উদ্দেশ্যসাধনের মতলবও আছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্য ইউরোপের অবস্থা স্থায়ীকরণের একটি কারণ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মধ্যে (১২ই জুন ১৯৬৪) মস্কোতে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের চুক্তি। যখন পশ্চিম জার্মান জঙ্গীবাদ **ন্যাটো**র মধ্য দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের উপর অধিকার খুঁজছে, যেন জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র 'জার্মান শান্তি নীতি' ঘোষণা করছে, ইতিহাসে সর্বপ্রথম তারা মধ্য ইউরোপে পারমাণবিক অস্ত্র-বিহীন এলাকা সৃষ্টির এক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জার্মান মৃত্তিকায় আজ দুই জার্মানী বিরাজ করছে, দুইটিই পৃথক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বহন করছে। অবশ্যই এই ঐতিহ্যগুলি বর্তমানকালের ত্রিকোণ কাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জঙ্গীবাদী আদর্শ যা জড়িত আছে, ধরা যাক্, হেনরিক ফন ত্রিৎসকের প্রুশিয়ানিজমের সঙ্গে বা প্যান-জার্মানীক ইউনিয়নের আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ কিংবা রোজেনবার্গের বহুঘোষিত জাতিবিদ্বেষ ও তাঁর '*বিংশ শতাব্দীর কাল্পনিকরূপ*। এর পিছনে সরে গিয়ে স্থান করে দিয়েছে আরও আধুনিক 'আটলান্টিক ধারণা', বা "ইউরোপীয়ান ধারণা' এবং 'পাশ্চাত্যে খৃশ্চান ধারণা,' বর্তমানে রাজনৈতিক-

যাজকীয় রাজত্বের বিশেষ প্রিয় আদর্শ। 'ইউরোপীয়' নামক জঙ্গী বাদের যে আদর্শ ফেরি করা হয় তা খুবই বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য, সার্বজনীন তা গ্রহণ করলেও এর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সেই আক্রমণাত্মক জার্মান জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্য।

দুটি জার্মান রাষ্ট্রের আদর্শগত জীবনের মূল সমস্যার একটি জঙ্গীবাদ এবং এটি বর্তমানে স্পষ্ট বোঝা যায় জননেতা ও কূটনৈতিকদের এর প্রতি মনোভাব বিচার দ্বারাই শুধু নয়, এমন কি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারাও।

যাহোক, যখন জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জঙ্গীবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং জঙ্গীবাদ-বিরোধী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন করেছে, তখন ফেডারেল রিপাবলিকের বেলায় এর বিপরীতটাই সত্য হয়ে উঠেছে, বিষয়টি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে, যেহেতু এটি কেবল প্রাচীন জঙ্গীবাদী প্রুসীয় জার্মান সমরতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারণাকে সরলভাবে পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

জঙ্গীবাদী ধারণা সেইসব দেশের জনসাধারণের চক্ষে হেয়, যাদের এই শতাব্দীতে দুবার জার্মানীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, যদিও তারা আজ **ন্যাটোর** মধ্যে ফেডারেল জার্মানীর মিত্র। তারা বর্তমান কালের তরুণদের চক্ষেও হেয়, যারা নাৎসী জার্মানীর পাইকারীভাবে 'মগজ ধোলাইয়ের হাত এড়িয়েছে। তাছাড়া, ১৯১৮ ও ১৯৪৫ সালের পরাজয় জার্মান জঙ্গীবাদের অজেয় ধারণাটি, জার্মান জনসাধারণের স্বার্থের সহিত এর অভিন্নতা ও এর ইতিবাচক ভূমিকা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

গের্হার্ড রিটার, জার্মান ঐতিহাসিক দলের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিনিধি ১৯৫৪ সালে বলেছেন, "রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বপ্রধান কর্তব্যের মধ্যে একটি হচ্ছে যে অতীতকে বিচার করে বর্তমানের ঐতিহাসিক স্থান নির্ধারণ করা।" এই কথা বলা হয়েছিল সেই সময় যখন আডেনায়ার সরকার প্রাক্তন হিটলারীয় সেনাপতিদের সাহায্য গ্রহণ করে বুণ্ডেশয়র গঠন করছেন সমরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ, যার অঙ্গ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের নয়া নির্ধারিত পরিকল্পনা। খুব শীঘ্রই জঙ্গীবাদ পুনরুজ্জীবনকারী আদর্শবাদীদের সমবেত প্রচেষ্টা একত্রিত হয়েছিল ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রশ্নোত্তরের মধ্যে : ***কোয়েশ্চেনস অফ দি ডেস্টিনি অফ মর্ডানিটি*** (খণ্ড ১-৪, ১৯৫৭-৫৯)। কিন্তু তারও পূর্বে, বিশ্বযুদ্ধে জার্মান জঙ্গীবাদের দায়িত্ব ও তার দ্বারা জার্মান জাতির ক্ষতি এই অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রিটার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন :

"কেউ আর দায়ী নয়, কারণ বিরাট যুদ্ধ-যন্ত্র তার চিরন্তন সংঘাতসহ এমন বৃহৎ হয়ে উঠেছে যে তার কার্যের জন্য আর কোন একজনকে দায়ী করা চলে

না।" এর থেকে জঙ্গীবাদের স্বয়ংক্রিয় সম্বন্ধে এমন ধারণা জন্মায় যে, সংকটকালে এই অযৌক্তিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণকে অবজ্ঞা করে। সংক্ষেপে জঙ্গীবাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের স্থান দখল করে নেয় ঐতিহাসিক দায়িত্বহীনতা এবং পরিণামে, ঐতিহাসিক পুনর্বাসন।

পরে রিটার তাঁর ধারণা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে জার্মানীর ইতিহাসে জঙ্গীবাদের সমস্যা হচ্ছে একটি সমস্যা যা খুবই আপেক্ষিক ও যুদ্ধ কৌশলের সংগে জড়িত এবং ইতিহাস অনুসারে প্রয়োজন ও যুক্তিগ্রাহ্য. একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে যখন লুডেনডোর্ফের ন্যায় ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়, তখন এটি কূটনীতির পরিপন্থী হয় এবং রাজনীতি যুদ্ধের তাঁবেদার হয়ে ওঠে কিংবা যখন এটি হিটলারের ন্যায় শয়তানী শক্তির হাতিয়ার হয়। বিসমার্কের কূটনীতির আদর্শকে রিটার কিছুটা তুলে ধরেছেন। কিন্তু জঙ্গীবাদ-বিরোধী শক্তি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে থেকে তিনি 'র‍্যাডিকাল প্যাসিফিজম' বলে বর্ণনা করেছেন, রিটার তাদের ঐতিহাসিক নির্ভরতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন এবং যেহেতু 'রাষ্ট্র-নেতৃত্ব' একে গ্রহণ করতে পারে না 'আত্মহননের বিপদের মুখে না পড়ে' তাই তিনি এর অস্তিত্বের অধিকারকে অস্বীকার করছেন।

এই হচ্ছে সাধারণভাবে ঐতিহাসিক চিন্তাধারার আঁকাবাঁকা পথ, যা আধুনিক পরিবেশে জার্মান জঙ্গীবাদে পুনরুজ্জীবনের পুরনো ধারণার জাল বোনার চেষ্টা করছে। যাহোক, যদিও এটি সবচেয়ে ঐতিহ্যময় ও প্রতিক্রিয়াশীল তবু এটিই একমাত্র নয়। অন্য সবও আছে, আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত ও প্রাচীন ধারণা-বিরোধী, যা অতীতকে অস্বীকার করে নতুন দার্শনিক ঐতিহাসিক ধারণার খোঁজ করছে। পশ্চিম জার্মানীর অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত গণ্য কার্ল জাসপার 'জার্মান রাজনীতির মূলসমস্যা (১৯৬৩)' গ্রন্থে লিখেছেন, "অর্থনৈতিক বিস্ময় ও ওয়ারম্যাচেৎ হচ্ছে চমৎকার, কিন্তু তা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।" স্থায়িত্বের সন্ধান তিনি করেছেন তার মধ্যে, যাতে তিনি বর্ণনা করেছেন ইতিহাসের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। তাঁর মতে বিসমার্ক যেন আধুনিক জার্মান ইতিহাসের প্রবর্তক, প্রুসো-জার্মান জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক। তিনি সেই ভাবমূর্তিকে 'ইউরোপীয় ধারণা'র প্রতিভূ হিসাবে গড়ে তোলেননি যা আধুনিক পশ্চিম জার্মান ইতিহাসে প্রচলন হয়েছে (বিশেষ করে উইনস্টন চার্চিলের আদেনেউরকে বিসমার্কের সংগে তুলনা করার পরে)। বাহ্যত তিনি জার্মান জঙ্গীবাদের সমস্যার সংগে এই লৌহ চ্যান্সেলারের উল্লেখ করেছেন। তিনি বিসমার্কের কথা স্মরণ করেছেন,' একবার জার্মানী ঘোড়ার পিঠে বসলে নিজে থেকেই অশ্বচালনা শিখে নেবে," এবং আরও বলেছেন, "না, বিসমার্ক জনসাধারণকে অশ্ব-চালনা

শেখায়নি, বরং অমনধারা শিক্ষার অধিকার দেননি। বিসমার্কের পদত্যাগের পরে পরিণামের আভাস শুরু হয়—জনসাধারণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের কৌশলে শিক্ষাহীন এবং কাইজার, সেনাপতিরা ও শাসকগোষ্ঠীরা ঘোড়ার পিঠে বসা ছাড়া অশ্বচালনার কিছুই জানত না, তারা বাহনকে হাস্যকরভাবে লাফালাফি করানো ছাড়া কিছুই পারত না। ফলে এই দাঁড়াল যে সারা জগৎ ঘোড়াটাকে ঘোড়া না মনে করে পাগলা কুকুর মনে করে খতম করল। ১৯৪৫ সালে এই ছিল আমাদের অবস্থা।"

জার্মান জঙ্গীবাদের সঙ্গে জার্মান জনসাধারণের একাত্মকরণ দ্বারা জাসপারস জার্মানীর ঐতিহাসিক ভাগ্য সম্বন্ধে এক আংশিক ব্যাখ্যা এইভাবে উপস্থিত করলেন, যা অতীতের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতার আবরণে ঢাকা।

যেমন আমরা দেখি বিভিন্ন অঞ্চলে কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হয় বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা—কখনও সংরক্ষণশীল, কখনও দৃশ্যতঃ সমালোচনামূলক ও প্রাচীন ধারণার বাধ্যতামূলক নয়—যে জার্মান জাতির জঙ্গীবাদ বিরোধী শক্তি ঐতিহ্য কখনও ছিল না। এই কারণে যুক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান ইতিহাস ও জার্মান অস্তিত্ববাদী দর্শন একই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

জাসপারস বলেন, আজকে বড় কাজ হচ্ছে পশ্চিমের সংগে একতাবদ্ধ হয়ে ও তার ছত্রছায়ায় চলতে শেখা।"

তবুও দুটি বিশ্ব যুদ্ধের ও জার্মান জঙ্গীবাদজনিত ধ্বংসের পরে জাতির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে তার জঙ্গীবাদ বিরোধী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তার প্রয়োজন জঙ্গীবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে একতাবদ্ধ করা জঙ্গীবাদের পুনর্জন্ম ও তৃতীয় যুদ্ধের বিপদ মুছে ফেলা, যা আমাদের এই পারমাণবিক যুগে জার্মান জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ফেলবে। বহুকাল আগে হতেই জঙ্গীবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিরাজ করছে। যদিও প্রায়ই জার্মানরা প্রতিক্রিয়াশীল ও আক্রমণাত্মক শক্তির হাতের পুতুল হয়েছে, তবুও তার মধ্যে এমন শক্তিও সর্বদা ছিল যা তাদের প্রকৃত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করত। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দল ছিল, যাঁরা প্রতিকূল পরিবেশেও মাথা তুলে দাঁড়াত জাতির জীবনদায়ক দর্শনের সমর্থন প্রগতিশীল চিন্তার স্বপক্ষে, যা সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করত এবং কর্মে আহ্বান করত? এই চিন্তা ও কর্মের সংমিশ্রণ জার্মান রেনেসাঁসের কাল থেকেই প্রগতিশীল আন্দোলনের একটি অংগ।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমানতা, মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলীর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের প্রসার জার্মান ইতিহাসে এক নবযুগের চিহ্ন। প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম লাভ করল বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং সুনিশ্চিত লক্ষ্য। সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে তা সংগ্রামকে টেনে এনেছিল,

যা বর্তমানে জার্মান জনসাধারণের প্রকৃত জাতীয় ও গণতান্ত্রিক স্বার্থ রক্ষা করে। জার্মান শ্রমিক এবং সমগ্র জার্মান গণতান্ত্রিক শক্তি গর্ব বোধ করতে পারে যে একজন জার্মান, ফ্রেডরিক এঙ্গেলসই প্রথম যিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নতুন করে সমর সজ্জার প্রাক্কালে বিশ্ব নিয়ন্ত্রীকরণ পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেছিলেন। এটি ইউটোপিয়ান পরিকল্পনা ছিল না, বরং সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ, এমনকি পুঁজিবাদী পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও। অগাস্ট বেবেল, উইলহেম লিবেকনেট ও পল সিঙ্গারের মতো ঝান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট-রাও দৃঢ় জঙ্গীবাদ বিরোধী ছিলেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী-ফ্রাঞ্জ মেহরিং, ক্লারা জেট্‌কিন, কার্ল লিবেখনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবার্গ—জঙ্গীবাদ বিরোধী সংগ্রামের গভীর তাত্ত্বিক গবেষণায় এঁদের অবদান ছিল।

আজকাল বহু বর্জোয়া ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক স্বীকার করেন যে ১৯১৪-১৮ সালের প্রলয় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, বিশ্ব বাজারে আধিপত্য লাভের জন্যে যুদ্ধ। যদিও এই ধারণার জন্য, যা ভ্লাদিমির লেনিন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গড়ে তুলেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রবর্তনকারী শক্তির বিরুদ্ধাচরণের জন্য কার্ল লিবেখনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবার্গ তাঁদের প্রাণ দিয়েছিলেন।

আজকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তির সন্ধান করতে গিয়ে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা বলেন যে উইমার সাধারণতন্ত্রে কেউই নাৎসীদের ক্ষমতা লাভ আশংকা করেনি, যুদ্ধের কথা তো দূরে থাক। যদিও জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব অনুযায়ী কাজ করতো, তাঁরা সকলকে বারবার শুনিয়েছিলেন, "যে হিণ্ডেনবার্গকে ভোট দেবে, সে হিটলারকেই ভোট দেবে, যে হিটলারকে ভোট দেবে, সে যুদ্ধের জন্যেই ভোট দেবে।" অতীতের দিকে চাইলে এ কথাকে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু তখন বহু লোকই এটাকে 'কমিউনিস্ট প্রচার' বলে মনে করতো। জার্মানদের বেশ মূল্য দিতে হয়েছিল এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করার জন্য, যা একবারে ছিল নাৎসীবাদ, জঙ্গীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট সমানভাবেই বহু লোক যারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, তার সেই বর্বর লড়াইয়ে আদর্শগতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

"প্রতিভা বর্ধিত হয় শান্ত পরিবেশে, আর চরিত্র গড়ে উঠে মানব-জীবনের পূর্ণ স্রোতে," গোটে লিখেছেন। কমিউনিস্ট নেতাদের চরিত্র গড়ে উঠেছিল এই পূর্ণ স্রোতের মধ্যে, জঙ্গীবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন। বহু সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটের চেতনাও এই স্রোতে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। রুডোলফ ব্রিৎসসিডের মতো তাঁরাও বুঝেছিলেন যদিও দেরীতে এটা সত্যি, যে জার্মানীকে নাৎসীবাদ ও যুদ্ধ হতে যদি কিছু

বাঁচাতে পারে তা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত কার্যকলাপ। জার্মান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত যাঁরা, তাঁরাও বুঝেছিলেন। যদিও তাঁরা কমিউনিস্ট নন, তবু তাঁরাই 'অন্য জার্মানী'র আত্মা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ কথা বিশেষ করে কার্ল ফন ওসিৎস্কি সম্বন্ধে সত্য। জীবনের প্রথম দিকেই তিনি বুঝেছিলেন জার্মান ইতিহাসে জঙ্গীবাদের মন্দ প্রভাব এবং জঙ্গীবাদ ও ন্যাশনাল সোস্যালিজমের বাগাড়ম্বর ও কার্যকলাপকে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত তাঁর রচনাবলী পবিত্র ঝর্ণাধারার মতো জার্মানী ও পশ্চিম ইউরোপীয় বহু দেশের অসংখ্য সৎলোকের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করেছিল। এই সব লোকে জঙ্গীবাদের বিপদ অনুভব করেছিলেন, নাৎসীবাদ বিরক্তিকর বলে বোধ করতেন এবং জার্মান সাম্রাজ্য-বাদের বীভৎসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জীবনের কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাদের মধ্যে প্রাঞ্জল ক্ষমতাবান নির্ভীক ফ্যাসিবিরোধী লেখক কাল টুচোলস্কি সম্বন্ধেও এটি সত্য। ডেমোক্র্যাট ও হিউম্যানিস্ট লিওনার্ড ফ্রাঙ্কের কথা ব্যবহার করে বলা চলে এঁদের ধারা ছিল 'বাম, যেখানে হৃদয়টি ছিল।'

যদিও এই গ্রন্থটিতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গীবাদ সম্বন্ধে প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়েছে, তবুও লেখক কখনও বিস্মৃত হননি 'অন্য জার্মানী'কে, যে জার্মানী শ্রমিক শ্রেণীর, প্রশস্ত গণতান্ত্রিক চক্রের, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী-দের এবং এক মানবিক সংস্কৃতির, যা সকল মানুষের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছে ও বিশ্ব সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানকারী।

নাৎসী দুঃস্বপ্নের কালে যখন জার্মান জনসাধারণের বেশির ভাগই উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল বা ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং নাৎসীবাদ ও জঙ্গীবাদের অন্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, যেন জার্মানীতে বেশ কিছু লোক হয় ভাল ভাবে আত্মগোপন করেছিল, নয় প্রবাসে গিয়েছিল ফ্যাসিজম, জঙ্গীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। অবিশ্বাস্য কণ্টকর সংগ্রাম তাদের ইস্পাত দৃঢ় করে তুলেছিল। দৃঢ় বিশ্বাস ও ইচ্ছা শক্তিই এর মধ্যে দিয়ে তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিবিরোধীরা যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছিল অতীত সম্বন্ধে চিন্তা করে ও ভবিষ্যতের উপর ভরসা করে, জার্মান জাতির সম্মান পুনরুদ্ধারের সংকল্প করে।

সমকালীন প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করেছেন (কত সহজেই কিম্বদন্তী সৃষ্টি হয় আর কত ধীরে তা বিনষ্ট হয়!) যে ২০শে জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রকারীরাই ছিল হিটলারের জার্মানীতে একমাত্র দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ শক্তি। এটা উপেক্ষা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে, প্রতিরোধ আন্দো-লনকে এবং ফ্রি জার্মান কমিটিকে, ফ্যাসিজমে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রামকে। সেই সংগে এ বিকৃতভাবে উপস্থিত করে বিশে জুলাই

ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন অংশকে। ষড়যন্ত্রীদের অন্যতম প্রধান, যাঁর রাজনৈতিক-দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তাধারা বর্ধিত হয়েছে 'আধুনিক খৃস্টান ধারণা' ও পশ্চিম জার্মানীর 'ইউরোপীয় চিন্তাধারা', সেই গোয়েলারকে নায়করূপে তুলে ধরা হয়েছে অথচ তাঁর চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়াশীল স্বভাবটি তেমনি তর্কাতীত, যেমন ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার পরে তাঁর উচ্চতা বিভ্রান্তিকর। তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং অন্য ষড়যন্ত্রকারীদেরও আত্মসমর্পণে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই মর্মে তাঁর লিখিত চিঠিটি সত্যি অদ্ভুত। তিনি লিখেছিলেন, "বিশে জুলাইকে ঈশ্বরের শেষ বিচার বলে আমরা বিবেচনা করব। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফ্যুয়েরার বেঁচে গেছেন। রক্তাক্ত অপরাধের মূল্যে যে জার্মানীর অস্তিত্ব আমি ক্রয় করতে চেয়েছিলাম, তা ঈশ্বর চাননি। আরও একবার তিনি ফ্যুয়েরারের উপরই কর্তব্যভার ন্যস্ত করেছেন। এটাই পুরাতন জার্মান নীতি। প্রত্যেক জার্মান যারা ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছিল, এখন ফ্যুয়েরারের সংগে যোগ দিতে বাধ্য যাঁকে ভগবান রক্ষা করেছেন।"

প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রকৃত নায়কেরা গোয়েলারের মত চিন্তা, অনুভব বা কার্য করেন নি। তাঁদের দর্শন ভিন্ন প্রকার, কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা জীবন সচেতন সেই দর্শন, গভীর ধারণার, স্বাধীন চিন্তাধারার, সতীর্থ ও ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ববোধসম্পন্ন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে সেনাপতিদের ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার ছ'মাস আগে, বাউৎজেনের এক 'মৃত্যু-শিবিরে' এক বন্দী তাঁর এক কমরেডকে বিদায় জ্ঞাপক চিঠি লিখেছিলেন, যা চিরকাল লিপি লিখনের এক সুন্দর নিদর্শনরূপে গণ্য হবে, মানুষের সাহসের এক বিস্ময়কর স্মৃতিফলক। এই চিঠিতে সমকালীন সকলকে ও ভবিষ্যৎ পুরুষদের উদ্দেশ্যে আর্নস্ট থেলম্যান তাঁর "ঐতিহাসিক সত্য আছে এবং রাজনৈতিক বিবেক বলেও কিছু আছে, যাতে প্রয়োজন হয় এই সত্যকে অনুসরণ করার। দীর্ঘকাল সত্যকে মিথ্যা করে রাখা চলে না, কারণ তথ্যকে বিকৃত করার মতো কিছু নেই। সর্বদা মনে রাখবে আমাদের বিবেক পরিষ্কার, জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে তা কোন রূপেই কলঙ্কিত নয়। এই ভারাক্রান্ত নয় যুদ্ধাপরাধে, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন নীতিতে, স্বেচ্ছাচারে, অত্যাচারে, একনায়কত্বে, কারও মানসিক পীড়নে, অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করে, অপব্যবহারে মেকি-সমাজতন্ত্রবাদে ও ফ্যাসিস্ট জাতীয় তত্ত্বে, রোজেনবার্গীয় দার্শনিকতায়, ঔদ্ধত্যে, গর্বে, ইত্যাদিতে আমরা নিষ্কলঙ্ক।"

থেলম্যানের তাঁর পার্টি সম্বন্ধে গর্ব করার যথেষ্ট কারণ ছিল, সে ঐতিহ্য পশ্চিম জার্মানীর কমিউনিস্টরা আজও পালন করেন এবং যা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের শ্রমিকদের প্রেরণা দেয়, যাঁরা নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করছেন। সর্বদা সাফল্যে ও ব্যর্থতায়, থেলম্যান নিজের ও তাঁর পার্টির

গতিপথ পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করেছেন, সম্মুখের পথ ভালভাবে দেখার জন্য। সেলের মধ্যে তিনি লিখেছেন, "নিশ্চয় আমরা নির্দোষ দেবদূত নই। আমরাও বিরাট, এমন কি কখনও কখনও মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করেছি। দুঃখের বিষয়, আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এবং মুলতুবী থেকে গেছে এমন অনেক জিনিস যা করা উচিত ছিল……নাৎসীদের ক্ষমতায় আসতে বাধা দেওয়ার জন্য।"

ভ্রান্তি স্বীকার করাই নতুন প্রচেষ্টার পথ পরিষ্কার করে দেয়। ফ্যাসিস্ট বিরোধীরা বিস্ময়জনক আত্মাহুতি দিয়েছিল। শুধু ১৯৪৪ সালেই গেস্টাপোরা প্রায় পাঁচ লক্ষ লোককে ধরেছিল। অন্য জার্মানীর ফ্যাসী-বিরোধীফ্রন্টের রাজনৈতিক বিশালতা ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি যাঁরা ব্রুসেলস ও বার্ন সম্মেলনে নীতি ও কৌশল স্থির করেছিল, তাঁরা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তবুও কমিউনিস্টদের নাম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট খৃশ্চানস, বহু সহস্র শ্রমিক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী, যারা ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ কর্তব্য করেছিলেন তাঁদের নামের পাশেই রাখা হয়। প্রকৃত ফ্যাসি বিরোধী দেশপ্রেমিকদের এক দল বিশে জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রের সংগেও জড়িত ছিলেন। এই দলের মাথা কর্নেল ক্লস শেনেক ফন স্টাফেনবার্গ ও ক্রিসো চক্রের সভ্যোরা (গ্রাফ হেলমুথ ফন সোলৎকে, অ্যাডাম ফন ট্রট জু সোলজ· প্রভৃতি) জাতির গণতান্ত্রিক ফ্যাসী বিরোধী ও জঙ্গীবাদ বিরোধী শক্তিগুলির সংগে সংযোগের চেষ্টা করেছিলেন।

বর্তমানে দুটি জার্মানী আছে। একটি দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক জংগীবাদ বিরোধী আদর্শ ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ও জার্মান জাতির ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য কার্য করে চলে। কিন্তু সীমান্তকে অস্বীকার করার পদ্ধতি ঐতিহ্যের আছে। ফেডারেল রিপাবলিকেও তা জীবন্ত, যেখানে কমিউনিস্ট বিরোধিতার পতাকাতলে আক্রমণাত্মক সংশোধনবাদী ও সমরবাদের পথের বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া জনতাকে জাগরিত করে তুলছে।

জনতার গভীরে এখনও এই অলংকার অনুভূতি প্রবিষ্ট হয়নি বটে, তবে ইতিমধ্যেই নানাভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে, সর্বোপরি, রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে নব জাগরণের মাধ্যমে। জন সাধারণ বুঝতে পারছে যে কমিউনিস্ট বিরোধিতার আদর্শের সংগে 'চাল-তরোয়াল'-এর রণনীতি সংমিশ্রণ জার্মান জংগীবাদীদের হাতে সিঁদ কাটার যন্ত্রস্বরূপ, যা তারা ব্যবহার করছে পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সামনের সারির আসন দখলের জন্য। আগে হোক বা পরে হোক, ইতিহাসের তথ্য ও শিক্ষা ফেডারেল রিপাবলিকের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করবে যে আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তির সংগে তাদের সহাবস্থান জার্মান জাতিকে একবারে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছে এবং বিভিন্ন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছাড়া দুই জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে মিলন এবং জার্মান জনসাধারণের ইউরোপের তথা

বিশ্বের জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত নয়। সমকালীন জগতের বিরাট পরিবর্তন, আমাদের যুগের বাস্তবতা, ইতিহাসে এই প্রথমবার প্রদান করছে নতুন বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ এড়াবার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আশাবাদী সম্ভাবনা।

সংক্ষেপে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারমাণবিক ধ্বংসের মধ্যে বেছে নিতে হবে। এই নির্বাচনকালে আমাদের গণ্য করতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কমিউনিস্ট-বিরোধী ভয়ংকর নীতির পরিক্রম এবং বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে জার্মান জংগীবাদের ফেলা রঙের দাগ। কেউ আক্ষেপ করতে পারে যে এই নির্বাচন কল্পনার একাংশ নয় যা অতীত ইতিহাসের কিছু ঘটনাকে ছোট করে তুলতে ইচ্ছুক আনুমানিক ভবিষ্যতের অন্য কিছু ঘটনাকে বড় করে দেখাবার জন্য। না, এ নির্বাচন অপ্রীতিকর কিন্তু একে এড়ানো চলে না, আমাদের পারমাণবিক যুগের অবর্ণনীয় বিপদাশংকায় এ পূর্ণ। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একে অনুমান করে নিতে হবে এবং একে হৃদয়ংগম করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে হবে, আধুনিক পরিস্থিতির জটিলতা ও বৈচিত্র্যের দ্বন্দ্বমূলক চিন্তা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকালে অতীতের এই শিক্ষা সাহায্যই করবে।

এই মতানুসারে ঐতিহাসিক চিন্তা কখনই বর্তমানকে বাদ দিয়ে সুদূর অতীতে বা বিগত দশকে নিবদ্ধ থাকে না। ঐতিহাসিক তাঁর কালেরই জাতক এবং যখনই তিনি দূর বা নিকট অতীত সম্বন্ধে গবেষণা করেন তখন কিছুতেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। যত সামান্যই তাঁর অবদান হোক না কেন, তিনি কেবল ঘটনাবলীর আবৃত্তির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না। তাঁর পরিশ্রম অন্ততঃ একটি বিন্দুসম হবে জীবন-স্রোতধারা ও সংগ্রামের মাঝে, যা ইতিহাস ও আধুনিককাল নামে পরিচিত।

একথা বলার কি প্রয়োজন আছে যে, সৃজনশীল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সর্বদা ছিল ও সর্বদা থাকবে ঐতিহাসিকের দিক্ দর্শন যন্ত্র। যেমন কার্ল মার্কস *'পুঁজি'* লেখার কালে ব্রিটেনের ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, কারণ সেই দেশটিকে তিনি মনে করতেন সুস্পষ্টভাবে পরিণত পুঁজিবাদের আবাসগৃহ বলে; তেমনি লেনিন *'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর'* লেখার কালে ওই একই কারণে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

তাঁর *'সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নোট বই'* ঐতিহাসিকদের সুযোগ দেয় লেনিনের সৃজনশীল গবেষণাগারে স্বাগত দৃষ্টি নিক্ষেপের। সাম্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে এবং তার জার্মান ধরনটা বিশেষভাবে গবেষণা করার জন্য তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, তার কিছু দিক দেখতে পান তাঁরা।

এখন এই বইটি, যা প্রায় জীবৎকালব্যাপী রচিত হয়েছে, সম্পূর্ণ হলো, লেখক এর বহু ভুলত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এমন কি যদি সময় থাকত, তাহলে তিনি আবার এটাকে নতুন করে লিখতেন। সেটাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞান, জীবনের মতোই গতিশীল এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

আগস্ট, ১৯৬৪

প্রথম খণ্ড

"ওয়েলটপলিটিক"— যুদ্ধ ও পরাজয়ের পথ

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান বৈদেশিক নীতি

[সমস্যা এবং কারণ]

প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শাসকশ্রেণী যখন বিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তখন তারা যে অন্যান্য আশাবাদ এবং বল্গাহীন আত্মপ্রশংসায় বিলাসিতা করেছিল, তা আমাদের সমসাময়িকরা প্রায় কল্পনা করতে পারবেন না। শিল্পের বিপুল উন্নতি সর্বাধিক উজ্জ্বল আশার সৃষ্টি করেছিল। ১৯০০ সালে প্যারিতে শুরু হওয়া বিশ্বমেলা মনে হয়েছিল, পুঁজিবাদী ঐশ্বর্যের এক নতুন যুগ শুরু করবে। হেগে ২৬টি জাতির সম্মেলনে "মাটির যুদ্ধের নিয়মকানুন"-এর স্বাক্ষরিত ঘোষণা বুর্জোয়া সংবাদপত্রকে শান্তিরক্ষার সম্মিলিত প্রচেষ্টার সম্ভাবনা হিসাবে স্থাপিত করতে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সে সবই ছিল মহিমাময় ভ্রান্তি। হেগের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের কিউবাতে প্রতিষ্ঠা লাভে, ফিলিপিনসের দখল সম্পূর্ণ করায়, চীনের সম্মুখসীমায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করায় বাধা দেয় নি· যখন বৃটিশ সাম্রাজাবাদীরা দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ক্যারোলিন ও মার্শাল দ্বীপ ও সামোয়ার এক টুকরো অধিকার করল তুরস্ক ও চীনে এক সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা শুরু করল এবং একটা নতুন পরিকল্পনা রচনা করল। তারা ফরাসী সাম্রাজাবাদীদের আফ্রিকা আর ইন্দোচীনে তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ বাড়ানোয়, মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকার স্থাপনেও বাধা দেয় নি, তখন জাপানীরা কোরিয়াতে তাদের অধিকার দৃঢ় করেছে, পিকিং-এর রাজসভায় প্রভাব বাড়িছে এবং রাশিয়ার সংগে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভাগ সম্পূর্ণ করার জন্য ঝুঁকে পড়েছিল, যে পৃথিবী তখনই একটি ভীষণ পুনর্বিভাগের ভারসাম্যে অবস্থিত। কোন বৃহৎ শক্তি ইউরোপীয় বা অ-ইউরোপীয়, উদাসীন দর্শক মাত্র হয়ে থাকতে চায় নি। সকলে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল।

তবুও মধ্যবিত্ত ঐতিহাসিক, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক লেখকরা সর্বত্র ঘোষণা করেছিল যে, পুঁজিবাদী শক্তির শান্তি প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, কারণ, ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ থেকে আর কোন সামরিক দ্বন্দ্ব ইউরোপকে ত্রিশ বছরে নাড়া দেয় নি। বিস্ময়কর নয় যে, প্রতিটি শক্তি এর কৃতিত্ব দাবী করেছিল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উৎসাহী ভাববাদীরা কিংবদন্তী তৈরী করেছিল যে, ইউরোপে তার ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি ও কার্যকরী বৈদেশিক নীতির জন্য জার্মান সাম্রাজ্যের কাছে ঋণী—এই কিংবদন্তীর স্বরূপ পরে বুদ্ধিদীপ্তভাবে লেনিন প্রকাশ করেছিলেন, যিনি সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বৃদ্ধির সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসকে শাসনকারী আইনের আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, ইউরোপের আপেক্ষিক শান্তির সবচেয়ে বড় কারণ হল, ঔপনিবেশিক অঞ্চলের অবিশ্রাম যুদ্ধ।[১]

শতাব্দীর প্রথমে ঘটনাবলীর বুর্জোয়া ভাববাদীদের অংকিত গীতিময় চিত্রের সংগে কোন সাদৃশ্য ছিল না। প্রধান পুঁজিবাদী শক্তিগুলির শান্তি প্রচেষ্টা ফলবান হচ্ছে, এই যে বিবাদ, যা হেগ সম্মেলনের সময় উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল (শুধু শান্তিবাদীদের দ্বারাই নয়), যা শক্তিগুলির দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা যখন কিউবা এবং ফিলিপাইনসের ওপারে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছিল, তখন জার্মান কূটনীতি শান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ এড়ানোর জন্য সম্মিলিত কার্য গঠনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তা যে বিফল হয়েছিল, সেটা অন্য ব্যাপার। স্পেনীয়-আমেরিকান যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতার এক জটিল বিশৃংখলা সৃষ্টি করল এবং অচিন্ত্যভাবে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সম্মিলিত হস্তক্ষেপ ঘটাল। উপরন্তু এটা শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা, যারা পরিকল্পনার রচয়িতা, তারা শান্তিকে বাঁচানোর ব্যাপারে সবচেয়ে নিরুৎসাহী এবং স্পেনীয় উপনিবেশগুলির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আঞ্চলিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেশী উৎসাহী।

তারা যা চেয়েছিল, তা পেল এবং সেটা নিশ্চয়ই শান্তির পক্ষে হস্তক্ষেপের দ্বারা নয়, বরং যুদ্ধোচিত ভীতিপ্রদর্শন এবং জার্মান নৌ-শক্তির মহড়ার দ্বারা।

বুয়র যুদ্ধের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের ধারণা ঘৃণাভাবে ভেঙে পড়ল, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল, অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একটি আংগুল নাড়াল না। তাদের প্রত্যেকে যা চেয়েছিল তা হ'ল বৃটেনের অতিরিক্ত অসুবিধা সৃষ্টি করতে এবং তার থেকে কিছু

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪০১।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে। যে একমাত্র বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি চায়নি যে, তার ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী বুয়র সাধারণতন্ত্রকে তাদের সোনা আর হীরের খনিসহ গ্রাস করে, সে হ'ল জার্মানী। প্রভাবশালী জার্মান অর্থ-সম্প্রদায় ডিউটশে ব্যাঙ্ক এবং ডিসকণ্টো গেসেলশফ্টের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজেরাই বুয়র সাধারণতন্ত্রের দিকে লোভী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল এবং প্রথমে ব্রিটিশ আক্রমণকে নিরুৎসাহ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ অর্থ পুঁজিবাদীরা, বিশেষতঃ, রথ্স্চাইল্ড, জোসেফ চেম্বারলেন এবং সিসিল রোড্স্ ডিউট্শে ব্যাঙ্ককে মধ্যপ্রাচ্যে আর্থিক এবং কূটনৈতিক সাহায্য দিতে চাইল এই শর্তে যে, শক্তিশালী জার্মানগোষ্ঠী বুয়রদের তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবে। সমগ্র যুক্ত-জার্মানী, যারা বছরের পর বছর জাতিগত ভাববাদ এবং জার্মান-দক্ষিণ আফ্রিকার পরিকল্পনার কথা প্রচার করেছে, তারা সরকারের 'সহোদর ভাই'-এর প্রতি "বিশ্বাসঘাতকতার" বিরুদ্ধে প্রচার করতে লাগল, কিন্তু সেটা অমনোযোগের সঙ্গে এবং প্রেরণাহীনভাবে করতে লাগল। ১৯০০ সালে বুয়র প্রতিরোধ ব্রিটিশদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক অসুবিধা না সৃষ্টি করা পর্যন্ত, সেটা কিছুটা প্রাণবন্ত হয় নি।

তুরস্কে অর্থনৈতিক বিস্তারে লণ্ডনের সমর্থনে সন্তুষ্ট না হয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বীর অসুবিধার সুযোগ নিতে এবং অন্যত্র বিস্তৃতি ছড়াতে চাইল, বিশেষতঃ চীনদেশে। ব্রিটেনের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা, যেমন ফ্রান্স এবং বিশেষতঃ জার আমলের রাশিয়াও, প্রত্যেকে তার নিজের স্বার্থে তার অসুবিধার সুযোগ নেওয়ার জন্য নিশ্পিশ্ করছিল। দ্বিতীয় নিকোলাস এই ধারণার প্রশ্রয় দিলেন, যে, সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাবি তাঁর হাতে। তিনি কিভাবে মধ্য এশিয়ায় সৈন্যবাহিনী জড় করবেন এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিযোগিতার আহ্বান জানাবেন, তা পর্যন্ত তিনি গোপনে পরিকল্পনা করতে লাগলেন। যদিও তিনি স্থূলবুদ্ধি ছিলেন, তবুও যথাসময়ে তিনি বুঝতে পারলেন, যে তাঁর প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব—সৈন্যবাহিনী, অর্থ, যোগাযোগব্যবস্থা এবং পরিবহণ এবং এই নিশ্চয়তা যে, অন্য শক্তিগুলি তাঁর পক্ষ নেবে। শুধু জার্মান কূটনীতি তাঁকে বাধা দিচ্ছিল, কারণ জার্মানির শাসকরা এবং একচেটিয়া সংবাদপ্রতিষ্ঠান, যারা খোলাখুলিভাবে *ড্র্যাং ন্যাক অস্টেন* নীতি ঘোষণা করছিল এবং এশিয়া মাইনর ভেদ করে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত যাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল, তারা বিশ্বাস করত যে, ব্রিটেন আর রাশিয়ার মধ্যেকার তীব্র পরিস্থিতি তাদের বুয়র যুদ্ধের চেয়েও বেশী লাভবান করবে।

দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর দিক থেকে কাইজারের জার্মানিকে বৃটেনের উপরে চাপাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ জার্মান কূটনীতি দক্ষিণ আফ্রি-

কায় শান্তির জন্য মিলিত প্রচেষ্টার ধারণায় ফিরে যাওয়া স্থির করল, বৃটেনের অতিরিক্ত অসুবিধা সৃষ্টি এবং ঔপনিবেশিক ক্ষতির দিকে তার নতুন অবদানের আশা করে। জার আমলের রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে গোপন আলোচনা শুরু হল। সূক্ষ্ম আলোচনা অতি সতর্কতায় পরিচালিত হতে লাগল কারণ, আলোচনাকারীরা পরস্পরকে বিশ্বাস করত না, আশা করত যে অংশীদাররা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাদের বৃটেনের সঙ্গে বিরোধ ঘটাবে, যে বৃটেনের আর্থিক নৌশক্তি বিশ্বরাজনীতিতে তার কূটনৈতিক ওজনের সহযোগিতায় তখনো খুব বেশী মনে করা হত। যাই হোক, শেষে আলোচনার কথা বৃটিশদের কাছে পেঁৗছায়নি এবং জার্মান কূটনীতি হীন ভীরুতায় চেষ্টা করেছিল আলোচনার দোষটা রাশিয়ার উপরে চাপাতে তিনি তাঁর দিক থেকে সেটা কাইজারের উপরে চাপালেন। সুতরাং কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের নতুন প্রচেষ্টাও অসফল প্রমাণিত হল।

ইতিমধ্যে একট বিশ্ব অর্থনৈতিক দুর্যোগ দেখা দিল। সেটা ১৯০০ সালে রাশিয়ায় শুরু হল এবং ক্রমশঃ অধিকাশ পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলিতে, বিশেষতঃ জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ল। তখনই এর প্রতিক্রিয়া দুটি সংযুক্ত পথে বোঝা গেল : প্রথমতঃ এটা মূলধনের কেন্দ্রীকরণকে এবং একচেটিয়ার বৃদ্ধিকে জাগিয়ে তুলল এবং দ্বিতীয়তঃ এটা শক্তিগুলির বিস্তারী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিল।

যখন বিংশ শতাব্দী এল ও পুরনো "মুক্ত" পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদকে পথ ছেড়ে দিল, তখন সাম্রাজ্যবাদী বৈপরীত্যগুলি, যেগুলি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে সমস্ত পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছিল, তা একটি বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক সৃষ্টি করল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সর্বাধিক শক্তিশালী প্রসারণশীল শক্তিতে বেড়ে উঠল পৃথিবীর পুনর্বিভাগের বিরাট আতঙ্ক নিয়ে।

আমাদের যুগের পক্ষে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাহিনী হল সর্বোপরি, প্রসারণশীলতার এবং এর দ্বারা উন্মুক্ত দুটি বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী। অতএব, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের, বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে, বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি জানার গুরুত্ব সুস্পষ্ট। এটা ঐতিহাসিকদের আগ্রহকে সোভিয়েত জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে এবং অন্যত্র আকর্ষণ করছে।

বিষয়টির অনেক দিক আছে এবং একটি বিস্তৃত নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তু আছে। আমি দেখাতে চাই কিভাকে অনুসন্ধানকারীকে নতুন অথচ অনাবিস্কৃত উপাদানগুলির সন্ধান করতে হবে এবং অন্যদিকে কিভাবে তাঁর বিচিত্র উৎপত্তির এই নতুন উপাদানগুলির পরীক্ষা তাঁকে এমন সমস্যার মোকাবিলা করতে বাধ্য করবে যে সমস্যা জার্মান সাম্রাজ্যবাদ এবং সমরবাদের ইতিহাসের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চিরাচরিত ধারণাগুলিকে ছাড়িয়ে যায়।

পুরনো ধারণা সাধারণ পরিভাষায় এইভাবে সীমাবদ্ধ—"বুলো যুগ", জাংকারডম এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং নৌ-উন্নতি পরিকল্পনার "একত্রীকরণ নীতির" যুগ। এটা, জার্মান স্বরাষ্ট্রনীতি এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে, ১৯০০ সালে চীনের উপর প্রভাবের ইংগ-জার্মান চুক্তির ক্ষেত্রে, ১৯০১ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মৈত্রীর ইংগ-জার্মান আলাপ-আলোচনায়, তুরস্কে জার্মানীর হস্তক্ষেপ এবং বাগদাদ রেলপথের সুযোগের আলোচনার চূড়ান্ত অবস্থায়, রুশ-জাপান যুদ্ধে জার্মান কূটনীতিতে। ইংগ-জার্মান নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা জার্মানীকে 'ঘেরাও নীতির'-র সূচনা, মরক্কো সংকট, জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী-বৃটেন, ফ্রান্স আর রাশিয়ার মধ্যে মতভেদের সুযোগ নেওয়ার নীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পশ্চাৎপদক্ষেপরূপে আঁতাতের উদ্ভব।

এই সনাতন বিষয়গুলি, যা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রশ্ন থেকে আলাদা-ভাবে বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতিগুলি নিয়ে কাজ করে, যাকে জার্মান মধ্যবিত্ত ঐতিহাসিকেরা অতিক্রম করতে অস্বীকার করেন, "জাতীয়" বৈদেশিক নীতি প্রকৃত লক্ষ্যকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য জার্মান মধ্যবিত্ত ঐতিহাসিকদের ইচ্ছায় এর প্রথম উৎপত্তি, বিশেষতঃ জার্মান এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া নীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের খুঁটিনাটিতে এবং এই পদ্ধতির প্রতি অন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তিগুলির প্রতিরোধেও, দ্বিতীয়তঃ, এই সত্যে যে, Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914 মধ্যবিত্ত অনুসন্ধানের প্রধান উপাদান, যা একেবারে কূটনৈতিক দলিলের সংগ্রহ। জার্মানে মধ্যবিত্ত ঐতিহাসিকরা কিছুটা দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে পড়লেন। যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁরা জার্মানীর বৈদেশিক নীতিকে "বিশ্ব-রাজনীতি"রূপে এঁকেছিলেন তবুও তাঁরা এটাকে দূরপ্রাচ্য ও মরক্কোর প্রশ্নে লিপ্ত ইউরোপীয় ও এশিয়া মাইনর রাজনীতিতে নামিয়ে আনলেন, শুধু যেহেতু এটা ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যের পরিস্থিতির উপরে প্রতিক্রিয়া করেছিল। এই বিস্তৃত "ইউরোপকেন্দ্রিকতা"-র মূল ছিল জার্মান সমরবাদে, যে সমরবাদ ইউরোপে যুদ্ধের দ্বারা সংগৃহীত ওয়েলটপলিটিক *(বিশ্বরাজনীতি)* তথা জার্মান বিশ্ব আধিপত্যের সুরই গেয়ে চলেছিল।

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা (প্রাক্‌যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর) জার্মানীর সাম্রাজ্য-বাদী বৈদেশিক নীতি এবং কূটনীতির পিছনে জার্মান প্রসারণ এবং উদ্দেশ্য-মূলক শক্তিরতলায় থাকার পদ্ধতিকে একেবারে আলাদা ছেড়ে দিয়েছিল। জার্মান ঐতিহাসিকদের একজন হোমরা-চোমরা ফ্রেডরিখ মেইনেক সত্যই একবার সমস্যাটা নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সব কিছু ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, রপ্তানী শিল্পবাদ, নৌ-অট্টালিকা, টার্পিটজের নৌ-নীতিগুলি এবং নৌ-অস্ত্র পরিকল্পনার জন্য সমর্থন আদায় করতে ও প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে শহরে এবং গ্রামে কর্মদাতাদের একত্র করবার নীতি

রাষ্ট্রকে তাদের উদ্দেশ্যের বাহক করছে [জাংকারডম এবং বুর্জোয়ার। —এ-ওয়াই], এইভাবে জাতির সামাজিক বিভাগ ঘটাচ্ছে।

যা হোক, জার্মান বুর্জোয়া ইতিহাস এই সাধারণ নিয়মের বাইরে এক পাও এগোলো না। G. W. F. Hallgarten in Imperialismus vor 1914 এবং E. Kehr in Schlachtflottenbau und Parteipolitik-এ সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতির, বিশেষতঃ জার্মানীর "সামাজিক ভিত্তি"-কে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অনুসন্ধান, যা যথেষ্ট ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক সংখ্যার সংগে জড়িত, তা নিঃসন্দেহভাবে আকর্ষণীয়, কিন্তু তাতে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ-তত্ত্বের প্রাণশক্তির অভাব। যদিও হলগার্টেন, যাঁর কাজে সবচেয়ে নজর দেওয়া হয়, অনুকূলভাবে আমার লেখার উল্লেখ করেছেন, Vneshnaya politika i diplomatiya germanskogo imperializma v kontse XIX veka (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি), এবং যদিও Renouvin রোমে দশম আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক সম্মেলনে তাঁর আলোচনায় বলেছিলেন যে, আমাদের দুজনের লেখাই কাছাকাছি এবং একটা নতুন পথ উপস্থিত করেছে, তবুও আমি ভাবতে ইচ্ছুক যে, তাঁরা শুধু যে ভঙ্গীতেই বিশেষভাবে আলাদা তা নয়, উপরন্তু নাগরিক দেশে সাম্রাজ্যবাদের মূল সমস্যা এবং শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাব ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতি এবং কূটনীতির জন্য ঔপনিবেশিক জনগণের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উপস্থাপনাতেও তফাৎ।

একজন সোভিয়েত ঐতিহাসিক, যে জার্মান বৈদেশিক নীতির বর্ণনা করতে এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধের প্রধান বিষয়গুলির উপরে কার্যকরী জার্মান কূটনীতি বিশেষতঃ ইউরোপীয় সংকট জাগিয়ে তোলায় তার ভূমিকা ও পদ্ধতি দেখাতে চায়, তার পাওয়ার মত বাস্তব ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্টের চেয়ে বেশী থাকে—বড়সড় Staatsarchiv, Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette-এর খণ্ডগুলি, British Documents, Documents diplomatiquea francais, Krasng arkhiv বিশাল সংখ্যক স্মৃতিকথা, অসংখ্য অনুসন্ধান এবং শেষ অথচ গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে রুশ বৈদেশিক নীতির দলিল বিভাগে উপকরণের সম্পদ। আকর্ষণীয় খুঁটিনাটি এবং অতিরিক্ত তথ্য সম্প্রতি প্রকাশিত Friedric von Holstein-এর ব্যক্তিগত দলিল সংগ্রহেও পাওয়া যায়, যিনি জার্মান কূটনৈতিক ধারার বিখ্যাত বুদ্ধিমান, যিনি বিসমার্ককে ফেলে দিতে সাহায্য করেছিলেন এবং রাশিয়া আর বৃটেনের মধ্যে "পেণ্ডুলাম" নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সমালোচনার সংগে এবং খুঁটিয়ে ব্যবহার করলে, এই উপাদান-গুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রথম বিশ্ব-

যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত জার্মান বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির বিচিত্র পথ ও উপপথের ধারণা যোগায়। তার দ্বারা জাংকার এবং বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতির উপরে প্রভাবের উন্মোচনের ভূমিকা তৈরী হওয়া উচিত—অর্থনৈতিক মুষ্টিমেয়ের শাসনের বিভিন্ন দল, শৈল্পিক একচেটিয়া নীতি ও জাংকারডম ইত্যাদি এবং বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক নীতির বিষয়ে শ্রেণী ও দলসংগ্রামের আভ্যন্তরীণ পদ্ধতিকে প্রকাশ করা উচিত।

আমার মনে হয় যে, জার্মান স্বদেশনীতি ও শ্রেণীসংগ্রামের যুগপৎ সমকালীন পর্যালেচনা, ঔপনিবেশিক নীতি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি অনেক সুযোগ দেয়। প্রথমতঃ এটা অনুসন্ধানকারীকে ঐতিহাসিক দৃশ্য উন্মুক্ত করতে সক্ষম করে। দ্বিতীয়তঃ, তখন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়মের সংগে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় স্বাদেশিক ও বৈদেশিক নীতির পরীক্ষা করতে পারেন, যা কখনও স্থির নয়, সর্বদা গতিশীল[১]। তৃতীয়তঃ, এটা দেশে দেশে পুঁজিবাদের অসমবৃদ্ধিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, যা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজিবাদের প্রবেশের যুগে দৃশ্যমান অন্যতম প্রধান সূত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জার্মান বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির সমস্যা, একদিক দিয়ে, পূর্ববর্তী বছরগুলির মত, কিন্তু এতে তাত্ত্বিক এবং বাস্তব ঐতিহাসিক প্রসংগের অনেক নতুন উপাদান আছে। চ্যান্সেলারের পরিবর্তন নয়,—হোহেনলোহের পদত্যাগ এবং বুলোর আবির্ভাব নয় কিন্তু ১৯০০-১৯০৩ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট আমাদের আলোচনার আরম্ভের সূত্র হওয়া উচিত।

যে সংকট দেশে দেশে বিভিন্ন পথে গিয়েছিল তার দূর প্রসারী ফল হয়েছিল। এর অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত ভাল করে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু লেনিন যেমন বলেছেন, এটা কার্টেল অর্থনীতির মধ্যে[২] সম্পূর্ণভাবে ঘটেছিল, বিশেষতঃ সেটা জার্মানীতে ঘটেছিল এবং প্রচণ্ড স্বদেশী ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ফল দেখা দিল। অতএব, গভীর অন্তরসম্বন্ধে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন উৎপত্তির সূত্রগুলি দেখা দরকার।

একচেটিয়া কারবারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং জার্মান ব্যাংক, কার্টেল আর ট্রাস্টের, Krupp এর যুদ্ধসংস্থা, শিল্পপতিদের জার্মান ইউনিয়ন, জমির মালিকদের ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সংস্থা যারা জার্মান সরকারের নীতির উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাদের ইতিহাসের উপকরণ আবিস্কার করাকে আমি স্বাভাবিক মনে করেছিলাম। যে দলিলগুলি আমার প্রয়োজন ছিল, সেগুলি

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪০১, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ২৬৪ ;
২। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৭২ ;

অংশতঃ পট্‌সডামে কেন্দ্রীয় জার্মান দলিল বিভাগে, অংশতঃ বার্লিন জার্মান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহে আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে, আমি ডিউট্‌শে ব্যাংকের কিছু কাগজ পেয়েছিলাম। ক্রমবর্ধমানভাবে, এই উপকরণগুলি লেনিনের কথার সংগে মিলে যায়, যিনি বলেছিলেন যে, একচেটিয়া কারবার ১৯০০-১৯০৩-এর সংকটে বৃহত্তর, সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা লাভ করেছিল। সেগুলি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির উপরে জাংকারডম এবং একচেটিয়া কারবারের প্রচুর ও সরাসরি প্রভাবকেও প্রকাশ করে, বিশেষতঃ, কর্মীশ্রেণী ও পোলিশ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেই সংগে রাইখ্‌স্ট্যাগের ভেতরে ও বাইরে প্রত্যক্ষ ও অ-প্রত্যক্ষভাবে বুর্জোয়া এবং জাংকার দলের মাধ্যমে বৈদেশিক নীতির উপর তাদের প্রভাব সম্বন্ধে। তাছাড়া, তারা জার্মানীর ভিতরে ও বাইরে সংবাদপত্রের উপরে প্রভাবকেও প্রকাশ করে।

অতি আক্রমণাত্মক জার্মান সাম্রাজ্যবাদী উপাদানের ভাববাদী মূলঘাঁটি, সমগ্র জার্মান ইউনিয়নের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষ আকর্ষণীয়। বুর্জোয়া সাহিত্য বিষয়টি বিকৃত করার ঝোঁক দেখায়। The Alldeutsche Blatter ইউনিয়নের প্রধান মুখপত্র, তার পুস্তিকা ও দলিল মার্কসবাদ অনুসন্ধানকারীকে ইউনিয়ন ও বড় একচেটিয়া কারবারগুলির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠায়, মধ্যবিত্ত ও জাংকার দলের এবং কিছু সরকারী অঞ্চলের নেতৃত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এটা দরকারী. কারণ এটা সাম্রাজ্যবাদী Mitteleuropa ধারণার বিশেষ বিষয়কে প্রকাশ করে এবং সেটা আরো দরকারী কারণ তা ইউরোপ এবং অন্যান্য মহাদেশে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দূরপ্রসারী বিস্তারী পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে।

দলিলপত্রের উপকরণ অনুসন্ধানকারীকে শাসকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামকে বেশী নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম করে জাংকারদের যারা সরকার এবং সৈনাদের প্রধান পদগুলি দখল করেছিল এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে সংগ্রাম, অর্থনৈতিক স্থানীয় শাসনের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংগ্রাম এবং ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবার ও দলীয় একচেটিয়া কারবার যেগুলি শিল্পের কতকগুলি শাখায় আবির্ভূত হয়েছিল (যেমন, কয়লা, ইস্পাত, জাহাজ তৈরী) তাদের মধ্যে সংগ্রাম। এটা তথাকথিত Sammlungspolitik-এর সারমর্মকে প্রকাশ করে, শ্রমিক শ্রেণী ও সামাজিক গণতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে যৌথ ক্রিয়ার জন্য মধ্যবিত্ত ও জাংকারদমকে একত্র করার এক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, সমরবাদকে উন্নত করে। বিশাল নৌ-অস্ত্রীকরণ সম্পন্ন করে এবং আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি সম্পন্ন করে। জার্মান রাইখস্ট্যাগের প্রচুর খুঁটিনাটি, পটসডাম ও মার্সেবার্গ দলিলগুলি, বিশেষতঃ প্রুশীয় মন্ত্রিসভার অপ্রকাশিত খুঁটিনাটি জাংকার ও বুর্জোদের দলের পুনঃমৈত্রীর এক সুন্দর, সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরে, সমরনীতির অধিকতর বৃদ্ধির জন্য তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিশেষতঃ নৌ শক্তি

গড়ে তোলার জন্য এবং তাদের বিশ্ব রাজনীতির অন্য দিকগুলির ছবি তুলে ধরে।

উপরি উক্ত উপাদানগুলি যে জার্মান অর্থমূলধনের বিস্তারকে তুলে ধরে সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জার্মান মূলধন সর্বদা তার নিজের রাষ্ট্রের পতাকার নীচে কাজ করে নি, কোন চিহ্নের অধীনে সে কাজ করেছে, সেটা প্রকাশের জন্য সে একটা বিস্তারিত আলোচনা করে—যেমন ব্রিটিশ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অথবা আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবারের আন্তর্জাতিক ছদ্মবেশের অধীনে এখন সে Deutschland, Deutschland uber alles.-এর প্রচারভেরী বাজাচ্ছে। নিবিষ্ট দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, যা সে uber alles বলে মনে করেছে, তা হল ডিভিডেণ্ড, সেটা বার বার সরকারকে বাধ্য করেছে, যেমন বুলো বলেছিলেন, তাদের পক্ষে "জাতীয় ঢক্কা বাজাবার জন্য।"

এটা বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত যে বৃটিশ ও জার্মান মূলধনের সংঘাত, আন্তর্জাতিক বর্তমান একচেটিয়া কারবারের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগত দলের মধ্যে সংগ্রাম, তার সংগে পৃথিবীর সব মহাদেশে বিশ্বরাজনীতির মুখ্য ও গৌণ রঙ্গমঞ্চের দ্বন্দ্বই ছিল বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতা, যেটা বিশ্বরঙ্গভূমিতে সাধারণ মৈত্রীর শক্তিকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করেছে। যাই হোক এটা মনে রাখা উচিত যে, এটা বিরোধিতা সোজাসুজি বেড়ে ওঠেনি যদিও দুটি বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বীতে সংঘর্ষ হতে লাগল তবুও বহু ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ মিশে গিয়েছিল। এটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবার) রাজনৈতিক ক্ষেত্র (ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক লোকদের প্রতিযোগিতায়) এবং কখনো কখনো কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও (সাধারণ শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে) সত্য।

যাই হোক, এ সত্য রয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতা একটা ঐতিহাসিক সত্য এবং একমাত্র যারা প্রশ্ন করেছিল তারা হল, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পাশ্চাত্য প্রাচ্য ভাববাদী সমসাময়িকরা এবং ন্যাটো নীতি। যে পথে এই বিরোধিতা বেড়ে উঠেছিল, তা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রীর কূটনৈতিক আলোচনার অনেক দিকে আলোকপাত করে। আলোচনা ১৯০১ সাল জুড়ে চলেছিল এবং ১৯০২ সালের ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর পূর্বে ঘটেছিল। আজ এমনকি মধ্যবিত্ত ঐতিহাসিকরাও পূর্বের সুদূর প্রচারিত ধারণাকে গুরুত্ব দেয় না যে, আলোচনা ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ "হলস্টানের বড় না"-এর জন্য। এমন কি মেইনেক, রিটার এবং আরো কয়েকজন হোমরা-চোমরা, তাঁদের মত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরবর্তী বৃদ্ধির লক্ষ্যমূলক পরিস্থিতিকে যথার্থ খুঁজে বার করা প্রয়োজন।

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কূটনীতির ইতিহাসে খোঁজা উচিত নয়, কারণ বৃটেন ও জার্মানীর শাসকশ্রেণী অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষভাবে, জার্মান এবং বৃটিশ একচেটিয়া কারবারের মধ্যের সম্পর্কের গভীর পদ্ধতিতে সেই উত্তর রয়েছে। আর. জে. হফম্যানের প্রয়োজনীয় বইতে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্ণনা আছে, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় সাম্রাজ্য-বাদী দ্বন্দ্বের কথা নেই। আবার E. Kehr নৌ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বৃদ্ধিতে জার্মান একচেটিয়া কারবারের ভূমিকা এবং নৌ অস্ত্রীকরণের জন্য রাজনৈ-তিক সংগ্রামের বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। যাই হোক, তাঁর বই বিষয়বস্তু সময় তালিকা এবং Kerh-এর কিছু পদ্ধতিগত রীতির দ্বারা সীমিত। লেনিন তার সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নোটবই বইতে যেমন নির্দিষ্ট করেছেন, সেইভাবে লোকের আরো এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই জটিল সমস্যার আমাদের নির্দিষ্ট ধারণাকে বিবরণমূলক অনুসন্ধান এবং নতুন দলিলের উপকরণপাঠ বর্ধিত করবে।

১৯০০ সালের ঘটনায়, যখন অর্থনৈতিক সংকট এবং তার সংগে তাল মিলিয়ে চলার পথের অনুসন্ধানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর প্রলেপ পড়েছে, তখন, বোঝা যায় ইংগ-জার্মান বৈপরীত্য কত জটিল ছিল, যদি সমস্যাটার মোকাবিলা সাধারণভাবে না করে বাস্তব ঐতিহাসিক পটভূমিকায় করা হয়ে থাকে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তুরস্ক এবং চীনে আরো বেশী হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বা.য়র যুদ্ধের সুযোগ নিয়েছিল, সেখানে সহযোগিতার. এমন কি চুক্তির অজুহাতে সে বৃটেনকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিল। "হলদে শয়তান"র সংগে যুদ্ধ করার ছুতোয় জার্মানী জনপ্রিয় I-ho Tuan আন্দোলনের বিরুদ্ধে ও চীনের ধর্ষণে আন্তর্জাতিক সশস্ত্র হস্তক্ষেপে যোগদান করেছিল। কিন্তু কে হস্তক্ষেপের প্রেরণা জুগিয়েছিল? এতে কার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল? এটা কোন তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যকে অনুসরণ করেছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আগে অন্য প্রশ্নের আলোচনা করতে হবে, যেমন চীনে আরো হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য জার্মান একচেটিয়া কারবার ও তার পদ্ধতির অধিকার, লক্ষ্য ও পরিকল্পনা।

এটা দ্বিগুণ কঠিন হয়েছে এই ক্ষেত্রে যে, জার্মান কূটনৈতিক দলিলের বিরাট সংগ্রহের যে একটা পুরো খণ্ড "চীনে গোলযোগ" নিয়ে রচিত হয়েছে, তাতে চীনের ধর্ষণে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীদের গৃহীত সত্য ভূমিকাকে অস্পষ্ট করার জন্য দলিল গোপন বা মিথ্যা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সে নিজের পথ থেকে সরে গেছে। আমি নতুন দলিলের উপকরণ, সর্বোপরি চীনে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী মিশন ও কূটনৈতিক দপ্তরের দলিল, যেগুলি পটসডামে আগোছালো অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলাম, যেগুলি ব্যবহারের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সেগুলি পড়ে আমাকে আমার লেখা বদলাতে

হয়েছিল, কিন্তু ফলাফল থেকে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তা পরিশ্রমের যোগ্য ছিল। প্রথমতঃ যে জার্মান একচেটিয়া কারবার চীনে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং শানটুং সিণ্ডিকেটের প্রকৃত ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছিল যার পিছনে ছিল জার্মানীর প্রধান ব্যাংকগুলি, সেগুলি আবার অংশত বৃটিশ মূলধন ও সেই সংগে Krupp ও অন্যান্য শিল্পজগতের রুই-কাতলাদের সংগে যুক্ত ছিল, তার জটিল পথ সম্বন্ধে আমি একটা ভাল ধারণা পেয়েছিলাম। জার্মান অর্থ-মূলধনের কোন দলগুলি বৃটেনের সংগে "চুক্তির দ্বারা অসম্ভবরকম ধনী ইয়াংৎসে অববাহিকায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করছিল, তা বুঝতে এইগুলি এবং অন্যান্য উপকরণ আমাকে সাহায্য করেছিল। জার্মান মিশন ও কূটনৈতিক দপ্তরের দলিলগুলি আমার দেশের ভিতরের পরিস্থিতিও জানিয়ে দিয়েছিল। (I-ho Tuan আন্দোলন, চৈনিক রাজসভায় বিভিন্ন দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মনোভাব ইত্যাদি) অবশ্য তাতে যে খবরগুলি ছিল, তা যথেষ্ট নয় এবং আমাকে সোভিয়েত দলিলও দেখতে হয়েছিল—সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে রুশ বৈদেশিক নীতির দলিল, সামরিক ইতিহাসের কেন্দ্রীয় দলিলসংগ্রহ এবং লেনিনগ্রাদে কেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক দলিল-সংগ্রহ ও কেন্দ্রীয় নৌ-দলিল। চীনে প্রকাশিত নানা ঐতিহাসিক দলিলও যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

মোটের উপর, এই উপাদানগুলি অনুসন্ধানকারীকে চীনের উপরে সাম্রাজ্য-বাদী অধিকার এবং সেই দেশে প্রবিষ্ট জার্মান একচেটিয়া কারবারের সীমা, চীনে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের পূর্বগামী জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের জমি তৈরী জার্মান সমরবাদীদের অনুষ্ঠিত ভূমিকা ও জার্মান কর্মীশ্রেণীর বিরো-ধিতা, জার্মান একচেটিয়া কারবার এবং যে শর্তে চীন ক্রীতদাস হয়েছিল সেই শর্তগুলির শাস্তি আলোচনা এবং শেষ অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বরাজনীতিতে চীনের স্থানের একটা ভাল ধারণা দেয়। অতএব এখন চীনের দাসত্বে জার্মান একচেটিয়া কারবারের ভূমিকা এবং সরকারের বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির উপরে তার প্রভাব সম্পূর্ণ-ভাবে জানা হয়ে গেছে।

বেশী কঠিন জিনিস হল একচেটিয়া কারবার ও সরকারের সংগে বিশেষতঃ সাধারণ সেনাবাহিনী সমরবাদীদের সংগে সংযোগরক্ষাকারী সূত্রগুলি বার করা। ১৯০০-১৯০১ সালে চীনে সশস্ত্র অভিযানের কার্যকরী প্রতিবেদন রচিত হয়ে-ছিল নৌ-কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাধারণ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা নয়, যেটা স্বভাবতঃই তার বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করেছিল। অপ্রত্যক্ষ খবর অনুযায়ী যেমন কর্ণেল-জেনারেলকে আইনে একদা প্রুশিয়ার যুদ্ধমন্ত্রীর স্মৃতিকথা অনু-যায়ী উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কাজে লাগানোর অপেক্ষায় চীনে সশস্ত্র অভিযানের এক পরিকল্পনা বছরের পর বছর সাধারণ সৈন্যবাহিনী ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ-দপ্ত-

রের ফাইলে পড়ে ছিল। বৈদেশিক বিচারবিভাগের প্রধানরাও দড়িতে টান দিচ্ছিলেন। সর্বশক্তিমান হলস্টাইন সেই যাদুকর কূটনীতিক যিনি গোপনে অত্যন্ত নিপুণতায় স্টকমার্কেট চালিয়েছিলেন (চৈনিক ব্যাপারে ছদ্মবেশী আগ্রহে ব্যাংকের স্টক ও শেয়ার ধরে রেখে) তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। যেটাকে বুলো "বিউগিলের শব্দ শোনা বৃদ্ধ যুদ্ধের ঘোড়া"র সংগে তুলনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ হলস্টাইন সাধারণ সৈন্যবাহিনীর প্রধান Alfred von Schlieffen-এর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, যদিও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনের ভূমিকা তখনো অস্পষ্ট ছিল। Die Grosse Politik-এ প্রয়োজনীয় দলিলের তথ্য পাওয়া যায় না, আবার প্রাশিয়ার সাধারণ সৈন্য বাহিনীর ও যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দলিলগুলি ১৯৪৫ সালে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং পটাসডামে দুষ্প্রাপ্য, বৈদেশিক বিচার বিভাগের ফাইলগুলি শুধু অভিযানের নিয়মগত দিক ও লোক নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করে। তবুও এটা সম্ভব নয় যে. জার্মান সমরবাদের মাথা, জার্মান সৈন্যবাহিনী, জার্মান অর্থমূলধন আর কূটনীতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের যা আক্রান্ত করেছিল, সেই লোভ আর দুঃসাহসিকতার আবহাওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিল। General Moltke তাঁর স্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন, যদি আমরা নিজেদের কাছে সৎ থাকতে চাই তাহলে বলতে হবে যে লোভই আমাদের বিশাল চীনে খাদ্যটি কাটতে বাধ্য করেছিল। আমরা টাকা চাই, রেলওয়ে তৈরী করতে খনি কোম্পানী গড়তে এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির বাহক হতে চাই। একটি কথার মধ্যেই এই সবকিছু আছে, তা হল সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে আমরা, ট্রান্সভালের বৃটিশদের চেয়ে কোন অংশে ভাল নই। "যাইহোক, যখন সশস্ত্র অভিযানের পরিচালনা করার জন্য অন্য একজন নির্বাচিত হল, তখন এটা সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ প্রধানের বিরক্ত হওয়া ঠেকায়নি। সৈন্যবাহিনির ভূতপূর্ব প্রধান Field Marshal Alfred von Waldersee চীনের ইতিহাসে রক্তচিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন। এটা সাধারণ সত্য। কিন্তু যেটা শুধু অল্প কিছু লোকই জানে, তা হল, যে তাঁর তিন-খণ্ড স্মৃতিকথা যথেষ্ট কিছু বাদ দিয়ে ছেপে বেরিয়েছে এবং চীন থেকে যে যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহ আদায় করে নেবার দায়িত্ব Waldersee-র ছিল, সেটা বিশ্ব আধিপত্য লাভের উদ্দেশে জার্মান সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য, ঠিক যেমন আগে ফ্রান্সের টাকায় সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল। যেটা আরো কম লোক জানে তা হল, এই সবকিছুতে তৎকালীন সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং তখনো পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর পূজ্য জেনারেল Schlieffen-এর ভূমিকা ছিল।

জার্মান দলিলপত্রে আমাদের অনুসন্ধান বৃথা। যা আমরা পেয়েছিলাম, তাও আবার অপ্রত্যক্ষভাবে, তা হল এই যে, জেনারেল Schlieffen কাউন্ট

Nostitz-এর সংগে দেখা করেছিলেন, যিনি রাশিয়ার সমর প্রতিনিধি এবং সেটা চীনে হস্তক্ষেপের সময়ে। এটা আমাদের মস্কোয় সমর ইতিহাসের কেন্দ্রীয় দলিল আগারে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল, সেখানে আমরা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম যে, Schlieffen-এর ব্যক্তিগত চিঠি-গুলি Nostitz রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। এতে প্রকাশিত হল যে, যে Schlieffen ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে দুটি সীমান্তে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন, সেই তিনিই চীনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ব্যবস্থায় জড়িত ছিলেন। এতে আরো প্রকাশ পেল যে, রুশ ও জার্মান সমরবাদীদের মধ্যে বৈপরীত্য সত্বেও তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করায় সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল।

ঔপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আলাদাভাবে আলোচনা করতে হবে। এটা শুধু চীনের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, জার্মান একচেটিয়া নীতির বিস্তারের অন্যান্য জায়গাতেও সত্য।

এই বিস্তারের নির্দিষ্ট আকার ও ধরনের দিকে ভালো করে নজর দিলে দেখা যাবে যে, বিশ্ব রাজনীতির পরিকল্পনা শুধু ভবিষ্যতের ভেরী ঘোষণা বা পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশী। এটা শতাব্দীর শুরুতেই বাস্তব বিষয়, যথার্থ ভিত্তি পেয়েছিল। এটা তুরস্কে জার্মান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাবের ক্ষেত্রে এবং এশিয়ার বাকী অংশে, বিশেষতঃ বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনার সম্পর্কে প্রযোজ্য। বিশ্বজার্মান ইউনিয়নের মুখপত্র Alldeutsche Blatter-এ বিস্তারিতভাবে রেখায়িত, দক্ষিণ আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায় জার্মান সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা বাতিকগ্রস্তদের প্রলাপ মনে হতে পারে এবং সেটা আরো বেশী শোনাবে যেহেতু কূটনৈতিক দলিলের সরকারী সংগ্রহ এই সব অঞ্চলে জার্মান নীতির কোন ইংগিত দেয় না। কিন্তু জার্মান দলিলের দিকে একবার ভালো করে দেখলে অনেক কিছু প্রকাশ পায়। যখন জার্মান একচেটিয়া নীতি চীন, বলকান, এশিয়া মাইনর এবং মরক্কো ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে আংশিকভাবে ঢুকছিল, তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাতেও সমর্থনের ঘাঁটি ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকায় যে সব সম্পদ জার্মানী অধিকার করেছিল, এটা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, কিছু পরিমাণে বৃটেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিক অধিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নয়াবিষ্কৃত দলিল-গুলি ইংগিত দিচ্ছে যে, বিশ্বজার্মান ইউনিয়নের সহযোগিতায় কর্মরত প্রভাবশালী জার্মান পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলির দক্ষিণ আফ্রিকায় সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইটিতেই পর্তুগীজ এ্যাংগোলায় তাদের ব্যবহারের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, যে জায়গা তারা বৃটেনের সংগে ভাগকরে নেওয়ার আশা করেছিল। এইভাবে ঐ অঞ্চলে ইংগ-জার্মান

বিরোধিতার নতুন বন্ধন দেখা দিল, যদিও তা উত্তর আফ্রিকার (মরক্কো) চেয়ে কম স্পষ্ট।

মরক্কোতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বৃটেন ও ফ্রান্সের কথা চিন্তা করতে হয়েছিল, যে দুটি দেশ যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আলজেসিরাসে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মানীর বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছিল। সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশে যাদের উত্থান জার্মান সম্মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, সেই ঔপনিবেশিক জনগণের দ্বারা তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল। প্রভাবশালী জার্মান একচেটিয়া নীতি এবং Kolonialgesellschaft-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত জার্মান ঔপনিবেশকবাদের পক্ষে জার্মান মহাফেজখানায় পাওয়া হেরেরোদের সংক্রান্ত কাগজগুলি কোন কৃতিত্বের কথা নয়। কাগজগুলি দেখিয়েছে যে অত্যাচারিত মানুষ, এমনকি একেবারে অনুন্নত লোকেরাও কার্যকরী প্রতিরোধ পরিচালনায় সক্ষম। আফ্রিকার জনগণ শতাব্দীর শুরুতে অমানবিক ব্যবহার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সাহসে যুদ্ধ করেছিল। তখন উত্তর ও দক্ষিণ, দুই আফ্রিকাই বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যের সম্পর্কের উপরে এই ঘটনাগুলি আলোকপাত করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ল্যাটিন অ্যামেরিকা ছিল আর একটি লোভনীয় পুরস্কার। সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সাহায্যে ঋণের লভ্যাংশ ও সুদ আদায়ের জার্মান একচেটিয়া নীতির সিদ্ধান্তের ফলে উদ্ভূত ১৯০২ সালের ভেনজুয়েলার সংকট আকস্মিক বা স্থানীয় ঘটনা নয়। মাত্র একটি নৌশিক্ষার জাহাজ ভেনজুয়েলার তীরে পাঠানো হয়েছিল, এই তথ্যে, সেই সময়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাকে তুচ্ছ করার কোন কারণ নেই। ইতিহাসে ভেনেজুয়েলার সংকটের স্থান আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে যদি আমরা এর কারণ ও ফলাফলের সংগে, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলির প্রতি জার্মানীর সাধারণ নীতি পরীক্ষা করি। A. Vagts-এর গুরুগম্ভীর, অথচ অপাঠ্য তথ্যসমৃদ্ধ অনুসন্ধান জার্মান-আমেরিকান সম্বন্ধকে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ভূমিকায় আলোচনা করেছে। সেই অনুযায়ী তিনি সর্বাধিক নির্ভর করেছেন অর্থনৈতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস ও রাইখস্ট্যাগের খুঁটিনাটির উপরে। সেইসংগে রাজনৈতিক বিষয়ে আরো গভীর সিদ্ধান্তবাহী অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় সোভিয়েত ও জার্মান দলিলগুলি থেকে। উপাদানগুলি প্রমাণ করেছে যে, ভেনেজুয়েলার সংকট জাগিয়ে তোলার জন্য জার্মান সরকার ও তার কূটনীতিকদের উত্তেজিত করতে বড় জার্মান প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং একচেটিয়া কারবারগুলি অন্যান্য ল্যাটিন অ্যামেরিকান দেশগুলি, সর্বোপরি আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, এমন কি মেক্সিকোতেও হস্তক্ষেপের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হয়েছিল। বিস্তারের

রূপ ছিল অভিনব। কতকগুলি ক্ষেত্রে কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে জার্মান একচেটিয়া নীতি আন্তর্জাতিক একচেটিয়া নীতির মাধ্যমে বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র একচেটিয়া নীতির সহযোগিতায় বা তার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। তাদের মধ্যে সংগ্রামের স্পষ্টতঃই একটি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল ইংগ জার্মান এবং জার্মান অ্যামেরিকান সম্বন্ধের ও বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে, যার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফল শুধু ল্যাটিন অ্যামেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল না। এটা সমস্যার একটা নতুন ঐতিহাসিক বিস্তৃতিকে তুলে ধরে এবং যেহেতু এখানে আমাদের আগ্রহ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার প্রধান সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতায় নিবদ্ধ, অর্থাৎ বৃটেন ও জার্মানির বিরোধিতায়, সেইহেতু আমরা তৎকালীন জার্মান-অ্যামেরিকান সম্বন্ধকে পেছনে সরিয়ে না দিয়ে পারি না, এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের সমস্যাকে সহজ করে নিই, যে সমস্যা শুধু রাজনৈতিক সহযোগিতার সংগেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয়, পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিভাগের সংগেও জড়িত। লেনিন লিখেছিলেন: "পুঁজিবাদের সাম্প্রতিকতম পর্যায় আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, পুঁজিবাদী সংস্থাগুলির মধ্যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিভাগকে ভিত্তি করে কিছু সম্পর্ক গড়ে উঠে; সেই সময়ে এর সমান্তরাল ভাবে ও এর সংগে যুক্ত হয়ে, রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক মৈত্রীতে উপনিবেশের জন্য সংগ্রামে, "প্রভাবের ক্ষেত্র" নিয়ে সংগ্রামে পৃথিবীর আঞ্চলিক বিভাগকে ভিত্তি করে কিছু সম্বন্ধ গড়ে উঠে।[১]"

লেনিন এই সমস্যাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর আগ্রহ শুধু ঐতিহাসিক ছিল না, তাত্ত্বিকও ছিল। কিভাবে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদের ঘনীভূত অবস্থা, বৃহত্তম আন্তর্জাতিক জাহাজী কারবারের দ্বারা পৃথিবীর বিভাগে গিয়ে পেঁাছয়, তার উল্লিখিত উদাহরণ তিনি তাঁর *সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরে*-এ উদ্ধৃত করেছেন:

জার্মানীতে দুটি শক্তিশালী কোম্পানী প্রথম সারিতে রয়েছে: Hamburg-Amerika এবং Norddeutscher Lloyd, প্রত্যেকের মূলধন ২০ কোটি মার্ক করে···অন্যদিকে, আমেরিকায় ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারীতে Morgan trust নামে পরিচিত ইণ্টারন্যাশানাল মারক্যানটাইল মেরিন কোম্পানী গঠিত হয়েছিল, সেখানে ন'টি আমেরিকা ও ব্রিটিশ জাহাজী কোম্পানী একত্র হল···১৯০৩ সালেই জার্মান রুই-কাতলারা এবং এই ব্রিটিশ-আমেরিকান ট্রাস্ট স্বাভাবিক মুনাফার ভাষাসহ পৃথিবী ভাগের এক চুক্তি করল। জার্মান কোম্পানীরা ইংগ-আমেরিকান পথে প্রতিযোগিতা না করবার দায়িত্ব নিল। প্রত্যেকের ভাগে কোন বন্দরগুলি পড়বে তা ঠিকভাবে ঠিক হল; নিয়ন্ত্রণের এক যৌথ কমিটি হল, ইত্যাদি···

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২২, পৃ: ২৫৩

"আন্তর্জাতিক উৎপাদক-সমিতি থেকে দেখা যায়, কতদূর পর্যন্ত পুঁজিবাদী একচেটিয়া নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিভিন্ন পুঁজিবাদী সংস্থার মধ্যে সংগ্রামের *লক্ষ্য* ছিল। এই শেষ পরিস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; যা কিছু ঘটছে তার ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য শুধু এর থেকেই বোঝা যায়; কারণ, সংগ্রামের *আকার* বদলাতে পারে অনবরত বদলায়···কিন্তু সংগ্রামের *বিষয়*, শ্রেণীসংগ্রাম, কখনই *বদলাতে পারে না* যতক্ষণ শ্রেণীর *অস্তিত্ব* আছে।"

যখন আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম জার্মান-আমেরিকান সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম, তখন আমরা স্বভাবতঃই এমন দলিল আবিষ্কারের আশা করছিলাম, যা এই প্রথম বড় আন্তর্জাতিক একচেটিয়া নীতির ইতিহাসে আলোকপাত করে, যে একচেটিয়া নীতি, লেনিন দেখিয়েছিলেন, খুব প্রভাবশালী। আমাদের দীর্ঘ অনুসন্ধান সফল হয়েছিল। যে দলিলগুলি আমরা পেয়েছি, তা আটলাণ্টিক জাহাজী কারবারের বড় জার্মান ও আমেরিকান একচেটিয়া নীতির আন্তর্জাতিক চুক্তির অস্তিত্ব এবং উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের যথার্থ ফল হিসাবে লেনিনের সাধারণ বিচারকে সমর্থন করে। সময়ানুবর্তী অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের জ্ঞানও এই দলিলগুলি আমাদের দেয়: ঐ দলিলগুলি থেকে দেখা যায় যে, ১৯০৩ সালে সমাপ্ত চুক্তির আলোচনা ১৯০১-এ শুরু হয়েছিল। সেগুলি শুধু যে জার্মান গোষ্ঠী ও মরগ্যানের আমেরিকা গোষ্ঠীর পার্থক্যকে প্রকাশ করে তা নয়, জার্মান গোষ্ঠীর হামবুর্গ-আমেরিকা লাইন এবং উত্তর-জার্মান লয়েড-এর মধ্যে পার্থক্যও প্রকাশ করে। সেগুলি প্রমাণ করে যে, এই একচেটিয়া চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী কাইজার, জার্মান সরকার এবং জার্মান কূটনীতি এবং জার্মান সংবাদপত্রে "আমেরিকান ভীতি"-র বিরুদ্ধে প্রচার প্রেরণা পেয়েছিল সরকার ও জার্মান একচেটিয়া কারবারগুলির কাছ থেকে।

বিশাল জার্মান-আমেরিকান একচেটিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক পটভূমি, যার সংগে ব্রিটিশ মূলধনও জড়িত, তার সম্বন্ধে আমরা যা-ই ভাবি না কেন, অন্ততঃ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথমতঃ লেনিনের উল্লেখিত Morgan Ballin একচেটিয়া কারবার সেই সময়ে একমাত্র কোম্পানী নয়; জার্মান দলিলগুলি প্রকাশ করেছে যে, শতাব্দীর প্রথমে অন্যান্য আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবার গঠিত হয়েছিল এবং পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং জার্মান মূলধন যুক্তরাষ্ট্র অর্থবাজারে ঢুকবার জন্য সেই কারবারগুলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, যে সময়ে আমেরিকার মূলধন জার্মানী আক্রমণের আশা করেছিল। এর ফলে জার্মানীর অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ঘটেছিল। স্বভাবতঃই কৃষিজীবীরা যুক্তরাষ্ট্র কৃষিব্যবস্থার বিস্তারে বিরোধী ছিল এবং তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে

অনেক নতুন বিতর্কের বিষয় উত্থাপন করল (সংরক্ষণবাদের উপরে ঝোঁক ইত্যাদি)। অর্থনৈতিক কারণে, কৃষিজীবীদের স্বার্থ অর্থনৈতিক সংখ্যালঘুদের কিছু সম্প্রদায়ের সংগে মিলে গিয়েছিল। একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এবং একটা নির্দিষ্ট সময় অর্থনৈতিক স্বার্থের এই বিপরীতমুখী সমন্বয় জার্মানীতে বৈদেশিক, সেই সংগে স্বাদেশিক নীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীগত ও দলগত স্বার্থের উপরে ক্রিয়া করেছিল। দুই তরুণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের ধরন বিশ্বশক্তির সাধারণ ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটা শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সার্বিক বিশ্লেষণে জার্মান-আমেরিকান বিরোধিতার সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের মতে ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের সংগে সম্পর্কিত সাধারণ সমস্যাগুলি প্রসারিত হওয়া উচিত এবং সেটা যথাযথভাবে হওয়া উচিত কারণ বিশ্বজোড়া বিরোধিতা থেকে যুদ্ধ উদ্ভূত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর ইউরোপীয় *শক্তিগুলির* সংগে সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত সমস্যাগুলি থেকে এতে দূরে সরে যাওয়া হবে না—একদিকে জার্মানির মিত্রশক্তি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইটালী এবং অপরদিকে সামরিক ব্লকের রাশিয়া ও ফ্রান্সের মত সদস্যরা। অন্যদিকে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতার আলোচনায় যুদ্ধের ঐতিহাসিক মূল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হবে। যুদ্ধটা ইউরোপীয় মহাদেশে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর উৎস খুঁজতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী বৈপরীত্যে। যে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলি শতাব্দীর শুরুতে *ইউরোপে* দেখা গিয়েছিল, তারা শুধু ইউরোপীয়দের দ্বারা সৃষ্ট নয়, *বিশ্বব্যাপী* বিরোধিতাতেও সৃষ্ট। এই সামরিক গোষ্ঠীগুলির সমস্যা এখনো রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং জার্মান মৈত্রীর ইতিহাস এখনো লেখা বাকী। এটা মনে রাখা দরকার যে, জার্মান সমরবাদীরা যখন তাদের বিশাল নৌ-শক্তি তৈরী করতে শুরু করেছিল, তখন দুটি সীমান্তে তারা একটা যুদ্ধের পরিকল্পনা শেষ করেছিল।

অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং ১৯০৫-০৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের সময়ে পৃথিবীতে রাষ্টগুলির একটা সুদূরপ্রসারী মৈত্রী ঘটেছিল, যেটা অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, রুশ-জার্মান সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছিল। সোভিয়েত ও জার্মান দলিলখানার উপকরণ, দলিল সংগ্রহ ও কিছু অনুসন্ধানের দ্বারা এই সম্পর্কের কূটনৈতিক দিক যথেষ্ট দেখানো হয়েছে। লেনিনগ্রাদের কেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক দপ্তরখানায় (বিশেষতঃ শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাগজপত্র) বিশ্বজার্মান ইউনিয়ন এবং শিল্প-

পন্ডিতদের জার্মান সংস্থাগুলি থেকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্মান কূটনৈতিক দলিলের সংগ্রহে অবহেলিত, ১৯০৪-এর রুশ-জার্মান বাণিজ্যিক চুক্তির ইতিহাস জার্মান একচেটিয়া নীতি ও জাংকারডমের সম্বন্ধ সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব, তাদের বৈপরীত্য, জার্মান কর্মীশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বার্থ ও পূর্বাভিমুখী বিস্তারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপরে আলোকপাত করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাষ্ট্রগুলির পুনঃমৈত্রীর অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক, বিশেষতঃ রুশ-জার্মান সম্বন্ধের প্রবাহ আদৌ সব সমস্যা নয়। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাশিয়ার ভূমিকাকে যা প্রভাবিত করেছিল সেই প্রচণ্ড বিপ্লবের বিস্ফোরণকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তার ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় একটা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল যেটা ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গরূপে স্বৈরবাদী রাশিয়াকে দুর্বল করেছিল। যে ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় যুদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধতায় এবং জার্মানির দ্বারা দুটি ফরাসী প্রদেশে, আলসেস ও লোরেনের সংযুক্তীকরণে পৌঁছেছিল। এর ফলে রাশিয়ার শাসকরা এই প্রকৃত তথ্যের সম্মুখীন হয়েছিল, যদিও সেটা সম্পূর্ণ প্রশংসনীয় নয় যে, অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী একটি সমরবাদী রাষ্ট্র তার পশ্চিম সীমান্তে আভিভূর্ত হয়েছে। অন্যদিকে, বৈদেশিক নীতি ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের ক্ষেত্রে স্বার্থের জন্য ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধিতাকে কাজে লাগানোর একটা অনুকূল পরিস্থিতি জারের আমলের সরকার পেয়েছিল যেভাবে লেনিন ১৮৯৫ সালে পরিস্থিতিটা বর্ণনা করেছিলেন, তা হল এই : "যে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ দীর্ঘকাল জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধকে বপন করেছিল, সেই যুদ্ধের ফল হিসাবে রাশিয়ার প্রাপ্ত অত্যন্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অবশ্যই শুধু স্বৈরবাদী রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরূপে গুরুত্ব বাড়িয়েছিল।"[১] জার-বাদ ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধিতার উপরে নির্ভর করেছিল, যে বিদ্বেষ ইউ-রোপকে একাধিকবার সত্তর ও আশির দশকে যুদ্ধের সীমায় এনেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, যখন জার্মানী ও অন্যান্য বড় পুঁজিবাদী দেশে সাম্রাজ্যবাদ পরিণত বয়স্ক হল, তখন আবার জারের আমলের রাশিয়ার আন্ত-র্জাতিক অবস্থা পরিবর্তিত হল। লেনিন লিখেছিলেন : "জারবাদ প্রকাশ্যভাবে ও অবিসংবাদিতভাবে প্রতিক্রিয়ার প্রধান আশ্রয় স্থল হওয়া থেকে বিরত হয়েছে, প্রথমতঃ এটা আন্তর্জাতিক অর্থ-মূলধনের দ্বারা, বিশেষতঃ ফরাসী মূলধনের দ্বারা সমর্থিত এবং দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৫ সালের কারণে। সেই সময়ে [অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের আগে—*এ. ওয়াই*] বড় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭।

ইউরোপের গণতন্ত্রগুলির পদ্ধতি ছিল—জারবাদ সত্ত্বেও পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে আসা……এখন পদ্ধতিটা হ'ল [অর্থাৎ, বিংশ শতাব্দীর প্রথমে —*এ. ওয়াই*] মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী 'বৃহৎ শক্তিগুলির' (সংখ্যায় পাঁচ বা ছয়) একজনের অন্যের উপরে অত্যাচার করা……এখন সমাজতন্ত্রবাদী প্রলেতারিয়েত জারের আমলের সাম্রাজ্যবাদ ও অগ্রসর পুঁজিবাদীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের গাঁটছড়ার সম্মুখীন যে গাঁটছড়া কয়েকটি জাতির উপর অত্যাচারের সাধারণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

"পরিস্থিতিতে এই বাস্তব পরিবর্তনগুলি ঘটেছে।"[১]

অতএব, রাশিয়ার যে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী শক্তি রাশিয়ার ভাগ্যকে পুনর্গঠিত করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করেছে তার ভূমিকার দিকে অনুসন্ধানকারীকে তাকাতে হবে। শতাব্দীর শুরুতে সোজাসুজি জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বৈদেশিক নীতির সংগে এই বিষয়ের সংগে যুক্ত আরো তিনটি প্রশ্ন যুক্ত আছে: প্রথমতঃ, জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের উপরে ১৯০৫-এর রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব; দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্য জার্মানির প্রস্তুতি এবং তৃতীয়তঃ, একটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের আতংকের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধিতা, বিশেষতঃ জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বৈদেশিক নীতির প্রতি জার্মান শ্রমিকদের এবং সমাজ-তান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক দলের বিরোধিতা। সবশেষে বড় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এটা পশ্চিম ইউরোপের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়ার জারতন্ত্র এবং ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে সম্পর্কের সংগেও আবদ্ধ। দূরপ্রাচ্যে পরা-জিত হয়ে এবং বিপ্লবের দ্বারা দুর্বল হয়ে, রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে যোগাযোগ করতে বাধ্য হল। ইংগ-ফরাসী এবং ইংগ-রুশ চুক্তি জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বৈদেশিক নীতির পক্ষে পরাজয়ের ইংগিত দিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইউরোপে এবং অন্যত্র তাদের উন্মত্ত বিস্তার নীতির দ্বারা তাদের যথার্থ এবং সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিচ্ছিন্ন করেছিল।

পূর্বের আলোচনায় প্রধান বিষয়ের সংগে যুক্ত সমস্যাগুলি বা প্রধান উপাদানের তালিকা শেষ হয়নি। এটা একটা সাধারণ নির্দেশরেখার বেশী কিছু নয়। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ঐতিহাসিক শুধু কূটনৈতিক একেবারে বাহ্যিক ঘটনাগুলির বর্ণনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। তাদের গভীরতম জায়গায় সন্ধান করতে হবে, ঘটনা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির তথ্য আলোচনা করতে হবে, বিস্তারের বিভিন্নরূপের

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২২, পৃঃ ৩৪২।

পরীক্ষা করতে হবে, শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলন, বৈদেশিক নীতি এমন কি সাম্রাজ্যবাদের ভাববাদে প্রবেশ করতে হবে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনো স্থায়ী নয় এবং বিভিন্ন কারণের ফল হিসাবে পরিবর্তনযোগ্য, তার সংগে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক ও অন্তর্নির্ভরতা স্থাপন করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদের যথার্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা, লেনিনের, *সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নোটবই*,[১] যেটা থেকে আমরা সেই বুদ্ধিদীপ্ত বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবীয় গবেষণাগারের এক ঝলক দেখা পাই, সেই বই যে শুধু আমাদের পদ্ধতিবিজ্ঞানের এই ভিন্ন প্রকৃতি, নির্দিষ্ট ও জটিল গভীর পদ্ধতির প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে তাই নয়, উপরন্তু পদ্ধতিরও নির্দেশ দেয়। লেনিন অর্থনৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপাদানগুলি পরীক্ষা করার পর ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময়ে তাঁর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং দেখান যে, "যে সময়ে নতুন পুঁজিবাদ পুরনো পুঁজিবাদকে অতিক্রম করেছিল, ইউরোপের পক্ষে সেই সময়টা *যথার্থ* অনুমানের সংগে প্রতিষ্ঠা করা যায়; সেটা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।"[২]

লেনিনের লেখা সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, প্রভূত তথ্যের সাধারণ নিয়মভিত্তিক তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা নতুন এবং যে সব সংশোধনকারী বিকৃতি ও গোঁড়া পদ্ধতি জীবন্ত ইতিহাসের গভীর যুক্তিসম্মত প্রবাহের প্রতি অন্ধ, তাদের এটা শত্রু। তিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়ার পরেও তাঁর উত্তরাধিকারী ও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকাদর সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "খুব সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা যদিও সুবিধাজনক, কারণ তাদের মধ্যে প্রধান যুক্তিগুলি একত্র থাকে তবুও তারা অসম্পূর্ণ কারণ আমাদের একটি বিষয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির তার থেকে বার করতে হয়, যার সংজ্ঞা দেওয়ার দরকার হয়।"[৩]

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর বইতে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়ে দিয়ে ও প্রচুর উপকরণ নিয়ে গভীর সমালোচনামূলক আলোচনা করে এই জটিল ঐতিহাসিক বিষয়ের যথাযথ সংজ্ঞা দিয়ে, লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন, "সব সংজ্ঞার নিয়ন্ত্রণমূলক ও আপেক্ষিক মূল্য সাধারণভাবে দেওয়া হয়, যা একটা পরিণত বিষয়ের সব সূত্রকে কখনো উপস্থিত করতে পারে না।"[৪]

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ৩৯।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ২২, পৃঃ ২০০।
৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৬।
৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

অতএব, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বৈদেশিক নীতি নিয়ে ব্যস্ত ঐতিহাসিকের কাজ হল একচেটিয়া নীতির বৃদ্ধি ও নির্ধারণকারী প্রভাব তার সম্পর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তালিকার সর্বোচ্চে শ্রমিক শ্রেণীসহ অন্যান্য সমাজ-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিরোধকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা। এটা সহজ নয়। কিন্তু তাতেই এটা বেশী আকর্ষণীয় হয়।

১৯৬১

বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক প্রস্তুতি
১৯১৪-১৮

১৯১৪-র অনেক আগে যুদ্ধের কূটনৈতিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈপরীত্যগুলির ফলে বহুমুখী সামরিক মৈত্রী ঘটেছিল, তা ইউরোপে শক্তিগুলির নতুন মৈত্রী ঘটিয়েছিল এবং সেই সংগে রাষ্ট্রগুলির নতুন ব্যবস্থা করেছিল, যদিও তা অস্থায়ী কারণ, একটা উন্মত্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক বিস্তার সশস্ত্র দ্বন্দ্বের বিপদ সৃষ্টি করে তুলাদণ্ডকে ইতস্ততঃ হেলিয়ে দিচ্ছিল। তৎকালীন বৃহত্তম ঔপনিবেশিক এবং নৌশক্তি সম্পন্ন বৃটেন কিছুকাল সব মৈত্রীর বাইরে থাকা স্থির করেছিল, কিন্তু রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এর গুরুত্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল।

তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা "সশস্ত্র শান্তিব্যবস্থা" নামে পরিচিত ছিল। এই বিপরীত ধারণার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান বিরোধিতাকে গোপন করা ও তার যথার্থতা বুঝিয়ে দেওয়া।

মধ্যবিত্ত রাষ্ট্রগুলির, বিশেষতঃ জার্মান সাম্রাজ্য ও ইটালীর জাতীয় ঐক্য-বদ্ধতার যুদ্ধের পরে, যখন ইউরোপে সামরিক মৈত্রীর ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, তখন ফ্রেডরিক এংগেলস্ একটি যুদ্ধের সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— স্থানীয় যুদ্ধ নয়, এমনকি সমগ্র ইউরোপের যুদ্ধও নয়, তা হল বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং তার নিশ্চিত ফল বলে দিয়েছিলেন: পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক সাধারণ সংকট। তিনি যা লিখেছিলেন, তা হল এই (১৮৮৭ সালে): এটা হবে নতুন ধরনের এবং অচিন্তনীয় প্রচণ্ডতায় এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ। আশি লক্ষ থেকে এক কোটি সৈন্য পরস্পরের গলা টিপে ধরবে, তখনই তারা ইউরোপকে এমনভাবে নিঃশেষে ভোগ করবে যে পঙ্গপালের কোন বাহিনীর সংগে তার তুলনা হতে পারে না। এই হল, ত্রিশবছর ব্যাপী যুদ্ধের ধ্বংস সারা মহাদেশে, তিন চার বছরের মধ্যে বিধৃত যুদ্ধ তার সংগে ক্ষুধা, রোগ, সৈন্য-বাহিনীর ও সাধারণ মানুষের পাশবিকতা যা তীব্র অভাব থেকে সৃষ্ট,

ব্যবসায়ে শিল্পে ও ঋণে আমাদের কৃত্রিম পদ্ধতির হতাশ অব্যবস্থা, যার শেষ বিশ্বব্যাপী দেউলিয়া অবস্থায়, পুরনো রাষ্ট্রগুলি ও তাদের বাঁধাধরা রাজনীতির ধ্বংস—যে ধ্বংসে অগুন্তি রাজমুকুট রাস্তায় পড়ে থাকবে, কেউ তা কুড়িয়ে নিতে চাইবে না, কিভাবে সবকিছু শেষ হবে এবং কে জয়ী হবে তা অনুমান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; শুধু একটা প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত: বিশ্বজোড়া শূন্যতা এবং এমন একটা পরিস্থিতি যাতে শ্রমিক শ্রেণী শেষ জয়লাভ করবে।

যাইহোক, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে, সমাজতান্ত্রিক জয়ের জন্য পুঁজিবাদী শক্তিগুলির সৃষ্ট যুদ্ধই একমাত্র বা প্রধান শর্ত মনে করতেন এটা সত্য নয়। বিপরীতপক্ষে তাঁরা দৃঢ়ভাবে আক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন এবং যে পুঁজিবাদী রাজনীতির কূটনৈতিক চূড়ান্ত প্রকাশ মনে করা হত, তার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। যদিও অনেক দেশে কূটনীতি তখনো পুরনো অভিজাত শ্রেণীর অধীনে ছিল, তবুও এটা বৃহৎ শিল্পের নতুন শক্তি ও আগ্রহ এবং পরে অর্থ মূলধনের প্রভাব এড়াতে পারেনি। মার্কস এবং এঙ্গেলস সামরিকতাভিত্তিক এই শক্তিগুলির আক্রমণাত্মক বিস্তারমূলক এবং জাতীয়তাবাদী বৈদেশিক নীতিকে আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সামাজিক দৃঢ়তাভিত্তিক শ্রমিক শ্রেণীর শান্তিপ্রেমী বৈদেশিক নীতির সংগে প্রতি তুলনা করেছিলেন।

যে সময়ে পুরনো, প্রাক্ একচেটিয়া নীতি পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন সমরবাদ উচ্চ গতিতে বাড়ছিল। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি গঠনে বাজারের পুনর্বিভাগ ও কাঁচামালের উপাদানের জন্য সংগ্রাম, সর্বোপরি বিনিয়োগ ও নতুন উপনিবেশের ক্ষেত্রের জন্য সংগ্রাম অথবা সংক্ষেপে, পৃথিবীর পুনর্বিভাগের জন্য সংগ্রাম ছিল অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মূল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতা জাতিগুলিকে অবশ্যই বিশ্বব্যাপী সামরিক বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

"মুক্ত" পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উত্তরণ প্রধান ইউরোপীয় পুঁজিতে অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। ইংরেজরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশিয়ানিয়ায় বিশাল নতুন অঞ্চলের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করে বৃহত্তর গ্রেট বৃটেনের পরিকল্পনাকে পুষ্ট করেছিল। জার্মান ব্যাংক ও শিল্পপতিরা, জাংকার ও সমরবাদীরা ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরের এক বিশাল আঞ্চলিক একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহৎ জার্মানি অথবা মধ্য ইউরোপের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পুষ্ট করছিল। তাছাড়া তারা আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জার্মান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল অঞ্চলব্যাপী জার্মান প্রভাব চাইছিল। ফরাসী আর্থিক মুষ্টিমেয়ের শাসন আলসেস-লোরেন পুনরুদ্ধার করতে, রুর অববাহিকা

অধিকার করতে এবং আফ্রিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। জার আমলের রাশিয়ার বুর্জোয়া এবং ভূস্বামীরা বলকান অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য, কনস্টান্টিনোপল ও প্রণালী অঞ্চলে এবং ইরাণে অধিকতর প্রভাবের ক্ষেত্র চাইছিল। তাছাড়া, জাপান কর্তৃক রাশিয়াকে অপমানের পরেও তারা দূর প্রাচ্যে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নি। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শাসকরা বুলগেরিয়ায় এবং আংশিকভাবে রুমানিয়ায় তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না এবং সার্বিয়া পিষ্ট করে ভৃত্য করার এবং বলকান পেনিনসুলার পূর্ব ও পশ্চিমে শাসন কায়েম করার স্বপ্ন দেখছিল। শেষ অথচ সবচেয়ে প্রথম, ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচীন রোমের গৌরব থেকে প্রেরণা নিয়ে টাইরল, ট্রিস্ট, আলবেনিয়া এশিয়া মাইনরের অংশ, আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক অধিকার এবং ভূমধ্যসাগরে ইটালীয় প্রভুত্ব চাইছিল। অ-ইউরোপীয় শক্তির সাম্রাজ্যবাদীরাও বিজয়ের বিস্তারিত পরিকল্পনাকে লালন করছিল। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর অ্যালবার্ট জেরেমিয়া বেভারিজ বিংশশতাব্দীর প্রথমে বলেছিলেন যে, "যেখানে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব সেখানে" ভগবান "শ্রেষ্ঠ সংগঠক" আমেরিকানদের "তৈরী করেছেন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য...পৃথিবীর পুনর্জন্মের পথ দেখানোর জন্য তিনি আমেরিকান জনগণকে তাঁর নির্বাচিত জাতিরূপে চিহ্নিত করেছেন।" প্রথম যে জিনিসের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা ঝুঁকে পড়েছিল, তা হল পশ্চিমাঞ্চলে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং চীনে হস্তক্ষেপ ঘটানো।

জাপানের পুঁজিবাদী ও সমরবাদীরা সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের সংলগ্ন অঞ্চলে শাসনের কল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

এই পরিকল্পনার জন্য গৃহীত প্রস্তুতি, অধিকন্তু, সেগুলি কার্যকরী করার যথার্থ ইতস্ততঃ চেষ্টা বর্তমান বৈপরীত্যকে বাড়িয়ে তুলে নতুন বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটেনের অকস্মাৎ এই সত্য উপলব্ধি হল যে, তাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বী রপ্তানীকারক ও বিনিময়-কারীরূপে দেখতে হবে, যে তার কারবার শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ না রেখে উপনিবেশগুলির দিকে তার হাত বাড়াচ্ছে। যে বৃটেন দীর্ঘকাল চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, বলকান অঞ্চল, আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর ও ওশিয়ানিয়ায় শিল্প-নেতা ও ঔপনিবেশিক একচেটিয়া কারবারী হতে অভ্যস্ত, তাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা উত্যক্ত করেছিল। তারা এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এবার দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া বৃটেনের তার তরুণ জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। দ্বিতীয় উইলহেলম্ ঘোষণা করলেন, "বৃটেনকে এই ধারণায় অভ্যস্ত হতে হবে যে, জার্মানী একটা বিরাট ঔপনিবেশিক শক্তি হবে"। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্থলবাহিনী গড়ে তোলায় সর্বে

অ্যাডমিরাল Tripitz-এর তৈরী পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌ-বাহিনীর অস্ত্রীকরণও শুরু করেছিল এবং তাদের ঘোষণা "সমুদ্রেই আমাদের ভবিষ্যৎ" বৃটেনের প্রতি সরাসরি প্রতিযোগিতার আহ্বানস্বরূপ।

সাম্রাজ্যবাদী যুগের শুরুতে, বৃটেন তার শক্তির মধ্যগগনে, যদিও অবনতির প্রথম লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছিল। যদিও তার স্থান তখন প্রথম শিল্পের দেশ হিসাবে, তবুও সে আর তখন "বিশ্বের কারখানা" নয়। ' খনো সে মূলধনের প্রধান রপ্তানীকারক- যা তাকে বিশাল শক্তি দিয়েছিল। সকলের চেয়ে বড এক বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তার দখলে যা তার বিশ্ব-শক্তির একটি অর্থনৈতিক স্তম্ভ। সারা পৃথিবীতে তার অসংখ্য সুপরিকল্পিত শক্তিশালি ঘাঁটি—নৌ ঘাঁটি, কয়লার ঘাঁটি ইত্যাদি যেগুলি তার বিভিন্ন যোগাযোগকে রক্ষা করছিল। তাছাড়া, পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী নৌ-শক্তি তার, যে শক্তি সমুদ্রগুলিকে শাসন করছিল এবং ক্ষমতায় যার তুল্য কেউ ছিল না, অধিকন্তু যা অন্য দুটি ইউরোপীয় শক্তির চেয়ে বড, না যোক, অন্ততঃ সমকক্ষ।

এই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৌ-শক্তি নিয়ে বৃটেন, বিশ্বে প্রভাবের জন্য ব্যস্ত দেশগুলির শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে তখনও তার "অপূর্ব বিচ্ছিন্নতা" বজায় রাখতে পারত। যখন লাভজনক সে "ভারসাম্য" সৃষ্টিতে সমর্থ ছিল এবং ইউরোপীয় মহাদেশকে দূষিত করছে সে বিরোধিতা, তার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই নতুন বৈদেশিক নীতির অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল। বৃটিশ আধিপত্যের প্রতিযোগী হয়ে নতুন উপাদান পৃথিবীতে আবির্ভূত হল। পুরনোর সংগে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল—তারা জার আমলের রাশিয়া ও ফ্রান্সের চেয়ে শক্তিশালী এবং "পৃথিবীতে অধিকারের" জন্য বেশী আগ্রহী। মূলধনের অসমবৃদ্ধির নিয়ম বোঝা যাচ্ছিল। বৃটেন দ্রুত তার প্রথম শিল্পশক্তির সম্মান হারাচ্ছিল। জার্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্র তাঁর গলা চেপে ধরেছিল। মূলধন রপ্তানীতে তারা আগের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির উপর অধিকারের জন্য কাড়াকাড়ি করছিল। যুক্তরাষ্ট্র বাদে পরনো এবং নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সৈন্যবাহিনী বৃটেনের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। উপরন্তু, তাদের মধ্যে শুধু জার্মানীই নয়, আরো কয়েকজনও তাদের নৌবাহিনী বাড়াতে শুরু করেছিল।

বৃটেনের পক্ষে তার নৌ আধিপত্য বজায় রাখা কঠিন হল, কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাদের শক্তির বাজী জেতার সম্ভাবনা বৃটেনের পরিস্থিতিকে অনিশ্চিত করল। অন্য সব সাম্রাজ্যবাদী দেশের মত বৃটেনেও নতুন জয়ের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল। কাজেই সে শুধু তার পদ বজায় রাখতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে নি। তখনো কিছু সময় তার "অপূর্ব

বিচ্ছিন্নতা"-র চিরাচরিত নীতির অর্থ ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তার "গৌরব" ম্লান হয়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভিড়ের মধ্যে প্রধান শত্রুকে খুঁজে বার করা এবং তার বিরুদ্ধে মৈত্রীব্যবস্থাকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এটা "খোলাখুলি" নীতির আবরণ হয়ে দেখা দিল।

বৃটেনের "অপূর্ব বিচ্ছিন্নতা"-র সংকট তার ভবিষ্যৎ উত্থানের বিষয়ে তাঁর শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রেরণা জোগাল। এর ফলে, জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সংগে মিলিত হয়ে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির সংগে মিলিত হওয়া—ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রভাবের অংশ দেওয়ার মধুর প্রতিশ্রুতির অগণ্য ও সমসাময়িক প্রচেষ্টা শুরু হল। এই রকম প্রথম প্রচেষ্টা হল ১৮৯৮-তে যখন ফাশোডাতে (কোডোক) বৃটিশ ফরাসী উত্তেজনা আফ্রিকাতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে তার চূড়ায় পৌঁছেছিল, যা প্রায় যুদ্ধ ঘটিয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে নতুন প্রচেষ্টা চলতে লাগল এবং সেটা শুধু এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নয়। তাতে নতুন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে লাভজনক উপায়ে বৃটেনের নীতিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। রাশিয়াতে বৃটেনের কূটনৈতিক চেষ্টা ব্যর্থ হল। তখনো জারতন্ত্র মধ্য ও দূরপ্রাচ্যে তার বিস্তারী পরিকল্পনা অনুসরণের মত যথেষ্ট শক্ত ছিল। যে জাপান, বৃটেন ও জার্মানীর দূর প্রাচ্যে সশস্ত্র বিজয়ের ধারা শুরু করেছিল তাদের উদাহবণ অনুসরণ করে জারআমলের রাশিয়া তার নিজস্ব সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি করছিল এবং যেহেতু জাপানও রাশিয়ার সমকক্ষ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, অতএব, তাদের মধ্যে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

জার্মান কূটনীতি পরিস্থিতিকে খুব অনুকূল মনে করল। আগে বৃটেনের সংগে মৈত্রীর আলোচনা শুরু করে, তারপর কথা বলতে অস্বীকার করে কাইজার যেমন বলেছিলেন, তেমন জার্মানি বৃটেন থেকে ঔপনিবেশিক কূটনৈতিক ওবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ "নিংড়ে নেওয়ার জন্য" ঝুঁকে পড়ে। ১৯০১ সাল জুড়ে বৃটেনের কিছু প্রভাবশালী অংশ জার্মানির সংগে রাশিয়া বা ফ্রান্সের বা একসংগে দুয়েরই বিরুদ্ধে মৈত্রীর আলোচনা করছিল। বৃটেন তাদের দেশকে দুই সীমান্তে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে জেনে জার্মান কূটনীতিকরা দর বাড়িয়ে যেতে লাগল। উপরন্তু, যেহেতু ইংগ-জার্মান মৈত্রীতে জাপানকে চুকতে দেওয়ার সম্ভবনা ছিল, অতএব তারা দুই সীমান্তে জড়িয়ে পড়াটা এড়ানোর আশা করেছিল, তার উপরে, একই সংগে দূর প্রাচ্যে ও পশ্চিমে রাশিয়াকে যুদ্ধের ভয় দেখানোর আশা করেছিল। যাই হোক, ১৯০২ সালের মার্চে হলস্টাইন ঘোষণা করেছিলেন যে, "যদৃচ্ছ-নীতি বজায় রাখা" এবং "শেষে শুধু সমর্থনের জন্যই নয়। নিরপেক্ষতার

জন্যও বটে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করায় আমাদের আগ্রহ।" বৃটেন ও জার্মানীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা ভেস্তে গেল, যেহেতু তা ভেঙে যেতই। দু-জনেই বিশ্ব আধিপত্য জয়ের জন্য আগ্রহী ছিল এবং চুক্তির কোন সাধারণ ভূমি ছিল না। বরাবরের মত আলোচনা ভেঙে গেল। শীঘ্রই পৃথিবী জানাল যে, বৃটিশ সরকার জাপানের সংগে এক রাজনৈতিক-সামরিক মৈত্রী সম্পাদন করেছে, যে চুক্তি তাদের আশা ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাতকারী শক্তি হিসাবে ব্যবহার করার, যে সময়ে জার্মানীর সংগে তার আলাপ-আলোচনা একটা সুবিধাজনক আবরণ হয়েছিল। এর ফলে বৃটেন তার নৌশক্তিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উত্তর মহাসাগরে সরাতে সমর্থ হয়েছিল, যে উত্তর সাগরে জার্মান নৌশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বৃটেন ফ্রান্সের সংগে সম্পর্ক পরিবর্তন করতেও সময় নষ্ট করে নি।

এই পরিস্থিতিতে, জার্মান কূটনীতি তখনই তিনদিকে কাজ করার চেষ্টা করল: প্রথমতঃ এটা ফরাসী রুশ মৈত্রীকে দুর্বল করার চেষ্টা করল, দ্বিতীয়তঃ, ইংগ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উত্তেজিত করা এবং তৃতীয়তঃ, দূর প্রাচ্যে রুশ-জাপানী সংঘর্ষকে ত্বরান্বিত করা।

যে দ্বিতীয় উইলহেলম্ নিজেকে আটলান্টিকের অ্যাডমিরাল বলে দেখতেন তিনি, যে দ্বিতীয় নিকোলাস নিজেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ও জাপানের এ্যাড-মিরাল বলতেন তাঁর সংগে নিশ্চিত সংঘর্ষের যথেষ্ট আশা করতেন। জাপানের পিছনে বৃটেন আছে জেনে, জার্মান কূটনীতিকরা জাপানীদের গোপনে রাশিয়া আক্রমণের পরামর্শ দিচ্ছিল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর এবং সমরবাদী অঞ্চল ও তাদের মাথা জেনারেল স্টায়্ নিশ্চিত ছিল যে, যে ফলাফলই হোক না কেন, একটা রুশ-জাপানী যুদ্ধ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের শক্তিকে অন্যপথে চালিত করবে এবং তাদের অর্থনৈতিক বিস্তার, কূটনৈতিক যাদু, ঔপনি-বেশিক চাহিদা ও চাপ হয়ত এমন কি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী যুদ্ধ-সহ তাদের নিরঙ্কুশভাবে এগিয়ে যেতে দেবে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্যবস্থায় শক্তির পুনরায়োজনসহ, সকলের বিরুদ্ধে সকলের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে নতুন পদ্ধতি কার্যকরী হল। পৃথিবীর আঞ্চলিক বিভাগ সম্পূর্ণ হল এবং স্থল ও নৌ-সশস্ত্রীকরণের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত স্থানীয় যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক জটিলতার দ্বারা চিহ্নিত পুনর্বিভাগের প্রাথমিক অবস্থা দেখা দিল। যে রুশ-জাপানী যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের ঘনীভূত অবস্থাকে চিহ্নিত করেছিল, সেই যুদ্ধ ইউরোপে আন্তর্জাতিক বৈপরীত্যের সমাধান করতে পারল না, বিশ্বব্যাপী প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সমাধান করতে পারল না। বরং সেগুলিকে এটা আরও বাড়িয়ে তুলল এবং অর্থনৈতিক সংঘাত, কূটনৈতিক দ্বন্দ্বেও জটিল করে তুলল এবং অনেক

পরিমাণে আগামী সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষে শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করল।

পুঁজিবাদের বিশেষ ধরনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৃদ্ধির গুণে, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, যেকোন দুটি শক্তির বিভিন্ন চুক্তি আসলে দ্বন্দ্বের বিরতি বা তৃতীয় একটি দেশ কিংবা দেশগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌথসংগ্রামের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অসম বৃদ্ধি পূর্বে গঠিত রাজনৈতিক সামরিক গোষ্ঠীর উপরে প্রতিক্রিয়া করবেই: কিছু ঘনিষ্ঠ হওয়ার ঝোঁক দেখাল, কিছু অসংলগ্ন হওয়ার দিকে গেল এবং বাকীগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে গেল। নতুন দল দেখা দিল এবং ক্রমশঃ সেই একই ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত হল। কয়েকটি ক্ষেত্রে একদলের সদস্য বিপরীত দলের এক বা একাধিক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করত।

এই পদ্ধতিতে বৃটেনের "অপূর্ব বিচ্ছিন্নতা"-র পরিসমাপ্তী ঘটল। রুশ-জাপানী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই, অথবা, আরো সঠিকভাবে ১৯০৪ সালের ৮ই এপ্রিলে বৃটেন ও ফ্রান্স ইজিপ্টের উপর বৃটেনের "অধিকার" এবং মরক্কোর দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্সের "অধিকার" স্বীকার করে এক চুক্তি হল। এটা একটা বড় বৃটিশ সুবিধা হিসাবে স্বীকৃত হল, কারণ, মরক্কোর অধিকাংশ ব্যবসা বৃটিশ, বিশেষতঃ লিভারপুলের ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। যাই হোক, বৃটেনের পৃথিবীজোড়া বাণিজ্যিক স্বার্থের এক অনুল্লেখ্য ভগ্নাংশ হল মরক্কোর বাণিজ্য এটা চিন্তা করলে সুযোগটা একটা খুব বড় কিছু নয়। তাছাড়া, ফ্রান্সের "মুক্তদ্বার" নীতির গ্রহণে এটার ভারসাম্য ঘটল। বৃটেনের ক্ষেত্রে বিনিময়টা প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিল।

১৯০৬-এর জানুয়ারিতে বৃটিশ এবং ফরাসী জেনারেল স্টাফরা সামরিক বিষয় আলোচনা করতে গোপনে মিলিত হল। এই ঘটনা বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির আবরণ তুলে ধরল। পূর্বে প্রধানতঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত রাজনৈতিক সামরিক চুক্তির পর এখন বৃটেনের দিকে ছিল ফ্রান্স, জার্মানির বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ রুশ-জাপান যুদ্ধ ও রাশিয়ার পশ্চাৎগতি থেকে অন্ততঃ, তিনভাবে লাভ করার আশা করছিল। প্রথমতঃ, সে আশা করেছিল যে, প্রাশিয়ার জাংকারদের স্বার্থে সে রাশিয়ার উপরে একতরফা বাণিজ্য চুক্তি চাপিয়ে দেবে, যে চুক্তি রাশিয়ার কৃষিজাত দ্রব্য জার্মানীতে রপ্তানী করায় বাধা দেবে এবং রাশিয়াতে জার্মান স্বার্থবিস্তার করবে। দ্বিতীয়তঃ, সে ফরাসী-রুশ মৈত্রী চুক্তিকে বিপর্যস্ত করে ইউরোপীয় মহাদেশে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করবে। তৃতীয়তঃ, ১৯০৩ সালে সম্পূর্ণ বাগদাদ রেলওয়ের সুযোগে মধ্যপ্রাচ্যে গভীরতর হস্তক্ষেপের অনুকূল হাওয়া সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল।

দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার সামরিক পশ্চাদপসরণের ফলে সৃষ্ট অসুবিধায় সত্যিই সাফল্যের কিছু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। জার্মান কূটনীতি রাশিয়াকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা এবং ফ্রান্স থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পরিস্থিতিতে সর্বাধিক কাজে লাগাচ্ছিল। সমরবাদীরা যদিও দুই সীমান্তেই যুদ্ধের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী রেখেছিল, তবুও এটা তাদের ইচ্ছাতেই হচ্ছিল, যারা পূর্বসীমান্ত নিরাপদ রেখে শুধু ফ্রান্সকে আয়ত্ত করতে চাইছিল। ফ্রান্সকে পরাজিত করার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত করার পরিস্থিতি আপনিই দেখা দিত। সংক্ষেপে তারা তাদের মহাদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক এক করে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিল। রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতারও বিকল্প পরিকল্পনা ছিল। যেমন, হলস্টাইন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ফরাসী রুশ মৈত্রীর নীচে এক রুশ-জার্মান বোঝাপড়া থাকতে পারে এবং সেটা বৃটেনের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় লীগের পুনরাবির্ভাব ঘটাতে পারে। এটা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু যে জার্মান কূটনীতি, জার্মান সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষতঃ বৃহত্তম একচেটিয়া কারবারী এবং নৌ ও ঔপনিবেশিক অঞ্চল বৃটেনকে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু মনে করত, তাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে।

পোর্ট আর্থারের পতন রাশিয়ার জারের পক্ষে একটা সামরিক পরাজয়ের চেয়ে অনেক বেশী। এটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। লেনিন যেরকম বলেছিলেন ঠিক সেইভাবে এটা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী আবেগের একটা বন্যা এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে "রাশিয়ার যে সামরিক যুক্তি দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গ বলে মনে করা হত তার পতনে" অন্ততঃ প্রথমদিকে ইউরোপীয় মধ্যবিত্তদের সতর্ক করে দিল। লেনিন সেই সময়ে লিখেছিলেন "ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন রাশিয়ার নৈতিক শক্তিকে ইউরোপের পুলিশের সামরিক শক্তির সমান মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের চোখে যে অবিচল শক্তি জারতন্ত্র দৃঢ়ভাবে বর্তমান "ব্যবস্থা"কে রক্ষা করেছে, তরুণ রুশজাতির সম্মান অবিচ্ছেদ্যভাবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

"প্রকৃতই, ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের সতর্কতার কারণ আছে। প্রলেতারিয়েতদের আনন্দের কারণ আছে। যে বিপদ আমাদের নশ্বর শত্রুকে আক্রমণ করেছে, সেটা শুধু যে রাশিয়াতে স্বাধীনতার আবির্ভাবের লক্ষণ তাই নয়, উপরন্তু এটা ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবাত্মক প্রকাশের সংকেতও বটে।

পিতার্সবার্গের রক্তাক্ত রবিবার (জানুয়ারি ৯, ১৯০৫) এবং তার পরবর্তী "বিপ্লবী দিনগুলো" পাশ্চাত্য বুর্জোয়া ও তাদের সরকারদের আশঙ্কিত করেছিল। তারা "রাশিয়াকে বিপ্লব থেকে এবং জারতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে বাঁচাতে প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের ভয় হয়েছিল যে,

পরিমাণে আগামী সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষে শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করল।

পুঁজিবাদের বিশেষ ধরনের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৃদ্ধির গুণে, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, যেকোন দুটি শক্তির বিভিন্ন চুক্তি আসলে দ্বন্দ্বের বিরতি বা তৃতীয় একটি দেশ কিংবা দেশগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌথসংগ্রামের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অসম বৃদ্ধি পূর্বে গঠিত রাজনৈতিক সামরিক গোষ্ঠীর উপরে প্রতিক্রিয়া করবেই: কিছু ঘনিষ্ঠ হওয়ার ঝোঁক দেখাল, কিছু অসংলগ্ন হওয়ার দিকে গেল এবং বাকীগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকে গেল। নতুন দল দেখা দিল এবং ক্রমশঃ সেই একই ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত হল। কয়েকটি ক্ষেত্রে একদলের সদস্য বিপরীত দলের এক বা একাধিক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করত।

এই পদ্ধতিতে বৃটেনের "অপূর্ব বিচ্ছিন্নতা"-র পরিসমাপ্তী ঘটল। রুশ-জাপানী যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই, অথবা, আরো সঠিকভাবে ১৯০৪ সালের ৮ই এপ্রিলে বৃটেন ও ফ্রান্স ইজিপ্টের উপর বৃটেনের "অধিকার" এবং মরক্কোর দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্সের "অধিকার" স্বীকার করে এক চুক্তি হল। এটা একটা বড় বৃটিশ সুবিধা হিসাবে স্বীকৃত হল, কারণ, মরক্কোর অধিকাংশ ব্যবসা বৃটিশ, বিশেষতঃ লিভারপুলের ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত! যাই হোক, বৃটেনের পৃথিবীজোড়া বাণিজ্যিক স্বার্থের এক অনুলেখ্য ভগ্নাংশ হল মরক্কোর বাণিজ্য এটা চিন্তা করলে সুযোগটা একটা খুব বড় কিছু নয়। তাছাড়া, ফ্রান্সের "মুক্তদ্বার" নীতির গ্রহণে এটার ভারসাম্য ঘটল। বৃটেনের ক্ষেত্রে বিনিময়টা প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিল।

১৯০৬-এর জানুয়ারিতে বৃটিশ এবং ফরাসী জেনারেল স্টাফরা সামরিক বিষয় আলোচনা করতে গোপনে মিলিত হল। এই ঘটনা বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির আবরণ তুলে ধরল। পূর্বে প্রধানতঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত রাজনৈতিক সামরিক চুক্তির পর এখন বৃটেনের দিকে ছিল ফ্রান্স, জার্মানির বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ রুশ-জাপান যুদ্ধ ও রাশিয়ার পশ্চাৎগতি থেকে অন্ততঃ, তিনভাবে লাভ করার আশা করছিল। প্রথমতঃ, সে আশা করেছিল যে, প্রাশিয়ার জাংকারদের স্বার্থে সে রাশিয়ার উপরে একতরফা বাণিজ্য চুক্তি চাপিয়ে দেবে, যে চুক্তি রাশিয়ার কৃষিজাত দ্রব্য জার্মানীতে রপ্তানী করায় বাধা দেবে এবং রাশিয়াতে জার্মান স্বার্থ বিস্তার করবে। দ্বিতীয়তঃ, সে ফরাসী-রুশ মৈত্রী চুক্তিকে বিপর্যস্ত করে ইউরোপীয় মহাদেশে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করবে। তৃতীয়তঃ, ১৯০৩ সালে সম্পূর্ণ বাগদাদ রেলওয়ের সুযোগে মধ্যপ্রাচ্যে গভীরতর হস্তক্ষেপের অনুকূল হাওয়া সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল।

দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার সামরিক পশ্চাদপসরণের ফলে সৃষ্ট অসুবিধায় সত্যিই সাফল্যের কিছু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। জার্মান কূটনীতি রাশিয়াকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা এবং ফ্রান্স থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পরিস্থিতিতে সর্বাধিক কাজে লাগাচ্ছিল। সমরবাদীরা যদিও দুই সীমান্তেই যুদ্ধের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরী রেখেছিল, তবুও এটা তাদের ইচ্ছাতেই হচ্ছিল, যারা পূর্বসীমান্ত নিরাপদ রেখে শুধু ফ্রান্সকে আয়ত্ত করতে চাইছিল। ফ্রান্সকে পরাজিত করার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত করার পরিস্থিতি আপনিই দেখা দিত। সংক্ষেপে তারা তাদের মহাদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক এক করে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিল। রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতারও বিকল্প পরিকল্পনা ছিল। যেমন, হলস্টাইন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ফরাসী রুশ মৈত্রীর নীচে এক রুশ-জার্মান বোঝাপড়া থাকতে পারে এবং সেটা বৃটেনের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় লীগের পুনরাবির্ভাব ঘটাতে পারে। এটা স্বপ্নমাত্র। কিন্তু যে জার্মান কূটনীতি, জার্মান সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষতঃ বৃহত্তম একচেটিয়া কারবারী এবং নৌ ও ঔপনিবেশিক অঞ্চল বৃটেনকে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু মনে করত, তাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে।

পোর্ট আর্থারের পতন রাশিয়ার জারের পক্ষে একটা সামরিক পরাজয়ের চেয়ে অনেক বেশী। এটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। লেনিন যেরকম বলেছিলেন ঠিক সেইভাবে এটা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী আবেগের একটা বন্যা এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে "রাশিয়ার যে সামরিক যুক্তি দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার দুর্গ বলে মনে করা হত তার পতনে" অন্ততঃ প্রথমদিকে ইউরোপীয় মধ্যবিত্তদের সতর্ক করে দিল। লেনিন সেই সময়ে লিখেছিলেন "ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন রাশিয়ার নৈতিক শক্তিকে ইউরোপের পুলিশের সামরিক শক্তির সমান মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের চোখে যে অবিচল শক্তি জারতন্ত্র দৃঢ়ভাবে বর্তমান "ব্যবস্থা"কে রক্ষা করেছে, তরুণ রুশজাতির সম্মান অবিচ্ছেদ্যভাবে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

"প্রকৃতই, ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের সতর্কতার কারণ আছে। প্রলেতারিয়েতদের আনন্দের কারণ আছে। যে বিপদ আমাদের নশ্বর শত্রুকে আক্রমণ করেছে, সেটা শুধু যে রাশিয়াতে স্বাধীনতার আবির্ভাবের লক্ষণ তাই নয়, উপরন্তু এটা ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবাত্মক প্রকাশের সংকেতও বটে।

পিতার্সবার্গের রক্তাক্ত রবিবার (জানুয়ারি ৯, ১৯০৫) এবং তার পরবর্তী "বিপ্লবী দিনগুলো" পাশ্চাত্য বুর্জোয়া ও তাদের সরকারদের আশঙ্কিত করেছিল। তারা "রাশিয়াকে বিপ্লব থেকে এবং জারতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে বাঁচাতে প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের ভয় হয়েছিল যে,

যদি জার ক্ষমতাচ্যুত হয়, তাহলে ইউরোপে বিপ্লব আন্দোলন হবে এবং প্রাচ্য দেশীয় জনগণের মধ্যে আরো বেশী আন্দোলন হবে। উপরন্তু, তারা এক সামরিক সাকরেদ থেকে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংগী থেকে বঞ্চিত হবে। জার্মানীর শাসকদের ভয়ও হল যে, রাশিয়াতে বিপ্লবাত্মক বৃদ্ধি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিম পোলিশ অঞ্চলে একটা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জ্বালিয়ে দেবে।

জারতন্ত্রী রাশিয়ার উপরে রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হল ঋণ। রুশ-জাপান যুদ্ধের শুরুতে পিতাসবার্গ সরকার আবিষ্কার করেছিল যে তাদের একটা বিরাট ঋণের দরকার। তারা আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়ার আশা করেছিল। কিছু জারতন্ত্রী আমলারা জাপানের উপরে জয় লাভের বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে আদানপ্রদান স্থগিত রাখতে চাইছে, এটা জেনে, জারের অর্থমন্ত্রী কোকোভৎসোভ লিখেছিলেন: এই ব্যাপারটা ভালই হত, যদি না এটা আমায় মনে করিয়ে দিত যে, একজন পরিতৃপ্ত লোক একজন ক্ষুধার্ত লোককে নানারকম রন্ধন প্রণালীর সুবিধার কথা বলছিল। "শীঘ্রই বৈদেশিক মন্ত্রী লামমুভফের রাজী হওয়া ছাড়া উপায় রইল না। তিনি লিখেছিলেন, "এই ভীষণ যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত বিশাল পরিমাণ টাকার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের নিকট ভবিষ্যতে যে কোন উপায়ে সোনার খোঁজ করতে হবে। যারা বৈদেশিক নীতির জন্য দায়ী এবং যারা দেশের কোষাগারের জন্য দায়ী তাদের মধ্যে মতামত বেছে নেওয়ার সময় আসবে, তখন পরবর্তীদেরই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।"

১৯০৫ সালের প্রথমদিকে, জার সরকার ঋণের জন্য ফরাসী ব্যাংক মালিকদের কাছে গেলেন। টাকার খুব দরকার ছিল যুদ্ধ চালানো এবং বিপ্লব দমনের জন্য। অবশ্য যে ব্যাংক মালিকরা চাইছিল যে, জার জাপানের সংগে শান্তিস্থাপন করুক এবং রাশিয়ার উদারপন্থী বুর্জোয়াদের সংগেও মিটমাট করুক, তারা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। তারা একটা জুয়া খেলায় মেতে উঠল, যে জুয়াকে লেনিন প্রলেতারিয়েত বিরোধী ও বিপ্লব বিরোধী শক্তির অনুসারী" বলে বর্ণনা করেছেন। জার্মান সরকারও একই বিপ্লবীবিরোধী শক্তির হয়ে কাজ করছিল, কিন্তু সেটা, অবিলম্বে রাজনৈতিক সামরিক সুবিধার আশায়, ঠিক ফরাসীদের বিপরীত মুখে করেছিল। এটা জারপন্থী সরকারকে একটা বড় ঋণ মঞ্জুর করার পরামর্শ দিয়েছিল Mendelssohn and Sons-এর ব্যাংক ব্যবসাকে, তাদের আশা ছিল এতে জারতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারকে বাঁচাবে এবং তাকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করবে। তারা আরো আশা করেছিল যে, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ঘটাবে, তাদের দুর্বল মৈত্রীকে দমিয়ে দেবে এবং শেষ পর্যন্ত, রাশিয়ার সংগে সম্পর্ক প্রসারণের পর, আন্তর্জাতিক ভাবে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করবে। যদি রাশিয়ার বিপ্লব

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়ে জারের রাজত্ব এবং সমানভাবে জার্মানির নিজের আধা-স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে, যে শাসনব্যবস্থাকে ইতিমধ্যেই এক জাগরিত শ্রমিক শ্রেণীর সম্মুখীন হতে হয়েছে তাই সরকার ও জেনারেল স্টাফ্ এক সম্ভাব্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কথা বিবেচনা করছিল।

কিন্তু সেই সময়ের জন্য জার্মান কূটনীতি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়াকে নিজের পক্ষে আনার কাজ শুরু করল। ১৯০৫-এর জুলাই-এর শেষে Bjorko-তে উইলহেল্মের সংগে কথাবার্তার সময়ে, দ্বিতীয় নিকোলাস, যে ফরাসীরা রুশ-জাপানী যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থায় বৃটিশদের সংগে তাদের চুক্তিকে অভিনন্দিত করছিল, তাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কাইজারকে বলেছিলেন, "ফরাসীরা শয়তানের মত কাজ করছে। আমার বন্ধু আমায় সাহায্য করতে প্রত্যাখান করেছে, যেহেতু বৃটেন তাই চেয়েছিল। এখন ব্রেস্তের দিকে দেখুন: সেখানে তারা ইংরেজদের সংগে ভাব করছে। এই পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত ?".

কাইজার জারকে বলেছিলেন ঠিক কি তাঁর "করা উচিত।" তিনি তাঁকে একটা "সামান্য দলিলে" সই দিতে রাজী করিয়ে ছিলেন—অন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির যে কোন একটির সংগে সংঘাত ঘটলে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহায়তার এক গোপন চুক্তি সেটা। কাইজারের পরামর্শ অনুযায়ী, চুক্তিটা একজন মন্ত্রীর সই করার কথা। কাজেই এটায় কি আছে না পড়েই, নিকোলাস তাঁর নৌমন্ত্রী বিরিলিয়োভকে এটা সই করতে হুকুম দিলেন। উইলহেল্ম আনন্দ করে বললেন, "ভগবানের কৃপায় Bjorko-তে ২৪শে জুলাই-এর সকাল ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়রূপে এবং আমার পিতৃভূমির এক বিরাট সান্ত্বনা হিসাবে দেখা দিল যে, পিতৃভূমি শেষ পর্যন্ত গল আর রুশদের ভয়ংকর মুঠি থেকে মুক্তি পেল।"

যাইহোক, ঈশ্বরের কাছে আবেদন সত্ত্বেও, জার্মান কূটনীতি ফরাসী জেনারেল স্টাফের সংগে জারতন্ত্রী সৈন্যের বন্ধন ভাঙতে পারল না। সে বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযানে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারল না। জার Bjorko-তে জার্মানির সংগে এক মৈত্রী চুক্তি করেছেন জানতে পেরে বৈদেশিক মন্ত্রী লাম্‌সডর্ফ এবং উইট এর কার্যকারিতা বাতিল করতে ও ফরাসী রুশ মৈত্রী বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। লাম্‌সডর্ফ মন্তব্য করেছিলেন, "উইল্‌হেল্‌মের একমাত্র না হোক, প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধানো এবং এইভাবে আমাদের ঘাড় দিয়ে তাঁর নিজের বিচ্ছিন্নতাকে নষ্ট করা। "কিন্তু Bjorko চুক্তির মৃত্যু হল। চুক্তি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নিকোলাসকে গালাগালি দিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের মুকুট পরা মাথা বৃথাই উন্মত্ত হল।"

এক মৈত্রী চুক্তির দ্বারা রাশিয়ার ফ্রান্সের সংগে মৈত্রী ভেঙে দেওয়ার জার্মান প্রচেষ্টা অনেক কিছু প্রকাশ করে। যেমন, এতে দেখা যায়, এক দিকে জার্মান শাসকরা এবং অন্যদিকে ফরাসী শাসকরা আগামী যুদ্ধে রাশিয়ার উইলহেল্‌মের কূটনীতিকরা ও জেনারেল স্টাফ ইউরোপে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাশিয়ার সংগে একটা মৈত্রীর আশা করেছিল। রাইখচ্যান্সেলার এবং নৌ-কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন, যদি মৈত্রীচুক্তিতে শুধু ইউরোপ ছাড়াও আরো জায়গা ধরা হত এবং প্রধানতঃ বৃটেনের বিরুদ্ধে কাজ করত, তাহলে ওটা যথার্থ হত। তবুও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে আর একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের কথা ভাবতে হয়েছিল : রুশ সাম্রাজ্যে শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলন জারতন্ত্রকে তলিয়ে দিচ্ছিল এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় এটাকে সামরিক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে দুর্বল করে দিচ্ছিল। তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা, বৃটেন, জার্মান, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী, এমনকি মৈত্রীবদ্ধ ফ্রান্সও ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল, আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাশিয়া যে ক্ষীয়মান ভূমিকা গ্রহণ করছিল, তার থেকে পাওয়া ন্যূনতম অর্থনৈতিক কূটনৈতিক সামরিক সুবিধাকে ওজন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

রাশিয়ার অনুগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি চলছিল, কিন্তু মরক্কোতে একটা নতুন আন্তর্জাতিক সংকট না শুরু হওয়া পর্যন্ত এর ফলাফল স্পষ্ট হল না।

১৯০৪-এর শেষে ফরাসী পুঁজিপতিরা এবং শিল্পপতিরা (শ্‌চনেইদার-ক্রিউসট প্রতিষ্ঠানসহ) মরক্কোর ঘটনার জন্য একটা কমিটি তৈরী করল, প্রভাবশালী রাজনীতিকদের সমর্থন তালিকাভুক্ত করল এবং মরক্কোর সুলতানকে একটা বেশ ভাল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করল। তারা বৃটেনের সংগে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক চুক্তির সুবিধাগুলি নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। প্রধান বন্দরগুলিতে কাস্টমস্‌ ও পুলিশ এবং মরক্কো সৈন্যবাহিনীতে ফরাসী নির্দেশক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের শর্তে ঋণ দেওয়া হল। কার্যক্ষেত্রে এই শর্তগুলির অর্থ হল মরক্কোর স্বাধীনতার মৃত্যু। যেসব একচেটিয়া কারবার ও পুঁজিপতি-গোষ্ঠীর নিজেদের উদ্দেশ্য ছিল, তাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে জার্মান সরকার হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিল। তারা ইংগ-ফরাসী চুক্তির ক্ষতি করতে বৃটেন যে তাকে বিপদে ফেলে যাবে, এটাও দেখিয়ে দেওয়ার আশা করেছিল। জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে পেয়ে তৎকালীন জেনারেল স্টাফের প্রধান Schlieffen অধিকাংশ পদস্থ কূটনীতিকরা বিশ্বাস করল যে পরিস্থিতি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুকূলে।

১৯০৫-এর ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় উইল হেলম ট্যাঞ্জিয়ার পরিদর্শনের সময়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, মরক্কোর উপরে কোন বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য জার্মানি সহ্য করবে না এবং তাতে বাধা দেবে। ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী

Theoghile Delcasse (মৈত্রীচুক্তির অন্যতম রচয়িতা) জার্মানির শত্রু এই যুক্তিতে জার্মান সরকার তাঁর সংগে আলোচনা করতে অস্বীকার করল।

যাই হোক, জার্মানির কৌশল এক সত্বর বৃটিশ প্রতিক্রিয়া ঘটাল। বৃটিশ সরকার ফরাসী প্রধানমন্ত্রী Pierre Rouvier-কে মরক্কোয় দৃঢ় থাকার জন্য এবং Delcasse-কে বরখাস্ত না করার উপদেশ দিল। তারা কথা দিল, যদি জার্মানি আক্রমণ করে তা হলে তারা মহাদেশে ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ১৫ হাজারের সৈন্য বাহিনী নামাবে।

বৃটিশ সরকারের এই প্রকাশ্য আশ্বাসে উত্তেজিত হয়ে ফরাসী মন্ত্রীসভা এক ঝটিকা অধিবেশনে Delcasse জার্মান দাবীকে প্রত্যাখ্যান করতে বললেন। কিন্তু ফ্রান্সের নিকটতম মিত্র রাশিয়ার ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে (খবর পাওয়া গিয়েছিল যে রাশিয়ার একটি যুদ্ধজাহাজ জাপানীরা শুশিমাতে ডুবিয়ে দিয়েছিল)। ফরাসী মন্ত্রীসভা পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিল। Delcasse-কে ১৯০৫-এর জুনে পদত্যাগ করতে হল এবং ফ্রান্স মরক্কো সমস্যাকে আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তুলতে রাজী হল। যে জার্মানদের ফ্রান্সের সংগে যুদ্ধের চেষ্টা করার আগে অল্পই সময় ছিল. তারা দৃঢ় বৃটিশ মনোভাবের বিরুদ্ধে এটা ভাল মনে করল এবং আলোচনায় রাজী হল। অংশতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্টের চাপ এবং কিছুটা শেষ পর্যন্ত রুশ-ফরাসী মৈত্রীকে ভেঙে রাশিয়াকে স্বপক্ষে আনার আশা তাদের সিদ্ধান্তকে চালিত করল।

সম্মেলন ১৯০৬-এর প্রথমে দক্ষিণ স্পেনে আলজেসিরাসে শুরু হল এবং বিশ্বঘটনাবলীতে শক্তির নতুন মৈত্রীকে প্রকাশ করল। সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি আর্থার নিকোলসন বললেন, "বৃটিশ কূটনীতি ফরাসীর থেকেও বেশী ফরাসী।" এটাতে ইংগ-ফরাসী মৈত্রীচুক্তির শক্তি প্রমাণিত হল। লণ্ডনে জার্মান সামরিক অ্যাটাশে জানলেন যে, যদি সম্মেলন ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে জার্মানির বিরুদ্ধে এক অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী পাঠানোর এক বিকল্প পরিকল্পনা বৃটিশ জেনারেল স্টাফের আছে। অধিকন্তু খবর পাওয়া গেল যে, ব্রাসেলসে বৃটিশ সামরিক অ্যাটাশে বারনারডিস্টন বেলজিয়ান জেনারেল স্টাফ ডুকার্ণের সংগে যৌথ আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করছেন, যদি জার্মান সৈন্যবাহিনী বেলজিয়ান অঞ্চল পার হয়। বম্বের রুশ রাষ্ট্রদূতের কথা অনুযায়ী, সেখানকার ঔপনিবেশিক ও সামরিক অঞ্চল "গভীর মনোযোগের সংগে" সম্মেলন লক্ষ্য করছিল। তিনি লিখেছিলেন, "ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কথা খোলাখুলিভাবে আলোচিত হয়েছে……এবং যে কেউ প্রশ্নটা সকলের মুখেই দেখতে পাবে: ফ্রান্সই কি সেই নতুন উপকারী যে বৃটেনের জন্য সব কিছু বাঁচাবে অর্থাৎ ঘৃণ্য এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপজ্জনক জার্মানিকে দুর্বল করবে?"

রাষ্ট্রদূত লিখেছিলেন, "সামরিক দল বিশ্বাস করে যে, এই সময়টা জার্মা-

নির ওপরে আক্রমণ চালানোর পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল, এই আক্রমণ তার বিশ্ব বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক নীতিকে অনেকদিনের মত পঙ্গু করে দেবে।"

অনেক ঘটনায় সম্মেলন ভেঙে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। নিকোলসনকে লণ্ডন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, "যদি সম্মেলন ভেঙে যাওয়ার মত হয়, তা হলে ফ্রান্সকে দোষী সাব্যস্ত করার কৌশল ঘটতে দেওয়া চলবে না।" যে জার্মান কূটনীতি বুঝেছিল যে, তারা বিচ্ছিন্ন, তাদের সম্মিলিত ইংগ-ফরাসী চাপ পিছিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

আলজেসিরাস সম্মেলনে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাপানের সংগে যুদ্ধে ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যকলাপে দুর্বল, অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন এবং বৈদেশিক ঋণের জন্য সচেষ্ট জার সরকার ইংগ-বৃটিশপক্ষ ও জার্মানির মাঝখানে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। হয় ফ্রান্স অথবা জার্মানি অথবা দুজনের কাছ থেকেই ঋণ পাওয়া যাবে এই ভেবে রাশিয়া সম্মেলন শেষ হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল। "যে বিপ্লব আন্দোলন প্রতিবেশী রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করায় সেই রাজ্যগুলিকে আসন্ন বিপদের বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে," সেই আন্দোলনকে দমনের প্রয়োজনীয়তাই ছিল রাশিয়ার প্রধান আবেদন।

বিরক্ত জার্মান কূটনীতিকরা রাশিয়াকে মনে করিয়ে দিলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য বিচলিত জার সরকারকে তার নিজের সম্পদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করা থেকে এই বিপ্লব আন্দোলনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রচেষ্টার আবেদন মুক্তি দেয় নি। কার্যতঃ এটা মরক্কোতে জার্মানির ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যকে সমর্থনের জন্য জার সরকারকে বাধ্য করার একরকম চাপ। আবার ফরাসী সরকার নিশ্চিতভাবে পিতার্সবার্গকে বলল যে, আর দ্বিধা ঘটলে রাশিয়ার ঋণের আশা করার দরকার নেই। অতএব, আলজেসিরাস সম্মেলনের নিশ্চিত স্তরে জার সরকার তার কূটনৈতিক সমর্থন জানাল ফ্রান্সকে। তখনই প্যারির ব্যাংকমালিকদের রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় ঋণ মঞ্জুর করার অনুমতি দেওয়া হল, যা এতদিন ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল।

এমন কি সম্মেলনে জার্মানির মিত্র ইটালি সাধারণ কারণে ফ্রান্সকে সমর্থন করল। ত্রিশক্তি চুক্তিতে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ইটালি উত্তর আফ্রিকায় প্রভাবের ক্ষেত্র বিষয়ে ১৯০০ সালে ফ্রান্সের সংগে এক গোপন চুক্তি করেছিল। মরক্কোতে ফরাসী প্রভাব বুঝতে পেরে, ইটালি এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল যে, তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ট্রিপোলিটানিয়া অধিকারে ফ্রান্স বাধা দেবে না। দু'বছর পরে ইটালি ফ্রান্সের সংগে পারস্পরিক নিরপেক্ষতার আর একটি গোপন চুক্তি সই করল। এই ঘটনা ত্রিশক্তি চুক্তি থেকে ইটালির ক্রমশঃ সরে আসার একটা ইঙ্গিত।

ফরাসী ইটালিয়ান সম্বন্ধ জার্মান কূটনীতিকদের নজর এড়ায় নি। কিন্তু তারা নিরুপায়। রাইখ চান্সেলার বউলো এটা হালকা করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে লোকের স্ত্রী প্রতিবার অন্য কারোর সংগে ওয়াল্‌টজ নাচলেই তার মাথায় রক্ত উঠে যায়, সে অপদার্থ। কিন্তু আলজেসিরাসে এটা বোঝা গেল যে, ইটালির ব্যবহারে এই অস্থিরতা অসৎ উদ্দেশ্যে। যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ফরাসী ব্যাংকগুলির সংগে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল এবং যারা এখনো বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার সংগে সংঘর্ষ ঘটলে বৃটিশ কূটনৈতিক সমর্থনের আশা করে, তারাও আদৌ তাদের জার্মান মিত্রর দৃঢ় সমর্থক ছিল না।

ফলে, ফ্রান্সের কূটনৈতিক জয় হল: বাহ্যত সম্মেলন মরক্কোয় সব বৃহৎ শক্তি-র অর্থনৈতিক আগ্রহের সাম্য স্বীকার করল, কিন্তু ফ্রান্সকে মরক্কোয় "আভ্যন্তরীণ শৃংখলা" বজায় রাখার এবং মরক্কোর নীতি নিয়ন্ত্রণ করার পুরস্কার দিল। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে এটা মরক্কোর অধিকারের পরবর্তী পথ সুগম করল। রাশিয়ার বিপ্লবের বন্যা রাষ্ট্রগুলি স্থিতিশীল অবস্থার উপরে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলল। জারের আন্তর্জাতিক ভূমিকা কিছুটা বিচলিত হল, আর পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তিগুলির ভূমিকা যথোচিতভাবে উন্নত হল। এটা ঘটল যখন ইউরোপীয় বড় শক্তিগুলির ধারায় অন্যান্য পরিবর্তন স্পষ্ট হল। বৃটেনের "অপূর্ব বিচ্ছিন্নতা" সম্পূর্ণ অতীতের বস্তু। ইংগ-ফরাসী মৈত্রী আরো শক্তিশালী হল এবং অধিকন্তু, এই মৈত্রী যে অন্যান্য শক্তির সংগে বোঝাপড়ায় এসে নিজেকে প্রসারিত করতে চায়, তার স্পষ্ট ইংগিত দিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে যে ফরাসী রুশ মৈত্রী অমীমাংসিত হয়েছিল, সেটা আবার শক্তি ফিরে পাচ্ছিল, বিশেষতঃ রাশিয়া বেড়া ডিঙিয়ে মৈত্রী চুক্তির সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করার পর। যে জার্মানি ফ্রান্স থেকে রাশিয়াকে এবং তারপর বৃটেন থেকে ফ্রান্সকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল যাতে ওরা প্রত্যেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এখন নিজেই বিচ্ছিন্ন। এই সত্যটা জার্মান সাম্রাজ্যবাদরীরা তখনই বুঝতে পারে নি এবং কখনো পুরো অনুধাবন করতে পারে নি, যদিও যথার্থ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য সেটা একান্ত দরকারী ছিল। বৃটিশ কূটনীতিও মরক্কো সংকটের সময়ে জার্মানির সংগে সংঘর্ষের শিক্ষা ভুলে যেতে দিচ্ছিল। একজন বিশিষ্ট বৈদেশিক কার্যালয়ের কর্মচারী আয়ার ক্রো এক গোপন নোটে সরকারকে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির আক্রমণের দাবীর দিকে সংকেত করেছিলেন এই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বৃটেনের পক্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে বোঝাপড়ায় আসা অসম্ভব। তিনি লিখেছিলেন, জার্মানি বৃটেনের সংগে কোন মৈত্রী করে নি, যদিও বারবার সে মৈত্রীর মূল্য হস্তগত করেছে। কিছু বৃটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে প্রচলিত যে ধারণা ছিল যে, উদার বৃটিশ

সুযোগ-সুবিধায় জার্মানি সন্তুষ্ট হবে এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাবে সে আরো এগিয়ে আসবে, সে ধারণা ক্রো উড়িয়ে দিয়েছেন।

ইংগ-রুশ সম্পর্কের পরিবর্তন এই বিশেষ সময়ে ঘটে। জাপানের মাধ্যমে দূর প্রাচ্যে জারতন্ত্রী রাশিয়াকে লাঞ্ছিত করে এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং জার্মানির সংগে যুদ্ধ লড়বার জন্য প্রয়োজনীয় বন্ধুর সংগে বোঝাপড়ায় আগ্রহী হলেন। জার ও বৃটেনের দিকে ঝুঁকলেন। তাঁর পশ্চিম ইউরোপীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের সুযোগ ছিল এবং তিনি বিপ্লবের তুফান কাটিয়ে উঠেছিলেন ; জাপানের সংগে যুদ্ধ শেষ হয়ে পোর্টসমাউথের সন্ধিতে স্বাক্ষর করা হয়েছিল এবং এখন তিনি যা চাইছিলেন তা হল জার্মানির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। জার্মানদের আশা যে, রুশ জাপান যুদ্ধ ইংগ রুশ বৈপরীত্যগুলিকে বাড়িয়ে তুলবে যার সুযোগ নিয়ে জার্মানি বিশ্ব আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে, তা লক্ষ্য ভেদ করল না।

বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে উৎসাহী আলাপ-আলোচনা বিতর্কমূলক ঔপনিবেশিক সমস্যার একটা আপসের পথ দেখাল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯০৭-এর ৩১ আগস্টে একটা চুক্তি সই হল, যে চুক্তি এশিয়াতে প্রত্যেকের প্রভাবের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিল। ইরান তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—উত্তরাঞ্চল ছিল রাশিয়ার প্রভাবিত অঞ্চল, দক্ষিণ পূর্ব বৃটেনের এবং মধ্যাঞ্চল "নিরপেক্ষ" অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার "মুক্ত" অঞ্চল। কার্যতঃ আফগানিস্তান বৃটিশ প্রভাবিত অঞ্চলরূপে নির্ধারিত হল এবং দুই স্বাক্ষরকারী দেশই তিব্বতের আভ্যন্তরীণ সরকারের বিষয়ে নিরপেক্ষতার অনুরোধ জানাতে লাগল। এই ইংগ-রুশ ইচ্ছার আগেই জারতন্ত্রী রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি হয়েছিল যে চুক্তিতে উত্তর-পূর্ব চীনে প্রভাবের অঞ্চল নির্ধারিত হয়েছিল।

এই ইংগ-রুশ চুক্তি ত্রিশক্তি মৈত্রীর ভিত্তিস্থাপন করল—এই মৈত্রী হল অন্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ত্রিশক্তি চুক্তির জার্মান, অস্ট্রিয়া হাঙেগরী এবং ইটালির মৈত্রীর বিপরীতে বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সামরিক এবং কূটনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী মৈত্রী। এর ফলে দুটি সামরিক শত্রুগোষ্ঠীতে ইউরোপের বিভাগ ঘটল।

কিছু দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নেতা দুই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বন্ধন ইংগ রুশ চুক্তিকে "শান্তির জামিন" হিসাবে অভিনন্দন জানালেন। লেনিন এই সুবিধাবাদী মনোভাবে আপত্তি জানালেন। ত্রিশক্তি মৈত্রীর উদ্বোধনের এক বছরেরও কম সময়ে যে "দাহ্য উপাদান" সাম্রাজবাদী বিশ্ব রাজনীতিতে জড়ো হয়ে উঠেছে তারদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সতর্ক করে দিলেন যে, সব প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি কোন একটি শক্তির ন্যূনতম প্ররোচনায় যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।[১]

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১৫, পৃঃ ১৯১।

মৈত্রীর উদ্ভব পৃথিবীকে আরো এক ধাপ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে আনল। প্রথমে এর কোন যৌথ সামরিক ব্যবস্থা ছিলনা কোন সাধারণ সামরিক নিয়ম বা পরিকল্পনাও ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, বৃটিশ জেনারেল স্টাফ গোপনে ইংগ-ফরাসী গোপন মৈত্রীর সময়ে এবং তারপরে মরক্কো সংকট ও আলজেসিরাস সম্মেলনের সময়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের জেনারেল স্টাফদের সংগে আলোচনা করেছিল। বৃটিশ জেনারেল স্টাফ যুদ্ধ ঘটলে মহাদেশে চার ডিভিশন জাহাজ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নৌসহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নি। এই রকম প্রতিশ্রুতি—একটা সামরিক মৈত্রী চুক্তি বা ঐ জাতীয় কোন কিছু লাভের জন্য ফরাসীদের সব চেষ্টা বৃথা হল। অন্যদিকে ফরাসী-রুশ মৈত্রীর সামরিক ব্যবস্থা অব্যাহতভাবে কাজ করছিল। এটা বার বার পুনর্গঠিত হচ্ছিল এবং এর একটা নির্দিষ্ট সামরিক কৌশল ছিল।

যদি ত্রিশক্তি চুক্তির বা তার কোন দেশের সংগে সংঘর্ষ বাধে তাহলে সৈন্যপরিচালনার ব্যাপারে ১৯০৬-এর এপ্রিলে ফরাসী ও রুশ সৈন্যবাহিনীর প্রধানরা একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছলেন। ১৯০১-এ স্বাক্ষরিত পূর্বের চুক্তিতে বৃটেনের সংগে সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের ব্যবস্থাও ছিল। তবে এখন এসব অপ্রয়োজনীয়। মৈত্রীর শুধু অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল। জাপানীদের দ্বারা এবং ক্রমান্বয় বিপ্লবী ধ্বংসের দ্বারা বিধ্বস্তরুশ সশস্ত্র বাহিনীকে রক্ষার জন্য ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্বিগ্ন ছিল।

তবুও ঘনিষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা, ত্রিশক্তি মৈত্রী বা ত্রিশক্তি চুক্তি, কোনটাই স্থায়ী ছিল না। সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনিশ্চিত ভূমিতে বিকশিত হয়ে দুটি চুক্তিই তাদের সদস্যদের পার্থক্যে উৎপীড়িত হচ্ছিল, যে পার্থক্য মাঝে মাঝেই প্রকাশ্যে ফেটে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছত যার ফলে বিভিন্ন দেশ বিপরীত গোষ্ঠীর সদস্যদের সংগে আপস করে ফেলত। কখনো এই মধুর মিলন আকস্মিক ও স্বল্পস্থায়ী, কখনো বেশী সময় থাকত। সবসময়েই এসব ঘটনা আন্তরাষ্ট্র সম্বন্ধের অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দিত, যাতে সমগ্র ইউরোপে কূটনৈতিক সংকটমুখী স্থানীয় সংঘাত জাগিয়ে তুলত এবং শেষ পরিণতি যার, বিশ্বযুদ্ধ। শুধু একটা ব্যাপার শক্তিগুলিকে মিলিত করত এশিয়াতে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনমুখী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংগে লড়বার প্রয়োজন। এখানেও স্বার্থ সমান ছিল না। সেগুলির দ্বৈত ভিত্তি ছিল। যখন ১৯০৮ সালে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিপ্লবের অনিশ্চয়তা ইরান ও তুরস্ককে আক্রমণ করল তখন লেনিন লক্ষ্য করলেন যে, "সব ইউরোপীয় নীতির দুটি প্রধান উৎস" প্রথম, "যে পুঁজিবাদী শক্তিগুলি যত বড় সম্ভব ততবড় অংশ কেড়ে নিতে এবং তাদের অধিকার ও উপনিবেশ বাড়াতে উদ্বিগ্ন তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা" এবং দ্বিতীয়, "ইউরোপের উপর নির্ভরশীল বা ইউরোপের দ্বারা

সুরক্ষিত" জাতিদের মধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভয়।[1] সমস্ত বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তির গোষ্ঠী নির্বিশেষে অদৃশ্য রাজনৈতিক সম্বন্ধের এই হল বিপরীতমুখী ভিত্তি। জার আমলের রাশিয়ায় বিদ্রোহ দমনের পর পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলি অন্যদিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাল। যখন বিপ্লবের ঢেউ ইরানে তুঙ্গে উঠল তখন বৃটেন ও জারতন্ত্রী রাশিয়া পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। ১৯০৮ এর সেপ্টেম্বরে দুই শক্তির মধ্যে সজীব কূটনৈতিক বিনিময় ঘটল। পার্থক্য ছাড়াও এই বিনিময়ে কিছু সাধারণ স্বার্থ প্রকাশিত হল। লেনিন দ্রুত আলোচনার অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশ বুঝতে পারলেন। তিনি লিখলেন "এখন যেহেতু সব বৃহত্তম ইউরোপীয় শক্তি নিজেদের দেশে গণতন্ত্র প্রসারে ভীষণ ভীত কারণ তা প্রলেতারিয়েতদের উপকার করবে, সেইজন্য রাশিয়াকে এশিয়ায় সৈন্য পাঠাতে সাহায্য করছে।' এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই যে, পারস্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে রাশিয়ার 'কার্যস্বাধীনতা' হল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স আর বৃটেনের ***সেপ্টেম্বরের প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের অংশ***।"[2]

যাই হোক এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির বৈপারীত্য, এমনকি স্থিতিশীল গোষ্ঠীগুলির নিজেদের বৈপ্যরীত্যগুলিকে বাধা দেয়নি, শীঘ্রই যার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯০৮-০৯ সালে অস্ট্রিয়ার বসনিয়া এবং হারজেগোভিনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকট থেকে। ১৮৭৮-এর জুনে বার্লিন কংগ্রেস ঐ দুটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সৈন্য দলের উপর দিল, যদিও প্রদেশ দুটি বাহ্যত অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে রইল। তরুণ তুর্কী বিপ্লবের পর বলকান অঞ্চলে বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মনোভাব আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া খুব বেশী আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বাধা দিতে পারবে না এই ভয়ে ভিয়েনা বসনিয়া এবং হারজেগোভিনা অধিকারের সিদ্ধান্ত নিল। ভিয়েনা জারতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগল এই আশায় যে, রাশিয়া প্রণালী অঞ্চলে সমর্থনের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে অধিকারে সম্মতি দেবে। ইতিমধ্যে, জারের কূটনীতিকরা জাপানের সঙ্গে গৌরবহীন যুদ্ধের ও ১৯০৫-০৭-এর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াকে বিনষ্ট করার জন্যে একটা কূটনৈতিক জয়ের মত কিছু পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছিল।

১৯০৮-এর সেপ্টেম্বরে রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী ইজ্‌ভোলস্কি এবং তাঁর অস্ট্রীয় ভাগীদার Aehrenthal-এর দ্বারা বুচলোভে চুক্তিটা সম্পূর্ণ হল।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১৫, পৃঃ ২২১-২২।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৬-২৭।

জার বসনিয়া ও হারজেগোভিনায় অস্ট্রিয়ার অধিকারে তাঁর সম্মতি দিলেন আর যে কৃষ্ণসাগর প্রণালী অঞ্চল রাশিয়া তার নৌবাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করতে চাইছিল, সেখানে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিল। কিছুদিন পরে রুশ সরকার অনুরূপ প্রতিশ্রুতি জার্মানীর কাছ থেকে আদায় করল, যদিও তার শর্ত ছিল অস্পষ্ট এবং "ক্ষতিপূরণের" শর্তসাপেক্ষ। যদি রাশিয়া ইটালির ট্রিপোলিটানিয়া অধিকারে রাজী হত, তাহলে ইটালিও প্রণলীর বিতর্কে রাশিয়াকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিল।

যা হোক, প্রণালী সমস্যার ফলাফল বেশী পরিমাণে ফ্রান্স ও বৃটেনের উপরে নির্ভর করছিল। ইজভোলস্কি সাহায্যের সুপারিশ করতে প্যারি ও লণ্ডনে গেলেন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সরকার দেরীর জন্য বিরক্তি প্রকাশ করে ১৯০৮-এর ৭ই অক্টোবর বসনিয়া ও হারজেগোভিনা অধিকার সরকারীভাবে ঘোষণা করল। এটা তরুণ তুর্কীদের, দক্ষিণ স্লাভদের জাতীয় উচ্চাশার এবং সর্বোপরি প্রণালী অঞ্চলে রাশিয়ার আক্রমণাত্মক কূটনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি প্রচণ্ড আঘাত।

বসনিয়া এবং হারর্জেগোভিনা অধিকার তুরস্ক ও সার্বিয়ায় প্রচণ্ড প্রতিবাদ জাগাল। জার সরকারও বিষয়টা আলোচনার জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডেকে আপত্তি জানানোর চেষ্টা করল। ইজভোলস্কির আশা যে, প্রণালী সমস্যায় ফ্রান্স ও বৃটেন তার দাবীকে সমর্থন করবে, তা একেবারেই নিষ্ফল হল। ফ্রান্স চাতুরী করল, ব্রিটিশরা তাদের সমর্থন প্রত্যাখ্যান করল। ইতিমধ্যে, জার্মানী অস্ট্রো-হাঙ্গোরিয়ানদের পিছনে এসে দাঁড়াল এবং সেটা শুধু কূটনৈতিক সমর্থন ছিল না। অস্ট্রিয়ার জেনারেল স্টাফের প্রধান Conradvon Hotyendorf, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের একজন বৃদ্ধমূল সমর্থক সিদ্ধান্ত নিলেন যে হাপসবার্গ সাম্রাজ্যের পক্ষে আঘাত করার সময় এসেছে। তিনি জার্মান জেনারেল স্টাফের প্রধান Moltke-এর কাছ থেকে জার্মান সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন। উপরন্তু, যদি সার্বিয়া-আক্রমণ রাশিয়া এবং সম্ভবতঃ ফ্রান্সের সংগে সংঘর্ষ ঘটায় তা হলে যৌথক্রিয়ার বিভিন্ন পথের বিষয়ে দুজনে একমত হলেন।

কূটনৈতিক সংকট কয়েকমাস ছিল। তারপরে ১৯০৯-এর ফ্রেব্রুয়ারীতে জার্মানীর প্রচেষ্টার মাধ্যমে অাস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তুরস্কের কাছ থেকে অধিকারের সম্মতি পেল। তারপরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সরকার সার্বিয়ার সীমান্তে সৈন্য জড়ো করল। ইতিমধ্যে জার্মানি স্পষ্টভাবে রাশিয়াকে বলল যে, তার fait accompli-কে সম্মান দেওয়া উচিত এবং সার্বিককে রাজী করানো উচিত। জার্মান শাসকরা তাদের তলোয়ারে শান দিচ্ছিল। কাইজার উইলহেলম ভীতিপ্রদভাবে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর Nibelungian বিশ্বস্ততানুযায়ী তিনি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে সবরকমে সমর্থন

করবেন। যুদ্ধের প্রস্তুতিবিহীন জার সরকার রাজী হল। প্রধানমন্ত্রী স্টোলিপিন ভয় পেলেন যে, যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার বিপ্লবের নতুন প্রকাশ ঘটাবে এবং বৈদেশিকমন্ত্রী ইজভোলস্কির পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় রইল না।

বসনিয় সংকটের উপরে ১৯০৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী স্বাক্ষরিত জার্মান-রুশ চুক্তি ও মরক্কোর বিষয়ে, রাশিয়ার অবস্থাকে প্রতিকূল করেছিল। বছরের পর বছর লোরেনে এবং ব্রাই উপত্যকায় আকরিক খনি এবং সার ও রুর অঞ্চলে কয়লাখনি নিয়ে ফরাসী ও জার্মান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই দেশের সম্পর্ককে খারাপ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মরক্কো সংকটে বোঝা গেল যে, ফরাসী-রুশ বিরোধিতাকে আরো বাড়িয়েছে ঔপনিবেশিক সমস্যা। আলজেসিরাস সম্মেলন সেটাকে কিছুটা ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল, কিন্তু নষ্ট করতে পারে নি। Mannesmann ভাইদের নেতৃত্বে একটি জার্মান গোষ্ঠী মরকোতে প্রধান অর্থনৈতিক স্থান পাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, Krupp এবং Thyssen একচেটিয়া কারবারের নেতৃত্বে আর একটি গোষ্ঠী ফরাসী Schneider প্রতিষ্ঠানের সংগে একটা কারবার শুরু করল এবং একটা মিশ্র খনি সংস্থায় অংশগ্রহণ করল। জার্মান সরকার ঘোষণা করল যে, তাদের মরক্কোতে অর্থনৈতিক আগ্রহ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই এবং ফ্রান্সের "বিশেষ রাজনৈতিক আগ্রহ"কে স্বীকার করল। যে ফরাসী অর্থদাতাদের জন্য ঔপনিবেশিক বিস্তার প্রতিশোধের ধারণাকে ঢেকে ফেলেছিল এবং যারা জার্মানির সংগে আবার বোঝাপড়ার জন্য Roauier-এর চেষ্টাকে সমর্থন করেছিল, তাদের শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়েছিল মরক্কোর যোগাযোগ। মরক্কো ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক সমস্যা নিয়ে ফ্রান্সের সংগে যোগাযোগের দ্বারা জার্মান কূটনীতি এই পথ দিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত এবং রুশ-ফরাসী মৈত্রীকে দুর্বল করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

বলকান অঞ্চলের দ্বন্দ্ব, বিশেষতঃ একদিকে রাশিয়া এবং সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে অস্ট্রিয়া-হাংগেরী ও জার্মানীর দ্বন্দ্ব বসনিয় সংকটকে তীব্র করে তুলল। এই দ্বন্দ্ব মৈত্রীচুক্তিকে আক্রমণকারী কীটকে প্রকাশ করল, কিন্তু ইংগ-ফরাসী রুশ সাম্রাজ্যবাদী মৈত্রী এবং অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর চুক্তির দ্বন্দ্বের গভীরতাকে এই সংকট আরো গভীরভাবে প্রকাশ করল।

এই সংকটকে দূর করার জন্য আঁতাতের অস্তিত্ব এবং ব্যর্থপ্রসূ জার্মান প্রচেষ্টা হল আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের প্রমাণ। দুই প্রকাশ্য ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতা পশ্চাৎ পটে চলে গেল। এশিয়া মাইনরে বৃটেন ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব (বিশেষতঃ প্রণালী সমস্যা নিয়ে) যদিও বর্তমান ছিল, তবুও সেটা আর কার্যকরী ছিল না। বৃটেন ও জার্মানির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব আরো গভীর। ১৯০৭-এ যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল, তাতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল। দুই

দেশের শাসকরা নতুন সুযোগ ও বিনিময়ের নতুন ক্ষেত্রে মারামারিতে, ঔপনিবেশিক বিস্তার অতিক্রম করায় এবং সর্বোপরি, স্থল ও নৌবাহিনীর নতুন সরকারী অস্ত্র আদেশের আশ্রয় চাইল। জার্মানির ১৯০৭-এর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত না দেখা ঔপনিবেশিক মনস্তত্ব (হটেনটট নির্বাচন) বৃটেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত *বিশ্বরাজনীতির* ভীষণ প্রচার স্পষ্ট হয়ে উঠল, আবার বৃটেন, জার্মানীর প্রধান শত্রু, পরিবর্তে জার্মানীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত প্রচার চালাল।

ইংগ-জার্মান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বিগুণ ভয়ংকর হয়ে উঠল নৌ-প্রতিযোগিতার ফলে, যে প্রতিযোগিতায় শিল্পপতিদের এবং সম্মিলিত পুঁজিপতিগোষ্ঠীর গোপন আগ্রহ ছিল।

এ্যাডমিরাল Tirpitz-এর নৌ-বিস্তার পরিকল্পনার অগ্রগতি বৃটেনকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছিল। জার্মানীর প্রতিযোগিতার উত্তরে বৃটেন গুলি ছোঁড়ার দ্রুত গতিতে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ সম্পন্ন নতুন ধরনের যুদ্ধ জাহাজ ড্রেডনট তৈরী করতে শুরু করল। ১৯০৫-এ বৃটেনের ৬৫টি পুরনো যুদ্ধ জাহাজ ছিল আর জার্মানির ছিল ২৬টি। বৃটেনের নেতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য এবং বৃটেনের কাছ থেকে নৌ আধিপত্য আদায় করায় ব্যর্থতা জার্মানিকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে ড্রেডনটগুলি তৈরী হয়েছিল। কিন্তু জার্মানি দ্রুত নিজেদের ড্রেডনট তৈরী করে এবং বৃটেনের তৈরী ১২টা জাহাজের পরিবর্তে ১৯০৮-এর মধ্যে ৯টা জাহাজ তৈরী করে এর জবাব দিল। দাঁড়িপাল্লা কিছুটা হেলে যাচ্ছিল, যদিও এখনো সমুদ্রের উপরে বৃটেনেরই আধিপত্য বজায় ছিল।

বৃটিশ সরকার নৌ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে জার্মানির সংগে একটা বোঝাপড়ায় পেঁছিবার চেষ্টা করল এই শর্তে যে, জামানি বৃটিশ আধিপত্যকে মেনে নেবে। এটা প্রথম ১৯০৭-এ হেগে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে এবং আবার ১৯০৮-এ সপ্তম এডোয়ার্ড ও দ্বিতীয় উইলহেলমের আলোচনা চেষ্টা করা হয়। নিজেদের নৌশক্তি গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জার্মান সরকার দু'বারই বৃটিশ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। লণ্ডনে জার্মান দূত Paul Wolff-Metternich-এর পাঠানো প্রতিবেদনে ১৯০৮-এর গ্রীষ্মে উইলহেলম নোট লেখেন, "যদি বৃটেন এই সতর্কীকরণ দিয়ে আমাদের প্রস্তাব করে যে, আমাদের নৌ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ঔদ্ধত্য।" তিনি আরো লিখেছিলেন: "পরে এই একই যুক্তিতে ফ্রান্স এবং রাশিয়া দাবী করতে পারে যে, আমাদের স্থলবাহিনী নিয়ন্ত্রিত করতে হবে···আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে (নৌ-গঠনের আইন—এ. ওয়াই) বৃটিশদের তা ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক। যদি তারা যুদ্ধ চায়, তাহলে *তারা* যুদ্ধ করুক। আমরা ভয় পাই না।"

নৌ-অস্ত্রীকরণ থামাবার জন্য নতুন বৃটিশ প্রস্তাবসহ আরেকটি Wolff-Metternich-এর প্রতিবেদনে উইলহেলম এ কথা লেখেন: এধরনের কথা···

অনুচিত ও প্ররোচনামূলক। ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা বন্ধ করার জন্য আমাকে দূতকে বলতে হবে···যারা আমাদের "আক্রমণের মূর্খ বাসনা"-তে আপত্তি করে, সেইসব ভদ্রলোকদের তার "জাহান্নামে যাও" ইত্যাদি বলা উচিত। [এরপর অশ্লীল কথা আছে—এ. ওয়াই]। তাহলে ওদের বুদ্ধি হবে··· Wolf-Metternich-এর উচিত এই দিবাস্বপ্ন দ্রষ্টাদের পিছনে লাথি মারাও ভাল। এই সব নির্দেশ যাতে জার্মানির শাসকদের মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেই নির্দেশে নিঃসন্দেহে বৃটিশ কূটনীতিকরা বুঝেছিলেন তারা কিভাবে বৃটিশ প্রস্তাব গ্রহণ করবে। বৃটেনের প্রস্তাবকে ঘৃণা করে জার্মানি নিজের পথে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করতে লাগল।

১৯০৯-এর এপ্রিলে বার্লিনের পরস্পরের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা না করার জন্য নৌ-সম্মেলন এবং দুই দেশের যে কোন একটি দেশ তৃতীয় দেশ বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়লে সৎ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রস্তাব বৃটেন পেল। জার্মান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বুঝতে লণ্ডনের বেশী সময় লাগল না। চুক্তির আড়ালে জার্মানরা তাদের নৌশক্তি জোরদার করতে এবং বৃটেনকে নিরপেক্ষতায় রাজী করিয়ে, জার্মানির ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চাইছিল। তারা আশা করেছিল, তারপরে বৃটেনের ইতিহাসে প্রথম বৃটেনকে জার্মান গোষ্ঠীর অনুবর্তী হতে বাধ্য করা যেতে পারে।

যথারীতি, বৃটেনের প্রস্তাবে তার নৌ আধিপত্য বজায় রাখার ইচ্ছাই ছিল। অন্যদিকে জার্মানির প্রস্তাবে, বৃটেনকে নিরপেক্ষ রেখে ইউরোপীয় মহাদেশে জার্মানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অনুসরণ করা হয়েছিল। জার্মানির প্রস্তাবিত নিরপেক্ষতা চুক্তি আসলে সহ স্বাক্ষরকারী দেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পরিকল্পিত।

১৯০৯-এর শেষে জার্মানির অনুরূপ একটি প্রস্তাবে এই শর্ত ছিল যে, প্রত্যেকের নৌগঠনের পরিধি আগেই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। বৃটিশ নিরপেক্ষতার মূল্যরূপে জার্মান সরকার নৌ-পরিকল্পনা কিছুটা শ্লথ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বৃটিশ বৈদেশিক নীতি পরিকল্পনাকারীরা মনে করলেন যে, প্রস্তাবটায় তাদের দেশের চেয়ে জার্মানির রাজনৈতিক সুবিধা অনেক বেশী এবং ওটা ফিরিয়ে দিলেন।

বৃটেন ঠিক করল জার্মানির তৈরী প্রতিটি বড় যুদ্ধ জাহাজের বিপরীতে সে দুটো যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করবে। জার্মানি বৃটেনকে "জার্মানি ঘিরে ফেলার" অভিযোগে অভিযুক্ত করল। পরবর্তী সোরগোলে জার্মান স্থল ও নৌ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের বৃদ্ধিই প্রমাণিত হল। এইভাবে ইংগ-জার্মান দ্বন্দ্ব বেড়ে উঠতে লাগল।

ফরাসী-জার্মান কারবার এবং ১৯০৯-এর বসনিয়া সংকটে জারের পশ্চাদ-

প্রসারণ জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের মৈত্রী চুক্তি বানচালের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দিল। সময় নিতে, সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্টোলিপিন "সংস্কার" ঘটাতে উৎসাহী জার সরকার জার্মানির সংগে যুদ্ধের আশংকা করে আলোচনায় ইচ্ছুক হল। রাশিয়ার দ্বন্দ্ব এড়ানোর চেষ্টা এবং কাইজারের সংগে আপসের চেষ্টার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল মেসোপটেমিয়ায়, বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর ইরাণে জার্মান বিস্তারকে রোধের জন্য রাশিয়ার বুর্জোয়াদের প্রবল ইচ্ছা। বৈদেশিক মন্ত্রীরূপে ইজভোলস্কির স্থলাভিষক্ত সাজোনোভ ১৯১০-এর নভেম্বরে ইরান ও বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনায় জার্মান হস্তক্ষেপ নিয়ে রুশ জার্মান আলোচনা পরিচালিত করলেন। জার্মান কূটনীতি রাজনৈতিক সমস্যাতে মনোযোগ দিল। জার্মানি বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া-হাঙেগরীর আক্রমণাত্মক নীতির প্রতি সমর্থন তুলে নিতে ইচ্ছুক যদি, "বৃটেন থেকে উদ্ভূত জার্মানির প্রতি শত্রুতামূলক নীতিকে সমর্থন করার ইচ্ছা" রাশিয়া পরিত্যাগ করে। এটা মৈত্রীচুক্তি থেকে রাশিয়াকে বার করার স্পষ্ট প্রচেষ্টা।

আলোচনা পটসডাম থেকে পিতার্সবার্গে গেল এবং মাসের পর মাস চলতে লাগল। বৃটিশ কূটনীতি এতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল. কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা রুশ-জার্মান চুক্তি ১৯১১-র ১৯শে আগস্ট তৈরী হল। জারের সরকার বাগদাদ রেলপথ পরিকল্পনা ও তাতে বৈদেশিক মূলধনের অংশগ্রহণ মেনে নিল এই শর্তে যে, তার নিজের খানাকিন-তেহেরাণ পরিকল্পনায় বাধা দেওয়া হবে না। এটা জার্মানির বিস্তারনীতির জয়ের চিহ্ন। তবুও যেখানে প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত, সেখানে জার্মানি ব্যর্থ হল, কারণ, ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধ ঘটলে রাশিয়া নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করল। রাশিয়ার উপরে ইঙ্গ-ফরাসী মূলধনের অর্থনৈতিক অধিকার, রাশিয়াকে ফ্রান্সের সংগে যুক্তকারী সামরিক ও কূটনৈতিক পদ্ধতি, যেটা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে বৃটেনের সংগে রাশিয়াকে যুক্ত করেছে, তার সংগে রুশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈপরীত্য—এই সবকিছু হোহেনজোলার্ণ এবং রোমানভদের সাধারণ রাজত্বের আগ্রহের চেয়ে শক্তিশালী। তবুও জার্মান শাসকরা ব্যর্থতা মেনে নিল না।

ছ'বছর আগের মত ১৯১১-তে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা আবার মরক্কোকে বিবাদের বিষয় করে তুলল, কারণ ফরাসী মূলধন দ্রুত তার জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীকে বহিস্কৃত করে সেখানে জায়গা করছিল। মরক্কোর রাজধানী ফেজে সেই বছরের বসন্তে একটা অভ্যুত্থান দেখা দিল। ফরাসী সৈন্যবাহিনী আইন শৃংখলা ফিরিয়ে আনার অজুহাতে সেখানে গেল। আক্রমণাত্মক সমগ্র জার্মান ইউনিয়ন এবং Krupp, Thyssen এবং Mannesmann একচেটিয়া কারবারের মত অর্থ-দাতাদের যাদের মরক্কোতে গোপন উদ্দেশ্য আছে, তাদের দ্বারা চালিত

হয়ে জার্মান সরকার মরক্কো বিভাগের জন্য জোর সংবাদপত্রে প্রচার শুরু করল। তারপর হঠাৎ মরক্কোর বন্দর আগাদিরে *প্যান্থার* নামে গানবোট পাঠাল। ফ্রান্স "প্যান্থারের আক্রমণ" কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান হিসাবে নিল। একচেটিয়া কারবারের দ্বারা প্রণোদিত ফরাসী জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র চীৎকার করতে লাগল। ফরাসী সরকারের পিছনে একচেটিয়া কারবারগুলি মরক্কো থেকে জার্মানদের তাড়াতে বদ্ধপরিকর ছিল। অন্যদিকে "প্যান্থারের লাফ" থেকে বোঝা গেল কিন্তু জার্মান একচেটিয়া কারবারীরা থাকতে চাইছিল এবং অন্যেরা (বিশেষতঃ Krupps-এর পর্ষদের সদস্য ব্যাংক মালিক এল. ডেলব্রাক) অন্যান্য উপনিবেশ, বিশেষতঃ কংগোর ক্ষতি পূরণের দাও মারার জন্য মরক্কোকে ব্যবহার করতে চাইছিল। পরবর্তী আলোচনায় দু পক্ষেরই অতিরিক্ত জেদ দেখা গেল এবং পারস্পরিক ভীতি প্রদর্শন শুরু করল।

নূতন মরক্কো সংকট জার্মানি ও বৃটেনের সম্বন্ধকেও ক্ষতিগ্রস্ত করল, বৃটেন ফ্রান্সকে দৃঢ় থাকার অনুরোধ করেছিল। বৃটেনের বৈদেশিক বিষয়ের রাষ্ট্রসচিব এডোয়ার্ড গ্রে বললেন, ফরাসী-জার্মান যুদ্ধ হলে বৃটেন যোগদান করবে; তিনি আরো বললেন, যদি রাশিয়া জড়িত হয়, তাহ'লে অস্ট্রিয়াও আসবে এবং ফ্রান্স ও জার্মানির দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থেকে পুরোমাত্রার ইউরোপীয় যুদ্ধ দেখা দেবে।

কিন্তু যুদ্ধ এড়ানো গেল। জারতন্ত্রী রাশিয়া এখনো ফ্রান্সকে সাহায্য করার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল এবং সে তখনই ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিল। এই প্রস্তাব ফরাসী সরকারকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। Poincare তাঁর স্মৃতি কথায় লিখছেন যে, প্যারী পিতার্সবার্গকে মনে করিয়ে দিল যে, রাশিয়ার জাপানের কাছে পরাজয় এবং অপর্যাপ্ত সামরিক ও নৌপ্রস্তুতি সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সমস্যাতেও রাশিয়া ফরাসী রুশ চুক্তিতে আবদ্ধ। অবশ্য Joseph Caillaux-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সে শক্তিশালী আর্থিক গোষ্ঠী ছিল, যারা জার্মানির সংগে বোঝাপড়ায় আসতে চাইছিল। ইতিমধ্যে, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি বা ইটালি প্রত্যেকে নিজস্ব কারণে জার্মান মিত্রকে সামরিক সহায়তা দিতে ইচ্ছুক ছিল না।

এই কারণেই যখন ১৯১১-র ২১শে জুলাই লয়েড জর্জ ঘোষণা করলেন যে বৃটেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করবে এবং ফ্রান্সের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে তখন জার্মান নীতি প্রণেতারা পেছিয়ে এলেন। নভেম্বরে ফ্রান্স আর জার্মানি আপস করল। জার্মানি অধিকাংশ মরক্কোর উপরে ফরাসী প্রটেক্টোরেটকে স্বীকার করল এবং বিনিময়ে ফরাসী কংগোর একটা অংশ নিয়ে নিল।

স্পেন ও মরক্কোর একটা টুকরো নিতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু সে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির "কনিষ্ঠ অংশীদার" ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯০৪-এ ফ্রান্সের সংগে সম্পাদিত চুক্তি ফ্রান্সকে মেলিলা এবং কিউটার মাঝে একটা

মরক্কো ফালির উপর অধিকার দিল। দ্বিতীয় মরক্কো সংকট মিটে যেতে ফ্রান্স ও স্পেন স্পেনীয় অংশের ২৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং ফরাসী অংশের ৫৭২,০০০ বর্গ কিলোমিটার নির্ধারিত করে একটা নতুন চুক্তি করল। ত্যাঞ্জিয়ার শহরসহ মোট ৩৮০ বর্গকিলোমিটারের একটা আন্তর্জাতিক অঞ্চল বৃটিশ জেদের ফলে জিব্রাল্টার প্রণালীর প্রবেশ পথে স্থাপিত হল।

যে আগাদির সংকটে বোঝা গেল জার্মান সাম্রাজ্যবাদী এবং ইংগ ফরাসী মৈত্রীর মধ্যে বৈপরীত্য কত তীব্র, সেই সংকটই বিভিন্ন শক্তির ভবিষ্যৎ নীতির নির্দেশরেখা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক যুদ্ধকেও অনাবৃত করল। জার্মানীতে যে Tirpitz-এর নৌগঠন পরিকল্পনার সমর্থকরা ১৯১২-১৭ পাঁচ বছরে আরো তিনটি ড্রেডনট তৈরীর কথা ভেবেছিল তাদের সংগে, যারা মহাদেশীয় যুদ্ধের জন্য আরো শক্তিশালী স্থলবাহিনী চেয়েছিল, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল: সংঘর্ষ এক বিস্ফোরক আপসে চূড়ান্তরূপ পেল, ফলে রাইখস্টাগ স্থল ও নৌবাহিনী দুটিরই নতুন গঠনের আলোচনা করতে লাগল। জার্মান সমরবাদীদের দ্বারা পুষ্ট সব আক্রমণাত্মক ধারার পক্ষে এটা একটা জয়। বৃটেনে যারা ক্রমবর্ধমান নৌশক্তি এবং মৈত্রী চুক্তিকে দৃঢ় করে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের সমর্থক তাদের সংগে যারা জার্মানির সংগে পুনর্যোগাযোগ চাইত এবং যে রাশিয়ার সংগে মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত ঘটেছিল সেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জার্মান সৈন্যদের ছত্রভংগ করার আশা নৌঅস্ত্রীকরণের দমন চাইত তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। ১৯১২-র ফেব্রুয়ারির প্রথমে বৃটিশ ও জার্মান কূটনীতি একটা আপসে পৌঁছনোর শেষ চেষ্টা করল। বৃটেনের যুদ্ধের রাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালডেন বার্লিনে গিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, জার্মানরা তাঁদের নতুন নৌপরিকল্পনা ছাঁটাই করুক। তিনি আভাস দিলেন যে বিনিময়ে বৃটেন জার্মানীকে আফ্রিকায় কিছু সুবিধা মঞ্জুর করবে। কিন্তু জার্মানরা সেটা যথেষ্ট মনে করল না। তারা পূর্বে প্রকাশ্যে অঘোষিত নতুন নৌপরিকল্পনা হ্যালডেনকে দেখতে দিল এবং বলল যে তারা যে ভাবেই হোক এটা শেষ করবে। তারা বন্ধুত্বের আশ্বাসেও সন্তুষ্ট হল না এবং মহাদেশে জার্মান যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে বৃটিশ নিরপেক্ষতার প্রকাশ্য ঘোষণার জন্য চাপ দিতে লাগল। Tripitz বললেন "বৃটেনের মৈত্রী চুক্তি পরিত্যাগই হল" সমস্যার বিষয়।

সব দেশের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীদের খুশি করে হ্যালডেন মিশন একেবারে ব্যর্থ হল। Tripitz এবং জার্মানির যুদ্ধগোষ্ঠীর পক্ষে জয় সম্পূর্ণ হল। জার্মানির সংগে অনিবার্য সঘর্ষের প্রস্তুতি হিসাবে অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর সমর্থকেরা বৃটেনে জয়ী হল, কারণ জার্মান নৌগঠন পরিকল্পনার বিশালতা আর গোপন ছিল না। যে ফরাসী পুঁজিপতিগোষ্ঠী যৌথ ঔপনিবেশিক অভিযানের

(Rouvie Caillaux, Tardieu) মাধ্যমে জার্মানীর সংগে সহযোগিতার কথা প্রচার করেছিল, তারা প্রভাব হারাল, যখন সরকার যুদ্ধের জন্য সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। ১৯১২-র শরতকালে পিতার্সবার্গে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পয়েনকুঁরে ইংগিত দিলেন যে, কোন অস্ট্রো-রুশ সংঘর্ষে জার্মান যদি হস্তক্ষেপ করে, তা হলে ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে জার্মানীকে দুই সীমান্তে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। সীমিত শর্তে ১৯১১-তে রুশ-জার্মান চুক্তি হওয়ার পর জারও মৈত্রী চুক্তিতে তাঁর অবস্থান নতুন করে জোরদার করলেন; তাঁর সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত ও বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জার্মানির সংগে সংঘর্ষে বিলম্ব করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কাজেই আমরা দেখছি, জার্মানি মৈত্রীচুক্তি ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হল না। বরং বৃটেন এটাকে শক্ত করে তুলল। ১৯১২-তে বৃটেন ফ্রান্সের সংগে একটা গোপন নৌ-সম্মেলন সম্পন্ন করল এবং দ্বিতীয় জন কিছু পরে রাশিয়ার সংগে একটা সম্মেলন করল। সংসদে কিছু না প্রকাশ করে এবং এমন কি মন্ত্রীসভারও অধিকাংশেরও অজ্ঞাতসারে গ্রে লণ্ডনের ফরাসী দূত Cambon-এর সংগে পত্র বিনিময় করলেন, ১৯১১-র নভেম্বরে, ফ্রান্স যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে দুই দেশের কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত গোপন সামরিক আলোচনাকে সম্মান জানানোর বৃটিশ প্রতিশ্রুতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

১৯১১-র প্রথমে জেনারেল জোফ্রে খবর দিলেন যে, বৃটিশ সৈন্য নামানোর সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এবং প্রথম বড় যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য নামতে পারে। জোফ্রে ভেবেছিলেন দক্ষিণ বেলজিয়াম পেরিয়ে জার্মান অগ্রগতি ফ্রান্সের পক্ষে অনুকূল হবে, কারণ তাহলে যুদ্ধটা বিদেশে এমন জায়গায় হবে যেখানে শত্রুর কোন সুরক্ষা নেই।

১৯১২-র প্রথমে ফরাসী জেনারেল স্টাফ আশা করেছিলেন যে, সেই বসন্তে, হয়ত আরো আগেই যুদ্ধ শুরু হবে, কারণ জার্মানি রাশিয়ার সৈন্য চলাচলকে বাধা দিয়ে পিছল ও কর্দমাক্ত পথের সুবিধা পাবে। ফরাসীরা আরো বিশ্বাস করেছিল যে, জার্মানী ব্যয়সাপেক্ষ নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করার বৃটেনের মুখোমুখি হতে চাইবে।

অন্যদিকে জার্মান জেনারেল স্টাফ ভেবেছিলেন যে, ফরাসীরা যুদ্ধ শুরু করার উপায় খুঁজবে কারণ তারা নিজেদের যদ্ধের জন্য প্রস্তুত মনে করছে।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরাও ভেবেছিল, তাদের সমুদ্রে না হোক স্থলে সুযোগ আছে এবং Schlieffen-Moltke যুদ্ধ কৌশল কাজে লাগিয়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে তারা এটার সর্বাধিক সুযোগ নিতে চাইছিল। নিশ্চয়ই যেসব জার্মান সমরবাদী জেনারেল স্টাফের কাছাকাছি ছিল তাদের সঙ্গে যারা

নৌবাহিনীর কাছাকাছি থেকে সতর্কতার উপদেশ দিচ্ছিল, তারা প্রচণ্ড বিতর্কে ডুবেছিল। দুপক্ষই জাংকার ও বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের প্রতিনিধি এবং উভয়েই বিশ্বআধিপত্য লাভের জন্য যুদ্ধ চাইছিল। কিন্তু একপক্ষ ভাবছিল যেহেতু ইউরোপীয় মহাদেশই হবে প্রধান, হয়ত একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র সেইহেতু শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে স্থলবাহিনী প্রস্তুত কি না, শত্রুর সৈন্য পরিচালন পরিকল্পনার চেয়ে আমাদের বেশী কিনা, অস্ত্র শস্ত্র এবং যুদ্ধ কৌশল যথার্থ কি না আর অন্য পক্ষ ভাবছিল যে নৌবাহিনী বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। ত্রিশক্তি চুক্তির বৈপরীত্য ও সদস্যদের ঔপনিবেশিক জয়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার দ্বারা তাড়িত হয়ে গভীর সন্দেহ দেখা দিল। সমরবাদীরা সংঘর্ষ ত্বরান্বিত করার জন্য স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করছিল কারণ তারা ভয় পেয়েছিল যে ইটালি দ্রুত চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যেটাতে তারা আরো ভয় পেয়েছিল তা হ'ল তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিত্র বহুজাতীয় হাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবনতি এমন কি পতন।

যে ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ট্রিপোলিটানিয়া ও সিরেনাইকার উপরে চোখ ছিল, তাদের পক্ষে মরক্কো সংকট একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষ সুযোগ। ওসমান সাম্রাজ্যের এই আফ্রিকান প্রদেশগুলি দীর্ঘকাল ভ্যাটিকানের সঙ্গে সংযুক্ত রোমের ব্যাংক এবং ইটালিয় আর্থিক ও শিল্পগোষ্ঠীদের আকৃষ্ট করেছে। ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কছে দুটি অঞ্চলের অধিকার ভূমধ্যসাগর অববাহিকার অধিকারের পথে প্রথম পদক্ষেপ। ট্রিপোলিটানিয়ার প্রশ্ন স্বদেশের নীতিতে যথেষ্ট কাজে লাগানো হ'ল। স্বদেশের প্রচারে বলা হল যে, তুরস্কের সঙ্গে একটা যুদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামকে উচ্ছেদ করে "জাতি সংগ্রাম"কে এনে "ইটালীয়দের ঝালাই করবে।" কোন ইউরোপীয় শক্তিই ইটালীর পরিকল্পনা সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইল না। জার্মানি ভয় পেল যে, ইটালী ত্রিশক্তি চুক্তি নতুন করে ঝালাই করতে অস্বীকার করবে। অস্ট্রিয়া-হাংগেরী খুশী হল যে, ইটালীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আলবেনিয়া ও আড্রিয়াটিক সমুদ্রাঞ্চল থেকে আফ্রিকাতে সরে গেছে। ১৯০২-এর গোপন চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স ইটালীকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং ১৯০৯-এ র‍্যাকোনিগিতে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া তাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যে বৃটেনের সম্পর্ক জার্মানীর সংগে "ক্রমশঃ" খারাপ হচ্ছিল, সেও ইটালীকে আক্রমণ করতে পারত না। ১৯০২-তে বৃটিশ সরকার ইটালীর ট্রিপোলিটানিয়া অধিকারে নীরব সম্মতি জানাল। ইটালীতে রুশ অ্যাটাশে মন্তব্য করলেন, "বিস্ময়কর হল যে, ইটালী সমস্ত ইউরোপের সম্মতি নিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল।"

ইটালী দাবী করল (১৯১১-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর) যে তুরস্ক ট্রিপোলি ও সিরেনাইকা ছেড়ে দিক এবং স্বভাবতঃ প্রত্যাখাত হল। তখন ইটালীয়

জেনারেল একটা দ্রুত আক্রমণ চালাল এই আশায় যে, তুরস্ক প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে, আত্মসমর্পণ করবে। তুর্কী সৈন্যবাহিনী দুর্বল ছিল এবং যুদ্ধের প্রথমদিকে ইটালী ট্রিপোলি ও সমুদ্রের ধারে কিছু ছোট জায়গা অধিকারে সমর্থ হল। কিন্তু পরবর্তী স্তরে স্থানীয় আরব জনগণ কর্তৃক ভীষণ বাধা পেয়ে, ইটালীয়রা এগোতে পারল না এবং যুদ্ধ চলতে লাগল।

ইটালীয় নৌবাহিনী বেরুট ও দার্দানেলিসের উপর বোমা ফেলল এবং দোদেসেনিজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালীয় সৈন্য অবতরণ করল। ইতিমধ্যে, অন্যান্য শক্তির মধ্যস্থতার জন্য তুরস্কের আবেদন অগ্রাহ্য হল। সে একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ল।

বলকান অঞ্চলের সংকট ও স্বদেশের উত্তেজনা তুরস্ককে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করল। ১৯১২-র ১৫ই অক্টোবরে স্বাক্ষরিত একটি গোপন চুক্তি এবং ১৮ই অক্টোবরের আর একটি প্রকাশ্য চুক্তির ফলে তুরস্ক ট্রিপোলি এবং সিরেনাইকার উপরে অধিকার ত্যাগ করল।

ইটালীর দীর্ঘকালের ইচ্ছা শেষপর্যন্ত পূর্ণ হওয়ার পর সে ট্রিপোলি ও সিরেনাইকাকে উপনিবেশ লিবিয়ায় পরিণত করল। যে আরবরা বহু বছর ইটালীয় আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করে গেল তাদের প্রচুর ক্ষতি হল। ১৯১২-তে লেনিন লিখলেন: "শান্তি সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ চলবে, কারণ আফ্রিকার কেন্দ্রে, তীর থেকে অনেক দূরের অঞ্চলের আরব সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ মেনে নেবে না এবং অনেক দিন ধরে বেয়োনেট, গুলি, আগুন আর ধর্ষণের দ্বারা 'সভ্য' করা হবে।"[১] তিনি ট্রিপোলিটানিয়ার ঘটনাকে একটি 'সভ্য' বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রের সংঘটিত যথার্থ ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

এবারে নতুন সংকট দেখা দিল বলকান অঞ্চলে, সেখানে দৃঢ় মূল সামাজিক ও জাতীয় বৈষম্যের সংগে বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুক্ত হয়েছিল। তুরস্ক শাসনের অধীনে (ম্যাসিডোনিয়া, আলবেনিয়া, ইজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি) তখনো মুমূর্ষু বলকান জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গতি পেল। সেখানে শ্রেণী বৈষম্য জাতীয় ও ধর্মীয় বিরোধিতায় আবৃত ছিল। যেমন ম্যাসিডোনিয়াতে ভূস্বামীরা ছিল মুসলিম তুর্কী আর কৃষকরা ছিল খ্রীশ্চান স্লাভ। কাজেই স্বাধীনতার যুদ্ধের সংগে মধ্যযুগীয় রীতি, ভূমি-দাসপ্রথা আর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মিশে গিয়েছিল। লেনিন লিখে-ছিলেন: "বলকান অঞ্চলে যুক্ত জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে হলে স্থানীয় ভূমি দাস শাসকদের অত্যাচার ঝেড়ে ফেলা এবং ভূস্বামীদের বন্ধন থেকে সব জাতির বলকান কৃষকদের সম্পূর্ণ মুক্ত করা—বলকান জনগণের এই ছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব।"[২] বলকান শ্রমিকদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, যাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩৩৭-৩৮।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩৯।

সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা আছে, তারা অবিরাম জাতীয় প্রশ্নের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সমাধানের জন্য লড়ে যেতে থাকল। অবশ্য জনগণের স্বার্থে বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয় নি ; শাসকদের রাজত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ এবং উদীয়মান জাতীয় বুর্জোয়াদের উচ্চাশার দ্বারা ঐ নীতি গঠিত হল। ১৯১১-র বসন্তে সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া সরকার মনে করল যে, ম্যাসিডোনিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য তুর্কী অঞ্চলের প্রশ্নের সমাধানের উপযুক্ত সময় এসেছে। যখন ইটালী তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হল, তখন সার্বিয়া বুলগেরিয়ার সংগে সামরিক সহযোগিতার আলোচনা দ্রুত শুরু করল। রুশ কূটনীতি পর্দার পিছনে অংশ নিল। রুশ জাতীয়তাবাদীদের যুক্তি দেখিয়ে লেনিন লিখলেন: "অস্ট্রিয়া একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়েছে (বসনিয়া ও হারজেগোভিনা) এবং ইটালী নিয়েছে আর এক টুকরো (ট্রিপোলি) ; এবার আমাদের পালা।" তিনি আরো বললেন, "এই মুহূর্তে ত্রিশক্তি (জার্মান, অস্ট্রিয়া এবং ইটালী) দুর্বল, কারণ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইটালী ৮০ কোটি ফ্রাংক খরচ করেছে আর বলকান অঞ্চলে ইটালী এবং অস্ট্রিয়ার স্বার্থ এক নয়। ইটালী আর একটা টুকরো আলবেনিয়া ছিনিয়ে নিতে চায়, কিন্তু অস্ট্রিয়া দেবে না। আমাদের যে জাতীয়বাদীরা এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তারা ত্রিশক্তি মৈত্রীর দুটি শক্তির (বৃটেন ও ফ্রান্স) শক্তি ও সম্পদের উপর ভরসা রেখে এবং 'ইউরোপ' প্রণালী অঞ্চলে সাধারণ যুদ্ধ চাইবে না বা এশিয়া তুরস্কের জন্য আমাদের অঞ্চলকে 'বিচ্ছিন্ন' করতে চাইবে না এই ধারণার উপর ভরসা রেখে চলেছেন, তাঁরা এক বেপরোয়া ভাগ্যের খেলা খেলছেন।"[১] প্রকৃতই, ইটালী তুরস্ক যুদ্ধের সময়ে ত্রিশক্তি চুক্তির ছিদ্রের সুযোগ নিয়ে জার সরকার ফ্রান্সের সাহায্যে জাল বুনতে শুরু করে দিল, যে জাল শেষ পর্যন্ত তুরস্কের বিরুদ্ধে, সেইসংগে "অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সামরিক গোষ্ঠীতে বলকান দেশগুলিকে বেঁধে ফেলল। এখনো বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি বিহীন হওয়ায় জার সরকার তাড়াতাড়ি চাইছিল না সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক।

যে ম্যাসিডোনিয়া তুর্কী শাসন থেকে মুক্ত হবে এবং যার প্রতি সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া উভয়েই দাবী জানিয়েছিল সেই ম্যাসিডোনিয়াকে ভাগের বিষয়ে তীব্র মতভেদ হওয়ায় সার্বিয়া বুলগেরিয়া আলোচনা প্রায় ছ'মাস চলল। শেষে ১৯১২-র ১৩ই মার্চে একটা চুক্তি হল। যদি অস্থায়ীভাবেও কোন বৃহৎ শক্তি বলকান অঞ্চলের কোন অংশ অধিকার করে তা হলে বুলগেরিয়া এবং পরস্পরকে সমর্থনের দায়িত্ব নিল। এইভাবে সার্বিয়া অস্ট্রো হাঙ্গেরীয়ানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বুলগেরীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করল, আর একটা গোপন দলিলে তুরস্কের বিরুদ্ধে যৌথ সশস্ত্র অভিযানের কথা

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, খণ্ড ১৮, পৃ: ৩৩৯-৪০।

বিবেচনা করা হল। মিত্ররা ম্যাসিডোনিয়ার বিষয়ে একটা বোঝাপড়াতেও পৌঁছল এবং একটা "বিতর্কমূলক অঞ্চল" আলাদা রেখে দিল যার ভাগ্যের নিষ্পত্তি হবে রুশ জয়ের দ্বারা। যদি তুরস্ক বা অস্ট্রিয়া হাঙেরীর সংগে বিরোধ বাধে তা হলে যে কোন এক পক্ষের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বাহিনীর নামানোর ব্যবস্থা নির্দেশ করে দুটি দেশ একটা সামরিক চুক্তি করল ১৯১২-র ১২ই মে। তারপর বুলগেরিয়া গ্রীসের সংগে একটা মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করল, আর সার্বিয়া একই রকমের মৌখিক চুক্তি করল মণ্টেনেগ্রোর সংগে। এক বলকান লীগ দেখা দিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপদ্বীপ থেকে তুর্কীদের নির্বাসিত করা। লেনিন লিখেছিলেন: "বর্তমান বলকান রাষ্ট্র গুলিতে গণতান্ত্রিক শ্রেণীর দুর্বলতার (যেখানে প্রলেতারিয়েতরা সংখ্যায় কম এবং কৃষকরা অত্যাচারিত, একতাহীন ও অশিক্ষিত) ফল দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে অনির্ভরযোগ্য মৈত্রী বলকান রাজ্যের মৈত্রী হওয়ার।

১৯১২-র গ্রীষ্ম ও শরতে বলকান ও তুরস্কের সম্বন্ধ একটা বিপর্যয়ে পৌঁছল। দু পক্ষ পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শক চিঠি পাঠাতে লাগল। ইউরোপীয় শক্তির পক্ষে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া হাঙেরী এক ঘোষণা প্রকাশ করল যে, বলকান অঞ্চলে বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন সহ্য করা হবে না। কিন্তু সতর্কবাণীতে কোন ফল হল না।

৯ই অক্টোবর মণ্টেনেগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল, ১৭ই বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া যোগদান করল এবং পরের দিন গ্রীস যোগদান করল। বলকান মিত্রপক্ষের বেশী শক্তি প্রথম থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

সার্বিয় সৈন্যদল ভার্দারের ওপরের উপত্যকা, নোভি-পাজারের সাঞ্জাক এবং উত্তর আলবেনিয়া অধিকার করল, গ্রীকরা সালোনিকা অধিকার করল, (বুলগেরিয় সৈন্যদল তাদের পিছনে ফেলে) কয়েক ঘণ্টা পরে পৌঁছনোয়। বুলগেরিয় সৈন্যদল ইস্তানবুলের দিকে এগোল। তখনো তুরস্কের এডার্ণ (এ্যাড্রিয়ানোপল), জ্যানিনা এবং স্কোডারের (স্কুটারি) ওপরে আধিপত্য ছিল।

বলকান অঞ্চলে তুর্কী ভূমি দাস শাসন ভেঙে পড়ল। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া লেনিন এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "যদিও বলকান অঞ্চলে যে মৈত্রী-চুক্তি ঘটেছে, সেই চুক্তি রাজত্বের চুক্তি, সাধারণতন্ত্রের চুক্তি নয় এবং যদিও এই চুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়েই এসেছে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নয়, তবুও সমগ্র পূর্ব ইউরোপে মধ্যযুগীয় নীতি লোপ করার দিকে একটা বড় পদক্ষেপ ঘটেছে, তারপর তিনি লিখেছেন, "*রাশিয়া একমাত্র* এখন সবচেয়ে প্রাচীনপন্থী"। বলকান অঞ্চলের ঘটনার হিসাবে দুটি স্পষ্ট রাজনৈতিক ধারণা প্রকাশ পায়—একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী।

১৯১২-র ৭ই নভেম্বর লেনিন *প্রাভদায়* লিখলেন : "বুর্জোয়ারা এমনকি আমাদের ক্যাডেটদের সমান উদার বুর্জোয়ারা শ্লাভদের 'জাতীয় মুক্তির' জন্য চিৎকার করে। এতে এখন বলকান অঞ্চলে ঘটমান ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অর্থ সরাসরি ভুলভাবে প্রকাশিত হয় এবং এই এইভাবে বলকান জনগণের প্রকৃত মুক্তি *বাধা পায়*। এই ভাবে এটা ভূস্বামীদের সুবিধা, রাজনৈতিক শয়তানী ও জাতীয় অত্যাচার একভাবে বা অন্যভাবে *বজায় রাখে*।

"অন্যদিকে একমাত্র কর্মী গণতান্ত্রিকরা বলকান জনগণের প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ মুক্তিকে সমর্থন করে। সমস্ত বলকান জাতির কৃষকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি শেষ পর্যন্ত শুধু যে কোন জাতীয় অত্যাচারের সব সম্ভাবনাকে কমাতে পারে।

১৯১২-র বলকান যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের মূল্যবিচার আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থের ওপরে গঠিত। যে সব প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তুর্কী পরাজয়ের ফলে সৃষ্ট "শূন্যতা" পূরণ করতে উৎসাহী এই বিচার তাদের স্বরূপ প্রকাশ করল।

১৯১২-র ৩রা নভেম্বর তুর্কী সরকার বৃহৎ শক্তিগুলিকে মধ্যস্থতা করতে বলল তুরস্ক ও বুলগেরিয়া কর্তৃক ডিসেম্বরের প্রথমে একটা যুদ্ধ বিরতি ঘটল। ইতিমধ্যে প্রত্যেক বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি বলকান পরিস্থিতির দ্বারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। লেনিন যা লিখেছিলেন, তাতে এর অর্থ হল "সমস্যার মূলকেন্দ্র কার্যক্ষেত্র থেকে তথা-কথিত বৃহৎ শক্তিগুলির বক্তৃতা আর দ্বন্দ্বে সরে গেল।" বলকান অঞ্চলের দ্বন্দ্ব সামগ্রিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপরে এক অশুভ ছায়া ফেলেছিল এবং বিশ্বব্যাপী বিশৃংখলার আভাস দিচ্ছিল।

শীঘ্র, বৃহৎ শক্তিগুলির রাষ্ট্রদূতদের এক সম্মেলন লণ্ডনে শুরু হল। ওদিকে তুরস্ক আর বলকান মিত্ররা শান্তি শর্তের আলোচনা করছিল। সাম্রাজ্য-বাদী শক্তি আলোচনার ওপরে ক্রমবর্ধমান চাপ দিতে লাগল এবং কয়েকটি বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল।

সার্বিয়ার আড্রিয়াটিকের একটি বন্দরের দাবীতে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অসন্তুষ্ট হল। জার্মানীর দ্বারা সমর্থিত হয়ে তারা সৈন্য জড়ো করে সার্বিয় সীমান্তে সৈন্যবাহিনী একত্র করা শুরু করল। রাশিয়া সার্বিয়ার আঞ্চলিক দাবীকে অনুমোদন করল, কিন্তু সার্বদের সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াতে উপদেশ দিল। ইতিমধ্যে যদি বড় ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধে, তাহলে অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বুলগেরিয়া ও সার্বিয় সৈন্য ব্যবহারের আশায় ফ্রান্স আরো আক্রমণা-ত্মক পন্থার দিকে ঝুঁকল। Poincare জার সরকারকে অষ্ট্রিয় হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে আরো দৃঢ়ভাবে সার্বিয়াকে সমর্থনের জন্য অনুরোধ জানালেন; ওদিক প্যারির স্টক এক্সচেঞ্জ শুধু সামরিক কারণে জার-সরকারকে নতুন ঋণ মঞ্জুর

করল। বৃটেন মধ্যস্থের ভূমিকার দ্বারা লাভবান হওয়ার আশায় বিরোধিতাকে উস্কে দিল। এই সব কারণে শক্তিগুলি বড় যুদ্ধ শুরু করতে সাহস করল না। সার্বিয়া আড্রিয়াটিকে তার আঞ্চলিক পরিকল্পনা ত্যাগে এবং আলবেনিয়াতে মুক্ত বন্দরে বাণিজ্যিক পথ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হল।

লণ্ডনের আলোচনায় আলবেনিয়ার সর্বাগ্রে স্থান হ'ল। ১৯১১-১২-র মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পুরো দেশকে ভাসিয়ে দিল। যখন বলবান যুদ্ধ দেখা দিল, তখন যুদ্ধের পিছনের বলকান মিত্ররা ও বৃহৎ শক্তিগুলি তখনই আলবেনিয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে, বলকান লীগ আলবেনিয়াকে মন্টেনেগ্রো, সার্বিয়া ও গ্রীসের মধ্যে ভাগ করার পরিকল্পনা করেছিল। আড্রিয়াটিকে প্রবেশপথের জন্য সার্বিয়ার দাবী বিবেচনা করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী "স্বাধীন" আলবেনিয়ার জন্য ওকালতি করছিল, সেই আলবেনিয়া তারা নিজেরা রক্ষা করবে আশা করেছিল। ইটালী ও জার্মানী অস্ট্রিয়া পরিকল্পনাকে এই ধারণায় সমর্থন করল যে, আলবেনিয়া রুশ প্রভাবের পথে বাধা দেবে।

একদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান দাবী ও অন্যদিকে সার্বিয়ার দাবী বিবেচনা ক'রে শক্তিগুলি সুলতানের অধীনে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণে এক স্বায়ত্তশাসক আলেবেনিয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

স্কোডার আলবেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হ'ল। যে মণ্টেগ্রোর সৈন্যবাহিনী স্কোডার অবরোধ করেছিল, তারা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। রাশিয়া তাকে সমর্থন করল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী নিন্দা করতে লাগল। জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করল এবং বৃটেন সমর্থন করল রাশিয়াকে। আলবেনিয় প্রশ্ন বিশেষতঃ স্কোডারের প্রশ্ন দ্রুত একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হ'ল। শেষে মন্টেনেগ্রো রাজী হয়ে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিল।

আলবেনিয়া তার রাষ্ট্র ফিরে পেল। এর মূলে ছিল তুরস্কের অধীনতার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান জাতিগুলির যুদ্ধ। কিন্তু কার্যতঃ সে তার স্বাধীনতা ফিরে পেল না। যে বিদেশী শক্তি জার্মান উইদের প্রিন্স উইলিয়ামকে আলবেনিয়ার সিংহাসনে বসিয়েছিল, তারাই আলবেনিয়ার ঘটনাবলীতে নাক গলাচ্ছিল।

শান্তি আলোচনায় সব বিষয়ে গভীর মতভেদ দেখা দিল। বুলগেরিয়া পূর্ব থেসকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার সীমান্ত পূবে সরিয়ে নিতে চাইছিল। সালোনিকা দখলকারী গ্রীস ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং আলবেনিয়ার দক্ষিণ অংশ চাইছিল। সার্বিয়া "বিতর্কমূলক অঞ্চল"সহ এবং পূর্বে বুলগেরিয়ার অঞ্চলরূপে চিহ্নিত জায়গাসহ সমস্ত ম্যাসিডোনিয়া অধিকার করেছিল এবং সেটা ছেড়ে দেবার কোন ইচ্ছা ছিল না। ইতিমধ্যে বুলগেরিয়া সার্বিয় আধিপত্য এবং গ্রীসে সালোনিকার অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করতে রাজী হ'ল না।

পরিস্থিতি আরো তীব্র হ'ল যখন একটি ক্যু-দে'তা-র ফলে ১৯১৩-র জানুয়ারীতে যুদ্ধোন্মত্ত তরুণ তুর্কীরা ক্ষমতা পেয়ে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র মহড়া দিতে লাগল। কিন্তু শীঘ্রই তুরস্ক আবার পরাজিত হ'ল এবং বৃহৎ শক্তির খসড়ামত লণ্ডনে ১৯১৩-র ৩০শে মে বলকান লীগ ও তুরস্ক এক শান্তিচুক্তি করল। শুধু ইস্তানবুল ও ইনোস থেকে মিডিয়া পর্যন্ত একটি রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ সংলগ্ন প্রণালী অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ তুরস্কের হাতে রইল। আলবেনিয়া বাদে (স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গর্বিত) ইউরোপীয় তুরস্কের বাকী অংশ বলকান লীগের বাকী সদস্যদের হাতে গেল। শুধু ইজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপগুলির ভাগ্য বৃহৎ শক্তির হাতে নির্ধারিত হওয়ার অপেক্ষায় রইল!

লণ্ডন চুক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈষম্যও দূর করল না। বলকান রাষ্ট্রগুলির বৈষম্যও অমীমাংসিত রইল। বরং তা আরো তীব্র হয়ে উঠল। বলকান যুদ্ধ অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান গোষ্ঠীকে স্পষ্টতঃই অসুবিধায় ফেলল। যে তুরস্ককে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য মিত্র মনে করেছিল, সে পরাজিত হল। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর উচ্চাশার প্রধান লক্ষ্য সার্বিয়া আরো শক্তিশালী হ'ল। তাছাড়া বলকান লীগের অস্তিত্ব উপদ্বীপে অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবকে বাধা দিতে এবং মৈত্রীচুক্তির শক্তিগুলিকে রক্ষা করতে লাগল।

অতএব অস্ট্রিয়া ও জার্মান কূটনীতি বলকান চুক্তিকে নষ্ট করার কাজে লাগল। তারা সার্বিয়া কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়া অধিকারে বুলগেরিয়ার অসন্তোষকে কাজে লাগাল এবং স্যাক্সে-কোবার্গের ফার্দিনান্ড জারের মাধ্যমে বুলগেরিয়া ও বলকান লীগের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো এবং গ্রীস বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে একটা গোপন সামরিক চুক্তি করল এবং শীঘ্র রুমানিয়া তাতে যোগদান করল। সংঘর্ষ এড়াবার রুশ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। নিজের উঁচু লক্ষ্যের ভিত্তিতে বুলগেরিয়া ১৯১৩-র ২৯শে জুন তার সাম্প্রতিক মিত্রদের অকস্মাৎ আক্রমণ করল। অবশ্য সার্বিয়, মন্টেনেগ্রিয় ও গ্রীক বাহিনী রুমানিয় ও তুর্কীদের সহযোগিতায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

এইভাবে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হল। ১৯১৩-র ১০ই আগস্ট বুখারেস্টে এক সম্মেলনে বুলগেরিয়া সার্বিয়া, গ্রীস ও রুমানিয়ার সংগে এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। ২৯শে সেপ্টেম্বরে এক বুলগেরিয়-তুর্কী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আগে বুলগেরিয়ার কাছ থেকে তুরস্কের ছিনিয়ে নেওয়া ম্যাসিডোনিয়ার প্রায় সমস্ত অংশের দখল পেল সার্বিয়া, দক্ষিণ ম্যাসিডোনিয়া ও পশ্চিম থ্রেস পেল গ্রীসে, দক্ষিণ দোব্রুজা রুমানিয়ার এবং এডার্ন (আড্রিয়ানোপল) সহ পূর্ব থ্রেসের অংশ গেল তুরস্কে।

বলকান যুদ্ধে জয় করা অঞ্চলগুলির মধ্যে বুলগেরিয়ার দখলে রইল ম্যাসিডোনিয়া ও পশ্চিম থ্রেসের সামান্য অংশ। তুর্কী-বুলগেরিয় সীমান্ত ইনোস-মিডিয়া রেখার পশ্চিমে সরে গেল।

অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বলকান লীগে ভাঙনের সুযোগ নিল। জার্মানমুখী ভাবধারা বুলগেরিয়ায় তখন প্রবল। জার্মান সরকারও তুরস্কে দূত পাঠাল। দূতদের প্রধান জেনারেল লিম্যান ফন স্যাণ্ডার্স শীঘ্রই তৎকালীন তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে অবস্থানকারী তুর্কী বাহিনীর অধিনায়ক হলেন. এতে বোঝা যায়, বার্লিন তখনো ওসমান সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সমগ্র এশিয়া মাইনরকে একেবারে জার্মান একচেটিয়া প্রভাবিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য "বাগদাদ নীতি"-র দিক অভিমুখী।

বলকান ও তুরস্কে এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণসাগর প্রণালী অঞ্চলে জারের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ায়, তিনি লিম্যান ফন স্যাণ্ডার্সের নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এক নতুন রুশ-জার্মান সংঘর্ষ শুরু হল, কিন্তু শীঘ্রই তা আপসে মিটে গেল। জার্মান সরকার লিম্যানের সৈন্যাধিনায়কের নিয়োগ বাতিল করে তাঁকে সৈন্যবাহিনীর পরিদর্শক করলেন। সুবিধাটা প্রধানতঃ বাহ্যিক এবং জার্মান ও রাশিয়ার ঠোকাঠুকি লেগে রইল।

বলকান যুদ্ধ অত্যন্ত বিপজ্জনক সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতাকে বাধা দেয় নি। অন্যদিকে শুধু বলকান সম্বন্ধের কারণে পরিস্থিতি যে আরো জটিল ও বিস্ফোরক হয়ে উঠল তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কারণেও ঘটেছিল। সমরবাদী এবং যুদ্ধ শিল্প সংস্থার দ্বারা আবৃত অস্ত্র প্রতিযোগিতা নতুন প্রেরণা পেল। শাসকশ্রেণী এটাকে ব্যবসায়ে উন্নতির উপায় হিসাবে ব্যবহার করল, সেই সংগে শ্রম ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিসাবেও বটে: যে আন্দোলন সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের উত্থান সত্ত্বেও তাদের চিন্তিত করেছিল। ১৯১৩-র বুর্জোয়া শেষে সংবাদপত্র, যারা কূটনৈতিক উদ্দীপনার উদাহরণ লক্ষ্য করছিল, তারা এই মনোভাব সৃষ্টি করতে চাইল যে, ইউরোপীয় সরকারগুলি স্বদেশের ঘটনাবলী নিয়ে ব্যস্ত এবং যদি সংঘর্ষ ঘটে তাহলে কূটনৈতিক উপায়ে সেটা সীমাবদ্ধ করা হবে এই আশা নিয়ে আগামী বছরের দিকে তাকাচ্ছে।

যে ১৯১৩ বলকান যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই বছরকে বিদায় দিয়ে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি বলল ১৯১৪-র উত্তেজনা শিথিল হবে। অবশ্য লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শ্রম ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দিকে মনোযোগ শান্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপদ সৃষ্টি করছে। ১৯১৩-র মে মাসে তিনি লিখেছিলেন: ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ভয়ে উন্মত্তের মত সমরবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আঁকড়ে ধরছে। সামান্য সংখ্যক প্যাতি-বুর্জোয়া:

গণতান্ত্রিকরা শান্তির প্রবল ইচ্ছা ধারণে অসমর্থ এবং শান্তি আনতে আরো অক্ষম। সাধারণভাবে ক্ষমতা ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট এবং বৃহৎ পুঁজির হাতে। শান্তির একমাত্র প্রত্যাভূত হল শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত সচেতন আন্দোলন।"[১]

শাসক শ্রেণী এবং বৃহৎ শক্তির সরকারগুলি তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এবং অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রধানতঃ সংস্কারক ও সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতাদের সমর্থনের ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণীকে বাধা দেওয়ার ও বিভক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তারা দ্রুত যুদ্ধ প্রস্তুতির মধ্যে তাদের অসুবিধা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগল। ইউরোপের জনগণ দ্রুত এক বিরাট দঃখবার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৬০-৬৩

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১৯, পৃঃ ৮৪।

"রঙীন বই"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের পরিচায়ক দলিলের বৃহৎ সোভিয়েত ও বৈদেশিক সংগ্রহ বিবদমান সরকারগুলি কর্তৃক তাদের শান্তির প্রতি আকর্ষণ ও শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণের জন্য প্রকাশিত "রঙীন বই" নামক যথেষ্ট ক্ষুদ্রতর সংগ্রহকে তাচ্ছিল্য করেছে। সাধারণ বর্ণনায় সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িত সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর প্রতিটি সরকারই এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং যথারীতি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অতএব যত সোজাই মনে হোক, যুদ্ধকে সমর্থন করে একটা সহজ বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী খাড়া করা তত সোজা ছিল না।

এখন বিশ্বযুদ্ধের প্রচার পদ্ধতির যে মোটামুটি বড় আয়তনের কাহিনী আমরা পেয়েছি তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে গবির্ত একচেটিয়া কারবারগুলির সাধারণ ভূমিকা এমন কি খুঁটি-নাটিরও ভালো ধারণা করতে পারি।

যুদ্ধ প্রচার বিভিন্ন দিকে বিশেষ নৈপুণ্য এবং সব রকম সম্ভাব্য পদ্ধতিতে চালিত হয়েছিল। কিন্তু যে সব কিছুই প্রতিটি সরকারের নিজস্ব উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশেষ ধারণার ভিত্তিতে গঠিত। তবুও, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির সব দলেরই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে জাগানো—অতএব সব সরকারী ধারণার ভিতরে এই ভাব ছিল যে, যুদ্ধটা আত্মরক্ষামূলক এবং শত্রুরাই যুদ্ধ ঘটিয়েছে। ভাবটাকে সহজে বলতে গেলে—এটা সোজা করে বলা যতটা দরকারী, এটাকে প্রমাণ করা ততটাই কঠিন—সরকারগুলি প্রত্যেক আইন সভায় বিতর্কিত ও মধ্যবিত্ত সংবাদপত্রের মনোভাবের উপর প্রতিক্রিয়াশীল দলিলের সংগ্রহ প্রকাশ করল। "যুদ্ধাপরাধ" সমস্যা প্রকৃতই প্রথমে জার্মানিতে উত্থাপিত হয় নি, পরে যুদ্ধ শুরু হওয়া প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছিল এবং দ্রুত তা শ্রেণী সংগ্রামের বিষয় হ'য়ে উঠল।

এটাকে যুদ্ধ প্রচার পদ্ধতির অনুসন্ধান কারক যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল বিশেষভাবে বিদ্ধ করেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা হল এই :

"পশ্চিম ইউরোপের সরকারগুলি কখনো নিশ্চিত হতে পারে না যে, তাদের কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে শ্রেণী সচেতন প্রলেতারিয়েত যুদ্ধের তুরী নিনাদে মিলিত হবে।" যে প্রচার শ্রেণী সংগ্রামের একটি চেহারা সেই প্রচার অতএব এমন ভাবে তৈরী হ'ল যাতে "যাকে জনসাধারণ ঘৃণা করবে তার সম্বন্ধে ব্যর্থকতা" গঠিত হয়।

ল্যাসওয়েল দেখলেন, "আন্তর্জাতিক ঘটনাকে পরিচালনা বিশ্ব পদ্ধতি অথবা সব শাসক শ্রেণীর মূর্খতা বা বিদ্বেষের কারণে যুদ্ধ ঘটতে পারে, বরং শত্রুতার লালসার কারণে যুদ্ধ ঘটে······যদি প্রচারককে জনগণের ঘৃণা জাগাতে হয় তাহলে তাকে দেখতে হবে সেই ঘৃণা যেন ছড়িয়ে যায় যা শত্রুর একমাত্র দায়িত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।"

১

জার্মান *শ্বেত পুস্তক*-এর রুশ অনুবাদের দ্বিতীয় নাম *মিথ্যায়ভরা পুস্তক* নামটা যুদ্ধের প্রথমে প্রকাশিত প্রত্যেকটি "রঙীন" বই এর মলাটে ভালো ভাবেই লেখা চলে। এর মধ্যে অবশ্যই মৈত্রীচুক্তির দেশগুলির প্রকাশিত বইগুলি অন্তর্ভুক্ত। "রঙীন বইগুলি" রাজনৈতিক বিতর্ক ও যুদ্ধ প্রচারের হাতিয়ারের মধ্যস্থতা করেছিল এবং যদি জার্মান বইগুলি অন্য সরকারের একই রকম বই থেকে কোন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলাদা হয় সেটা পুরোপুরি এর বৈষম্যমূলক যুক্তির জন্য।

যুদ্ধের শুরু সম্বন্ধে লিখিত যে *শ্বেত পুস্তক* চ্যান্সেলের থিওবল্ড ফন বেঠমান-হলওয়েগ রাইখস্ট্যাগের কাছে দিয়েছিলেন ১৯১৪-র ৩রা অগাস্টে; সেই বই ২রা অগাস্টে শেষ হল। এটা যুক্তিসংগত সত্য। অত্যন্ত ত্বরিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান সরকারের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার দলিলের তাৎপর্য ও নির্বাচনের উপর প্রতিক্রিয়া করেছিল।

শ্বেত পুস্তক-এর স্মারকলিপি ও দলিলে জুলাই সংকটের কথা রয়েছে —যেদিন ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ায় আর্চ ডিউক সারাজেভোতে নিহত হলেন সেদিন থেকে ফরাসী সৈন্য চালনার দিন ১লা আগস্ট পর্যন্ত। এই সময় সীমার মধ্যে যেমন সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি চাইছিল সেইভাবে উপকরণ উপস্থিত করতে হয়েছিল।

ব্রিটেন তখনো জার্মানির প্রতি দ্বৈত ভঙ্গী বজায় রেখেছিল। সুতরাং জার্মান ধারণার মূল ছিল যে, রুশ সরকার আক্রমণ শুরু করেছিল। এর সংগে জার্মানি কর্তৃক অনুমোদিত সার্বিয়ার অস্ট্রিয়ার প্রতি চরম পত্র জুড়ে দিলে বইটি প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, জার্মান সরকার অস্ট্রো-সার্বিয় সংকটকে স্থানীয় সংঘর্ষ হিসাবে দেখেছিল। জার্মান সরকার *শ্বেত পুস্তক*-এ লিখেছিল "সংঘর্ষের প্রথম থেকেই আমরা এই মনোভাব গ্রহণ করেছিলাম যে

বিতর্কটায় অস্ট্রিয়া ছাড়া আর কেউ জড়িত ছিল না এবং সেটা অস্ট্রিয়া আর সার্বিয়ার দ্বারা মিটে যাওয়া উচিত ছিল। এই জন্য আমরা যুদ্ধ টাকে সীমিত করার দিকে ও অন্য শক্তিকে এই কথা বোঝানোর জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা সংহত করেছিলাম যে, অস্ট্রিয়া-হাঙেগরী পরিস্থিতির চাপে অস্ত্র গ্রহণে এবং আত্মরক্ষার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন নিতে বাধ্য হয়েছিল।"

সারাজেভোতে হত্যাকাণ্ডের পর জার্মানি যে অস্ট্রিয় দাবীকে সমর্থন করেছিলেন, এমনকি পথও দেখিয়েছিল, সেই তথ্যের ঝলক দিয়ে **শ্বেত পুস্তক** এই ধারণায় নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিল যে, জার্মানি সার্বিয়া সম্বন্ধে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে কাজের স্বাধীনতা দিয়েছিল এবং আলাদা দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে অস্ট্রো সার্বিয় সংঘর্ষে রুশ হস্তক্ষেপকে মনে করা হল একটি স্থানীয় সংঘর্ষকে এক সারা ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত করার প্রধান উপাদান।

জার্মানির মনোভাবকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করা হয়েছে—প্রথম, সার্বিয়া বনাম অস্ট্রো-হাঙেগরীয় মনোভাবকে অপ্রত্যক্ষ অনুমোদন এবং দ্বিতীয় অস্ট্রো-সার্বিয় সংঘর্ষে রুশ হস্তক্ষেপের মুহূর্ত থেকে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালানো। এই দুটি যুক্তি সত্য থেকে অনেক দূরে, কিন্তু এতে জার্মান সরকার কর্তৃক অনুসৃত সাধারণ রাজনৈতিক ধারার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রাক্ যুদ্ধ সংকটে বার্লিন ও ভিয়েনার মধ্যে বিনিময় হওয়া অসংখ্য বার্তার একটিও জার্মান বইটিতে নেই। যদি এর একটাও অন্তত: প্রকাশিত হত, তা হলে সেটা **শ্বেত পুস্তক**-এর রাজনৈতিক ধারণাকে তুলে ধরত। জার্মান সরকারকে শুধ যে অস্ট্রিয়া-হাঙেগরীর প্রতি তার সক্রিয় সমর্থনকে গোপন করতে হল তাই নয়, উপরন্তু ২৮শে থেকে ৩১শে জুলাই-এর মাঝে বৃটেন কর্তৃক গৃহীত ভীতিজনক মনোভাব সম্পর্কিত অস্ট্রো-জার্মান কৌশলগত পার্থক্যেরও কয়েকটি গোপন করতে হয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে জার্মানরা তাদের নিরপেক্ষতা দেখাতে চেয়েছিল এবং অন্যদিকে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে চেয়েছিল, এইভাবে অস্ট্রো-জার্মান রাজনৈতিক সহযোগিতার দৃঢ়তা প্রমাণ করতে চাইছিল। যে মনোভাব সৃষ্টি হতে চাইছিল, তা হল জার্মানি অস্টিয়া-হাঙেগরীর বেপরোয়া নীতির প্রতি তার নিষ্ক্রিয় মনোভাবের কারণে মহাযুদ্ধে জড়িত হয়েছিল।

জার্মান সরকার শেষ পর্যন্ত তার মনোভাব বজায় রাখল।

অস্ট্রো-জার্মান দৃঢ়তার প্রদর্শনী যুদ্ধারম্ভের সাধারণ ধারণার উপর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। যেহেতু কয়েকটি দলিলের খুঁটিনাটি পুরো উপস্থাপিত হলে জুলাই সংকটে অস্ট্রো-জার্মান সম্বন্ধের প্রকৃত প্রকৃতিকে প্রকাশ করবে অতএব জার্মান সরকার তা বদলাতে, সংক্ষিপ্ত করতে, ছাটাই ইত্যাদি করতে চাইছিল। জুলাই-এর শেষাশেষি ভিয়েনা ও পিতার্সবার্গের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা সম্পর্কিত দলিলের কয়েকটির সাহায্যে জার্মান সরকার দাবী করতে

পারত যে, জার্মানি রাশিয়ার চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধকে এড়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু এইসব দলিলকে **শ্বেত পুস্তক**-এ ঢোকানোর চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং জার্মান ও অস্ট্রিয় নীতির মধ্যে সামান্যতম সংঘর্ষের ইঙ্গিত এড়াতে হল। যার ওপরে জোর দিতে হল সেটা ততটা জার্মানির নিজের অবস্থানের আত্মরক্ষামূলক দিক নয়, যতটা স্পষ্টভাবে রুশ নীতির আক্রমণাত্মক দিক।

বিষয়টির পরবর্তী অর্ধেক সংগ্রহ করা সহজ, কিন্তু তবুও দলিলের কাটাছেঁড়া করার দরকার ছিল। রুশ নীতি সম্পর্কিত উপকরণ বাদ দিয়ে ও সংক্ষিপ্ত করে কাম্য ফল পাওয়া গেল। ২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় প্রেরিত উইলহেল্মের কাছে জারের তারবার্তা, যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, অস্ট্রো-সার্বিয় সংঘর্ষ হেগ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া হোক, সেটা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হল, কারণ স্পষ্টতঃই এটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য রুশ বাগ্রতার ইঙ্গিত দিয়ে থাকতে পারে।

স্বভাবতঃ, রুশ সরকার যে কোন সময়ে তারবার্তা ছাপিয়ে জার্মান বয়ান প্রকাশ করতে পারত। তারা এটাকে জার্মান বিরোধী প্রচারের জন্যও ব্যবহার করতে পারত। এই কারণে, জার্মান ঐতিহাসিকরা লিখেছিলেন যে, দলিল না ছাপান "কৌশলগতভাবে আনাড়ী" কাজ হয়েছিল।

শ্বেত পুস্তক-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রুশ সরকারের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে দেখানো। উইলহেল্ম্ বিশ্বাস করতেন যে, জার্মান সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকদের সমর্থন জয় করা প্রয়োজন। তিনি ভেবেছিলেন যে, যুদ্ধ ত্বরান্বিত করায় ফ্রান্সের ভূমিকা খর্ব করায় এই উদ্দেশ্য সবচেয়ে বেশী সাধিত হবে। ফ্রান্সকে শুধু রাশিয়ার একজন সঙ্গীমাত্র রূপে দেখানো হল, যে তার মিত্রকে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুসরণ করেছে। ফ্রান্স যুদ্ধ বাধিয়েছে এ অভিযোগ চেপে যাওয়া হল কারণ, **শ্বেত পুস্তক** যখন প্রস্তুত হচ্ছিল তখনো জার্মানির ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধেনি (২রা আগস্ট)। তাছাড়া, সে ইঙ্গ-ফরাসী সম্বন্ধের ব্যাপারেও সচেতন ছিল।

প্রাক :যুদ্ধ সংকটে বৃটেনের ব্যবহার, যা **শ্বেত পুস্তক**-এ প্রতিফলিত, তাকে এক বিশেষ তির্যক চেহারা দেওয়া হয়েছে। বৃটেনকে ইউরোপীয় শান্তির গোঁড়া সমর্থকরূপে দেখান হয়েছে। বিরোধী দলিলগুলি চেপে রাখা হল। (যেমন, এডোয়ার্ড গ্রে-র ভীষণ জার্মান বিরোধী মনোভাবের বিষয়ে জার্মান সরকারকে সতর্ক করে লণ্ডন থেকে জার্মান রাষ্ট্রদূতের তারবার্তা)। এটা দুটি কারণে করা হয়েছিল। প্রথমতঃ যে বৃটেন নিরপেক্ষ থাকতে পারে তার বিরক্তি এড়ানো এবং দ্বিতীয়তঃ যদি সে যুদ্ধে যোগ দেয়, তা হলে তাকে অশ্রুতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতায় দোষী করা। যুদ্ধের পূর্ব ইঙ্গ-জার্মান সম্বন্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হল। এইভাবে যেহেতু কয়েক দিন

পরে বৃটেন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, অতএব জার্মান সরকার বৃটেনের রাজনৈতিক অসামর্থের দলিলগত প্রমাণ জোগাল। পরে **শ্বেত পুস্তক**-এর নতুন, যথেষ্ট সংশোধিত সংস্করণে জার্মানি ছাঁদ বদলাল, কিন্তু মূল বয়ানটি বৃটিশরা তাদের **নীল পুস্তক**-এর জন্য ধার নিল, যেটি ঠিক দুদিন পরেই বেরোল (১৯১৪, ৫ই আগস্ট) যুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে বৃটেনের যোগদানের যথার্থতা প্রমাণের জন্য। যতই হোক বৃটিশ সরকারের কূটনৈতিক দলিল নির্বাচন ও হাতসাফাই-এর প্রচুর অভিজ্ঞতা হল।

২

১৯১০-র ৩রা আগস্ট হাউস অফ কমন্স সার এডোয়ার্ড গ্রে কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাকে সমর্থনের জন্য **নীল পুস্তক** পরিকল্পিত হয়েছিল, যে বক্তৃতায় গ্রে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে বৃটেনের জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া উপায় ছিল না। গ্রে এই বক্তৃতায় বলেছিলেন, "যখন আমরা শান্তির জন্য চেষ্টা করছিলাম গত সপ্তাহে, তখন কি ঘটেছিল সে বিষয়ে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাগজ-পত্র প্রকাশ করব এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ কাগজগুলি প্রকাশিত হলে সেগুলো প্রত্যেক মানুষকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে শান্তির জন্য আমাদের চেষ্টা কত কষ্টকর, যথার্থ ও আন্তরিক ছিল এবং শান্তির বিরুদ্ধে কোন্ শক্তিগুলি কাজ করেছিল সে বিষয়ে জনসাধারণের নিজস্ব বিচার বোধ গড়ে তুলতে ওগুলি সাহায্য করবে।"

যেহেতু জার্মান সরকার বৃটেনের নিরপেক্ষ থাকার আশায় বৃটেনের নীতির আপসজনক দিকটির কথা দলিলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, বৃটিশ **নীল পুস্তক** তার অর্ধেক কাজই করে রেখেছিল।

কিন্তু যে বৃটিশ স্বার্থ কোন গোপনচুক্তি বা "সম্মানজনক প্রতিশ্রুতিতে" জড়িত নয় বলে কথিত, সেই বৃটিশ স্বার্থেই জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের যথার্থতাও গ্রেকে প্রমাণ করতে হয়েছিল। বৃটেনের "মতামতের স্বাধীনতা"র দাবীই ছিল **নীল পুস্তক**-এর দলিল নির্বাচনে প্রধান নির্দেশক রেখা। এটা বলা প্রয়োজন যে বৃটেনের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝানোর ধরন ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ছিল। বলা হয়েছিল যে, ফ্রান্স জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচাতে বাধা হয়েছিল। ১৮৩৯-এ শক্তিগুলির দ্বারা প্রতিশ্রুত বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা প্রধান যুক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। গ্রে কমন্সে বলেছিলেন, "যদি তার স্বাধীনতা যায়, তা হলে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতাও যাবে। বৃটিশ স্বার্থের দিক থেকে আমি, যা বিপজ্জনক হতে পারে তা বিবেচনার জন্য হাউসকে বলছি।" অবশ্য প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কয়েক বছর আগে বিপদ ঘটেছিল। বৃটেনের নীতি নির্ধারকরা জানতেন যে, দুই সীমান্তে যুদ্ধ ঘটলে জার্মানি নিশ্চিত বেলজিয় নিরপেক্ষতাকে ভেঙে ফেলত। উপরন্তু

১৮৮৭-তে যখন ব্টেন জার্মানির গোপন সমর্থনে গঠিত ভূমধ্যসাগরীয় মৈত্রীতে যোগদান করে, তখন সে জার্মানিকে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভাঙতে দিতে প্রস্তুত ছিল।

১৯০৭-এ যখন মৈত্রীচুক্তি সমাপ্তি পর্বে তখন ব্টেনের জেনারেল স্টাফ সম্ভাব্য যৌথ অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে বেলজিয়ানদের সংগে যোগাযোগ করলেন, কার্যতঃ বেলজিয়াম নিরপেক্ষতা অনেকদিন থেকে রাজনৈতিক কল্পকাহিনী হয়েছিল। প্রথম মরক্কো সংকটের সময়ে জার্মান সরকারের দখলে থাকা তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ফরাসী জার্মান যুদ্ধ ঘটলে এক অভিযানমূলক বাহিনী পাঠানোর তিনটি বিকল্প পরিকল্পনা ব্টেনের ছিল: ক্যালে ও ডানকার্ক হয়ে, ব্লোজউইগ ও ডেনমার্ক হয়ে এবং শেষতঃ বেলজিয়াম হয়ে। এগুলির মধ্যে শেষটিই ছিল সবচেয়ে সম্ভাব্য। হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের যে নিরপেক্ষতার কথা গ্রে তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন, তা অনেকদিন একটা ধারণামাত্র ছিল এবং ব্টেনও সমানভাবে সেই ধারণা পোষণ করত।

ইঙ্গ-বেলজিয়ান আলোচনাকে আবৃতকারী বিশেষ গোপনতার পরিপ্রেক্ষিতে যে বেলজিয়ান নিরপেক্ষতার কাহিনী রাজনৈতিক তথ্যরূপে উপস্থিত করা যেত, সেই নিরপ্রেক্ষতার কাহিনীর পরে দেখা দিল ইঙ্গ-ফরাসী সম্বন্ধের মত একটি সংকটজনক বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ মিথ্যাচারণ। ব্টেন যে কোন রাজনৈতিক দলে জড়িত ছিল না, কোন রাজনৈতিক বা সামরিক প্রতিশ্রুতি দেয় নি এবং ফ্রান্সকে "কূটনৈতিক সমর্থনের বেশী অন্য কোন প্রতিশ্রুতি" দেয় নি, তা প্রমাণের জন্য গ্রে যে উপায় অবলম্বন করলেন, সেটা ভদ্রভাবে বলতে গেলে বলতে হয় হাতসাফাই। ১৯:২-র নভেম্বরের ২২শে লণ্ডনে ফরাসী দূত Cambon-এর কাছে লেখা অপ্রকাশিত চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে গিয়ে, যে চিঠিতে গ্রে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ স্থল ও নৌবাহিনীর নীতি ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ স্পষ্টতঃই তা প্রতিশ্রুতির পর্যায়ে পৌঁছয়, গ্রে চিঠিতে সেই জায়গায় জোর দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে ব্টেন ও ফ্রান্সের আলোচনা করা উচিত, "আক্রমণ প্রতিরোধ ও একসংগে শান্তি রক্ষা করতে তারা একত্রে কাজ করবে কি না এবং যদি করে, একত্রে তারা কি ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।" তিনি পরের লাইনটা বাদ দিয়েছেন যাতে জার্মাষনর বিরুদ্ধে যৌথ অস্ত্রধারণের নীতি লেখা আছে। সেই লাইনে আছে, "যদি সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে অবিলম্বে জেনারেল স্টাফের পরিকল্পনা বিবেচিত হওয়া উচিত এবং সেটা কতটা প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন।

পরে যখন গ্রে তার স্মৃতিকথায় লিখলেন যে, অন্যমনস্কভাবে তিনি লাইনটা বাদ দিয়ে গেছেন। (যেটা সম্পূর্ণভাবে দোষ প্রকাশ করে) যখন যুদ্ধে ব্টেনের যোগদান নিয়ে তর্ক হচ্ছিল, তখন তিনি পাঠকের সহজে বিশ্বাসের

উপরে নির্ভর করেছিলেন, কারণ বিষয়টা তার মতে বেশী পুরনো বা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক। স্বভাবতঃই বাদ যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। যে ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল মনে করেছিলেন, সে বিষয়ে তিনি সরলতার ভান করেছিলেন। যেমন, ১৯০৪-এর ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির কথা বলতে গিয়ে গ্রে ও Poincare দুজনেই চুক্তির গোপন অংশটাকে অল্পভাবে কম গুরুত্বহীন বলে উল্লেখ করেছিলেন, যদিও তার সংগে মিশর ও মরক্কোর ব্যাপার জড়িত ছিল। Poincare-র ক্ষেত্রে বিষয়টা চমৎকার সাহিত্যভঙ্গীতে ঢাকা পড়েছে, কিন্তু গ্রে-র ক্ষেত্রে ওটাকে অবাস্তর বলে মনে হয়েছে। পূর্বে সযত্নে গোপন করা তথ্য জনগণের গোচরে এলে যখন তা প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া হয় তখন মিথ্যা সরলতা ব্যর্থ হয়।

মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণার অন্য কৌশলটি গ্রে-র ৩রা আগস্টের বক্তৃতায় এবং *নীল পুস্তক*-এ বেশী কার্যকরী হয়েছিল। কয়েকটি উদাহরণ হল এই (অবশ্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় নয়)। রুশ সরকারের মতে সার্বিয়াকে দেওয়া অস্ট্রিয়ার চরমপত্রের বক্তব্য জানার পর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই বলে বৃটিশ দূত জর্জ বুকানন ১৯১৪-র ২৪শে জুলাই যে তারবার্তা পিতার্সবার্গে পাঠিয়েছিলেন সেটা *নীল পুস্তক*-এ আছে। বুকানন তার নিজস্ব মত দিয়েছিলেন যে, কোন বৃটিশ ঘোষণায় "অস্ত্রের সাহায্যে রাশিয়া ও ফ্রান্সকে সমর্থনের··· নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি" থাকবে না।

বুকানন বলেছিলেন, "সার্বিয়া সরাসরি বৃটিশ স্বার্থ কিছু নেই এবং সেই দেশের হয়ে যুদ্ধ কখনো বৃটিশ জনমতের দ্বারা অনুমোদিত হবে না।" এই লাইনটার জন্যই দলিলটা প্রকাশের যোগ্য। এর কিছু আগে পিতার্সবার্গে Poincare-র অবস্থানের সময়ে সম্পাদিত রাজনৈতিক চুক্তির যা বুকাননের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল তাও এই তারবার্তায় ছিল। সংকটে বৃটিশ মনোভাব কেমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তার আলোকে বৃটিশ নীতি নির্ধারকদের যে ফরাসী-রুশ যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘটিয়েছিল তার বিষয় জানার কোন দরকার ছিল না। না হলে বৃটিশ নীতিকে দ্বৈত নীতির ছাপ দেওয়া যেত। এইজন্য Poincare-র পরিদর্শনের সময়ে সম্পাদিত চুক্তির একটা বড় অংশ বিশেষভাবে মুছে দেওয়া হয়েছিল। যে অংশে এইরকম ধারণা করার সুযোগ ছিল যে, যদি বৃটেন সংকটের প্রথমে জারের নীতির আক্রমণাত্মক ভঙ্গীরকে অস্বীকার করত, তাহলে রাশিয়াও যতদূর পৌঁছেছিল, ততদূর যেত না, তাই অংশটাও মুছে দেওয়া হয়েছিল।

বৈষম্য চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছনো পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত অপেক্ষা করার বৃটেনের নীতি, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে সমর্থনের ইচ্ছকৃত নীতি এবং সেই সংগে জার্মানী সম্পর্কে প্ররোচনার বৃটিশ নীতির প্রকৃত চেহারা গোপন করাই ছিল উদ্দেশ্য বুকানের ২৫শে জুলাইয়ের তারবার্তার প্রতি যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তার

থেকে এটা স্পষ্ট। বৃটেনের নিরপেক্ষতায় জার্মানীর বিশ্বাসকে নষ্ট করা এবং সেই সংগে ফরাসী-রুশ সহযোগিতায় প্রকাশ্যে বৃটেনের যোগদান করার জন্য রুশ বৈদেশিক মন্ত্রী সাজোনভের প্রতিনিধি সম্পর্কিত বিষয় এটি। বৃটিশ সরকারকৃত তারবার্তার প্রকাশ্য বয়ানে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ দূত উত্তর দিয়েছেন যে, "বার্লিন এবং ভিয়েনায় বন্ধুরূপে মহত্তর উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে পারে।" কিন্তু তারবার্তার সাধারণ বিষয়-বস্তুতে এই শান্তি বজায়কারী উপায়ের প্রকৃত অর্থ নেই: ফরাসী সরকার রাশিয়ার সংগে থাকার প্রকাশ দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করার পর বৃটিশ বলল "সময় নেওয়ার" প্রয়োজন। অতএব এটা মুছে ফেলতে হল। পিতার্সবার্গে গৃহীত সিদ্ধান্তে বৃটেনের শান্তির আগ্রহও প্রদর্শিত হয়েছে, যে "সিদ্ধান্ত নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, রাশিয়া সৈন্য জড় করে যুদ্ধে অংশ নেবে না।" ইতিমধ্যেই ১১,০০,০০০ লক্ষ সৈন্যের একত্রীকরণ শুরু হয়ে গেছে এই সংবাদের উত্তরে যদি ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার কি মূল্য থাকতে পারে?

এই মনোভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল যে, পরবর্তী ঘটনাবলীর উপরে সংকটপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল রুশ সৈন্য চালনা বন্ধের জন্য বৃটিশ সরকার চেষ্টা করেছিল এবং এ বিষয়ে রুশ সরকার তাকে সতর্ক করে নি। যেহেতু ফ্রান্সের প্রতি বৃটিশ প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, অতএব রাশিয়ার সার্বিয়া নিয়ে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সংগে তাকে নিঃশর্ত সাহায্য করার জন্য ফ্রান্সের দৃঢ় মনোভাবের সূচক সবকিছু মুছে দিতে হয়েছিল। বৃটেন প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তার তৎপরতা ঘোষণা করুক—ফ্রান্সের এই সরাসরি দাবীর বিষয়ে এটা আরো সত্য। বুকানন ২৫শে জুলাইয়ের তারবার্তায় লিখেছিলেন, "ফরাসী দূত বলেছেন যে ফরাসী সরকার অবিলম্বে জানতে চাইবেন যে, ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-আলোচনা অনুযায়ী আমাদের নৌবাহিনী তার ভূমিকা পালনে প্রস্তুত কি না। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এ বিষয়ে যারা একসঙ্গে কাজ করছে সেই দুই বন্ধুর পাশে ইংল্যাণ্ড দাঁড়াবে না।"

এই অংশটাও মুছে দেওয়া হল, কারণ, বৃটিশ প্রচার দেখাতে চেষ্টা করেছিল যে, বৃটেন তার নিজের স্বার্থে যুদ্ধে এসেছে, কোন বাহ্যিক প্রতি-শ্রুতির কারণে নয়।

বৃটিশ সরকারের দলিলগতভাবে দেখানোর প্রচার লক্ষ্য ছিল যে, বৃটেন শান্তির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল: প্রকাশের পূর্বে ১০০ থেকে ১৫৯টি বিশেষভাবে নির্বাচিত দলিলের মিথ্যা চেহারা দিতে হয়েছিল।

৩

ঠিক যেমন কমন্সে গ্রে-র বক্তৃতায় গঠিত ধারণাকে দলিলগতভাবে সমর্থনের জন্য *নীল পুস্তক* প্রকাশিত হয়েছিল, তেমন ৬ই আগস্টে জার সরকার

প্রকাশিত *কমলা রঙের পুস্তক*-এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ডুমা-র সাজোনোভ কর্তৃক উপস্থাপিত মূল ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সাজোনভ ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের শত্রুরা ইউরোপে যে বিপদ ছড়িয়ে দিয়েছে তার জন্য তারা আমাদের দোষ দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যারা রাশিয়ার অতীত দিনের নীতিগুলি দেখেছে তাদের এই মিথ্যা অভিযোগভুল বোঝাতে পারবে না"

এর পরে, সাজোনোভ দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের জন্য অস্ট্রিয়া-হাংগেরীকে দোষ দেওয়া এবং প্রথম যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাশিয়ার অংশগ্রহণকে উজ্জ্বল করার কৌশল অবলম্বন করলেন। একই কৌশল *কমলা রঙের পুস্তক*-এ কাজে লাগান হয়েছে।

ব্যাপারটা সোজা। যুক্তিটা ছিল এই যে ফ্রান্সের প্রতি, সেইসংগে রাশিয়ার প্রতি যুদ্ধের বাহ্যিক ঘোষণা জার্মানদের কাছ থেকে এল। এতে জার্মানিকে "যুদ্ধের অপরাধীদের" প্রধান বলে দেখান সহজ হল। বাহ্যিক বয়ান ছিল, জার্মানি কর্তৃক সমর্থিত অস্ট্রিয়া-হাংগেরী রাশিয়াকে অপমান করার আশা করে সার্বিয়াকে আক্রমণ করেছিল যে রাশিয়া ফ্রান্স ও বৃটেনের সংগে একঘেঁয়ে সংঘর্ষের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছনোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। যাই হোক, বিশ্বাসঘাতক জার্মানি রাশিয়া, তার বন্ধুদের সব শান্তির প্রচেষ্টা নষ্ট করল এবং সাজানোভ দাবী করলেন, "জার্মানি ফাঁকা আশ্বাস দিল।" অতএব বিশেষভাবে অস্ট্রিয়ার ভীতিপ্রদর্শক মনোভাবের ফলে স্থল ও নৌবাহিনী চালনা করতে রাশিয়া বাধ্য হল আর জার "জার্মান সম্রাটকে ভদ্রতা করে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অস্ত্রের সাহায্য নেবে না।"

জার্মান যুদ্ধ ঘোষণা করে জবাব দিল। এই সরাসরি সরকারী বয়ানের সিদ্ধান্ত কিছুটা বিস্ময়কর: জার্মানি যুদ্ধের একমাত্র অপরাধী, কারণ সে "রাজকীয় প্রতিশ্রুতির চেয়ে সৈন্যচালনায় বেশী প্রত্যয় করার হঠকারিতা দেখিয়েছিল।

এইসব যুক্তি বুর্জোয়া-ভূস্বামী ডুমাকে আনন্দিত করল। এখন যুদ্ধ কি করে শুরু হল তার সরকারী বয়ানকে দলিলের দ্বারা সমর্থন করতে হল। আর যেহেতু দলিলের সরকারী কাহিনীর মিল ছিল না, তাই তাদের কাটাছেঁড়া করতে হল।

জার সরকারের গোপন দলিলের সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক প্রকাশনায় জার সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক প্রচারের উপকরণ তৈরী করা, তার মিথ্যার কারখানার আবরণ তুলে ধরে প্রাক্‌যুদ্ধ সংকটে রাশিয়ার নীতির অবস্থাটা তুলে ধরল।

এটা যুক্তিসঙ্গত যে, "জার্মানি কোন রকমেই যুদ্ধ চায় নি" এই ভাব প্রকাশক দলিলগুলিকে অত্যন্ত ভালভাবে গোপন করতে হল। অস্ট্রো-সার্বিয় সংঘাতকে সীমাবদ্ধ করার বিভিন্ন জার্মান প্রস্তাব কেন প্রত্যাখ্যাত হল তার

ইংগিতের সম্ভাবনাময় প্রকৃত কারণগুলিকেও গোপন করতে হল। সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটা প্রমাণ করা দরকারী ছিল যে, "জার্মানির পরিস্থিতি পরিচালনার লক্ষ্য ছিল রাশিয়া ও ফ্রান্সকে বিভক্ত করা, ফ্রান্সকে পিতার্সবার্গে প্রতিনিধি পাঠানোর বাধ্য করা এবং আমাদের চোখে এইভাবে ঐক্যের আপস মীমাংসা করা এবং যদি যুদ্ধ ঘটে তাহলে দোষটা জার্মানির উপরে না চাপিয়ে······রাশিয়া ও ফ্রান্সের উপরে চাপানো।"

ফরাসী সরকার যে ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা বাড়াবার জন্য জার্মানদের যৌথ মধ্যস্থতার প্রস্তাবের উত্তর দিতে দেরী করেছিল, এ তথ্য স্বভাবতঃই গোপন করা হয়েছিল। ইজভোলস্কির খোলা প্রতিবেদনকে চাপা দেওয়ার জন্য আরো কিছু মুছে দেওয়া দরকার ছিল। ইজভোলস্কি পিতাসবার্গকে লিখলেন, "বিচারমন্ত্রী [বিয়েনভেনু-মার্টিন, যিনি বৈদেশিক মন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন—*এ. ওয়াই.*] ও তার সহযোগিরা কতদূর পর্যন্ত পরিস্থিতিটা আয়ত্ত করেছেন, আমাদের প্রতিটি সাহায্য দিতে তারা কতটা দৃঢ় ও শান্তভাবে মনঃস্থির করেছেন এবং আমাদের সংগে এতটকুও পার্থক্য না রাখার জন্য তারা কতটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাই দেখে আমি বিস্মিত।"

ফরাসী সরকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাশিয়াকে যুদ্ধে টেনে এনেছেন, এই ঘটনার ইংগিত এড়ানোর জন্য যথেষ্ট কাটা ছেঁড়া করার পর দলিলগুলি প্রকাশিত হল। প্যারিতে রুশ দূত ইজভোলস্কিকে এই ফরাসী মনোভাব আনন্দিত করেছিল, যিনি এইভাবে তাঁর পদের দীর্ঘ সময়ের কাজের ফল পেয়েছিলেন। তিনি পরে বলেছিলেন, "এটা আমার যুদ্ধ।"

ফ্রান্সের ভূমিকাকে গোপন করতে হয়েছিল, কারণ একে তো সে রাশিয়ার বন্ধু, উপরন্তু রাশিয়ার নিজের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবহারের যথার্থতা প্রমাণের জন্যও বটে। ঘটনাবলী সময়ক্রম ও উল্টোপাল্টা করা হয়েছিল বিশেষতঃ সাধারণ সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে। কার্যতঃ রাশিয়ার যে সৈন্য চালনার ফলে জার্মানিতেও সৈন্য চালনা ঘটেছিল সেটা অস্ট্রিয়া-হাংগেরীর সাধারণ সৈন্য চালনাকে অনুসরণ করেছিল বলে আত্মরক্ষামূলক ছিল। এটা দলিলের দ্বারা প্রমাণ করার দরকার ছিল। সাজোনভ তার করেছিলেন, "অস্ট্রিয়া আটটি সৈন্যবাহিনী পাঠানোর পরে আমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম।" শেষের দুটি কথা—"আটটি সৈন্যবাহিনী" মুছে দেওয়া হয়েছিল এই ধারণা সৃষ্টির জন্য যে, অস্ট্রিয়ার সাধারণ সৈন্য চালনার উত্তরে রাশিয়া তার সৈন্য পাঠিয়েছিল। এর যুক্তি প্রমাণের জন্য এবং পাতি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের প্রভাবিত করার জন্য জার সরকার এই ইংগিত দিয়ে একটা তারবার্তা প্রকাশ করলেন যে, "যে অস্ট্রিয়ার মনোভাবে একটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে পারে, তাকে Jauresও অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। কিন্তু ফরাসী শ্রমিকদের যুদ্ধ বিরোধী প্রদর্শন এবং যুদ্ধ

যে আত্মরক্ষামূলক এটা ফরাসী বিপ্লবী শ্রমিকদের "বোঝানোর" জন্য ফরাসী সরকারের ব্যবস্থার উল্লেখ এতে নেই।

ফরাসীদের প্রকৃত ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য জার সরকার কতদূর চেষ্টা করেছিলেন, তার উদাহরণ এখানে পাওয়া যাবে। ১লা আগস্টে পিতার্সবার্গে ইজভোলস্কি খবর পাঠিয়েছিলেন, "গত রাতে অস্ট্রিয় দূত দুবার ভিভিয়ানির (ফরাসী প্রধানমন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করেছিলেন......এবং তাঁকে বলেছেন যে, সার্বিয়ার আঞ্চলিক ঐক্য বিনষ্ট করার কোন ইচ্ছা অস্ট্রিয়ার ছিল না এবং সার্বিয়ার সংগে তার যুদ্ধের বিষয়ে সে অন্যান্য শক্তির সংগে আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিল। "আজ, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জার্মান দূত ভিভিয়ানির সংগে দেখা করেছিলেন, যে ভিভিয়ানি ফরাসী জার্মান সম্বন্ধের ক্ষেত্রে জার্মানদের অন্যায় মনোভাব সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। যখন দূত বললেন যে, অস্ট্রিয়া ও জার্মানির প্রকাশ্যভাবে পরিচালিত রাশিয়ার স্থল ও নৌ বাহিনীর সাধারণ সৈন্যচালনার পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানি সাহসী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল, তখন ভিভিয়ানি উত্তর দিলেন যে তিনি যতদূর জানেন কোন নৌ সৈন্যচালনা ঘটে নি। এতে দূত ধাঁধায় পড়ে গেলেন। দীর্ঘ আলোচনার শেষে Baron Schoen ফরাসী মনোভাবের ঘোষণা ও চলে যাবেন বলে তাঁর হুমকি দেখানোর দাবী আবার জানাবেন এবং আজ সন্ধ্যে ৬টায় আবার ভিভিয়ানির সংগে দেখা করতে চাইলেন। আজ জার্মান দূতের আলোচনা সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও, ফরাসী সীমান্তে জার্মান সামরিক প্রস্তুতিতে ফরাসী সরকার উদ্বিগ্ন, তাঁদের বিশ্বাস যে তথাকথিত Kriegszustand-এর আবরণের আড়ালে সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী রয়েছে যা ফরাসী বাহিনীকে অসুবিধায় ফেলছে। অন্যদিকে ইটালী এবং বিশেষতঃ বৃটেন সংক্রান্ত রাজনৈতিক কারণে ফ্রান্স জার্মানদের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করতে পারে না। জার্মানির সৈন্য চালনার উত্তরে ফরাসী সৈন্যও অবশ্য চালিত হওয়া দরকার। ঠিক এই মুহূর্তে Palais de l'Elysee তে মন্ত্রীপরিষদে এই বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ পরিষদ সাধারণ সৈন্য চালনার সিদ্ধান্ত নেবে।"

এই উল্লিখিত কথাগুলি Orange Book-এ বাদ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছিল। যে জার সরকারের বয়ান দ্রুত ফ্রান্স ধার নিয়েছিল, সেই জার সরকার ঠিক এইটিই চাইছিল।

মোটামুটিভাবে, মৈত্রীচুক্তির সরকারগুলি পরস্পরের বক্তব্যকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে নি। তারা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে দলিলের উপকরণ প্রকাশ এবং পরিবর্তন করে নি। তারা নোটগুলি তুলনা করে পরস্পরের কাজ সহজ করে দিয়েছিল এবং উপরন্তু, পারস্পরিক পরীক্ষার এক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটা শুধু বিশ্বস্ততা মাত্র নয়। কি ভাবে যুদ্ধ শুরু হল সে বিষয়ে তাদের নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার দরকার ছিল, কিন্তু তাদের বন্ধুদের বক্তব্যের

সংগে তাদের বক্তব্যকে মেলানোর প্রয়োজনও কম ছিল না, কারণ যে কোন বৈষম্যমূলক উপাদান তাদের ও তাদের কূটনীতিকে অপদস্থ করতে পারত।

জারের বৈদেশিক দপ্তরের দলিল সংগ্রহে কয়েকটি প্রতারণায় সহযোগিতার বিষয়ে জার ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে বিনিময়ের স্পষ্ট প্রমাণ দেখেছিলাম। যে বৃটিশ সরকার যুদ্ধের পূর্বে পারস্যে ইঙ্গ-রুশ সম্বন্ধ নিয়ে কিছু দলিল প্রকাশ করতে চেয়েছিল, তারা রুশ সম্মতি চেয়েছিল এবং সেগুলো তারা মুছে দিতে চায়, সেগুলোর বিষয়ে পিতার্সবার্গকে জানিয়েছিল। জার সরকার রাজী হয়ে আদেশ জারী করেছিল যে, বৈদেশিক কার্যালয়ের দ্বিধা এড়াতে যে কোন রুশ প্রকাশনায় বৃটিশ পরিবর্তনগুলি গণ্য হবে।

৪

স্বভাবতঃই এর ফলে দলিলের প্রকাশ জটিল হয়ে পড়ল। অতএব বেশ কিছু সময় বাদ দিয়ে ফরাসী সরকার তাদের *হলুদ পুস্তক* প্রকাশ করল। ফরাসী অফিসাররা বললেন দেরীর কারণ হল তাদের প্রকাশনায় সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি প্রকাশ করা। কিন্তু আরো সম্ভাব্য হল, দলিলগুলি বদলাতেই শুধু তাদের অনেক সময় লেগেছে এবং অধিকন্তু, যে সব দলিলের আদৌ অস্তিত্বই ছিল না, সেগুলি তৈরী করতেও সময় লেগেছে।

অস্ট্রো-সার্বিয় সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ফ্রান্স যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং সমরবাদী জার্মানীর ভীতি প্রদর্শন ও রাশিয়ার ওপরে জার্মানির আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে তার বন্ধু জারতন্ত্রী রাশিয়ার প্রতি কর্তব্য করতে বাধ্য হয়েছে, এটা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য ছিল।

এই বক্তব্যকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য এবং জার্মানিকেই একমাত্র যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য, ঠিক প্রাকযুদ্ধ কালীন ঘটনার আলোচনাকারী *হলুদ পুস্তক* অন্যান্য "রঙীন বই"-এর বিপরীতে ১৯১৩-র গোড়ার দিকের দলিল নিয়ে শুরু হয়েছে। জার্মানির আক্রমণাত্মক মনোভাব ও দীর্ঘকালের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখানোই ছিল দলিলগুলির উদ্দেশ্য। যদি ফরাসী ও রুশ নৌকর্মচারীদের যৌথ আলোচনার খুঁটিনাটি দিয়ে শুরু হত, তাহলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্যরকম হ'ত। এইজন্য, ঐতিহাসিক প্রসংগগুলি খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দলিল চেপে রাখা ছাড়াও ফরাসী সরকার আরো সূক্ষ্ম, অন্য উপায় অবলম্বন করেছিল। যেমন, ১৯১৪-র ৩০শে জুলাই তারিখের তারবার্তা, *হলুদ পুস্তক*-এর তালিকায় যার নম্বর ১০৬, তাতে গ্রে-কে ফরাসী ও জার্মান যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর এমনভাবে জানানো হচ্ছে যাতে দেখা যায় ফরাসী সরকার "রাশিয়ার মতই, আক্রমণের জন্য দায়ী নয়।" বার্তাটিতে বলা হয়েছে, লণ্ডনে ফরাসী দূত Paul Cambon-এর মাধ্যমে ফরাসী প্রধান

মন্ত্রী Rene Viviany পাঠিয়েছিলেন। তবুও এটা এখন নিশ্চিতরূপে বোঝা গেছে যে, এটা আসলে দুটো আলাদা দলিলের জোড়াতালি ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু অনেক বাদ- পরিবর্তন ও সরাসরি মিথ্যাচারিতা করা হয়েছে, যার সাধারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উদাহরণে দেখানো যেতে পারে। প্রকাশ্যে বিলম্বিত ও আত্মরক্ষামূলক ফরাসী ব্যবস্থা বোঝাতে গিয়ে, যাকে তারা প্রতিব্যবস্থা বলেছে, দলিলে বলা হয়েছে, যে "মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই" ফ্রান্সে রেল স্টেশনগুলি সামরিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল, ওদিকে বিশ্বস্ত দলিলে বলা হয়েছে "রবিবার" যাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ফরাসী রেলপথ সামরিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে জুলাই ২৬শে।

জার সরকারের বয়ান অনুযায়ী ফরাসী নীতি নির্ধারকরা সৈন্য চালনার সময় চাকতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েছিল। যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করতে গিয়ে Poincare' ১৯১৪-র ১লা আগস্ট সকালে প্যারিতে বৃটিশ দূত বার্টিকে জানালেন যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর .সাধারণ সৈন্যচালনার কথা ঘোষণা করেছে। এই দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ১৯১৪-র ৩১শে জুলাই প্রেরিত ভিয়েনার ফরাসী দূতের তারবার্তা নিম্নলিখিত কৌশল করা হল: দূতের যে কথাগুলি ছিল,"অস্ট্রো-হাঙ্গেরীও সরকার কর্তৃক ১৯ থেকে ৪২ বছর বয়স্ক সব পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সৈন্যচালনা ঘোষিত হয়েছে, তার পরে "আজ সকালে" কথা-গুলি যোগ করা হল, আর বাকী অংশ যা ফরাসী সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর, তা সোজা মুছে দেওয়া হল। ফরাসী সরকার তার প্রচারলক্ষ্যে পৌঁছতে এতটুকুও ত্রুটি করল না। যখনই কাম্য উপকরণ পাওয়া যায় নি, তখনই তা তৈরী করা হয়েছে। ৩১শে জুলাই তারিখের পিতার্সবার্গের ফরাসী দূতের যে সংক্ষিপ্ত তারবার্তা ছিল, "রুশ সৈন্যবাহিনীর সাধারণ সমরসজ্জার আদেশ দেওয়া হয়েছে" সেটা এইভাবে প্রকাশিত হল: অস্ট্রিয়ার সাধারণ সমরসজ্জা ও গত ছ' দিনে জার্মানীর গোপন সমরসজ্জার কারণে, সম্পূর্ণ পরাজয়ের ঝুঁকি এড়াতে রুশ বাহিনীর সামগ্রিক সমরসজ্জার আদেশজারী করা হয়েছে: প্রকৃত-পক্ষে ইতিমধ্যেই জার্মানী যে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, রাশিয়াও সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জার্মানী অস্ত্রসজ্জা করেছে জেনে অনিবার্য সামরিক কারণে রুশ সরকার তার আংশিক সমরসজ্জাকে সামরিক সমরসজ্জায় পরি-বর্তিত করতে দেরী করতে পারে নি।"

বাকী কথাগুলি Mourice Palcologue-এর তারবার্তায় ছিল না এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ফরাসী মন্ত্রীসভার বৈদেশিক বিষয়ের দ্বারা এই কথাগুলি রচিত হয়েছে।

৫

অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠীর সরকারগুলির সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য গোপন করতে তাদের আক্রমণের আত্মরক্ষামূলক দিকের বিষয়ে তাদের বাহ্যিক বয়ানকে দলিলের দ্বারা সমর্থনের জন্য এতটুকুও কম উদ্বিগ্ন ছিল না (মৈত্রী চুক্তির সরকারগুলির তুলনায়)। কিন্তু অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠীর বিপরীতে মৈত্রীচুক্তির শক্তিরা আরো কম লোকের সংগে সংগ্রামের দাবী জানাল। তাদের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে তারা "ক্ষুদ্র সার্বিয়া"কে এবং হুনদের দ্বারা আক্রান্ত "ক্ষুদ্র সহায়হীন বেলজিয়াম"-কে রক্ষার জন্য গল্প তৈরী করল।

লেনিন যুদ্ধের প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়ার যুদ্ধে শুধু জাতীয় উপাদান উপস্থিত হয়েছে।[১] অবশ্য তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, "এটা একটা সম্পূর্ণ গৌণ প্রয়োজন এবং এটা যুদ্ধের সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে প্রভাবিত করে নি।"

সার্বিয়ার রাজতন্ত্রী সরকার প্রকৃতই মৈত্রীচুক্তির সরকারগুলি কর্তৃক পরিচালিত সরকারী বয়ানগুলিকে সমর্থন করতে আগ্রহী ছিল।

১৯১৪-র ৮ই নভেম্বরে সার্বিয়া *নীল পুস্তক* নামে দলিলের এক সংগ্রহ প্রকাশ করল, যার উদ্দেশ্য ছিল শুধু সার্বিয় সরকারের শান্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করাই নয়, সারাজেভো হত্যার বিষয়ে নির্দোষিতা প্রমাণ করাও বটে। সরলতার ভানের দিক দিয়ে অন্যান্য "রঙীন বই"-এর সার্বিয় প্রকাশনার পদ্ধতি ছিল আলাদা। পিতার্সবার্গ ও বেলগ্রেডের মধ্যে ফলপ্রসূ চিঠিপত্র থেকে সার্বিয় সরকার সবচেয়ে কমসংখ্যক প্রতিশ্রুতিবিহীন দলিল প্রকাশ করা উপযুক্ত মনে করলেন। সমস্ত রাজনৈতিক গুরুত্ব এমনভাবে উপস্থিত করা হল যাতে সার্বিয়া ও জারতন্ত্রী রাশিয়া সম্পূর্ণরূপে আপস-ইচ্ছুক প্রমাণিত হয়। অফিসারদের এক গোপন সমিতি Black Hand-এর দ্বারা পরিচালিত সারাজেভো হত্যার বিষয়টিও স্বভাবতঃই এড়িয়ে যাওয়া হল।

অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠী সার্বিয়ান ও বেলজিয়ান বইগুলি অবজ্ঞা করতে পারল না। ১৯১৫ অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সরকার এক *লাল পুস্তক* প্রকাশ করল, সার্বিয়ার প্রতি অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে প্রকাশিত অভিযোগগুলিকে সমর্থনকারী দলিলের সংগ্রহ এটি (বিশেষত: Narodna Odbrana-র কার্যকলাপসংক্রান্ত) লাল বই আরো একটি সাধারণ আকারের Grey Book-এ বেলজিয়ান সরকার বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা বজায় রাখায় ফ্রান্সের বাহ্যিক তৎপরতা দেখবার চেষ্টা করল, তার দ্বারা এই প্রমাণ করল যে, আন্তর্জাতিক নিয়মভঙ্গের অপরাধে জার্মানি একাই দায়ী।

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২১, পৃঃ ১৩৫।

প্রমাণ করতে চাইল যে, "সার্বিয়ার সমরসজ্জার" (৩৯নং) আগে পর্যন্ত অস্ট্রিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নি, সামগ্রিক সমরসজ্জার (৪২নং) রাশিয়া প্রথম শুরু করেছিল এবং সংক্ষেপে "রাশিয়া…জার্মানী আক্রমণ করেছিল।"

বিভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য একই পথ অবলম্বন করা হয়েছিল এবং একই যুক্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়বস্তুকে সমর্থন করা হয়েছিল।

১৯১৫-র মে মাসে যখন ইতালী তার পূর্বের মিত্রদের বিপক্ষে মৈত্রীচুক্তির হয়ে যুদ্ধে যোগদান করল, তখন ইতালীও *সবুজ পুস্তক* নামে এক দলিল সংগ্রহে তার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করল। মাত্র ৭৭টি দলিলের এই ছোট সংগ্রহ দুই শক্তিগোষ্ঠীর অন্যান্য সব "রঙীন বই"-এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এটা আরো পক্ষপাতপূর্ণ। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও জার্মানীর সংগে ইতালীর সম্পর্কসংক্রান্ত দলিল ছাড়া আর কিছু গৃহীত হয় নি। প্রথমতঃ ইতালীর সংগে পরামর্শ না করে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ত্রিশটি চুক্তির শর্ত ভংগ করেছে এবং দ্বিতীয়তঃ ইতালী যে আঞ্চলিক ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল তা তাকে না দেওয়ার জন্য অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী এবং জার্মানী ইতালীকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য—এই দুটি বিষয় প্রমাণ করার ইচ্ছার দ্বারা দলিলের নির্বাচন করা হয়েছিল।

যে দলিলে দেখা যায় যে শতাব্দীর শুরুতে যখন ইটালী অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় গোষ্ঠীর সদস্য তখন ফ্রান্সের সংগে তার এক গোপন নিরপেক্ষতা চুক্তি হয়েছিল সেই দলিলগুলি ইটালী সরকার উল্লেখ করেনি। উপরন্তু, মৈত্রী শক্তির সংগে তার ফলপ্রসূ আলোচনার কথাও সে গোপন করেছে। দুই সামরিক গোষ্ঠীর শক্তিকে লেখা ইতালীর চিঠিপত্রের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যেত যে, ইটালীর শাসকরা নিপেক্ষতার আড়ালে আঞ্চলিক জবরদস্তির এক চতুর কূটনৈতিক খেলা খেলেছিলেন। সর্বেসর্বা *সবুজ পুস্তক*-এর উদ্দেশ্য ছিল ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত বিজয়ের ইচ্ছাকে গোপন রাখা, যে ইচ্ছার ফলে ইটালীর জনগণকে মৈত্রী শক্তির হয়ে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিবদমান দেশগুলির শাসক শ্রেণীরা, সশস্ত্র সংঘর্ষ আত্মরক্ষামূলক, এই দাবীর আড়ালে তাদের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির গোপন কূটনীতি নিয়মমত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং পৃথিবীর পুনর্বিভাগে প্রস্তুতি শুরু হওয়া পর্যন্ত তাদের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। লেনিন ১৯১৬ সালে লিখেছিলেন: "ওরা [বুর্জোয়া সরকারগুলি—*এ. ওয়াই.*] মিত্রদের সংগে ও মিত্রদের বিরুদ্ধে পরস্পর *গোপন চুক্তির* জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর এইসব চুক্তির বিষয়বস্তু আকস্মিক

নয়, বিদ্বেষপ্রসূত নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতির গতিবৃদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"

তারা যে ক্রমশঃ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সেটা সাম্রাজ্যবাদীরা, অদের সরকাররা ও তাদের ঐতিহাসিকরা আদৌ জনগণের কাছে প্রকাশ করতে চায় নি। যুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। জনসাধারণকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, যুদ্ধ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক, পবিত্র যুদ্ধ।

সাম্রাজ্যবাদী গল্প তৈরী হল এবং তার রচয়িতা হলেন সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিকরা। যে "রঙীন বইগুলি"তে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও পরিবর্তিত উপাদান ছিল, সেই বইগুলির দ্বারা রাজনৈতিক উপকথার তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল। সে সময়ে যুদ্ধের পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ করা এবং শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করা ছিল অপরাধ। কেন এবং কিভাবে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল, তার সরকারী ধারণাকে বাধ্যতামূলক বিশ্বাসে পরিণত করা হল সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় যারা এইভাবে শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধকে সমর্থন করল।

যখন সব বিবদমান দেশে এক জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল যার ফলে তারা বিভিন্ন সরকারের সরকারী বয়ান ও সমাজতান্ত্রিক-দেশাত্মবোধক দলের মিথ্যা যুক্তির মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য সাহস করে চেঁচিয়েছিল। লেনিন লিখেছিলেন, "গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যে, ঠিক এই যুদ্ধটিই বিবদমান দেশগুলি নিয়মগতভাবে প্রস্তুত করছিল। সমাজতান্ত্রিকদের কৌশল বুঝতে গেলে কোন দল প্রথম সামরিক আঘাত হেনেছিল বা প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল সে প্রশ্ন অবান্তর। পিতৃভূমি রক্ষা, শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ, আত্মরক্ষার যুদ্ধ ইত্যাদি দুপক্ষের বাঁধা বুলি লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

"রঙীন বইগুলি" বিরাট জুয়াচুরির অংশ। যত নতুন নির্বাচিত দলিলই ছাপা হোক, অথবা যত নিপুণ যুক্তিতেই তা পূর্ণ হোক না কেন, একটিও টিঁকে থাকে নি। ইতিহাস দেখিয়েছে যে বিভিন্ন সরকারী বয়ান সম্পূর্ণ আপাত সত্য ও ফলতঃ বুর্জোয়া ইতিহাস যে সেগুলিকে পরিবর্তিত করে, বক্তব্য সহযোগে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। ১৯১৪-র জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততায় আত্মসমর্পণের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলি কঠোর মূল্য দিয়েছে।

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২১, পৃঃ ১৫৯।

এর দ্বারা ইতিহাস প্রমাণ করেছে লেনিন সব কিছুর সার কথা কত গভীর ভাবে বুঝেছিলেন এবং সংঘর্ষের সাম্রাজ্যবাদী দিককে চাপা দিয়েছিল যে মিথ্যা সেটা যখন খুলে ধরেছিলেন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন, তখন তিনি কতদূর দেখেছিলেন। ঐতিহাসিকের কাছে এই নিদর্শন তার সমসাময়িকদের প্রতি বৈজ্ঞানিক, নৈতিক দায়িত্বের স্মারক হয়ে থাকুক।

১৯৩২

১৯১৮-র আত্মসমর্পণ

আত্মসমর্পণের যৌথ চুক্তি সহ যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করে ১৯১৮-র ১১ই নভেম্বর ভোর পাঁচটায় Compiegne এ মার্শাল ফকের রেলওয়ে কোচ থেকে Matthias Erzberger-এর নেতৃত্বে জার্মান নাগরিক ও সামরিক প্রতিনিধিরা বেরিয়ে এলেন। ছ ঘণ্টা পরে বন্দুকগুলি নীরব হল। বিজয়ী জাতিরা আনন্দিত হল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। জার্মানিতে এক বিপ্লব দেখা দিল। ৮ই নভেম্বরের রাতে কাইজার হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন এবং তাঁর জেনারেলরা গোপন জায়গায় লুকোলেন।

অধিকাংশ লোকের কাছেই যুদ্ধ অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হল। যখন ১৯১৪-র আগস্টে ইউরোপে বন্দুকের গর্জন শুরু হল তখন যুদ্ধ কতদিন চলবে তা কারুর ধারণাই ছিল না। এ কথা সত্য যে, জার্মানীতে ট্রেঞ্চে গমনোদ্যত সৈন্যদের বলা হয়েছিল তারা শীঘ্রই বাড়ী আসবে। এটা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ছিল না বরং যুক্তিযুক্ত ধারণা ছিল। জার্মানীর সামরিক নেতারা বিশ্বাস করেছিলেন যে, দ্রুত যুদ্ধের ধারণাভিত্তিক Schlieffen-Moltke পরিকল্পনার গতিতে ঘটনা ঘটবে, এক আঘাতে ফ্রান্স পদানত হবে তারপর রাশিয়া এবং ফলে সমুদ্র শাসক বৃটেন প্রধান মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। শত্রুদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এইভাবে দুই সীমান্তে যুদ্ধ এড়ানোর যে জার্মান কূটনীতি বিসমার্কের সময় থেকে ব্যর্থ হয়েছে, তার দুর্দৈবের প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল জার্মান যুদ্ধ কৌশল। এই উদ্দেশ্য অবাস্তব হয়েছিল : জার্মান সামরিক শক্তি তাদের শত্রুদের এক এক করে ধ্বংস করার সুযোগ পেল না। তা ছাড়া বিশ্ব আধিপত্যের ঝোঁকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা মহাদেশে সব বৃহৎ শক্তির বিরোধিতা করল। মৈত্রী চুক্তির কর্তারা, যে অন্য সাম্রাজ্যবাদী যুক্তদল বিশাল অর্থনৈতিক ও জনশক্তির উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তারা সমান উন্মত্তভাবে পৃথিবীর পুনর্বিভাগের চেষ্টা করছিল।

এই পরিস্থিতিতে জার্মানি কিভাবে জয়ী হতে পারত? যুদ্ধ শুরু হওয়ার

ছ'দিন পরে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, Schieffen-Moltke পরিকল্পনা ভেঙে গেছে। যাই হোক ঐ পরিকল্পনার যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে জার্মান অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে এবং নিজেদের যুদ্ধবিদ্যার পাণ্ডিত্যে গর্বিত হয়ে জার্মান জেনারেলরা মনে করলেন যে, দ্রুত যুদ্ধ যদি ব্যর্থ হয় তা হলে তারা বিলম্বিত যুদ্ধে জয়ী হবেন। দু' বছর চলে গেল। ১৯১৬ সালে জার্মানরা সাফল্যে পৌঁছতে পারল না। Verdux-এ দুর্বল জার্মান পশ্চিমী সৈন্যরা Somme-এ শক্তিশালী ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণে মার খেল এবং পূর্বে গ্যালিসিয়ায় রুশ আক্রমণ জার্মানদের ও তাদের বন্ধুদের যুদ্ধ পরিস্থিতি বিপজ্জনক করে তুলল। আবার নানা "শান্তি" আলোচনার দ্বারা মিত্রতাবদ্ধ শক্তিগুলিকে বিভক্ত করার জন্য জার্মান কূটনীতি পুনরায় শুরু হল।

যদিও তাদের আসল যুদ্ধ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছিল এবং যুদ্ধ চলছিল, তবুও এ ব্যাপারটা জার্মানীর শাসকদের কখনো মনে হয় নি, যে কার্যতঃ তারা হেরে গেছে। যেহেতু জার্মান সৈন্যবাহিনী পূর্ব, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বিশাল অঞ্চল অধিকার করেছে সেইহেতু আরো তাদের মনে হয় নি। তাদের জয়ের বিশ্বাস দৃঢ় হল যখন কোয়ার্টার মাস্টার-জেনারেল লুডেন্ডর্ফের সংগে তার চীফ অফ স্টাফ হিসাবে সর্বোচ্চ আধিপত্য পেলেন ফিল্ড-মার্শাল ফন হিণ্ডেনবুর্গ। সেই সময়ে নিঃসন্দেহে অন্যতম সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন যোদ্ধা লুডেনডর্ফ ছিলেন নিষ্ঠুর, অধ্যবসায়ী ও স্বেচ্ছাচারী, পরিকল্পনায় স্থির এবং দ্বন্দ্বে ক্রুদ্ধ, তিনি পরে স্বীকার করেছিলেন যে, তার কাছে যুদ্ধটা ছিল "উদ্দেশ্যহীন বিকৃত খেলা," আমরা বলতে পারি, যে খেলায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব শাসনের নামে লক্ষ লক্ষ জীবনের বলী হয়েছিল।

১৯১৭-র সেপ্টেম্বরে লুডেনডর্ফ ঘোষণা করলেন যে, জার্মানী শুধু পূর্বে ও পশ্চিমে ইতিমধ্যে আধিকৃত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি, পোল্যাণ্ড, উক্রাইনের একটা বড় অংশ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং "সমুদ্রের ওপারে আমেরিকা ও আফ্রিকার সমর্থনক্ষেত্র এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে নৌ ঘাঁটি" চাইলেন। জার্মানীর অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থা যা ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আর একটা যুদ্ধ সম্ভব করে তুলবে" তা তিনি নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

অতএব আমরা দেখছি একটি যুদ্ধের তুঙ্গে পৌঁছে জার্মান অধিনায়ক আর একটি যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছে। নিশ্চয়ই এটা কোয়ার্টার মাস্টার-জেনারেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনের দ্বারা সৃষ্ট নয়। শতাব্দীর শুরু থেকেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিকল্পনা পুষ্ট হয়েছে, বিশেষতঃ বিশ্বযুদ্ধের আগে ও শুরুতে এবং ইউরোপ বিজয় ছাড়াও এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশিয়ানিয়ায় বিশাল ঔপনিবেশিক অধিকারের কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল। সংক্ষেপে, বর্তমান

এবং ভবিষ্যৎকে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক শাসকরা বিশ্ব আধিপত্যের এক ক্রমপ্রসারমান উদ্যম বলে মনে করেছিলেন।

মহাদেশে এবং সমুদ্রে জার্মান অস্ত্রের সাফল্য এত স্পষ্ট হয়েছিল যে, শত্রুরা হতাশ হয়েছিল। নিষ্ঠুর জার্মান সাবমেরিন যুদ্ধ প্রথম দিকে সফল হয়েছিল, কিন্তু এই যুদ্ধ ব্রিটেনকে পর্যুদস্ত করতে ব্যর্থ হল। যখন ব্রিটিশ নৌশক্তি জাতীয় বাণিজ্য জাহাজকে রক্ষা করতে লাগল, তখন সাবমেরিনগুলির আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেল। অন্যদিকে, জার্মান কূটনীতির প্ররোচনামূলক আচরণসহযোগে জার্মানী দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের সংগে যুদ্ধ শুরু করল।

রাশিয়াতে ১৯১৭-র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের বিরাট পরাজয় এবং এই বিপ্লব আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নতুন চেহারা দিল। জার্মানীর নাগরিক ও সামরিক নেতারা বুঝলেন না ও বুঝতে পারলেন না যে, একটা নতুন যুগ, শুরু হয়েছে। নিজেদের সামরিক সাফল্যে অন্ধ হয়ে তারা রাশিয়ার বিশাল অঞ্চল অধিকার করতে এবং ইংগ-ফরাসী সৈন্যদলকে ধ্বংস করার আশায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে তাদের সৈন্যের একটা বড় অংশকে স্থানান্তরের জন্য দস্যু Brest সন্ধিকে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছিল, কিন্তু ফলাফল তখনো অস্পষ্ট। ইউরোপে বিশাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে জার্মান গোষ্ঠী—বেলজিয়াম, ফ্রান্সের অংশ, উত্তর ইতালীর অংশ, বলকান দেশগুলি এবং বিশেষভাবে পূর্বে বিশাল অংশ: পোল্যাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি, উক্রাইন এবং রাশিয়ার অংশ। জার্মানী যে আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে তার উপনিবেশ হারিয়েছিল এটা সত্য, কিন্তু তুলাদণ্ডে তার ওজন খুব বেশী নয়। দ্রুত শেষ ঘনিয়ে আসছিল দাঁড়ি-পাল্লা জার্মানীর দিকে হেলে যাওয়ার সংগে সংগে তবুও তার মিত্ররা—বুলগেরিয়া এবং তুরস্ক এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীও বিশ্বাস হারাতে শুরু করে প্রত্যেকে অচলাবস্থা থেকে মুক্তি খুঁজছিল। জার্মানীর শাসকরা তখনো বর্ণনা দিচ্ছিল কিভাবে তারা পৃথিবীর মানচিত্রকে নতুন করে গড়বে, কিন্তু তারাও তাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনার সম্ভাব্যতায় সন্দেহ করতে শুরু করছিল।

শেষ মরিয়া আঘাত হানবার জার্মান সিদ্ধান্ত ১৯১৭-১৮-র শীতে পাকা হল। জার্মান সৈন্যবাহিনীর শক্তি ও পূর্বের জয় এই সিদ্ধান্তের উৎস নয়। বরং জার্মান জেনারেল বুঝতে শুরু করেছিল যে তাদের যুদ্ধযন্ত্র শক্তি হারাচ্ছে। সে যন্ত্র অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। কম্যাণ্ডকে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। অভিজ্ঞ অফিসারদের কমতি ছিল সাংঘাতিক। যুদ্ধের কাঁচামালের সঞ্চয় কমে যাচ্ছিল, আর নতুন "আমদানী" মাঝের ফাঁক ভরাতে পারছিল না। বড় বড় কথা দিয়ে সব ঢাকা দেওয়া হচ্ছিল। জার্মানীর জনসাধারণ, মিত্ররা এবং সর্বোপরি, শত্রুরা

সন্দেহ করেনি যে, জার্মান শক্তি ক্ষয় পাচ্ছে এবং পরাজয়ের কীট ইতিমধ্যেই সশস্ত্র বাহিনীতে ঘুণ ধরিয়েছে।

শেষ বিজয় জার্মানীর মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। জার্মান কমাণ্ড সৈনাবাহিনীর অবস্থা ও তাকে জোরদার করার সম্ভাবনা পরীক্ষা করলেন। ভালমন্দ দুদিক বিবেচনা করার পর কমাণ্ড আত্মরক্ষার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলেন। লুডেনডর্ফ পরে বলেছিলেন, "আমরা আত্মরক্ষামূলক মনোভাব নিলে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তা প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করা ছাড়াও আমার ভয় হয়েছিল যে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, যাতে শত্রুরা নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে তার আঘাতকে জড়ো করার সুবিধা পায়, সেই যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের চেয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীর বেশী খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটাবে। আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষায় সৈন্যরা বেশী পীড়িত হয়·········আক্রমণ একটা প্রচণ্ড নৈতিক সাহস জোগায়, যেটা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে পারতাম না। আত্মরক্ষায় নিশ্চিত আমাদের সৈনাদের দুর্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়ত।"

ছাঁচ তৈরী হল। ছাঁচটা সবদিক দিয়েই আক্রমণের জন্য তৈরী হল। ১৯১৮-র জার্মান প্রচার সম্বন্ধে এক বইয়ে জেনারেল ফন কুাহল লিখেছিলেন, "আমাদের আর কোন উপায় ছিল না।" একদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসুবিধার সংগে জনশক্তি হ্রাস এবং অন্যদিকে মৈত্রীশক্তির ক্রম-প্রসারমান শক্তি বিশেষতঃ ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর অবির্ভাব জার্মান কমাণ্ডকে পশ্চিমে ও পূর্বে এক বৃহৎ আক্রমণে বাধ্য করেছিল। জার্মান নেতারা কাগজ কলমে হিসাব করলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী ১৯২০ সালের আগে ইউরোপে শক্তি একত্র করবে না এবং বিশাল রুশ অঞ্চল অধিকারের ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক দুই সুবিধাই পাওয়া যাবে। সে হিসাব ছিল বেপরোয়া দুঃসাহসীদের উন্মত্ত জুয়ার হিসাব। সমাধানের অতীত এক বৈষম্য জার্মানী কমাণ্ডের চোখ এড়িয়ে গেল : জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর বাস্তব উপাদান এবং জনশক্তি অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, যেগুলির পশ্চিমের নতুন আক্রমণে প্রয়োজন ছিল। তবুও প্রধান যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী অবতরণের পূর্বে লুডেনডর্ফ জয়ের জন্য যা ছিল সব পণ রাখতে মনঃস্থির করলেন। তিনি পরে লিখেছিলেন, "যদি আক্রমণ সফল হত, তাহলে ফলাফল হত বিরাট।"

ইংগ-ফরাসী কমাণ্ড জানত যে, লুডেনডর্ফ ১৯১৮-র বসন্তে একটা নতুন বড় আক্রমণের চেষ্টা করবেন কিন্তু কেউ সন্দেহ করে নি যে, সেইটা শেষ বড় জার্মান উদ্যম হবে। মিত্রদের সামরিক পরিস্থিতি ছিল বেশ খারাপ। বৃটিশ বাহিনী তখনো Passchendaele-এর বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারে নি, ফ্রান্সে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এবং গর্বিত Petain-র পুনর্গঠনের জালে তার সৈন্যরা জড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সব বৃটিশ ও ফরাসী আশা যুক্তরাষ্ট্রেই আবদ্ধ ছিল।

১৯১৭-র শেষে প্রেসিডেন্ট উইলসনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্ণেল এডেয়াডা হাউসের নেতৃত্বে এক আমেরিকান মিশন লণ্ডনে এল। লয়েড জর্জ তাকে বললেন যে, তার দেশ জার্মানদের হারাবার জন্য শেষ সম্বল দিয়ে দিচ্ছে। তিনি চেয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষিত ও সজ্জিত সর্বাধিক সংখ্যক লোক দিক। তিনি আরো চাইলেন যে, তখনো পর্যন্ত অচিন্তিত পরিধিতে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজী বাহিনী প্রসারিত হোক। উপরন্তু তিনি খাদ্য সরবরাহের দাবী জানালেন। কিন্তু সবচেয়ে আগে তিনি যা চেয়েছিলেন তাহল দ্রুততা। তিনি তখনকার পরিস্থিতিতে গম্ভীরভাবে বর্ণনা করেছিলেন পাছে আমেরিকানরা ভাবে যে তাদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার প্রচুর সময় আছে। তিনি বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী ইউরোপে ১৯১৮-য় বা ১৯১৯-এ আসুক সেটা দরকারী নয়, এর কম ভাবাটা ভুল। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যে কোন দেরী মৃত্যু ঘটাতে পারত।

কর্ণেল হাউস, যিনি ইউরোপের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানতেন, তাঁকে দুবার বলতে হল না। তিনি এক গোপন বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টকে জানালেন "যদি এই যুদ্ধ জিততে হয়, তাহলে মিত্রশক্তিদের মধ্যে আরো ভাল সহযোগিতা অবশ্যই চাই······কেন্দ্রীয় শক্তি ঠিক আছে, কারণ তাদের রসদ সম্পূর্ণ সরবরাহ হচ্ছে এবং সেটা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে। ব্যক্তিগতভাবে একজন জার্মান সৈনিক হয়ত একজন ইংরেজের মত দক্ষ নয়, কিন্তু জার্মান সামরিক ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের চেয়ে উন্নত।"

খুব অল্পলোক ভেবেছিলো যে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সমর্থ। যেমন জেনারেল পেত্যাঁ যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর চালনার খবরকে বলেছিলেন "আনুমানিক তথ্য।" তিনি ভাবেন নি যে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী ১৯১৮-য় কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ করবে। ফলে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, "ফরাসী বৃটিশ বাহিনীকে এমন সতর্কতায় চালনা করতে হবে যাতে ভাগ্যের সম্ভাব্য ভূমিকা ক্ষুদ্রতম হয়।" ১৯১৮-র ২৪শে জানুয়ারী Compiegne-এ তিনি নিশ্চিত শর্তে তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। সরকারী সূত্রানুযায়ী, "ফরাসী সর্বাধিনায়ক এ তথ্য গোপন করেন নি যে, তাঁর মতে, ১৯১৮-তে আক্রমণের পক্ষে মিত্র শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তাঁর মতে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী বিশাল না হলে ঘাটতি দেখা দেবে।" এতে বোঝা যায়, পৈত্যাঁ মিত্র শক্তির বল সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেছিলেন। শীঘ্র পৈত্যাঁ আরো বেশী হতাশায় ডুবে গেলেন। ৭৬ বছর বয়স্ক ফরাসী প্রধানমন্ত্রী Clemenceau "Verdun বীর"-এর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি Pointcare কে বললেন যে, পেত্যাঁর হতাশা তাঁকে বিরক্ত করেছে এবং জার্মানরা যে এক দারুণ যুদ্ধে বৃটিশদের ধ্বংস করতে পারে ও তারপর ফরাসীদের দমন করতে পারে পেত্যাঁর এই ভয়ে তিনি চটে উঠলেন।

আমরা যা দেখেছি, পেত্যাঁর মধ্যে কয়েক বছর আগে থেকেই আতংক দেখা দিয়েছিল।

অন্যান্য মিত্র শক্তির সামরিক নেতারা পেত্যাঁর মত ভয় পান নি কিন্তু ফক ছাড়া তাঁরাও সন্দিগ্ধ ছিলেন যে, ১৯১৮-র আক্রমণ জার্মানদের বিপর্যস্ত করবে। ১৯১৮-র ২১ শে জানুয়ারী ভার্সাইতে এক সম্মেলনে ফ্রান্স, বৃটেন ও ইটালীর পক্ষে যথাক্রমে ওয়েগ্যাঁ, উইলসন ও ক্যাডোর্না সিদ্ধান্ত করলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর প্রত্যাশিত আবির্ভাব সে বছরে জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়িপাল্লাকে হেলিয়ে দেবে না। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বন্দুক, এরোপ্লেন, ট্যাংক ইত্যাদির সরবরাহ ও অন্যদিকে শত্রুর ক্রমক্ষীয়মান প্রতিরোধ ১৯১৯-র কোন সময়ে শক্তি সাম্যকে উল্টে দেবে। স্বভাবতঃ এই ধারণা ১৯১৮-র প্রচারের প্রস্তুতিতে প্রতিক্রিয়া ঘটাল। পেত্যাঁ যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর আবির্ভাবকে বাধা দিয়ে কঠোর আত্মরক্ষামূলক কৌশলের আবেদন জানালেন। অন্যদিকে জেনারেল হেগ ১৯১৮-র বসন্তে আক্রমণের আহ্বান জানালেন, যদিও তিনি ভেবেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী তখনো ইউরোপের তীর থেকে দূরে থাকবে। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী, বিভিন্ন পরিকল্পনা, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, পরিকল্পনার অভাবের প্রমাণ। শত্রুর আক্রমণের প্রাক্কালে জেনারেল ওয়েগ্যাঁ উদ্বিগ্নভাবে লক্ষ্য করলেন ১৯১৮-র ২২শে জানুয়ারিতে যে, ১৯১৮-র যৌথ কাজের জন্য মিত্র শক্তির কোন সাধারণ পরি-কল্পনা নেই।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এইটি ফ্রান্স ও বৃটেনের সামরিক নেতাদের মধ্যে বর্তমান পার্থক্যের ফল। ফরাসী অধিনায়ক অভিযোগ করলেন যে, তাঁদের দেশ যুদ্ধের পুরো বোঝা বহন করছে আর বৃটেন অন্তত কম কষ্ট ভোগ করেছে। তাঁরা আরো অভিযোগ করলেন যে, সীমান্তের বৃহত্তর অংশে ফরাসী সৈন্যবাহিনী রয়েছে এবং দ্বীপে বসবাসকারী প্রচুর বৃটিশ সৈন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁরা দাবী করলেন যে, মহাদেশে বৃটিশ শক্তি বাড়াতে হবে।

১৯১৮-র বসন্তে জার্মান কম্যাণ্ড সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমে জোর আক্রমণের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল, লুডেনডর্ফ ভাবলেন যে এতে জার্মান গোষ্ঠীর ভাঙ্গন এড়ানো যাবে এবং শেষ বিজয় ঘটবে।

১৯১৮-র ১লা মার্চ জার্মান সৈন্য কিয়েভ অধিকার করল, বারো দিন পরে তারা ওডেসায় ঢুকল, ৮ই এপ্রিল খারকোভে, এপ্রিলের শেষে ক্রিমিয়ায় এবং মে-র শুরুতে রোস্তভ-অন-ডনে। প্রচণ্ড তৈল ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে (কারণ রুমানিয়া তেল প্রচণ্ড প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না) লুডেনডর্ফ বাকুতে যেতে বাধ্য হলেন। এর ফলে পূর্ব সীমান্তে কয়েক ডিভিশন জার্মান সৈন্য ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষতঃ রুশ, উক্রাইনীয়, বাইলোরুশ আর বাল্টিক জাতি-গুলি জার্মান আক্রমণকারীদের গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়ে তীব্র যুদ্ধ করছিল।

২১শে মার্চ জার্মান সৈন্য পশ্চিম সীমান্তে এক আক্রমণ শুরু করল। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গুণে তারা ভালই শুরু করল: ১৬৭টি বৃটিশ ও ফরাসী ডিভিসনের বিরুদ্ধে ১৯৭টি জার্মান ডিভিসন। যদিও দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত, তবুও জার্মানরা উৎসাহিত হল। আক্রমণের পূর্বে জেনারেল ফন কুাহল জার্মান সৈনাদের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন: ভীষণ শারীরিক কষ্ট, বেশী নৈতিক চাপ এবং দারুণ ক্লান্তি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সমস্ত বাহিনীতে একটি ইচ্ছা বিরাজ করছিল: ট্রেঞ্চ আর গোলার গর্ত থেকে বেরোতে হলে সবচেয়ে কঠিন আক্রমণও ভাল। "জার্মান সৈন্যেরা এই বিশ্বাস নিয়ে যুদ্ধে গেল যে, এই শেষ যুদ্ধ, তারা বলেছিল, "শান্তির উদ্দেশ্যে আক্রমণ।"

৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ চলল। জার্মান সাফল্য প্রতিষ্ঠিত। সৈনারা যথেষ্ট লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অসংখ্য সৈন্য বন্দী করে এগিয়ে চলল।

মিত্র পক্ষের শিবিরে প্রতিক্রিয়া ঘটানোর পক্ষে এ আঘাত অত্যন্ত বেশী। স্পষ্টতঃই জার্মান কম্যাণ্ড সীমান্ত ভেঙে দিতে ও বৃটিশ অঞ্চলকে ফরাসী অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২৬শে মার্চ মৈত্রীশক্তি "পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যের মধ্যে সহযোগিতা আনবার" দায়িত্ব জেনারেল ফককে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকরী সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ল। যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত প্রস্তুতি চলছিল, কিন্তু ইংগ-ফরাসী কম্যাণ্ডের সেটা যথেষ্ট দ্রুত মনে হচ্ছিল না। জেনারেল রবার্টসন মার্কিন সাহায্যকে ভঙ্গুর খড়ের সঙ্গে তুলনা দিলেন। লয়েড জর্জ কম হতাশ হয়েছিলেন। তবুও পরে স্বীকার করেছিলেন যে, আমেরিকানদের ক্রমান্বয়ে টেনে আনতে হচ্ছিল। ২৭শে মার্চ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছে সব অসুবিধা দূর করে ইউরোপে সৈন্য দ্রুত পাঠাবার আবেদন জানালেন। তিনি সোজাসুজি বললেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ভীষণ দরকার।

নিয়মগত বাধা শীঘ্র দূর হল। বৃটিশ কম্যাণ্ডকে বলা হ'ল যদি বৃটেন তার আমদানী বন্ধ করে তাহ'লে তিন-চার মাসের মধ্যে আরো ১৫০ ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠানো যেতে পারে। প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস।

যে পার্থক্য মিত্র শক্তির ক্ষতি করছিল, জার্মান আক্রমণের ফলে তা চাপা পড়ল। সেই পরিস্থিতিতে তখন কাজের প্রয়োজন, কথার নয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ বৃটিশ দূত ভাইকাউণ্ট রিডিং লক্ষ্য করেছিলেন যে, মার্কিনরা সচেতন ছিল যে বক্তৃতা আর প্রচারে জার্মান সমরবাদীদের থামানো যাবে না। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যদি জার্মানিকে হারাতে হয়, তাহ'লে তা শক্তি দিয়েই করতে হবে। জার্মান আক্রমণ বন্ধ করতে হ'লে শক্তিশালী সৈন্য পাঠাতে হবে।

মিত্র শক্তির শিবিরে কেউই জানত না যে, শেষ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া জার্মান আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। এমন কি মার্শাল ফকও

শত্রুদের আঘাতের শক্তিকে অতি রঞ্জিত করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে গেলে ও জার্মান প্রতিরোধ নষ্ট করতে গেলে অন্ততঃ ১০০ মার্কিন ডিভিশনের দরকার। এর অর্থ হ'ল মিত্রপক্ষের ৪,০০০,০০০ লোক। পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেল অবশ্য যে, এর শতকরা ৫৫ ভাগ লোকেই ঘটনার গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যখন ১৯১৮-তে জার্মানি পরাজিত হ'ল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানকারী বাহিনীতে ফকের কায়া শক্তির অর্ধেক লোক ছিল।

পশ্চিমে জার্মান আক্রমণ আমেরিকানদের আক্রমণে উৎসাহিত করল। অবশ্য লুডেনডর্ফ আশা করেছিলেন যে, তিনি সময়টা কাজে লাগাতে পারবেন।

প্রথম লড়াই শেষ হওয়ার সংগে সংগে "৯ই এপ্রিল (পাঁচ দিন পরে) নতুন আক্রমণ শুরু হ'ল"—এবারে আক্রমণ লী নদীর ওপরে ফ্ল্যাণ্ডার্সে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত চলেছিল। ঐ অঞ্চলে প্রায় দ্বিগুণ বৃটিশ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও জার্মানরা এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারপর প্রচণ্ড প্রতি রোধের সামনে তারা থেমে গেল। লুডেনডর্ফ দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ২৭শে মে Aisne নদীর ওপরে নতুন আক্রমণের আদেশ দিলেন। শেষ জয়ের জন্য প্যারি পেঁছিনোর উন্মাদনায় জার্মান সৈন্যরা মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল। ২রা জুন তারা সত্যিই ফরাসী রাজধানীর কাছাকাছি এল, এমন কি Chateau-Thierry অধিকার করল। লুডেনডর্ফ আশা করলেন যে, ফ্রান্স ভেংগে পড়বে।

চেম্বার অফ্ ডেপুটিজে Clemenceau ঘোষণা করলেন, "আমরা লড়ছি, আমরা বাধা দিচ্ছি, আমরা জয় করব। সব হারায় নি। ভালো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। উৎসাহিত হোন।"

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। জার্মান আক্রমণ দুর্বল হ'তে শুরু করেছিল এবং শীঘ্রই থেমে গেল। অধিনায়করা ১৪ই জুলাই রাতে মার্ণ পার হয়ে তাঁদের লোকদের নতুন আক্রমণে পাঠালেন। যখন এই খবর পেঁছিল, জার্মান-শাসকরা উৎসাহিত হলেন, যদিও পরাজয়ের এত কাছাকাছি তাঁরা আর কখনো পেঁছিন নি।

'দু' দিন পরে জেনারেল ফকের বিশাল বাহিনীকে পাঠানো হ'ল যুদ্ধে। মিত্র শক্তি শুরু করতে জার্মানরা প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে লাগল। ৮ই অগাস্ট Amiens-এ এক নতুন প্রতি আক্রমণ জার্মানদের হটিয়ে দিল। পরাজয়টা আরো দুঃখজনক হ'ল কারণ লুডেনডর্ফের অর্থনৈতিক বা মানবিক আর রসদ ছিল না। তিনি লিখলেন, "৮ই অগাস্ট বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে জার্মান সৈন্যের পক্ষে ভীষণতম দিন।"

তারপর থেকে বিশৃংখলা চলতে লাগল। জার্মান সৈন্যের মেরুদণ্ড ভেংগে গেল। জার্মান রসদ সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে জার্মান ও অস্ট্রো-হাংগেরীয়ান সৈন্যদের ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হ'ল না।

১৯১৮-র অগাস্টে উক্রাইনে এক বিরাট উত্থান দেখা দিল। রাশিয়ার উপরে চাপিয়ে দেওয়া ব্রেস্ট শান্তি চুক্তির ফলে উক্রাইনের "শস্য ভাণ্ডার" উন্মুক্ত হবে এ আশা ব্যর্থ হ'ল। পূর্ব ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাশা, যা সফল হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, ফলে জার্মানির সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য আরো করুণ হয়ে উঠল। খেলা শেষ হয়ে গেছে দেখে লুডেনডর্ফ চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ভীতি বিবর্ণ, ভাগ্যাহত জুয়াড়ী লুডেনডর্ফ শুধু বলতে পারলেন, "সব শেষ হয়ে গেল।" তবুও ১৯১৮-র ১৪ই অগাস্ট লুডেনডর্ফ ও হিণ্ডেনবুর্গ সহ রাজকীয় পরিষদ সিদ্ধান্ত নিলেন যে জনসাধারণের "উদ্দীপনাময় বক্তৃতা" শোনার প্রয়োজন আছে। কয়েক দিন পরে, এসেনে শ্রমিকদের লক্ষ্য করে উইলহেল্‌ম্‌ ঘোষণা করলেন যে, "শত্রুরা ভুল ভেবেছিল" এবং যদিও পৃথিবী জার্মানিকে ঘৃণা করে, তবুও "যারা নিজেদের পরাজিত মনে করে ঘৃণাই তাদের ভাগ্যে থাকে।" নিষ্ফল জুয়ায় মেতে সমরবাদীরা প্রায় আরো তিনমাস একটা নির্বুদ্ধি প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। বার্লিনে পোস্টার পড়ল "জার্মানদের জয় নিশ্চিত……"

৮ই অগাস্টের প্রতি আক্রমণের পূর্ণ ফল বোঝা যায় নি। এর পরে মাসের পর মাস জার্মান সমর ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে গুঁড়িয়ে গেল, মিত্রপক্ষের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তখনো ভাবছিল যে যুদ্ধ প্রলম্বিত করাই হচ্ছে আক্রমণের চেয়ে জয়লাভের নিশ্চিততর উপায়। পেত্যাঁ তখনো আশাবাদী, ওদিকে জেনারেল উইলসন ১৯১৯-এর জুলাই বা ১৯২০তে একটা নির্দিষ্ট আক্রমণের সুযোগ বিচার করছিলেন।

স্পষ্টতঃ কখন যে ইতিহাসের গতি ফিরল সেই মুহূর্তটা নির্দিষ্ট করা কঠিন। যুদ্ধের রক্তচিহ্নিত আবরণ এবং ঘটনার ঘনঘটা ভেদ করে দেখার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সজাগ মস্তিষ্কের দরকার। শক্তিসাম্য যাচাই করা, বাস্তব ও নৈতিক উপাদানের হিসাব দেওয়া এবং ঘটনার গতি পুনর্নির্ধারিত করার জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তা জয়কে নিকটতর করে।

১৯১৮-তে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে জার্মান সৈন্যবাহিনীর প্রতি আঘাতের ঘটনার গুরুত্ব স্থানীয় গুরুত্বের চেয়ে বেশী। তারা জার্মান গোষ্ঠীকে ধ্বংসের দিকে দ্রুত ঠেলে দিচ্ছিল।

Erzberger বলেছেন, শরৎকাল আসতেই জার্মানীর বন্ধুরা আশংকিত হয়ে পড়ল। তাদের কেউ কেউ পৃথক শান্তির জন্য জোড়াতালি দিচ্ছিলেন কিন্তু ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধান্তের ভার কূটনীতিকদের পরিবর্তে সৈন্যদের উপরে পড়ল। সালোনিকায় আক্রমণ করে জেনারেল Franchet d' Esperey বুলগেরিয়াকে নত হতে বাধ্য করলেন। জার্মান

গোষ্ঠীতে যোগদানের সম্ভাবনা সব পরীক্ষা করে তুরস্কও আত্মসমর্পণ করল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী টুকরো টুকরো হয়ে শান্তির প্রার্থনা করল।

কয়েকদিন পরে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীও আত্মসমর্পণ করল। জার্মান সমরবাদীরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজয় থেকে বাঁচাতে এবং জার্মানীতে অবক্ষয়ী যুদ্ধ নিবারণ করতে হলে আত্মসমর্পণ একমাত্র উপায়। জার্মান কম্যাণ্ডের আদেশে Erzberger যে কোন শর্তে যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাতে ১৯১৮-র ৭ই নভেম্বর শ্বেতপতাকা নিয়ে Compiegen-এ গেলেন। দুদিন পরে জার্মানী বিপ্লবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল এবং চারদিন পরে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের নীতির ফল হিসাবে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ব্রেস্ট চুক্তিকে বাতিল বলে ঘোষণা করল।

ইতিহাসে কখনো একটা যুদ্ধ ঠিক অন্যটার মত হয় না। ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আলাদা। তার মেজাজ ও ওজন আলাদা। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, জনসাধারণ অন্য লক্ষ্যের দিকে চালিত হল। ১৯১৮-র প্রভাব আবার জার্মানীর উপরে দেখ দিল, কিন্তু এবারে আরো প্রচণ্ড মাত্রায়।

যখন হিটলারের শেষ, সম্পূর্ণ পরাজয়ের দিন এল, তখন সেটা অতীতের কোন পরাজয়ের মত ছিল না। হিটলারের সৈন্যবাহিনীর ধ্বংস হিটলারের রাষ্ট্রের ধ্বংস ডেকে আনল। ১৯১৮-র আত্মসমর্পণের উপর ফ্যাসীবাদী জার্মানীর আত্মসমর্পণের ছায়া পড়ল, যে আত্মসমর্পণ রাতের অন্ধকারের পরে দিনের আবির্ভাবের মত অবশ্যম্ভাবী।

১৯৪২

দ্বিতীয় খণ্ড

উইমার সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক গোলকধাঁধা

অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্ক

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আন্তর্জাতিক ও আন্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে বিপুল পরিবর্তন ঘটাল। কালানুযায়ী এই পরিবর্তনগুলি প্রথমে তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জার্মানীর সম্পর্ককে প্রভাবিত করল। সাধারণ ও বিশেষ দুভাবেই সোভিয়েত-জার্মান সম্বন্ধের সমস্যা নিয়ে অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মেরও আগে লেনিন ও বলশেভিক দল চিন্তিত ছিল। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে রাশিয়ার বিপ্লবী অপসারণ এবং তারপর বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমস্যার বৃহত্তর অংশের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর শাসকদের জন্য বিষয়টার সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা হল। অতীতে এবং এখনো, জার্মান বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা পূর্ব ও পশ্চিমে জার্মানীর সম্পর্কের সমস্যার গভীরে লক্ষ্য করছিলেন, যদিও সেটা প্রধানতঃ কূটনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে। তারা মূলতঃ একটা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন : ইউরোপে এবং পৃথিবীর বাকী অংশে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক শত্রুকে আলাদা ধ্বংস করে দুই সীমান্তে যুদ্ধ কি এড়ানো যায়? তারা কখনো সমস্যাটাকে জার্মানীর ও মানবজাতির শান্তির দিক থেকে দেখেনি। আজও তারা এ বিষয়ে চিন্তিত মনে হয় না, যদিও স্বভাবতঃই তারা সোভিয়েত-জার্মান সম্বন্ধের সমস্যাকে এড়াতে পারে না। নিঃসন্দেহে এটা ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ও আন্তরাষ্ট্র ঘটনাবলীর কেন্দ্রীয় সমস্যা, কিভাবে এর সমাধান হয় তার উপরে অনেক পরিমাণে শান্তি নির্ভর করছে।

দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়েছে যে বৃহদাকারের স্থানীয় সংঘর্ষের দিন চলে গেছে। অতএব, সোভিয়েত-জার্মান সম্বন্ধের এক গভীর প্রভাব রয়েছে বিশ্ব-শান্তির ভবিষ্যতের উপর। আমাদের যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সমস্যাগুলির এটি একটি যার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা অত্যন্ত শিক্ষামূলক। সামাজিক শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক সচেতনতা পরি-বর্তনে ইতিহাস বিশেষ জ্ঞানরূপে কোন স্থান অধিকার করেছে, এক ধরনের

মতবাদের পুনর্গঠনে এটা কতদূর উৎসাহ দেয়, সেই মতবাদ পুরনো বা অসম্পূর্ণ যাই হোক এবং আর এক ধরনের মতবাদ বুদ্ধিভিত্তিক ভূমিকা নেয়, যা সময়ের বিচারে সফল হয়ে কঠিনতম বিচারক- ইতিহাসের কাছে তার মূল্য প্রমাণ করে- তা বুঝতে এই আলোচনা সাহায্য করে।

আমরা দেখব যে, আধুনিক পশ্চিম জার্মান ইতিহাস সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঘৃণায় আবৃত্ত হয়ে নিশ্চিত সোভিয়েত জার্মান সমাধানের জন্য আমাদের যুগের সাফল্য ও সম্ভাবনার প্রতি অন্ধ যদিও এই সমাধান জার্মান জাতির, বিশ্ব শান্তির ও ইতিহাসের বাস্তব গতির স্বার্থে। আমরা আরো দেখব যে, প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরা কিছুই শেখেনি। ইতিহাস শুধু শিক্ষক নয়: যারা ইতিহাস তৈরী করে এবং যারা ইতিহাস লেখে- ইতিহাস তাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ বিচারকও বটে।

১

অনস্বীকার্যভাবে সোভিয়েত রাষ্ট্র তার জন্মের দিন থেকেই প্রথম গুরুত্বের আন্তর্জাতিক কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরা যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক- এটা স্বীকার করে- কিন্তু এটা যে বিষয়গতভাবে ন্যায়সংগত তা অস্বীকার করার চেষ্টা করে। আজ কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, সমাজতন্ত্র ও শান্তির যে ধারণাকে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করে: তা আন্তর্জাতিক। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করে যে, রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক মূল গভীর এবং তার একটা প্রবল আন্তর্জাতিক প্রভাব আছে। একজন যথার্থ প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক **Georg von Rouch,** এর মতে বলশেভিক মতবাদের রহস্যময় সত্তার মূলে আছে "মানুষের দ্বৈত সত্তা, যা পাপী এবং একই সংগে ঈশ্বরের সদৃশ।" তিনি তার *বলশেভিক রাশিয়ার ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন "যা হোক- বলশেভিকবাদ শুধু রাশিয়ার ইতিহাসের সংগে যুক্ত নয় এবং তার মূল শুধু রুশ বা পূর্ব ইউরোপ বা পূর্ব এশিয়ার জনগণের সংগে যুক্ত নয়।" সোজাসোজি একদিকে তিনি বলশেভিক মতবাদের প্রতি রাশিয়ার মানুষের গভীর ভালবাসাকে স্বীকার করেছেন এবং অন্যদিকে কমিউনিজমকে তাড়ানোর ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পুরনো আশা পোষণ করেছেন। এটা কার্যতঃ ১৯১৭-১৮-র আশা ও পরিকল্পনার পরিবর্তিত পুনর্ঘোষণা, যখন কাইজার ক্ষমতায় ছিলেন। একমাত্র পার্থক্য হল যে, জার্মানীর শাসকরা প্রথমে বিশ্বাস করেন নি যে- সোভিয়েত মজুর-কৃষক রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব এবং পরে যখন তা ঘটল, যখন তাঁদের ধারণা হল যে, এই রাষ্ট্র প্রতিবিপ্লবের আঘাতে ভেঙে পড়বে। মৈত্রীশক্তিরাও তাই ভেবেছিল। যা হোক, যখন মৈত্রীশক্তি রাশিয়াকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল, তখন

জার্মান শাসকরা অন্য পরিকল্পনা করছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে দুই সীমান্তে জয়লাভ যখন মরীচিকায় পর্যবসিত হয়েছে, তখন জাংকার ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা রুশ সরকারের সংগে আলাদা সন্ধি করতে চাইলেন। যদিও যুদ্ধ অনেকদিন শুরু হয়েছিল, তবুও তারা জারকে ক্ষমতাশালী মিত্র মনে করছিলেন, বৃটেনের পিছনে এক সম্ভাব্য চুক্তির অংশীদার হিসাবে এবং তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ও রাশিয়াতে যে বিপ্লব পরিণত হতে চলেছে এবং জার্মানীতে যে বিপ্লব প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রকে ভীত করেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাধারণ স্বার্থে, দুদিক থেকেই।

বুর্জোয়া ও জমিদারের রাশিয়া আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক জটিল অভিব্যক্তি পেরিয়ে এসেছিল—জার্মানির সংগে প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রী থেকে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সংগে সমান প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী মৈত্রী পর্যন্ত—রুশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য এবং মধ্য ও দূর প্রাচ্যের যে রুশ ও জার্মান প্রসারণশীল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরে বালটিক রাষ্ট্র ও ফিনল্যাণ্ডে (জার্মান শাসকদের ক্ষেত্রে) এবং গ্যালিশিয়ায় (রুশদের ক্ষেত্রে) ছড়িয়ে পড়ে ছিল তার সংঘর্ষে উত্তেজিত ছিল এই সম্পর্ক। যে পোল্যাণ্ড-বিভাগের ফলে আগে রুশ-জার্মান মৈত্রী ঘটেছিল, সেটা শুধু বিবাদের বিষয়ই ছিল না, যুদ্ধেরও কারণ ছিল। রাশিয়ার বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজারে আধিপত্য লাভের জন্য ইংগ-ফরাসী ও জার্মান অর্থমূলধনের প্রচেষ্টাতেও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাওয়া যায়। এটা ইংগ ফরাসী মূলধনের ওপরে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলে ছিল। তবুও, রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বৈষম্যের অস্তিত্ব, এমন কি বৃদ্ধিও (বিশেষতঃ মধ্য প্রাচ্য ও পারস্যে), বুর্জোয়া জমিদার রাশিয়া এবং জাংকার বুর্জোয়া জার্মানির রাজত্বগত বন্ধন এবং সর্বোপরি বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থার সাধারণ স্বার্থ—এই সব কিছু পুরনো রাশিয়া ও পুরনো জার্মানির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতি বিপ্লবের ভিত্তিতে যোগাযোগকে সম্পূর্ণ সম্ভব করে ছিল।

লেনিন যখন যুদ্ধের সময়ে "জার্মানির বিরুদ্ধে রুশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সহযোগিতা থেকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশ জার্মান সহযোগিতার দিকে মোড় নেওয়ার" সম্ভাবনার সংজ্ঞা দিচ্ছিলেন তখন তিনি হোহেনজোলার্ন এবং রুশ সাম্রাজ্যের রোমানফদের সম্বন্ধের ইতিহাস থেকে শুরু করেছিলেন।[১] তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, "যুদ্ধের ফল যাই হোক, জার্মান বুর্জোয়ারা জাংকারদের সংগে একযোগে রাশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে জারতন্ত্রকে সমর্থনের জন্য সব রকম চেষ্টা করবে।"

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২২, পৃঃ ১৭৮।

অতএব আমরা দেখছি, বলশেভিকরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কথা চিন্তা করেছিল এবং যে সম্ভাব্য পরিবর্তন বিপ্লবী শক্তিগুলিকে জটিল বা সরল করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী বিপ্লবী কর্মপন্থার কৌশলকে বদলাতে পারে তার কথা বিচার করেছিল। এই প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ও সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার সম্পর্ক এবং প্রত্যেকের আন্তর্জাতিক ও সামরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব চেয়ে যুক্তি-যুক্ত দেশপ্রেমিক ও প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদী বলশেভিকরা এই সব জটিল প্রশ্ন বিচার করে ছিল বৃহৎ শক্তির দিক থেকে নয়, বরং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও অন্যান্য দেশে, সর্বোপরি জার্মানীতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের দিক থেকে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের জার্মান বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা, উইমার সাধারণতন্ত্র এবং রুশ-জার্মান সম্পর্কের সেই যুগকে রাজনৈতিক সামরিক মৈত্রীর সমস্যার অংশ রূপে দেখেছে এবং জার্মান কূটনীতির প্রচেষ্টায় এর সমাধান খুঁজেছে। এতে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক কৌশল বোঝা গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর জার্মান বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ফ্রেডরিখ মেইনেক বলেছিলেন যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানী ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রীর আলোচনা ও তার ব্যর্থতা জার্মান ইতিহাস, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেও এক যুগান্তকারী ঘটনা। ই. ব্রাণ্ডেনবুর্গ, এইচ. ওংকেন এবং অন্যান্য জার্মান ঐতিহাসিক একই নিয়মে বিচার করেছেন। বিসমার্ক উত্তর যুগের জার্মান কূটনীতিতে সর্বোচ্চ ব্যক্তি ফ্রেডরিখ ফন হলস্টাইনের কাগজপত্র এখন প্রকাশিত হওয়ায় পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরা আবার মিত্র নির্বাচনে কূটনীতির নির্ধারকের ভূমিকা, বিশেষতঃ একদিকে ব্রিটেন ও অন্যদিকে রাশিয়ার ভূমিকা পরীক্ষা করে দেখছেন। আরও বলা যায় যে, হিটলারের সময়ে সরকারী মতবাদের স্তরে উন্নীত "ভৌগোলিক রাজনৈতিক" ধারাতে রুশ জার্মান সম্বন্ধকে শুধু রাজনৈতিক সামরিক মিত্রতার দিক থেকেই বিচার করা হয় নি, উপরন্তু, পূর্ব ইউরোপে জার্মান ঔপনিবেশিক বিস্তারের দিক থেকেও বিচার করা হয়েছিল।

যাই হোক, বৈদেশিক নীতির সমস্যা, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী যুগের রুশ-জার্মান সম্বন্ধের সমস্যা কূটনীতির পদ্ধতি ও লক্ষ্যের মত বিষয়কে ছাড়িয়ে যায়। এই সমস্যার সংগে কুখ্যাত "ভৌগোলিক রাজনৈতিকমতবাদ"-এর কোন সম্বন্ধও নেই। যা আমাদের সব চেয়ে বিচলিত করে তা *কূটনৈতিক কৌশল* বা ভৌগোলিক ভাবে পূর্ব নির্ধারিত রাজনৈতিক *ভাগ্য* নয়, কিন্তু তা হল আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থের অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন।

অক্টোবর বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে সমস্যার বিষয়বস্তুকে উন্মোচিত করল।

সেটা শুধু তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঘটে নি, কারণ অনেকদিন আগেই মার্কস সে যুক্তি দিয়ে গেছেন, উপরন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত শক্তি বুর্জোয়া জমিদারীর অবস্থাকে বাতিল করে দেশের সামাজিক কাঠামোকে পুনর্গঠিত করল। ফরাসী, ব্রিটিশ, জার্মান ও বেলজিয়ান মূলধনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একচেটিয়া কারবার ও ব্যাংকগুলি, বড় ভূসম্পত্তির পদ্ধতি, পুরানো আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলি—অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল রুশ জনসাধারণের ইউনিয়ন থেকে শুরু করে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিকরা, প্যাতি-বুর্জোয়া মেনশেভিকরা এবং সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি দল—সব ভেঙে পড়ল। সোভিয়েত মজদুর-কৃষক-রাষ্ট্র, নতুন সামাজিক কাঠামোয় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাষ্ট্র পুরনো ব্যবস্থার ধ্বংসের উপরে দেখা দিল। আর সম্পূর্ণ নতুন কাঠামোর রাষ্ট্রের জন্মের ফলে নতুন ধরনের নীতিরও জন্ম হল। লেনিন যা বলেছিলেন, যখন রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লব দেখা দিল, তখন দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যে যুদ্ধে আবদ্ধ ছিল, এটা খুব সৌভাগ্যজনক। এর অর্থ এই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার আশায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধে আগ্রহী ছিল এবং এখনো আগ্রহী, যেটা প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চান। না, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন দায়িত্ব আন্তর্জাতিক বিপ্লব আন্দোলনের নেই। এই আন্দোলন যুদ্ধের বিরোধী এবং যুদ্ধের বিপরীতে কাজ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতম কংগ্রেস প্রমাণ করেছিল যে, ১৯১৭ সালে অর্থাৎ যখন রাশিয়ার জনগণ বিধ্বংসকারী যুদ্ধে নিপীড়িত হচ্ছিল, তখনকার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থায়ও বিপ্লব জয়ী হতে পারে। জাতির প্রধান অংশের মুখপাত্র যারা, সেই শ্রমিক শ্রেণী শুধু যুদ্ধের অবস্থাতেই ক্ষমতা কেড়ে নেয় না এবং সেটা শুধু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারাই ঘটে না। সেটা শান্তিপূর্ণ উপায়েও ঘটতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে রাশিয়াকে বার করে আনা ও জনগণকে যুদ্ধ থামাবার এবং এক *বিশ্বজনীন* গণতান্ত্রিক *শান্তি* প্রতিষ্ঠার বাস্তব উপায় দেখানো। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ায় বলশেভিক দল কর্তৃক প্রস্তাবিত সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিকদের উজ্জ্বলতম আশার প্রতীক গণতান্ত্রিক বিশ্ব শান্তির বাস্তব ধারণাকে রূপ দেবার প্রথম ঐতিহাসিক উপকরণ হল লেনিন-রচিত শান্তিবিধি। এই বিধি বিশ্বশান্তিকে গভীর ঐতিহাসিক আবেগ ও অনন্ত নৈতিক শক্তি দিয়ে যুগে যুগে অমর করে রেখেছে।

চূড়ান্তভাবে শ্রেণীগত ধারণা, বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির পদ্ধতি ও লক্ষ্যকে ভেঙে ফেলে সোভিয়েত নীতি জনগণের, সর্বোপরি

শ্রমিকশ্রেণীর শান্তিপ্রেমী মনোভাবের সংগে মিল রেখে নতুন শ্রেণীগত বিষয় খুঁজে পেল। তার ধারাও নতুন, বিদেশী পুঁজিবাদী সরকারের সংগে সম্বন্ধ ও শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের সংগে সম্বন্ধ দু'ক্ষেত্রেই।

বুর্জোয়া সংবাদপত্র রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের নতুন, অভাবিত পদ্ধতির প্রতি নিজেদের ধারণার অভাব প্রকাশ করল এবং দাবী করল যে, সোভিয়েত সরকারের কোন "বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক নীতি" নেই। তবুও লেনিন, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতিকে পরিচালিত করে-ছিলেন, তিনিও এর মূল নীতিগুলির সমাধান করছিলেন। এটা সত্য যে, সব সমাধান রাতারাতি তৈরী হয়নি, যখন পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আশংকায় আশংকিত, যখন পুঁজিবাদী দেশগুলির জনসাধারণ শ্রমিকরা বিপ্লবের প্রতি জেগে উঠছিল আর শাসকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঘটাচ্ছিল তখন অক্টোবর বিপ্লবের বিশেষ পরিবেশে সমাধান ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল। সমাধান দেখা দিচ্ছিল, যখন রাশিয়ার শ্রমিক-শ্রেণী, যে কোন দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা মনে নিয়ে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সময়ে বিরোধী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবৃত দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কঠিন ব্রত নিয়েছিল, সেখানে পৃথিবীর প্রথম কৃষি-মজদুরদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সামরিক প্রহরা ও অর্থনৈতিক অবরোধ উৎপীড়িত করছিল।

লেনিন এবং সোভিয়েত সরকার তাদের শান্তির আবেদন "সকলকে" জানিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলন শাসকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিভূ সরকারগুলির নীতিকে কার্যকরী, এমন কি নির্ধারণযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার মত যথেষ্ট শক্তি-শালী। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিশ্বশান্তির জন্য সচেষ্ট এবং জার্মানদের সংগে পৃথক শান্তি আলোচনায়, পশ্চিমী শক্তিগুলির বিকৃত বুদ্ধির কারণে বাধা লেনিন ও সোভিয়েত জনগণ আশা করছিলেন যে, জার্মানীর শ্রমিকরা রাজ-নৈতিক চাপ দেবে।

অক্টোবর বিপ্লব পুরনো রুশ-জার্মান সম্বন্ধকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীচেতনাসহ রুশ-জার্মান সম্বন্ধকে স্থাপিত করল। এখন সমস্যার বিষয়বস্তু ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সম্বন্ধ একদিকে এবং অন্যদিকে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছে সেই রুশ শ্রমিক-শ্রেণী এবং পুঁজিবাদী শাসিত জার্মানীর সংগে সম্বন্ধ লেনিন রচিত বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাধারণ নীতিকে অনুসরণ করল, যে নীতিকে সোভিয়েত রাষ্ট্র তার ইতিহাসে উন্নত করেছে। জার্মানী শ্রমিকশ্রেণীর সংগে ঘনিষ্ঠতা প্রলেতারিয়েতদের আন্ত-র্জাতিকতাবাদের অপরিবর্তনীয় নীতিকে মেনে চলল। যখন প্রতিক্রিয়া-

শীল ঐতিহাসিকরা বলে যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রলেতারিয়েতদের আন্তর্জাতিকতাবাদের আবরণ এবং সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ "বিপ্লবের আমদানী"র আদর্শগত প্রমাণ ও আবরণ, তখন তারা শুধু নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং উপরন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি, মূলনীতি ও নির্দেশরেখাকে ভুল উপস্থিত করে। তারা একদিকে রাশিয়া থেকে জার্মানীতে "বিপ্লব আমদানী" প্রমাণের চেষ্টা করে এবং উল্টোদিকে জার্মানী থেকে রাশিয়াতে "বিপ্লব আমদানী" প্রমাণ করতে চায়। দুটোই ভুল। জার্মান প্রবাদে বলে মিথ্যার পা খাটো।

প্রলেতারিয়েতদের আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব হয়েছিল অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগে এবং বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাকে লেনিন আবিষ্কার করার অনেক আগে। সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি "কোন সাম্রাজ্যবাদ পছন্দসই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দেয় নি, বরং যে সব শর্ত সবচেয়ে ভালভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে গড়ে তোলে ও শক্ত করে সম্পূর্ণ সেই দৃষ্টিভংগী থেকে" উদ্ভূত হয়েছে। মোট কথা, সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সংগে চিরাচরিত বন্ধন এবং অবশ্যই পুঁজিবাদী দুনিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধের অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক নির্ভরতার দ্বারা গড়ে উঠেনি। শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক গঠনের সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশের জন্য সার্বভৌম নির্বাচনই হল নির্ধারক নীতি।

শান্তিবিধি প্রচারিত হওয়ার পরে ১৯১৭-র ২৩শে নভেম্বর লেনিন বলেছিলেন, "আমরা প্রস্তাব করছি শান্তি আলোচনা এখনই শুরু হোক ··· সব দেশের সংগে। আলোচনার মাধ্যমে বিষয়ের মিমাংসা, সব দেশের সংগে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ বজায় রাখা, প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বভাবতঃই এটা অন্যান্য নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যেমন ধরুন, প্রলেতারিয়েতদের আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি ঃ যা অক্টোবর বিপ্লবে শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ইচ্ছায় জাগিয়ে তুলেছিল, এটা তারই সমন্বয়। লেনিন তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে, শান্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত জনগণের প্রকৃত নির্ভরযোগ্য বন্ধ হতে পারে শুধু আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু তার সব বিপ্লবের আশা সত্ত্বেও তিনি জানতেন যে, "বিপ্লব হুকুম দিয়ে তৈরী হয় না ঃ বিপ্লব বিশাল অশান্তির বিস্ফোরণ থেকে জন্ম নেয়।

যখন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির দ্বারা আশংকিত হল, তখন লেনিন জার্মানীতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন, যে আন্দোলনের উপরে তাঁর যথেষ্ট আশা ছিল। তিনি জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলনকে প্রশংসা করলেন এবং সেটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবলেন। রাশিয়া ও জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের সৈনাদের

মধ্যে গভীর ভাবগত রাজনৈতিক ও কিছুটা সংগঠনগত বন্ধন এবং উপরন্তু দুই দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও আক্রমণকারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌথযুদ্ধে ব্যবহৃত পারস্পরিক প্রভাব ও সহায়তা ছিল এর মূলে। রাশিয়ার ও জার্মানীর বিপ্লবী কর্মপন্থার চিরাচরিত বন্ধনের উদ্ভব মার্কস ও এঙ্গেলস-এর সময় থেকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, ১৯০৫-০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে বিশেষ শক্ত হয়। সারা জীবন লেনিন জার্মান ইতিহাস, জার্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা, জার্মানী দর্শন ও বিজ্ঞান, জার্মানীর সংস্কৃতি ও তার শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতির অভাবের বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। আরও বিশেষ করে তিনি জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধি, আকার ও ভাবধারা লক্ষ্য করেছেন—দ্রষ্টাহিসাবে তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য নয়, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ বিপ্লবীগোষ্ঠীর নেতারূপে। তিনি সিঙ্গার, বেবেল, লুক্সেমবুর্গ এবং লিবকনেকটের মত নেতাদের প্রশংসা করেছেন এবং বার্নস্টাইন, লেজিয়েন, পারভাস এবং পরে কাউটস্কির পুনর্বিচারবাদকে নিন্দা করেছেন, যারা জার্মানীর অনেক ক্ষতি করেছেন এবং শুধু জার্মানীর নয়, শ্রমিক আন্দোলনেরও অনেক ক্ষতি করেছেন।

ইতিহাস চেয়েছিল যে, জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন অনেক দশক ধরে রুশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আদর্শ হয়ে থাকবে অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির তুলনায়। ১৯১৪-র এপ্রিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্প আগেই লেনিন এই বিষয়ে লিখেছিলেন : জার্মান সমাজ-গণতন্ত্রের অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে। Hochberg, Duhrings and Co-র বিরুদ্ধে মার্কসের যুদ্ধের কল্যাণে এই গণতন্ত্রের হাতে একটি কড়াভাবে তৈরী তত্ত্ব রয়েছে গণসংগঠন, সংবাদপত্র, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল সেই এক গণসংগঠন যা নিশ্চিতভাবে আমাদের দেশকে গড়ে তুলছে…। তিনি দেখালেন যে, সংস্কারক ও পুনর্গঠনকারীদের লজ্জাজনক ব্যবহার সত্ত্বেও জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নিজেকে চিহ্নিত করেছে এবং শেষে বললেন : জার্মান দল নিঃসন্দেহে যে রোগে ভুগছে এবং যা এই ধরনের ঘটনায় প্রকাশ পাচ্ছে, তা আমরা কখনোই ডেকে আনব না ; 'সরকারী মনভোলানো' কথায়ও আমরা সে রোগকে চাপা দেব না। আমাদের রুশ শ্রমিকদের কাছে রোগটা খুলে ধরতে হবে যাতে আমরা পুরনো আন্দোলন থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি, কি নেওয়া উচিত নয় তা শিখতে পারি।" এটা মনে রাখতে হবে যে, রোগটা যুদ্ধের সময়েও ভয়ংকর ছিল যখন সামাজিক দেশপ্রেম ও শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীকরণবাদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বন্ধুর মত কাজ করছিল। তবুও, জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের ক্ষমতা সম্বন্ধে লেনিনের গভীর বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস জার্মান শ্রমিকদের আন্দোলনের সংগ্রামী সময়ের স্মরণভিত্তিক অন্ধ বিশ্বাস নয়, এ হল যুদ্ধের সময়ে জার্মানীতে

আবির্ভূত একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণী ও সৈন্যদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক চেতনার বিশ্লেষণ ভিত্তিক বিশ্বাস। যখন ১৯১৭-র এপ্রিলে লেনিন সুইজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় যাচ্ছিলেন, তিনি তখন সুইস শ্রমিকদের কাছে এক বিদায়ী চিঠিতে লিখেছিলেন: জার্মান প্রলেতারিয়েতরা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু, হল রুশ ও বিশ্ব প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের।"[১]

তবুও এখনো প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা বলে যে, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাহায্য করেছে শ্রমিকরা, জার্মান জেনারেল স্টাফ নয়। লেনিনের জার্মানী ও সুইডেন হয়ে সুইজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানী ও অন্যত্র লেখা বেরোল। বলা হয় যে, জেনারেল হুডেনডর্ফ নিজে এই লেনিনের পথের ব্যবস্থা করে ছিলেন, এই তথ্য দিয়ে যে প্রথমে হুডেনডর্ফ ও জেনারেল স্টাফ জার্মানীর সামরিক ধ্বংস কমাবার জন্য "বিপ্লব রপ্তানী" বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে "বিপ্লবের স্থানান্তর"-এ ব্যস্ত ছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ অতএব রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হওয়া ও জার্মানীতে তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের দোষ পড়ে হুডেনডর্ফ ও জেনারেল স্টাফের ওপরে। লেখকরা আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইলেন যে, যদি লেনিন অন্যভাবে রাশিয়ায় পেঁাছতেন, তাহলে ইতিহাসের গতি অন্য রকম হত।

সাধারণ ধারণার পাশে পাশে নতুন ঐতিহাসিক ধাঁধা দেখা দিল জার্মান সমরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এই উন্মাদ ধারণা উচ্ছেদের জন্য যে, বিপ্লব জার্মানী থেকে রাশিয়ায় পাঠানো হচ্ছিল, যে ধারণার বিপরীতে রয়েছে আরও ধাঁধা লাগানো অথচ বেশী প্রচারিত ধারণা ছিল যে বিপ্লব রাশিয়া থেকে জার্মানীতে "রপ্তানী" হচ্ছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মান সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte লণ্ডনে প্রাপ্ত বলে কথিত জার্মান কূটনৈতিক দলিলের প্রমাণ দেখাল রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরুতে হুডেনডর্ফের কুকর্মকে সর্বতো প্রকারে বাতিল করার জন্য, এই যুক্তিতে যে তিনি কখনো ব্যক্তিগতভাবে লেনিনকে দেখেন নি, এমন কি তাঁর নামও জানেন না। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হল না। সংবাদপত্রটি সোজা বলল যে, জার্মানী হয়ে রাশিয়াতে "বিপ্লব প্রেরণ"-এর পরিকল্পনাটি পণ্ডিত জার্মান সমর কুশলীদের মাথা থেকে আসে নি, এসেছে কাউন্ট Ulrich von Brockdorff-Rantzau-এর কাছ থেকে যাঁকে স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিক বলা হত। তথ্য হল এই যে জার্মানীর শাসকরা জানতেন না তাঁরা কি করছেন এবং বিপ্লবী রাশিয়ার নেতাদের সংগে আলোচনা করে যে ডালে বসে আছেন সেই ডালই কেটেছেন।

১। লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৩৬৭।

অক্টোবর বিপ্লবের জন্য লুডেনডর্ফের দোষে উন্মত্ত ধারণার বিরুদ্ধে আঘাতের উদ্দেশ্য ছিল এক সংগে তিনটি জিনিস প্রমাণ করা: প্রথমে, স্বভাবতঃ লুডেনডর্ফো ও জেনারেল স্টাফ রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দোষ থেকে মুক্ত হলেন, যার ফলে তাঁরা পশ্চিম জার্মান প্রধান প্রতিক্রিয়াশীলদের চোখে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন; দ্বিতীয়তঃ Brockdorff Rantyau বিপ্লবকে কমিয়ে দিয়ে ছিলেন যাঁরা পরে সোভিয়েত-জার্মান সম্বন্ধকে উন্নত করেছিলেন এবং তৃতীয়তঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার নেতাদের সংগে সব সম্পর্ক অবাঞ্ছনীয় ছিল কারণ সেই সম্পর্ক জার্মানীতে "বিপ্লব রপ্তানী"-র পথ খুলে দেয়।

কিন্তু এই সব নয়। দুটি পশ্চিম জার্মান প্রকাশন সংস্থা, যারা নিজেদের স্বাধীন বলে প্রচার করত, তারা Whilelmstrass দলিল থেকে অক্টোবর বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে "উত্তেজক" খবরের টুকরো প্রকাশ করেছিল, যে খবর ইচ্ছাকৃতভাবে লেনিন ও *প্রাভদাকে* হেয় করার জন্য বিকৃত করা হয়েছিল। আরো ভাল করে দেখলে দেখা যাবে যে, ১৯১৯-এ বার্ণে যুক্তরাষ্ট্রের জনতথ্য বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উপকরণের সংগে এ গুলির মিল আছে, যে উপাদান গুলি White emigre গোষ্ঠীর দ্বারা বিকৃত করা হয়েছিল বলে প্রমাণিত এবং তা করা হয়েছিল একজন যুক্তরাষ্ট্র এজেন্টের জন্য যিনি তাদের বলেছিলেন, রুশ সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক দলের প্রতিবিপ্লবী সংস্থা *Rech*-এর দোষযুক্ত আবিষ্কারকে "দলিলজাত" করতে। লেনিন ১৯১৭-য় শয়তানদের অসততা প্রমাণ করে *প্রাভদায়* জবাব দিয়েছিলেন। তবুও লেনিনকে ভুল প্রমাণ করার জন্য আগ্রহী পশ্চিম জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল লেখকরা বিদ্বেষপূর্ণ দীর্ঘকাল আগে মুখোশ খুলে দেওয়া মিথ্যাকে প্রচার করতে দ্বিধা করেন নি।

২

যদি লেনিনের বৈদেশিক নীতির শক্তি ও সত্যতার প্রমাণ দরকার হয়—একদিকে প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদ ও অন্যদিকে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—তাহলে সোভিয়েত, জার্মান সম্বন্ধে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই নীতি অনেক সময়ে কঠিন ও জটিল, সোভিয়েত রাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ব্রেস্ট শান্তি চুক্তির দ্বারা পরিচালিত; র‍্যাপ্যালো, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছিল; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জার্মানির শাসকবর্গ ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন যোগাযোগ, ১৯৩৯-এর সোভিয়েত জার্মান চুক্তি; সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ্বাসঘাতক নাৎসী আক্রমণের ফলে

জাগরিত মহান দেশাত্মবোধক যুদ্ধ যা শুধু সোভিয়েত জার্মান সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

যুদ্ধ যখন চলেছে এবং পরে পটসড্যাম সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে উচ্ছেদের ধারণাকে সমর্থন করেছিল এবং জার্মানীর সর্বাধিক জাতীয় স্বার্থে, ঐক্যবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক জার্মানীর ধারণাকে সমর্থন করে ছিল। সর্বদা সোভিয়েত ও জার্মান জনগণ, ইউরোপ ও পৃথিবী সংক্রান্ত জটিলতম ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্টোবর বিপ্লব থেকে জাত লেনিনের নীতির আদর্শ গ্রহণ করেছে।

এই সব নীতি মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষার মতই কোন বাঁধা ধরা ছকে নয়। বিষয় বস্তুতে তারা বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত, বহুভাবে তারা বাস্তবে রূপায়িত। উপরন্তু, যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাজের ভার নেওয়ার ফলে তাদের সংগে বুর্জোয়া কূটনীতির নীতি, বা সঠিক বলতে গেলে অনৈতিকতার কোন মিল নেই, যে কূটনীতি ট্যালিরাণ্ড পামার স্টোন, ডিজরেলি ও 'বিসমার্কে'র ধারায় বড় হয়ে উঠেছে। সত্যই এটার পার্থক্য থাকা সম্ভব। কারণ, আলেকজাণ্ডার হারজেনের মতে, ট্যালিব্যাণ্ড প্রমাণ করেছিলেন যে, সরলতার অর্থ বুদ্ধি নয়, পামার স্টোন এটা প্রমাণেরও চেষ্টা করেননি আর বিসমার্ক, যিনি নিজেকে দক্ষ কূটনৈতিক জাদুকর কল্পনা করতেন, তাঁর পরিস্থিতির প্রয়োজনে সততার ভান করার অভ্যাস ছিল।

লেনিন শুধু যে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তাই নয়, উপরন্তু জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদ যার নিন্দা করত, সেই জার্মানীর জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু জার্মানীর শাসকরা সোভিয়েত সরকারের শান্তির আবেদনকে দুর্বলতার চিহ্ন মনে করলেন ও পূর্ব ও পশ্চিমের সামরিক পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করলেন। সত্য যে, তাঁদের জার্মান শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাবের কথাও চিন্তা করতে হয়েছিল, কিন্তু জার্মানীতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই তাঁরা পূর্বে লুণ্ঠনকারী শান্তি চুক্তি চাপানো এবং পশ্চিমে সামরিক জয় লাভের জন্য দীর্ঘকাল জনগণকে দমিয়ে রাখার আশা করে ছিলেন। যাই হোক, আক্রমণের কৌশলের সংগে বিপ্লব কৌশলের কোন মিল নেই। শান্তির জন্য প্রচাররত রুশ শ্রমিকরা নিজেদের সংগে সংগে জার্মান জাতির স্বার্থও সমর্থন করেছিল, এই ভাবে জার্মানীর শ্রমিকদের প্রচণ্ড নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিচ্ছিল।

অন্যদিকে জার্মানীতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সব বিপ্লবী কাজের খবর রাশিয়াতে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থক কাজ হিসাবে অভিনন্দিত হচ্ছিল। সীমান্তে জার্মান ও রুশ সৈনিকদের মৈত্রী প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতা এবং সামাজিক

পারস্পরিক সহায়তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। লেনিন লিখেছিলেন, "মৈত্রী জনগণের বিপ্লবী উদ্যম, বিবেকের ও মনের জাগরণ, অত্যাচারিত শ্রেণীর সাহস। অন্য কথায়, এটা সামাজিক প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের সোপানের ধাপে।" যদিও সামাজিক বিপ্লবের সামাজিক অর্থনৈতিক পূর্বাবস্থা বজায় ছিল। তবুও তা তখনো অপরিণত এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তা "প্রচণ্ড মুষ্টি"-র পূর্ণ শক্তিতে তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ভেঙে দিতে সক্ষম ছিল।

ভারী মনে অথচ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সোভিয়েত সরকার ব্রেস্ট-লিটোভস্কে আলোচনা করতে রাজী হল। এটা সম্ভব হল যখন দুই বিশিষ্ট শক্তি কূটনৈতিক টেবিলের দুদিকে প্রথম মুখোমুখি হল—একদিকে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও শান্তির শক্তি এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধের শক্তি। এটাই দুই সামরিক লক্ষ্যের সংঘর্ষও বটে—সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ জয় এবং জার্মান সরকারের লক্ষ্য হল পূর্বে তার দস্যু বৃত্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করা এবং পশ্চিমে নির্দিষ্ট সামরিক জয়ের স্বাধীনতা পাওয়া। সোভিয়েত লক্ষ্য জনগণ, শান্তি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে অনুপ্রাণিত—যা সাম্প্রতিক যুক্তিযুক্ত দলিলের দ্বারা প্রমাণিত—আর জার্মান সরকারের লক্ষ্য বড় জার্মান ব্যাংক, একচেটিয়া কারবার ও জাংকারদের (Karl Holfferich, আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী, Reichsbank-এর প্রেসিডেন্ট রুডোলফ হ্যাভেনস্টাইন, Krupp-এর পরিচালক অ্যালফ্রেড হুগেনবুর্গ ইত্যাদি) স্বার্থে অনুপ্রাণিত।

পৃথিবী এই কূটনৈতিক দ্বন্দ্বকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করতে লাগল। অনেকে ভাবল আক্রমণাত্মক জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত বিপ্লবের উপরে ক্ষমতা বিস্তার করবে। এমন কি বলশেভিক দলেও ভীতু, দাম্ভিক, বিশ্বাসঘাতকদের পাওয়া গেল। তাদের "বিপ্লবী" বোলচাল, তাদের প্ররোচনাকে বাধা দেওয়া ও সেই সময়ের কঠিনতম সমস্যা, যার অনেক শাখা রয়েছে, তার সংগে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিশাল ইচ্ছাশক্তি, অস্বাভাবিক চিন্তার স্বচ্ছতা ও আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল।

পটাসড্যাম দলিল সংগ্রহের একটি দলিলে প্রমাণ পাওয়া যায় লেনিন জার্মানীতে শাসক সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের মধ্যে শক্তির সমন্বয়ের সম্বন্ধে কত সঠিক ধারণা করেছিলেন এবং উপরন্তু, জার্মান আশা ও পরিকল্পনার ধারণা করেছিলেন। ১৯১৮-র ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে ব্যাড হোমবুর্গের সম্মেলনের খুঁটিনাটির কথা আমি বলছি, যে সম্মেলনে আলোচনা হয়েছিল ব্রেস্ট আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পরে সশস্ত্র কার্যাবলী আবার শুরু হবে কি না! লেনিন যা আশংকা করেছিলেন, দুটি পৃথক ধারা সেখানে স্পষ্ট হল: "নরম" দল যার প্রতিনিধি ছিলেন বৈদেশিক সচিব রিচার্ড ফন কুহলমান এবং ভাইসচ্যান্সেলর ফেডরিখ ফন পেয়ার এবং চরমপন্থীর প্রতিনিধি ছিলেন

হিন্ডেনবুর্গ, লুডেনডর্ফ ও দ্বিতীয় উইলহেলম। হিন্ডেনবুর্গ বলেছিলেন, "আমাদের দৃঢ় ও দ্রুত কাজ করতে হবে। পশ্চিমে শত্রুতা দীর্ঘকাল থাকবে। আমাদের শক্তিকে এর জন্য মুক্ত করতে হবে। সুতরাং রুশদের ধ্বংস করতে হবে। তাঁদের সরকারের পতন ঘটাতে হবে। "পেয়ার প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন যে, বলশেভিকদের পতন ঘটানো যাবে না কারণ তাদের জনসাধারণের সমর্থন আছে এবং সতর্ক করেছিলেন যে, "আমাদের দেশেও বলশেভিকদের জন্য সহানুভূতি থাকতে পারে। "লুডেনডর্ফ আরো বললেন, "আমাদের সামরিক উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এর জন্য পূর্বে আমাদের স্বাধীন থাকা দরকার। আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা পূর্বে জয়লাভ করতে পারি! এর কম করার জন্য আমাদের স্বাধীন থাকতে হবে।"

কাইজারও সমান পথে তর্ক করেছিলেন, কিন্তু নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য যুক্তিটি যোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, কিছু বৃটিশ অঞ্চলের মত "বৃটেনকে যৌথভাবে জার্মানীর সংগে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।" এটা সোভিয়েত সরকার ও লেনিনের বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে, মৈত্রীচুক্তি বা অন্ততঃ কিছু বৃটিশ অংশ সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সংগে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের বিরোধে উৎসাহী ছিল।

ব্যাড হোমবুর্গ সম্মেলন সামরিক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল, যার ফলে সোভিয়েত সরকার ব্রেস্ট আলোচনার প্রথম দফায় দাবীকৃত শর্তের চেয়ে কঠিন শর্তে এক "দুর্ভাগ্যজনক শান্তি"-চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হল। তবুও খুঁটিনাটি থেকে বোঝা যায় লেনিন তাঁর গণনায় কত সঠিক ছিলেন। "নরম" ও চরমপন্থীরা স্বদেশের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হলেন, বিশেষতঃ জার্মানীতে ধর্মঘট আন্দোলনে। যখন লুডেনডর্ফ ঘোষণা করলেন, "আমাদের পিতার্সবার্গে যেতে হবে," তখন চ্যান্সেলর বাধা দিলেন, "আমরা ধর্মঘটের ঝুঁকি নিচ্ছি এবং যদিও লুডেনডর্ফ পাল্টা জবাব দিলেন, "ধর্মঘট কিছুই নয়" তবু প্রায় প্রকাশ্য ভয় সম্মেলনে দেখা দিল যে, অক্টোবর বিপ্লব জার্মান শ্রমিকদের ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে পারে।

এইবারেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তার আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করল।

লেনিন যে, "দুর্ভাগ্যজনক শান্তি"-র বিরোধীপক্ষকে বলেছিলেন যে, জার্মান বিপ্লবকে বাধা দেওয়া দূরে থাক, ব্রেস্ট শান্তিচুক্তি তাকে আরো ত্বরান্বিত করবে, সেটা কতটা ঠিক তা পরের ঘটনায় বোঝা গেল। এই চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ্য অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে, তখন লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টি রুশ শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাব ও বুদ্ধি থেকে এবং জার্মান জনগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শক্তি অর্জন করলেন। লেনিন ব্রেস্ট শান্তিচুক্তিকে টিলজিটের সন্ধির সংগে তুলনা করলেন, যে সময়ে

নেপোলিয়ন জার্মানীকে ধ্বংস ও অপমানিত করেছিলেন। লেনিন লক্ষ্য করলেন, "তবুও জার্মান জনগণ এমন সন্ধির পরেও বেঁচে রইল, তাদের সৈন্য চালনার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার অধিকার লাভের প্রচেষ্টা ও জয়ের ক্ষমতা প্রমাণ করল।"

তিনি আরো লিখলেন, "সেই সময়ে ঐতিহাসিক অবস্থা এমন ছিল যে, এই উত্থানকে শুধু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের লক্ষ্যে চালিত করা যেত। সেই সময়ে, একশো বছরেরও আগে মুষ্টিমেয় অভিজাত ও কয়েকজন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবির দ্বারা ইতিহাস রচিত হয়েছিল, আর শ্রমিক ও কৃষক জনগণ তখন অর্ধজাগ্রত ও নিষ্ক্রিয়। ফলে তখন দারুণ ধীরে ইতিহাস চলত।

যে অক্টোবর বিপ্লব জনগণকে ইতিহাস রচনার উদ্যমী প্রচেষ্টায় জাগিয়ে তুলেছিল, তা ঐতিহাসিক গতিপথে নতুন শক্তিশালী উপাদান যোগ করল এবং তার দ্বারা সময়ের গতি বাড়িয়ে তুলল, আর সেটা শুধু রাশিয়ায় নয় লেনিন এই ভবিষ্যতের ধারণা আগেই করেছিলেন। জার্মান সমরবিদরা এটা ধারণা করতে পারেন নি। তাঁরা কি করে বিশ্ব আন্দোলনকারী ঘটনার গুরুত্ব ও অবশ্যম্ভাবিতা ধারণা করবেন? পূর্ব ও পশ্চিম তাঁদের বেপরোয়া জুয়ায় ব্যস্ত তাঁরা যেটুকু খাদ্য পূর্বে পেতে পারেন তার পরিমাণ নির্ধারণ ও জার্মানীতে জাহাজ পাঠানোয় এবং একবার পূর্বনত হতে বাধ্য হলে ফ্রান্সে জাহাজে পাঠানোর মত ডিভিশনের সংখ্যার সুলভতা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। যেটা তাঁরা হিসাবে আনেন নি ও ধারণা করতে পারেন নি, তা হল, যে রাশিয়ায় ইতিমধ্যে অক্টোবর বিপ্লব জয়লাভ করেছে, সেখানে জমাট বাঁধা বিপ্লবী শক্তির উদ্যম, উপরন্তু জার্মানীরও উদ্যম, যারা নিজেদের নভেম্বর বিপ্লব ঘটাবে।

যদিও তারা জার্মান জনগণকে "খাদ্য ও শান্তি"-র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তারা কোনটাই রক্ষা করেনি। যদিও তারা পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী ছিল, তবুও কার্যতঃ তারা দুজায়গায়ই মুস্কিলে পড়েছিল এবং যেটা তারা একেবারে চায়নি, সেটাই ঘটল—পূর্ব, পশ্চিম দুজায়গায়ই তাদের সৈন্যদের বিপ্লবী মনোভাবের বিস্তার। যদিও তারা ভেবেছিল যে, দেশের লোকসংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগ লোক, শতকরা ৫৪ ভাগ শিল্প ও শতকরা ৯০ ভাগ কয়লাসহ অঞ্চল অধিকার করে তারা সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবকে দমন করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা পরাজয়ের তীরে দুলছিল। যে ব্রেস্ট সন্ধি তাদের ক্ষুধাকে মেলে ধরেছিল। সেই সন্ধি তাদের পক্ষে সামরিক ধ্বংস ও জার্মানীতে বিপ্লবের বিস্ফোরণের দিকে আরো একটি মৃত্যুঘাতী পদক্ষেপ।

ফলতঃ, হিটলার তাঁর মেইন ক্যাম্প-এর ব্রেস্ট সন্ধিতে জার্মান নীতিকে মাজাঘষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান

ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেন যে, ব্রেস্ট সন্ধি প্রধানতঃ কূটনৈতিক ভুল এবং উপরন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক অবনতি এমন এক সময়ে যখন জার্মান শাসকরা প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগে যোগাযোগের সমস্যার মুখোমুখী হলেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে, এখন যে সব বিষয়কে আধুনিক জার্মান ঐতিহাসিকরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তার উল্লেখ করা উচিত। যেমন, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ঐতিহাসিকরা ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে জার্মানীর সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাববাদী পরিস্থিতির দিকে ফিরিয়েছেন এবং অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবের বিষয়ে চিন্তা করেছেন, যখন পশ্চিম জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল লেখকরা "বিপ্লব রপ্তানী" ধারণা নিয়েই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ঐতিহাসিকরা জার্মান ও সোভিয়েত জনগণের সম্পর্কের ঘটনা ও সমস্যাকে প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতার স্মারক মনে করেছেন, আর পশ্চিম জার্মান লেখকরা কাইজারীয় সমাজতান্ত্রিকদের সরকার ফ্রেডারিখ ইবার্ট ও ফিলিপ স্কেডেমানের দ্বারা কার্যকরী সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংগে সম্বন্ধের বিচ্ছেদের প্রশংসা করেছেন। হারমান স্টেগেমান, সুপরিচিত প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক বিষয়টাকে আরো দূরে নিয়ে গেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে ১৯১৭-১৮-র ঘটনা রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে চিরাচরিত সুসম্পর্ককে শেষ করে দিয়েছে এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের ওপরেও জার্মানীতে নভেম্বর বিপ্লবের উপরে যোগ দিয়েছে। এর সিদ্ধান্ত টানতে তিনি সর্বোপরি ইতিহাসকে স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতই কি জাঙ্কার বুর্জোয়া জার্মান ও বুর্জোয়া ভূস্বামীদের রাশিয়ার মধ্যে চিরাচরিত সুসম্পর্ক যুদ্ধটা ঠেকিয়ে ছিল, যার ফলে দুদেশকে পারস্পরিক ধ্বংসের মাশুল দিতে হল? ১৯১৭-১৮-র বিপ্লবের ঘটনা রাশিয়া ও জার্মানীর জনগণকে কি প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদের সনাতন রীতি ফিরিয়ে আনার ও দৃঢ় করার ও সমাজতান্ত্রিক পারস্পরিক সহায়তার অপূর্ব সুযোগ দেয়নি, যে সুযোগ এক নতুন রুশ-জার্মান যুদ্ধকে সরিয়ে দেবে? আসল ব্যাপার হল জার্মানীর শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোরা ও জাঙ্কারডম, যারা সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকদের অক্ষমতার ভান করে দেশের উপরে অধিকার বজায় রেখেছিল—তারা নিজেদের পথে চলবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ই. এইচ কার তাঁর 'বার্লিন-মস্কো' বইতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যখন জেনারেল স্টাফ ও ভারী শিল্পের মৈত্রী শক্তিশালী হল, তখন নতুন জার্মানির নীতি, যা তারা সব চেয়ে স্বার্থানুকূল মনে করেছিল, তার উপরে নির্ভর করত। সর্বোপরি, তারা সোভিয়েত ও জার্মান জনগণের বিপ্লবী সৈন্যদলের মধ্যে সংযোগ নিবারণে, জার্মানীতে এই সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করায় এবং জার্মান শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করায়, এমন কি তার নেতাদের হত্যায় আগ্রহী ছিল। লেনিনের

ভাষায় বলতে গেলে তারা তার দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, "পৃথিবীর স্বাধীনতম ও অগ্রসরতম সাধারণতন্ত্রের অন্যতম জার্মান সাধারণতন্ত্রে 'স্বাধীনতা' হল বিনা শাস্তিতে প্রলেতারিয়েতদের বন্দী নেতাদের হত্যা করার স্বাধীনতা।

যেহেতু বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে সব দোষের মূল মনে করা হয়েছিল, অতএব তাদের পক্ষে "পিছনে ছুরি মারা"-র পুরনো সামরিক ধারণা, যেটা জার্মান বাহিনীতে নভেম্বর বিপ্লবের ফলে দেখা দিয়েছিল বলে গুজব, সেটা ফিরিয়ে আনা খুবই স্বাভাবিক। উইমার সাধারণতন্ত্রের সময়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে গেল, সেই সময়ে সমরবাদীরা জার্মানির পরাজয়ের দোষ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এই কাহিনী রটিয়েছিল। এখন গল্পটা কিছুটা অদলবদল করা হল, ফলে আরো ভালভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা সেই সময়ে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র থেকে এমনকি শস্যের মাধ্যমেও যে সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিলেন তা যথার্থ প্রমাণ করতে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন, অন্য দিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পূর্বাঞ্চলের বিপ্লবের আশংকার ফলে জার্মান সরকার ভার্সাইতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব আমরা দেখছি, কাহিনীর পরিবর্তনের ফলে জার্মানীর সামরিক পরাজয়ের দোষ রাশিয়ার উপরে চাপানো হল, আর আগে দোষ চাপানো হয়েছিল জার্মানি শ্রমিকদের উপরে। তবুও লেনিন সতর্ক করেছিলেন যে, পশ্চিমী শক্তির জার্মানির পক্ষে "সম্পূর্ণ বিধ্বংসকারী, ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শর্তের চেয়ে অনেক কঠোর" সন্ধির শর্ত রচনা করেছে। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, জার্মান যে "বলশেভিক বিরোধী নীতি" গ্রহণ করেছে পশ্চিমী শক্তিদের খুশী করার জন্য তা জার্মানীকে বাঁচাবে না, বরং দেশ ও তার বিজেতাদের "গোলযোগ ও বিশৃংখলা"য় ডুবিয়ে দেবে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে হিংস্র ভার্সাই সন্ধির প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভাব কি ছিল। পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নি। যাই হোক, একটি জার্মান প্রবাদে বলে, নীরবতাও একরকমের উত্তর। ঐ ঐতিহাসিকরা হয় সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়কে এড়িয়ে যাচ্ছেন অথবা অন্য সমস্যার মত এটিকেও উচ্ছেদ করছেন। ডিয়েট্রিচ্ গেয়ার-এর "উইলসন ও লেনিন"-এর কথাই ধরুন, যাতে প্রমাণ করার যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে "গণতান্ত্রিক" দিক থেকে দেখেছিলেন আর লেনিন দেখেছিলেন "একনায়কত্বের" দিক থেকে।

প্রকৃতপক্ষে যখনই সোভিয়েতের ভার্সাই বিরোধী মনোভাবের কথা ওঠে, তখনই প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে যে, রুশ "বলশেভিকবাদ" পশ্চিমী শক্তিগুলিকে একত্রে, আক্রমণের জন্য জার্মান

"জাতীয়তাবাদ" এমনকি সমরবাদের সংগেও মৈত্রীর চেষ্টা করেছিল। তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রথম এই বয়ানের পরিকল্পনা করেন, যিনি ১৯১৯-এ তাঁর বিখ্যাত Fontainebleaur স্মারকগ্রন্থে তাঁর ভার্সাই সংগীদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন। তবুও তিনি এটাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে নয়, সম্ভাবনা বলে বর্ণনা করেছিলেন। এখন, প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকরা আবার এই ধারণাকে জাগিয়ে তুলছেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জনগণ জার্মান শ্রমিক ও বাকী জার্মান জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। ভার্সাই-এর বিপজ্জনক মুহূর্তে ও পরে রুর অধিকারের সময়ে সোভিয়েত জনগণ জার্মান জাতীয় স্বার্থের প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখিয়েছিল এবং এমনকি যখন জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিল না, তখনো সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছে। তার জার্মান শ্রমিক শ্রেণী তার প্রলেতারিয়েত দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে ও কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়ে "সোভিয়েত রাশিয়া অসহযোগিতা কর" এই সতর্কবাণীতে এক কার্যকর প্রচার শুরু করল। এ বিষয়ে পশ্চিম জার্মান লেখকরা কিছু বলেন না। অন্যদিকে, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ঐতিহাসিকরা বিশাল দলিল উপকরণের সাহায্যে সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্কের সাধারণ সমস্যার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকের গভীরে প্রবেশ করলেন। জার্মান প্রগতিবাদীরা যে সোভিয়েত জার্মান সম্পর্কের সাধারণ সমস্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হারিয়ে ফেলেন নি এটা প্রশংসনীয়।

পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরাও সামরিক সমস্যার সন্ধান করছেন। পশ্চিম জার্মানি শাসনের রাজনৈতিক ও ভাববাদী প্রয়োজনের উত্তরে তাঁরা পরবর্তী সময়ে তাঁদের আগ্রহকে জড করেছেন এবং "আধুনিক ইতিহাস"কে বিশদ ব্যাখ্যা করার মাধ্যমরূপে সাংবাদিক জগতে আক্রমণ করেছন। প্রাচীন বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীর জন্য গর্ব করতেন, লিওপোল্ড ব্যাংকের ভাষানুযায়ী, যাঁরা দাবী করতেন যে "ঠিক যেমন ঘটেছে" তেমনই তাঁরা লিখতেন, সেই দাবী বিশেষতঃ সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্কের সমস্যার ক্ষেত্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। যুদ্ধের সময়ে র‍্যাপালো চুক্তির প্রতি মনোভাব এবং জার্মানির বৈদেশিক নীতির তথাকথিত পূর্ব ও পশ্চিমে উত্থানের দ্বারা এটা প্রমাণিত।

ভার্সাই ব্যবস্থা জার্মানীকে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ফেলল। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতি এত অসুবিধাজনক যে, ১৯১৯ সালেই কার বললেন, জার্মানীর "সব রাস্তা পূর্বমুখী" হয়ে দেখা দিল। শুধু জার্মানীর জনগণই নয়, শাসকশ্রেণীর প্রভাবশালী অংশ ও সোভিয়েত রাশিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠতর

সম্পর্কের মধ্যে আশ্রয় পেল, কারণ তারা বৈদেশিক বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষ্কৃতি খুঁজছিল এবং তাদের বেকার কারখানা গুলির জন্য অর্ডার চাইছিল। জার্মানীর শাসকরা দুটো কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার সংগে আরো আগে সম্বন্ধ স্থাপন করেন নি: প্রথমতঃ যেসব বৃহৎশক্তি (বিশেষতঃ সামাজিক গণতান্ত্রিকদের উচ্চশ্রেণী) "বলশেভিকবাদ বিরোধিতা"-কে তাদের রাজনৈতিক নীতি করে তুলেছে তাদের জন্য এবং মৈত্রীশক্তির চাপের জন্য। মস্কোতে জার্মান দূতাবাসের তৎকালীন উপদেষ্টা গুস্তাভ হিল্জার তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন যে, সোভিয়েত জার্মান সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিবর্তন দেখলেই পশ্চিমী শক্তিরা চাতুরী এবং কোলাহল এমন ভীষণভাবে শুরু করত যে, জার্মান শাসকরা, বিশেষতঃ যারা এর একটা কারণ খুঁজত, তাঁরা ভয়ে কুঁকড়ে যেত। এইসব কারণে, দুই দেশ ১৯২২-এর এপ্রিলে জেনোয়া সম্মেলনে র‍্যাপালো চুক্তি নামে এক চুক্তিতে সই করল। এই চুক্তির জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক ফিরে এল ও স্বাভাবিক হল এবং একদুট ও বৈষম্য মূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। জোসেফ ওয়ার্থ যথার্থই বলেছেন যে, "বিরাট দুর্ঘটনার পর র‍্যাপালো চুক্তি পৃথিবীর শ্রমিকদের দ্বারা প্রথম যথার্থ শান্তিপূর্ণ সৃষ্টিরূপে অভিনন্দিত হল"। ওদিকে পশ্চিমী নেতারা এই ঘটনায় দুঃখিত হলেন। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের মুখপত্র '*টেম্পস*' জার্মানীর বিরুদ্ধে বাধা প্রদানকারী যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন পর্যন্ত শুরু করল। স্পষ্টতঃ অধিকাংশ পশ্চিম জার্মান লেখকরা র‍্যাপালোর বিরুদ্ধে প্রচার করছিল।

তবুও এই চুক্তির সবাধিক প্রবল বিরোধিরাও এর বিষয়বস্তুতে আপত্তিজনক কিছু পায় নি। তারা যা সহ্য করতে পারছিল না তা হল, "র‍্যাপালোর মনোভাব" অর্থাৎ চুক্তিতে প্রকাশিত নীতি ও তৎকালীন সোভিয়েত জার্মান সম্পর্কের বাস্তব দৃষ্টিভংগী দুই বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর পৃথক সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। যদি এই নীতিগুলো বজায় থাকত, তাহলে ইউরোপীয় শান্তি যথেষ্ট উপকৃত হত। তখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানকে ব্লাড হাউণ্ড হিসাবে ব্যবহারের যে সুযোগের কথা বিসমার্ক বলেছিলেন। সোভিয়েত জার্মান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বদলে দিতে পারত, আন্তর্জাতিক ঘটনায় জার্মানিকে তার জায়গা ফিরে পেতে সাহায্য করত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সমর্থকদের নতুন যুদ্ধ আরম্ভ করার সুযোগ দিত না। পশ্চিমী শক্তিরা ক্রুদ্ধ হল। এখনো পশ্চিম জার্মান লেখকদের একটা বড় অংশ একই কারণে "র‍্যাপালো মনোভাব"কে আক্রমণ করেছে। Die Gegenwart পত্রিকা চুক্তিটিকে "প্রেত" এবং "চাঞ্চল্যকারী ঘটনা" বলে বর্ণনা করেছে এবং Merkur, যারা নিজেদের ইউরোপীয় মতামতের জার্মান পত্রিকা

বলে ঘোষণা করে। তারা বলেছে যে, র‍্যাপালো একটা "রহস্য, স্বপ্ন ও প্রেত" মাত্র। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, র‍্যাপালো চুক্তি শুধু পশ্চিমী শক্তিদের ভয় দেখানোর জন্য হয়েছে এবং এটাকে শুধু জার্মানিই কাজে লাগাচ্ছে না, সোভিয়েত রাশিয়াও জার্মানির বিরুদ্ধে এটা কাজে লাগাচ্ছে। আরো যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, র‍্যাপালো একটা ধাপ্পা এবং রাজনৈতিক কৌশলের যন্ত্র মাত্র। অনেকে বলেছে, সোভিয়েত জার্মান সামরিক মৈত্রীর সব বৈশিষ্ট্য র‍্যাপালোর রয়েছে।

সব ভুল। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাব্য অন্যতম প্রকাশ র‍্যাপালোর বক্তব্যকে হেয় করাই তাদের লক্ষ্য। এ বিষয়ে তাদের সর্বাধিক ভয় হল ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের জয়। তারা খুব ভাল ভাবেই জানে যে, বর্তমানে পশ্চিম জার্মানিতে পুনরাবির্ভূত সমরবাদের সংগে র‍্যাপোলোর বক্তব্য প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে ও এই সমরবাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

ইতিহাস বিকৃত করায় নিপুণ ঠাণ্ডা যোদ্ধারা যুক্তি দেখায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর র‍্যাপালোর পুনরাবির্ভাবের কোন উপায় নেই, যে র‍্যাপালো তাদের মতে ছদ্মবেশী সামরিক চুক্তি।

তবুও পশ্চিম জার্মানিতে এমন লোক আছে যারা এটাকে অসত্য ঘোষণা করে। তারা বলে, প্রথমতঃ র‍্যাপালো কখনই শুধু কৌশলী আলোচনা মাত্র ছিল না, দ্বিতীয়তঃ এটা কখনো গোপন সামরিক চুক্তি ছিল না এবং তৃতীয়তঃ কেউ র‍্যাপালো চুক্তির বক্তব্য ফিরিয়ে আনার কথা বলছে না।

সোভিয়েত জার্মান সম্বন্ধের ইতিহাস রচয়িতা Dieter Posser-এর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম হল। "র‍্যাপালো, টরোগেন নয়", তিনি এইভাবে, প্রাচীন রুশ-প্রাশিয়ান সামরিক মৈত্রীর টরোগেন ধারণা থেকে র‍্যাপোলের ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

পশ্চিম জার্মান ইতিহাসের একটি তৃতীয় এবং প্রাচীনতম ধারা রয়েছে: একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার বৈষম্যগুলিকে কাজে লাগানোয় পশ্চিম জার্মানির সাফল্য এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে "র‍্যাপালো বক্তব্য"-র বিরোধী এমন কি স্তাবকেরাও সমস্যাটার বিচার করে। অনেকে বিশ্বাস করে যে, এটা সফল হতে পারে, অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। অবশ্য একটা জিনিস স্পষ্ট যে, পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিক ও প্রকাশকরা এখনো কাইজার, উইমার ও নাৎসী রাজত্বের ধারণার দ্বারা মুগ্ধ। পূর্ব পশ্চিম বৈষম্যকে মূলধন করাকে এখনো "রাজনৈতিক শক্তি" ও "কূটনীতি"-র প্রমাণ বলে মনে করা হয়। এই সব লোক যা বুঝতে পারছে না তা হল রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় থেকে এবং বিশেষতঃ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর

উদ্ভবের সময় থেকে, বৈষম্য সৃষ্টির নীতি ও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুধু যে মনুষ্য জাতির প্রধান স্বার্থের বিরোধী তাই নয়, এটা দেশ ও জাতির নির্দিষ্ট স্বার্থেরও বিরোধী বটে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যা দরকার তা হল, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে দৃঢ় করা, যুদ্ধের আশংকাকে দূর করার জন্য বাস্তব গঠনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ের সমাধানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সম্প্রতি, পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকরা আবার দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যবর্তী জার্মানির বৈদেশিক নীতির সমস্যায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আবার "লোকার্নো বক্তব্য" "র‍্যাপালো বক্তব্য"-এর বিরোধী হয়ে উঠেছে। গুস্তাভ স্ট্রেসমানের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের মূল্যের বিষয়ে পশ্চিম জার্মানিতে এক আলোচনা দেখা দিল। এই তর্ক দুটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রকাশ করেছে: প্রথমত: প্রকাশিত স্ট্রেসমান দলিলগুলি বিকৃত, বিশেষত: যেখানে সোভিয়েত জার্মান সম্বন্ধের সমস্যা জড়িত এবং দ্বিতীয়ত: পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভারসাম্য রাখার নীতি, অর্থাৎ, বিসমার্কীয় পদক্ষেপ হিসাবে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের দ্বারা চাপানো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী শক্তির মধ্যে কৌশলের নীতি প্রকৃতপক্ষে র‍্যাপালো নীতিকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টার এক আবরণমাত্র ছিল। "র‍্যাপালোর বক্তব্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু "লোকার্নোর বক্তব্য" কি ছিল?

"লোকার্নোর বক্তব্য" পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীতে জার্মানি, মিউনিখ আলোচনা ও শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রবেশের পথ সুগম করে দিল। সত্যই, এ পথ আঁকাবাঁকা, নানা সাম্রাজ্যবাদী বৈষম্যে ভরা যা সুগঠিত পরিকল্পনানুযায়ী জার্মান সমরবাদের দৃঢ় শক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের দায়িত্বে সমাধানের অপেক্ষায় ছিল। শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণ "চালনা"-র এক রাজনৈতিক কৌশলের নীতিতে বিকাশিত হয়ে উঠল।

আমরা জানি যে পরিকল্পনাটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন আকারে এর পুনরাবৃত্তির রোধে মানুষ অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। এইজন্য এর আত্মপক্ষ সমর্থন ইউরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এক আশংকাস্বরূপ স্পষ্টত:, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণায় মানুষ লাভবান হবে। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে ঘোষিত এইসব লেনিনবাদী নীতির প্রভাব শুধু তাদের নাটকীয় গুরুত্ব থেকে উদ্ভূত নয়। সাধারণ মানুষকে জয় করেছে এবং সেগুলি মানুষের ভাগ্যের উপরে এক ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারকারী ভীতিজনক উপাদানের জোগান দেয়।

৩

অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা সূচিত নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনই ছিল একমাত্র শক্তি যা সমরবাদের পথ বন্ধ করতে ও যুদ্ধকে বাধা দিতে পারত। যা হোক, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী তথাকথিত শ্রমিক অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা সমর্থিত সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সুবিধাবাদী কার্য-কলাপের জন্য এবং ১৯১৪-র দুঃখজনক আগস্টে শান্তিভঙ্গের কারণে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এড়াতে অসমর্থ হল। সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, এই শ্রেণী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সার্বজনীন যুদ্ধবিরোধী প্রতি-ক্রিয়া শুরু করার মত যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং তাছাড়া, পরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিশ্বব্যবস্থা যেরকম শক্তিশালী হয়েছিল, তার অভাব ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধ থামাতে এবং শান্তির দৃঢ়তাকে এক বাস্তব উদ্যোগ করে তুলত।

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়ে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে সমাজতান্ত্রিক শান্তি অঞ্চল উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত শান্তির জন্য সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নির্ধারণ কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সুযোগ পায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসার পর এই সুযোগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক শক্তিশালী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক মানুষের সহানু-ভূতি পেয়েছিল, বিশেষতঃ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের সহানুভূতি।

এই বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হল জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। জার্মান ইতিহাসের প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়েছিল, পশ্চিমী শক্তির তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে জার্মানীকে টুকরা করতে চাওয়ার উপর এবং জার্মান জনগণের জাতীয় স্বার্থকে তুচ্ছ করে তারা ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মানী সৃষ্টি করল। যেটা তারা দ্রুত আক্রমণাত্মক অ্যাটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করল। এইভাবে মধ্য ইউরোপে পৃথক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাববাদী ব্যবস্থাসহ দুটি জার্মান রাষ্ট্র দেখা দিল, যাদের পরস্পরের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিল না। এই দুই জার্মানীর লোকসংখ্যা অসম, অর্থনৈতিক ক্ষমতা অসম এবং বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র। তবুও, ঐতিহাসিক গঠনের জীবন্ত যুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ যদি জনসাধারণের উদ্যম তার পিছনে প্রধান সৃষ্টিশীল শক্তিরূপে থাকে,

তাহলে, গাণিতিক হিসাব যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, প্রগতিশীল শক্তির দ্বারা চালিত বিশাল ক্ষমতা এবং তার ফলে সৃষ্ট সম্ভাবনা তাতে কিছুই বোঝা যাবে না। জার্মান জাতির দুর্গতির মূল হল পশ্চিম জার্মানীতে একচেটিয়া কারবার ও সমরবাদের পুনর্জাগরণে বাধা দিতে পারার ব্যর্থতা। অন্যদিকে তার সৌভাগ্যের মূল হল এই যে, বারো বছরের নাৎসীবাদ, যা জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেদের নষ্ট করছে এবং জাতীবাদ, জাতীয়তাবাদ ও আক্রমণাত্মক সমরবাদকে কাজে লাগিয়ে জাতিকে শোষণ করেছে, সেই নাৎসীবাদ থাকা সত্ত্বেও জার্মানীতে এমন রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে, যা জাতির সম্মান বাঁচানোর জন্য শ্রমিক ও পূর্বজার্মানীর জনগণকে মিলিত করেছে এবং এমন দিগন্ত খুলে দিয়েছে যা আগে কখনো জার্মানী দেখে নি। যে সব লোক জার্মান সমরবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা বুঝেছে, তাদের সচেতন প্রচেষ্টায় এগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিস্থিতির আড়ালে রয়েছে বিশ্বশক্তির নতুন সম্বন্ধ, হিটলার জার্মানীর উপরে সোভিয়েত জয়ের নতুন পদক্ষেপ এবং অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকে সোভিয়েত-জার্মান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার বিশাল সঞ্চয়।

জার্মান শ্রমিকশ্রেণী এক প্রচণ্ড ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, দুই-ই। ইউরোপীয় মহাদেশে নিরাপত্তাব সাধারণ সমস্যার সমাধানে এক ঐক্যবদ্ধ শান্তিপ্রেমী গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রই হবে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই কারণে ওয়াল্টার আলবৃন্ট যথাযথ লিখেছেন যে, "জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই সত্যের মধ্যে আছে যে, জার্মানীর জাতীয় পুনর্জাগরণ ও শান্তিপ্রেমী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে তার উন্নতিতে সে একটা মহৎ ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিচ্ছে।" জার্মান সমস্যার সমাধানের প্রতি প্রথম পদক্ষেপরূপে দুটি বর্তমান জার্মান রাষ্ট্রের মিলনের প্রস্তাব ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ, বাস্তব এবং জার্মান জনগণের জাতীয় স্বার্থ ও ইউরোপীয় শান্তিব পক্ষে সংগত। সেইজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন একে সমর্থন জানিয়েছে। এটা উপেক্ষা করে এবং আক্রমণাত্মক অ্যাটলান্টিক গোষ্ঠীর কাঠামোর মধ্যে আণবিক অস্ত্রের চেষ্টা করে পশ্চিম জার্মানীর শাসকরা শান্তিপূর্ণভাবে জার্মান সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আগ্রহের অভাবকে প্রকাশ করছে। **ন্যাটোর** মধ্যে তাদের একপক্ষীয় পথ গ্রহণ করে তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংগে সম্পর্কস্থাপনের সব সোভিয়েত প্রস্তাবকে উপেক্ষা করেছে এবং সোভিয়েত-জার্মান সম্বন্ধের অতীত শিক্ষাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞা করেছে।

তবুও জার্মান শ্রমিকদের পক্ষে এই শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। জার্মান শ্রমিক ও তাদের ঐতিহাসিক আগ্রহের দ্বারা সৃষ্ট জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর সংগে মৈত্রীপূর্ণ সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বন্ধন গড়ে তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কজনিত সমস্যার যে সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গেছে সে কথা বলার ন্যায়সংগত কারণ রয়েছে। প্রলেতারিয়েত আন্তর্জাতিকতাবাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিই হল এই সমাধান। জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক যদিও তার প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি পরিত্যাগ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে, তাহলে ইউরোপীয় শান্তি অত্যন্ত উপকৃত হবে। তাহলে রণদেবতা মংগল, যিনি এতবার ইউরোপকে ধ্বংস করেছেন, তিনি আর তাকে দলিত করতে সাহস করবেন না।

এক সংঘের কাঠামোতে দুটি জার্মান রাষ্ট্রের যোগাযোগ শুধু ইউরোপেই শান্তি আনবে না, সারা পৃথিবীতেও শান্তি আনবে। সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে জি. ডি. আর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক সুন্দর এগিয়ে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশাল পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, যখন জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে শুরু করেছিল এবং মধ্য ইউরোপে শান্তি স্থাপনে এক গুরুত্বপূর্ণ দায় নিয়েছিল। যদি ফেডারেল রিপাব্লিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে তার নীতি গড়ে তুলত, তাহলে ইউরোপের জাতী ও ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হত, সোভিয়েত ও জার্মান জনগণের প্রতিভায় সৃষ্ট বাস্তব ও সাংস্কৃতিক মূল্যের সম্ভাবনাপূর্ণ বিনিময়ের পথ এবং সব কিছুই ঘটত পৃথিবীর স্বার্থে।

১৯৫৭

ভার্সাই তত্ত্ব ও তার সমীক্ষা

[রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়াররূপী ঐতিহাসিক দলিল]

বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শান্তির জন লড়াইতে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পথ থেকে বার করে এনেছিল, সেই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল গোপন কূটনীতি ও গোপন চুক্তি তুলে ধরা যেগুলির দ্বারা শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের পথ তৈরী করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শান্তির পরিকল্পনা করছিল।

১৯১৭-র মার্চে ভবিষ্যৎ সোভিয়েত সরকারের শান্তি পরিকল্পনার খসড়া করে লেনিন "জার রাজতন্ত্রের ও সমস্ত বুর্জোয়া সরকারের হিংস্র লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য এই সব চুক্তি" প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে ছিলেন।[১] যখন অক্টোবর বিপ্লব জয়ী হল, তখনই এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হ'ল। প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের তৃতীয় দিনেই ঘোষণা করা হ'ল যে গোপন চুক্তি প্রকাশ করা হবে। খুব সাম্প্রতিক অতীতের সংগে সরাসরি সংযুক্ত গোপন কূটনৈতিক চিঠিপত্র ইতিহাসে এই প্রথম প্রকাশিত হতে যাচ্ছিল। প্রথম নাবিক নিকোলাই গ্রিগোরিয়েভিচ মার্কিন-এর মত অভিনব প্রকাশক তা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, যিনি সাক্ষীদের বক্তব্যানুযায়ী মেশিনগানের সংগে খুবই পরিচিত এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আর একটি অস্ত্রেও কম দক্ষতা দেখাননি : দলিলের প্রকাশনা। তাঁর *গোপন দলিলের* সাতটি সংগ্রহ (পেত্রোগ্রাদ, ১৯১৭-১৮) ১৯১৭-র শেষে ও ১৯১৮-র শুরুতে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং জনসাধারণের ওপরে সেই রকম প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। কেউ এর গুরুত্ব অস্বীকার করবে না, যদিও তা প্রকৃতপক্ষে ভুল, যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক কাজ হিসাবে প্রকাশনা শান্তির বৈদেশিক নীতিকে অগ্রসর করে।

তাদের বিপ্লবী শ্রেণীর পটভূমিকা একটি স্বতঃসিদ্ধ তথ্য। একজন জার্মান ঐতিহাসিক এ রোজেনবার্গ লিখেছিলেন, "গোপন দলিলের

১। লেনিন, সংগৃহীত বচনাবলী, খণ্ড ২৩, পৃঃ ৩৩৮।

উন্মোচনকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম আবর্তিত হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার লোকসহ এই সংগ্রাম ছিল তীব্র, হিংস্র, কারণ দুই পক্ষই জানত যে, বিবাদের বিষয় ছিল যুদ্ধ বা শান্তি, গণতান্ত্রিক ধরনে বা নৈতিক ধরনের সাধারণতন্ত্র [সোভিয়েত— এ. ডুম্নাই.]। তৎকালীন পদ্ধতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনের ওপরে উদাহরণের যে দৃঢ়তা প্রযুক্ত হয়েছে, তা খুব কঠিন ছিল।" অন্যত্র রোজেনবার্গ লিখেছিলেন: যখন গোপন দলিলের সমসাময়িক জীবনের কোন প্রভাব আছে, তা প্রকাশ করা সত্যিই নতুন···এই বিপ্লবী ধরনের কাজের বিপ্লবী উদ্দেশ্য ছিল।"

সোভিয়েত প্রকাশনা প্রকৃতই এক বিপ্লবী উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করেছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সীমারেখা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং গোপন কূটনীতির প্রক্রিয়া এই প্রকাশনা নগ্নভাবে প্রকাশ করেছিল। এই অর্থে, প্রকাশনাগুলি শান্তির শক্তিশালী অস্ত্র ছিল।

কিন্তু প্রথম ও তার পরবর্তী প্রকাশনের গুরুত্ব বেশী ছিল, কারণ সেগুলো শুধু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকেই প্রকাশ করে নি, উপরন্তু যুদ্ধকালীন আলোচনা, বোঝাপড়া ও গোপন চুক্তিকেও প্রকাশ করেছে, যেগুলো পৃথিবীর ভাবী সাম্রাজ্যবাদী পুনর্বিভাগের শর্ত গঠনের কারণে ভার্সাই পদ্ধতির মূলমন্ত্র হয়েছে। এইসব দলিলের রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ যেহেতু এইগুলি অগ্রগামী, কারণ, বিশেষ প্রচারোদ্দেশ্যে প্রকাশিত ও অত্যন্ত বিকৃত "রঙীন বই" ছাড়া কয়েক দশকের মধ্যে সাধারণতঃ কূটনৈতিক দলিল পাওয়া যেত না।

সাম্রাজ্যবাদী সরকাররা বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দোষ থাকতে চাইত এবং ভবিষ্যৎ শান্তি চুক্তি বা সংক্ষেপে, যুদ্ধোত্তর যে ব্যবস্থা ফরমায়েশী বৈষম্য নতুন তীব্র যুদ্ধ প্রস্তুতির পথ তৈরী করছিল, তার যুদ্ধকালীন কলহ-সংক্রান্ত উপকরণ তাদের কোন বইতে ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত পূর্বসূরী যতই নতুন উপাদানের প্রকাশনাকে উৎসাহিত করুক, তার বৈজ্ঞানিক প্রভাবকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া যেতে পারে না।

১

বিজয়ীদের সংগে উইমার জার্মানির সম্পর্কের প্রত্যেক রাজনৈতিক ও কূট-নৈতিক গোলক ধাঁধায় জার্মান নেতারাও তাঁদের পশ্চিমী সঙ্গীদের মধ্যে সরকারী আলোচনায় "যুদ্ধাপরাধীর প্রশ্নটি নিশ্চিতভাবে দেখা দিল। জার্মানির পরাজয়ের ফলে উদ্ভূত নতুন রাজনৈতিক শর্তের দ্বারা তর্কটা প্রভাবিত হল এবং ভার্সাই ব্যবস্থা সংক্রান্ত কৌশলগত দ্বন্দ্বে নতুন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন করল।

আসলে, যুদ্ধাপরাধ ছিল শুধু প্রচারের বিষয়বস্তু। কিন্তু পৃথিবীর পুনর্বিভাগকারী গোপন চুক্তিকে বাধাদানকারী গোপন রাজনৈতিক দলিলের সোভিয়েত প্রকাশনা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের তাদের পথ পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল। গোপন চুক্তি ও সামরিক মৈত্রীর আবেদনে, জাতিগুলির আত্ম-প্রতিজ্ঞা বজায় রাখার আবেদন ইত্যাদিতে উইলসনের বিখ্যাত ১৪ দফা দাবীর দ্বারা নতুন মনোভাব রূপ পাচ্ছিল।

সোভিয়েত প্রকাশনা ও ব্রেস্ট-লিটোভস্ক আলোচনায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত ভঙ্গীর কারণে মৈত্রীশক্তি ভাবল "যুদ্ধাপরাধ" সংক্রান্ত বিবাদকে ন্যায্য শান্তি"র বিষয়ে পরিবর্তিত করাই বুদ্ধির কাজ হবে। কিন্তু যেই জয়ী মিত্র-পক্ষ পরাজিত জার্মানিকে শান্তি শর্তের নির্দেশ দেওয়া শুরু করল, তখন আবার যুদ্ধাপরাধের প্রশ্ন দেখা দিল। তখন যে জার্মান জনগণ "ন্যায্য শান্তি"-র আশা করেছিল, তারা নিজেরাই দেখল যে, শান্তির শর্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের শান্তি বাণীর চেয়ে বাস্তব বিষয়ের উপরেই বেশী নির্ভর করছে।

তবু ও জার্মান সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকারের বৈদেশিক নীতি গঠনে উইলসনবাদই হল নির্দেশরেখা, যে সরকার বিপ্লবকে ঘৃণা করে ভিন্ন পথে গিয়েছিল জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া শান্তিবাদী ভ্রমসৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা লোককে বোঝাতে চেষ্টা করল যে জার্মানি কাম্য উইল-সনবাদী "ন্যায্য শান্তি" পাবে যদি বিনা প্রশ্নে মিত্রপক্ষের দাবী পূর্ণ করা হয়।

তারপর সেইদিন এল যেদিন গর্বিত বিজয়ীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করা শুরু করল। যুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা সম্পন্ন গোপন চুক্তিগুলি এখন কার্যকরী হওয়ার সময়ে এসেছে। জয়ীরা তাদের প্রচণ্ড দাবী নিয়ে বাজি খেলতে শুরু করল আর যুদ্ধক্লান্ত ও দরিদ্র, করভারজীর্ণ জনসাধারণকে বলা হল: "জার্মানী টাকা দেবে।" যুদ্ধ শুরু করার বিষয়ে জার্মানীর দোষের অনুপাতে "ন্যায্যতা"-র পরিমাণও স্থির হবে এটা বোঝানোর জন্য "ন্যায্য শান্তি" ফর্মুলা বদলান হল। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বিনাশব্দে এই ব্যাখ্যা এবং আধিপত্যকারী মিত্র পক্ষের যুক্তি মেনে নিল।

Compiegne যুদ্ধ বিরতির দিন থেকে এই প্রচার চলতে লাগল, বিজয়ী দেশগুলির প্যারী সম্মেলন যখন শান্তিচুক্তির মূল নীতিগুলির কাজ করতে লাগল, তখন তো আরো বাড়ল।

সেই সংগে মিত্রপক্ষ জার্মানীর পরিস্থিতির সর্বাধিক সুযোগ নিল। ব্যাভে-রিয়াসরকারের প্রধান, "নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক" কুর্ট আইসনার দয়ার আশা করতে লাগলেন। পুরনো সমরবাদী জার্মানী ও বার্লিন সরকারের তিন সদস্য ফ্রেডরিখ এবার্ট, ফিলিপ স্কিডেমান ও গুস্তাভনোসকের মত উইলহেলবাদী ধারার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নীতির থেকে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে আইসনার, দ্বিতীয় উইলহেলম ও তার রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের বিশ্বযুদ্ধের প্রধান

অপরাধী প্রমাণ করে কিছু কূটনৈতিক দলিল প্রকাশ করলেন। আইসনার ঘোষণা করলেন, "যারা পড়তে পারে এবং যারা সৎ, আমি তাদের প্রত্যেককে দেখিয়ে দিয়েছি যে, কেমন করে নাটক অভিনয় করার মত এই অপরাধীদল বিশ্বযুদ্ধের অভিনয় করেছে ; যুদ্ধ হয়নি—এটা সাজান হয়েছে। "অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, "যুদ্ধের জন্য দায়ী মুষ্টিমেয় লোক জার্মান নয় অল্প দোষী লোক পিতৃভূমির নয়।

যখন মিত্রপক্ষীয় রাজনীতিকরা দোষ স্খালন করছেন, বিশেষত: এডোয়ার্ড গ্রে, তখন আইসনার "যুদ্ধ এবং যুদ্ধের যে নীতি জার্মান জাতি গহ্বরের প্রান্তে নিয়ে এসেছে, তার জন্য অপরাধী" বলে কাইজার সরকারের নিন্দা করলেন। তিনি বিশ্বাস করনে যে. কাইজার সরকারের পক্ষে ক্ষতিকর দলিল প্রকাশ করলে শান্তি সম্মেলন "পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে" যেতে পারবে। লক্ষ্য যখন স্থির হল, পথও তার উপযুক্ত হয়ে তৈরী হল : দলিল গুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল এবং প্রচুর জিনিস বাদ দেওয়া হল। কিন্তু তারা যে প্রতিক্রিয়া জাগাল, তা প্রচণ্ড। রাজতান্ত্রিকরা আইসনারকে বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীর ছাপ মেরে দিলেন, আর অদম্য জনসাধারণ সব গোপণ জার্মাণ দলিলের প্রকাশ. সব সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির উন্মোচন দাবী করল।

বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবসংক্রান্ত দলিলগুলি প্রকাশের জন্য কার্ল কাউটস্কি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সরকারের অনুমতি চাইলেন। সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকবার চিন্তা কাউটস্কির মনের কোথাও ছিল না। তাঁর মত একেবারে কার্ল আইসনারের মতই ছিল. শুধু এইটুকু তফাৎ যে, তিনি আরো সতর্ক এবং এবার্ট ও স্কিডেমানের ওপরে নজর রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হল নতুন রাজত্ব যে পুরানো যুগের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, সেটা সন্দিগ্ধ পৃথিবীর কাছে "প্রমাণ করা। কিন্তু সেটা এবার্ট-স্কিডেমান সরকারের কাছে বড় বেশী ঝুঁকি মনে হল। তারা এই শর্ত করল যে, কাউটস্কি আইসনারের মত গোপন দলিল দেখা মাত্রই" ছাপাবেন না. এমন কি, দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কোরার্ককে কাউটস্কির কার্যকলাপ দেখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই কাউটস্কি তাঁর সংগ্রহ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করে ছিলেন। তিনি মনে ভাবলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, "আলোচনার পরিচালক জার্মান সরকারের সংগে যে জার্মান সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাদের কোন মিল নেই। "কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সরকার ছাপার জন্য প্রস্তুত প্রকাশন বন্ধ রাখার আদেশ দিলেন এবং কাউটস্কি পরে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি আদেশ মেনে ছিলেন ও "নীরব হয়ে ছিলাম···আইনের কারণে নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণ, নিঃসন্দেহে ঐ একই

কারণে তিনি তার সংগ্রহ পরীক্ষা করায় ও অধ্যাপক Walter Schucking এবং কাউন্ট ম্যাক্স মন্টেগেলাসের দ্বারা সেগুলোর পরিবর্তনে রাজী হয়ে ছিলেন, ঐ দুজন এই উদ্দেশ্যে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সংগ্রহের কাজ চলাকালীন লিখিত এক বইতে নিঃসন্দেহে একই রাজনৈতিক কারণে, কাউটস্কি যুদ্ধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উল্লেখ করে ছিলেন। আমরা "উল্লেখ করে ছিলেন" বলছি, কারণ, গভীর পরীক্ষা ও শ্রেণী বিশ্লেষণ অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত ছিল। তিনি বলে ছিলেন, "যখন অপরাধীদের সন্ধান বন্ধ করার জন্য অনির্দিষ্টভাবে পুঁজিবাদের উপরে দোষ চাপানো হয়, তখন সেটা মার্কসবাদ নয়।" কাউটস্কি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে আরও সুবিধাজনক পথে বিষয়টা পরিবর্তিত করতে চাইলেন। তিনি "অপরাধীর অনুসন্ধানের" উপরে দৃষ্টি দিলেন এবং এই ভাবে পুঁজিবাদের দোষ থেকে নজর অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "সাম্রাজ্যবাদ, কথাটা আমাদের সমাধানের বেশী কাছাকাছি আনবে না।" এই বক্তব্যের প্রভাবে দলিল নির্বাচিত ও বিন্যস্ত হ'ল। তৎকালীন রাষ্ট্রসচিব অটো বয়ারের নির্দেশে তৈরী অস্ট্রিয় প্রকাশনেও এক মনোভাব দেখা গেল।

জার্মান দলিলের মূল রাজনৈতিক ধারণা উপাদানের সময় সীমাকেও প্রভাবিত করে ছিল। যখন থেকে যুদ্ধের উদ্ভবের সংগে ব্যক্তিগত যুদ্ধাপরাধকে এক মনে করা হয়েছিল, তখন থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান নির্ধারক তথ্য। সেইজন্য প্রাক যুদ্ধ সংকটের উপরে জোর দেওয়া এবং সেইজন্য ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে যা বিকৃত করে ছিল সেই সারা জেভো হত্যার ঘটনাই সংগ্রহের প্রথম বিষয়বস্তু ছিল। অন্য কোন তারিখ থাকলে হয়ত অন্য ধারণা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। ব্যাপকতর কালানুক্রমিক কাঠামো সাম্রাজ্যবাদী যুগে আন্তর্জাতিক বৈষম্যের বিশৃংখলাকে প্রকাশ করতে পারত। কাউটস্কি হয়ত সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পারার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে এ সব কিছু এড়িয়ে গিয়ে ছিলেন।

মিত্র শক্তি তাদের রায় জানিয়ে দিয়ে সব যুদ্ধাপরাধের বোঝা জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার পরে কাউটস্কির সংগ্রহ দিনের আলো দেখল। ক্ষতি পূরণের ছদ্মবেশে টাকা দাবী করার মিত্র পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে জার্মান সরকার সুইটজারল্যাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সংগে যোগাযোগ করল ও প্রস্তাব দিল যে এক নিরপেক্ষ কমিশন "যুদ্ধাপরাধ"-এর প্রশ্ন পরীক্ষা করুক। উত্তর যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই নির্দিষ্ট নিঃসন্দেহে জার্মান দায়িত্ব প্রমাণ হয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে ক্ষতিপূরণের সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে মিত্র পক্ষ "যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণ স্থির করার জন্য এক কমিশন" নিয়োগ করে ছিল। প্যারিসে ক্ষতি পূরণ নিয়ে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব হ'ল ও ১৯১৯-এ

মার্চে আধা সংকট সৃষ্টি করল। এতদিনে কমিশন তার তদন্ত শেষ করে এক প্রতিবেদন দিল।

নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরা প্রতিবেদনের কয়েকটি অংশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করে ছিলেন। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মনোভাব অনুযায়ী তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়ে ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁদের ১৯১৮-র ৫ই নভেম্বরের নোটের কথা ও বক্তব্যের উপরে জোর দিলেন, সে নোটে রয়েছে "মিত্রপক্ষের নাগরিক জনসংখ্যা ও তাদের সম্পত্তির উপরে স্থলে, সমুদ্রে ও শূন্যে জার্মানীর আক্রমণের দ্বারা যে ক্ষতি হয়েছে, সেই সব কিছুর জন্য জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেবে।" অন্যদিকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধ ব্যয়ের পূর্ণ প্রত্যার্পণ চাই ছিল, যার ফলে নতুন বিবাদ সৃষ্টি হয়ে ছিল, কারণ প্রতি সদস্যই তার ভবিষ্যৎ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে চাই ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাট হ'ল। যে ব্রিটিশ কূটনীতিকরা তাঁদের ফরাসী সংগীদের সংগে বোঝাপড়ায় পৌঁছে ছিলেন, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্রের নীতিগত মনোভাবের উপযুক্ত শর্তে আবৃত করলেন তাঁদের দাবীকে, যে মুখপাত্ররা শেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমশঃ তাঁদের নিজেদের দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থনও হারিয়ে ফেললেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মনে করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও মিত্র শক্তির মধ্যস্থ হয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত পথ তাদের সম্পর্ককে পরিচালিত করবে, এমন কি ক্ষতিপূরণ সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও। যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা প্রকৃত উদ্বিগ্ন ছিল তাদের ঋণ ফেরত পাওয়া সম্বন্ধে।

ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে ঝগড়া উইলসন মতবাদের বিপরীত দিক তুলে ধরল: রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন আমেরিকান প্রতিনিধি, আপসে বাধ্য এবং কার্যত তাদের নিজস্ব মনোভাব থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে, এমনকি বৃটিশ কূটনীতিকরা যা চেয়েছিল, তার থেকেও বেশী পিছিয়ে গেল এবং জার্মান অপরাধ ও বাধ্যবাধকতার আলোচনার দ্বারা তাদের রাজনৈতিক সুযোগের ক্ষতিপূরণ ঘটাল। এইভাবে ভার্সাই সৌধের নৈতিক স্তম্ভ বজায় রইল এবং "ন্যায্য শান্তি"-র যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি জয়ী হতে পারল।[১] তবুও জার্মান সরকারের উইলসনবাদী সংগঠন নতুন কিছুর ইঙ্গিত দিল। মিত্রপক্ষের শর্তের পুনঃ পরিবর্তনের কৌশলের বিষয়ে শাসক বুর্জোয়ারা নিজেদের

১। ফলতঃ যুক্তরাষ্ট্র ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির স্বাক্ষরিত সন্ধিতে শুধু জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত কোন ধারা নেই।

মধ্যে ঝগড়া শুরু করল। Count Ulrich von Brockdorff-Rantzau-এর নেতৃত্বে যে দৌত্য ভার্সাইতেই প্রেরিত হয়েছিল তারও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিল। ক্যাথলিক সেন্টারের নেতা Matthias Erzberger ভাবলেন যে শান্তিশর্তের বিরুদ্ধে আলোচনা করা অনর্থক। তিনি মনে করেছিলেন যে, সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ জার্মানীর দুর্ভাগ্যকে কমিয়ে দেবে, জার্মানীর আক্রমণ ও বিভাগকে বন্ধ করবে এবং জার্মানীর যুদ্ধাপরাধের প্রসঙ্গের বিষয়গুলির আলোচনা করা ভুল হবে। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা তাঁর কথায় সম্মত হতে রাজী হলেন এবং ভার্সাইতে প্রতিনিধিদলে সঙ্গত নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু রাজনৈতিক যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং বিশেষতঃ যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে। যুদ্ধাপরাধ কমিশনের সূত্রের বিষয়ে অগ্রিম বেসরকারী তথ্য পেয়ে জার্মান প্রতিনিধি। তার মত প্রকাশ করল। প্যারি সম্মেলনে Brockdorff Rantzau তাঁর বক্তৃতায় প্রধান যুক্তিগুলো দেখালেন। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের বলা হয়েছে আমাদের নিজেদের যুদ্ধের একমাত্র অপরাধী বলে স্বীকার করতে হবে। যদি আমি এটা স্বীকার করি, তাহলে সেটা মিথ্যা হবে। কেন যুদ্ধ হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে তার সব দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করতেই পারি না। হেগে শান্তি সম্মেলনে পূর্বের জার্মান সরকারের ব্যবহার, তার কাজের ধারা এবং জুলাই এর বারোটি করুণ দিনের ঘটনাই এর জন্য দায়ী হতে পারে যে, যে জার্মানীর লোকেরা যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেছিল, সেই জার্মানীই একমাত্র যুদ্ধের জন্য দোষী হচ্ছে···রুশ সৈন্য চালনার ফলে পরিস্থিতিকে বাঁচানোর কোন সুযোগ রাজনীতিকরা পান নি।"

আলোচনার ফলাফল ছিল পূর্বনির্ধারিত। ১৯১৯-এ বিজয়ী দেশগুলি জার্মানীকে শুধু প্রধান নয়, একমাত্র অপরাধী বলে ঘোষণা করল। জার্মান প্রতিনিধিদলকে বলা হল যে, তারা যে বিষয় উত্থাপন করেছে, তা আলোচনায় যোগ্য নয়। Brockdorff Rantzau ইস্তাফা দিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ভার্সাই চুক্তিতে সই করলেন।

প্রথমে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ইটালির সরকাররা লেনিনের সেই তত্ত্ব নস্যাৎ করা শুরু করল যে, সব সাম্রাজ্যবাদী সরকার, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা সমানভাবে দোষী এবং দ্বিতীয়তঃ জার্মানীর কাছ থেকে আদায় করা ক্ষতিপূরণ, যার সীমা প্রথমে স্থির হয় নি, তা যথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করল। অপরাধী ক্ষতিপূরণ দেয়, অপরাধী সব লোকসান ও ব্যয়ের জন ক্ষতিপূরণ দেয়—এইভাবে বিষয় ভার্সাই চুক্তির ২৩১ ধারায় ঢোকানো হল। অতএব, বিজয়ীদের বিশেষতঃ ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধাপরাধের প্রশ্নটির বিশ্বাসযোগ্য প্রশ্নরূপে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট কারণ হয়ে দেখা দিল। যখন উইমার জার্মানীর শাসকরা, তাদের সরকার কূটনীতি ও সংবাদপত্র "যুদ্ধা-

পরাধ" সমস্যাটিকে "যুদ্ধাপরাধ"-এর মিথ্যা বলে বাদ না করল, তখন সেটা তারা ইতিহাসের দেবতা ক্লিও-র প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ করে নি।

রাজনৈতিক যুদ্ধ চলতে লাগল। ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট হয় নি, অর্থের পরিমাণ ঠিক হয় নি, প্রকাশ্য ইঙ্গ-ফরাসী বৈষম্যের ক্ষতিপূরণের উপর একটা প্রভাব ছিল। এর ফলে ভার্সাই তত্ত্ব নিয়ে ঝগড়া তীব্র হয়ে উঠল। দুপক্ষই এর প্রকৃত রাজনৈতিক গুরুত্ব জানত। Poincare লিখলেন "প্রকৃতপক্ষে, যদি কেন্দ্রীয় শক্তি যদি যুদ্ধ না ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তারা কেন ক্ষতিপূরণ দেবে? এতে প্রয়োজনীয় ভাবে ও যথার্থভাবে বোঝা যায় যে, যদি দায়িত্বের ভাগ নেওয়া থাকে, তাহলে ক্ষতিপূরণেরও ভাগ নেওয়া উচিত।"

বিষয়টা আরো জরুরী হয়ে উঠল এবং একদিকে ফরাসী সরকার ও ফরাসী শিল্পপতিদের আলোচনায় সতর্ক ও বিরক্ত ব্রিটিশ সরকার এবং অন্যদিকে বৃহৎ জার্মান শিল্পস্বার্থ হঠাৎ তাদের পুরো সমর্থন ছিল চরমপন্থী ফরাসী দাবীকে তখন বলতে গেলে বিষয়টা ১৯২১-এর বসন্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯২১-এর মার্চের শুরুতে লণ্ডন সম্মেলনে জার্মানদের প্রতি প্রস্তাব একেবারে প্রত্যাখ্যাত হল। জার্মানীকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হল যে, যদি সে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণে রাজী না হয়, যে ক্ষতিপূরণ কার্যতঃ বিধ্বংসী, তাহলে ডুইসবার্গ ও ডুসেলডর্ফ নিয়ে নেওয়া হবে। এই চরমপত্রের সংগে রইল লয়েড জর্জের ক্রুদ্ধ হুমকি যে, "মিত্রশক্তির কাছে যুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায় মূলগত। এই ভিত্তির উপরে চুক্তির কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং যদি সে স্বীকৃতি না মানা হয়, তাহলে চুক্তিটা নষ্ট হয়ে যায়…অতএব আমরা এ কথাটা বরাবরের মত সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, যুদ্ধের জন্য জার্মান দায়িত্ব মিত্র পক্ষের দ্বারা চূড়ান্ত রায় বলে গণ্য হবে।"[১] ১৯২১-এর আগস্টে এ্যারিস্টাইড ব্রায়াণ্ডও একই বক্তব্য প্রকাশ করলেন।

এইভাবে যুদ্ধাপরাধের প্রশ্নটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে, বিশেষতঃ জার্মানির উপরে চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল। আরো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্য ভার্সাই তত্ত্বের উল্লেখের উপযুক্ততার বিষয়ে জার্মানিতেও বিভিন্ন বুর্জোয়াগোষ্ঠী বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। তথাকথিত ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং প্রাকনিয়ন্ত্রীকরণ কমিটির জার্মান প্রতিনিধি, শান্তিবাদী ও বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কাউন্ট জোহান হাইনরিশ ফন বার্নস্টর্ফ বাস্তব রাজনীতিতে "যুদ্ধাপরাধ" বিষয়টি

১। টাইমস, মার্চ ৪, ১৯২১।

তোলার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সোজাসুজি রাজনৈতিক তর্ককে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়া দলের মতবাদ বিপরীত, তারা সম্পূর্ণ ভার্সাই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধে ভার্সাই তত্ত্বকে একটা শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইত। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, সংবাদপত্র এবং বিদ্যালয়গুলিকেও যুদ্ধে টানা হল। জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ সংস্থা প্রধান ভাববাদী কেন্দ্র ও সহযোগিতা কেন্দ্র হয়ে উঠল। সংস্থার প্রধান, কাইজারের বাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল আলফ্রেড ফন ওয়েগেয়ার "ভার্সাই চুক্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ভিত্তি" স্থাপন শুরু করলেন।

জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয় তাদের দলিল সংগ্রহ থেকে দলিল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল। যখন ক্ষতিপূরণের বিতর্ক সবচেয়ে তীব্র এবং নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ জার্মানির ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে, তখন ১৯২২-এ প্রথম খণ্ডগুলো বেরোল। এবারে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হল। যুদ্ধ পূর্বের ঘটনা নিয়ে কূটনৈতিক দলিল ফরাসী সরকার ১৮৭০-৭১-এর যুদ্ধের পর প্রকাশ করেছিল এবং জার্মানিকে তার নিজের গোপন দলিল প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিল। যুদ্ধের উদ্ভবের বিষয়ে কূটনৈতিক দলিল প্রকাশ শুরু করার পর জার্মান সরকার ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের পর মিত্রপক্ষকে অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছিল।

স্বভাবতঃই রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রভাব দলিলের প্রধান দিকগুলি, কালানুক্রমিক সীমা ও বিন্যাসের ওপরে পড়েছিল। প্রকাশ হয়েছিল কালানুযায়ী নয়, বিষয়ানুযায়ী। তা ছাড়া, অনেক দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, এক অথবা পৃথক পৃথক খণ্ডের বিভিন্ন বিভাগে তার থেকে অংশ তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এটার বিদেশে ও কিছু জার্মান গবেষকদের কাছে অত্যন্ত সমালোচনা হয়েছিল। ফ্রেডরিখ থিম, যিনি সব গবেষণা ও সম্পাদনা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে বিষয়ানুযায়ী উপাদানগুলিকে সাজানোর নীতির পেছনে প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। কালসীমা ও খণ্ডগুলির বিভাগও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা স্থির হয়েছিল। এগুলি ১৯১৪-র প্রাকযুদ্ধ সংকটের বিষয়ে ফিরে যায় নি, কিন্তু সংকটের সময়ে জার্মান সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা ও সমর্থনের জন্য একরকম সেই দিকেই পথ দেখিয়েছে (প্রাকযুদ্ধ বিষয়টা কাউটস্কির প্রকাশনায় রয়েছে)। ওয়েগেরার লিখেছেন, "দলিলগুলি নিশ্চিত প্রমাণ দেয় যে, জার্মানি "অপরাধী রাষ্ট্র নয়…এবং গত চল্লিশ বছরে জার্মান রাইখের নীতি অন্ততঃ সার্ব, রুশ, ফরাসী ও বৃটিশদের নীতির মত শান্তিপূর্ণ ও নীতিগতভাবে ন্যায্য ছিল।"

প্রকাশকরা ব্যক্তির দোষ অস্বীকার করল এবং যে আন্তর্জাতিক রাজ-

নৈতিক পরিস্থিতি পৃথিবীকে দুটি শত্রু শিবিরে ভাগ করে সামরিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছে।

এই ধারণার মূল নিয়মগত দিকগুলি রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বিষয়ের থেকে গভীরে যায় না। মনে করা হয় যে, যে সব বিভিন্ন বৃহদাকার রাজনৈতিক সমন্বয় সৃষ্টিকারী শক্তি নানা অবস্থার কারণে অন্যাসব কম স্পষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়েছে, সেই শক্তি এইসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের গভীর বৈষম্য নয়। "ইউরোপীয় মন্ত্রীসভাগুলির বড় রাজনীতি"—এই কথাগুলি প্রকাশনার নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল—বিশ্বযুদ্ধের কারণরূপে ইউরোপীয় ইতিহাসের চলন্ত আত্মাকে উপস্থিত করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, বই-এর নাম সমগ্র প্রকাশনের নিয়মগত চক্রের দর্পণস্বরূপ হয়েছে।

অতএব প্রকাশনা যে শুধু বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের উপকরণ নিয়ে গঠিত এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক নীতিসংক্রান্ত দলিলের যে কোন পুরস্কারই হয় নি, তা বোঝা যায়। ঔপনিবেশিক সমস্যার শুধু ইউরোপীয় নীতির ভিত্তির সংগে এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্যের সংগে সম্পর্ক রেখে বোঝাপড়া করা হয়। এই শক্তিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেহারা পায় এবং মিত্রশক্তি ও গোপন কূটনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত নিয়মনিষ্ঠা ও নির্দিষ্ট গঠন থাকার ধারণা দেখা দেয়।

প্রধান শক্তির এই ধারণা কালানুক্রমিক সীমার প্রারম্ভের পিছনে ছিল, কারণ এই পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধ, তথা অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রীর সমন্বয়ে চূড়ান্তরূপপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক শক্তির পুনর্গঠন ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন ছিল। প্রকাশনাকে আর একটি প্রকাশ্য তথ্য ফুটিয়ে তুলতে হল: যে ফরাসী প্রচার মূল জার্মান অপরাধের প্রমাণ হিসাবে ১৮৭৯-র অস্ট্রো-জার্মান গোষ্ঠীকে কাজে লাগাচ্ছিল, সেই প্রচার প্রকাশ্যে আপত্তিকর নীতিকে তুলে ধরছিল এবং বিসমার্কের মনোভাবকে সাধারণভাবে ইউরোপীয় ঐক্যতানে প্রাধান্য পাওয়ার অবিরত ইচ্ছা, এমন কি বিশ্বআধিপত্যের ইচ্ছা বলে চিহ্নিত করেছিল। প্রকাশকরা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, বিসমার্ক বাদী যুগ ও জার্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুরুসংক্রান্ত প্রথম দফার দলিলগুলি (ছয় খণ্ড) প্রকাশের এটা অন্যতম কারণ। এটাও স্পষ্ট যে, সংগ্রহের প্রকাশের দিন ১৮৭১-এ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল ফ্রাংকফুর্ট সন্ধির পরে জার্মান অধিকারনীতি এবং ভার্সাই সন্ধির পরে ফরাসী দখলসূচীকে অনুকূলভাবে তুলনা করার মত উপকরণ প্রকাশের ইচ্ছা। যখন প্রকাশনা শুরু হল, তখন এটা রাজনৈতিকভাবে বোঝানো কাম্য ছিল যে, নির্দিষ্ট তারিখের আগেই জার্মানী দখলীকৃত ফরাসী অংশ থেকে সরে এসেছিল।

রাজনৈতিক মৈত্রীর পদ্ধতি নির্ধারক এই ধারণা অনুযায়ী চলে সাম্য ও

মৈত্রীর নীতিসহ সব জার্মান নীতি প্রকাশনায় বিসমার্কের স্বীকৃত উপকরণরূপে উপস্থাপিত হল জার্মান স্বার্থরক্ষা ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। তবুও এতে দেখা যায় উইলহেলমবাদী যুগের নীতি অচল কারণ এই নীতি "জর্মান অবরোধ"-এ বাধা দেওয়া এবং পরে নষ্ট করায় ব্যর্থ হয়েছিল। অধিকাংশ ভাষ্যকাররা স্বীকার করেন যে, শেষ পর্যায়ে দলিলগুলির এটা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি আদৌ উইলহেলমের নেতৃত্বে জার্মান রাজনৈতিক নেতাদের বিষয়ে দায়িত্বের প্রশ্ন তোলার দরকার হয়, তাহলে প্রশ্নটা তোলার দায়িত্ব জার্মান জনগণের প্রতি তাদেরই, প্রথম কারণ, তারাই সেই ঝড় তুলেছে। ভার্সাই তত্ত্বে এই ঘোষণা ছিল যে, কোন কাজ, এমনকি বিপজ্জনক ও দ্ব্যর্থক হলেও, শান্তি বজায় রাখার চূড়ান্ত লক্ষ্যের অধীন। যখন একটা দলিল এই অর্থে ব্যাখ্যা করা যেত যে, উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সংগে ব্যবহৃত রাজনৈতিক উপায়ের বৈপরীত্য আছে, তাহলে প্রকাশকরা সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে প্রচুর পাদটীকা সরবরাহ করেছিলেন।

প্রকাশকরা স্বীকার করে যে, তারা প্রায়ই কয়েকটি দলিলে কাইজারের হাতে লেখা টীকাকে অগ্রাহ্য করত কারণ তারা মনে করেছিল যে, এই টীকাগুলি বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের দ্বারা পরবর্তী ঘটনাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। এই ঘটনাও যথেষ্ট সমালোচনার উদ্রেক করেছিল। অবশ্য প্রকাশকদের কাইজার ধারার প্রভাবশালী প্রধান রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক এবং দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলির কথাও চিন্তা করতে হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোপন দলিলের প্রকাশনের বিরুদ্ধে এত সম্প্রতি-কালের প্রতিবাদ রাজতন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। এই রাজতন্ত্রীরা ভয় পেয়েছিল যে, প্রাচীন রাজতন্ত্রী অঞ্চলের নেতাদের পক্ষে এই প্রকাশন লজ্জার হবে। উইলহেলমবাদী ধারার এক প্রধান কূটনৈতিক লিখেছিলেন, "এই ধরনের প্রকাশন অপরিণত সময়ে আসেনি, কারণ সাংবাদিকরা তো দূরের কথা, সর্বাধিক বাস্তববাদী ঐতিহাসিকদেরও এখনো দূরদর্শী মতের অভাব আছে। পরাজিত জার্মানীর শত্রুদের নতুন বাক্তব ও পুরনো বিজয়ী মৈত্রী পক্ষের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তীব্রতম সংগ্রামে আমরা প্রতিযোগী...জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ফ্রান্সের পরাজয় থেকে দশকের পর দশকের নীতির এখনো সাক্ষ্য আছে এবং প্রত্যেক যুক্তি তার তালিকার অন্তর্ভুক্ত...সম-সাময়িক বিবাদের বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি দ্বারা আলোচনা বিষাক্ত হবে। বর্তমান প্রকাশনা সম্বন্ধে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি : cui bono? শুধু তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য? রাজনৈতিক হিসাবে আমি প্রকাশনাকে লক্ষ্য বলে মনে করতে পারি না। রাজনৈতিক লক্ষ্য (যে লক্ষ্যের কাছে দলিলগুলি তাদের অস্তিত্বের জন্য ঋণী) আরও উচুঁতে। যখন আমাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে দলিল প্রকাশিত হবে (কারণ

আমরা সম্পূর্ণরূপে গত চার দশকের আশ্রয়ে রয়েছি) তখন রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা চিন্তা করতে হবে।"

কিন্তু শীঘ্র দক্ষিণপন্থীদের অসন্তোষ মিলিয়ে গিয়ে তৃপ্তি দেখা দিল। অন্যপ্রান্তে, প্রকাশনার প্রতি বুর্জোয়া শান্তিবাদী এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল কিছু সমালোচনামূলক মন্তব্য করল, প্রধানতঃ কারণ প্রকাশকরা সম্পূর্ণ উইলহেলম-এর কিছু প্রতিজ্ঞার কথা বাদ দিয়েছিল, যা, তাদের মতে জার্মান কাইজারকে লজ্জিত করত। সমালোচকদের উত্তর দিতে গিয়ে থিম মার্কস ও এঙ্গেলসের পত্র সংগ্রহে সম্পাদক বার্ণস্টাইনের ঠিক এই রকম একটি বর্জনের উল্লেখ করেছিলেন। বার্ণস্টাইনের মনোভাবের সংগে এতটুকু পরিচিত যে কেউ বুঝবে এই যুক্তির অজুহাত দেওরা কারোর পক্ষে কত অন্যায়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে জার্মান সংবাদপত্রের সমালোচনা প্রকাশিত পুস্তকের পরিবর্জন সম্বন্ধে অভিযোগ ও আরো কিছু প্রকাশ করার ব্যর্থতার সম্বন্ধে অভিযোগে সীমাবদ্ধ ছিল।

তবুও ফরাসী জাতীয়তাবাদীরা এটাকেই তাদের তীব্রতম আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলল। দক্ষিণপন্থী ফরাসী সাময়িক পত্রগুলি জার্মান প্রকাশনকে প্রচারের দল বলল এবং প্রকাশকদের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে অপরাধী করা হল। এই প্রচারের নেতা ছিলেন সরবোঁ-র এক অধ্যাপক, ১৯১৯-এ ফরাসী সেনেটে প্রত্যর্পিত যুদ্ধাপরাধ প্রতিবেদনের সহযোগী লেখক এবং ফরাসী প্রাশিয়ান যুদ্ধের উদ্ভবের বিষয়ে ফরাসী দলিলের সহযোগী প্রকাশক, এমিল বুর্জোয়া। তিনি এমনকি এ অভিযোগও আনলেন যে, জার্মান প্রকাশনের শিরোনামা—*ইউরোপীয় মন্ত্রীসভাগুলির বৃহৎ রাজনীতি*—ইচ্ছাকৃতভাবে তির্যক করা হয়েছে, সম্পাদকদের লক্ষ্য ছিল জার্মানীর শত্রুদের দ্বারা পুষ্ট আগ্রাসী রাজনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ জার্মান নীতিকে স্পষ্ট করা। তিনি কিছু সংখ্যক ইচ্ছাকৃত পরিবর্জন দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং জার্মান প্রকাশকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিদ্বেষপূর্ণভাবে চেপে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করে শেষে এই দাবী জানিয়েছিলেন যে, "জার্মান জেনারেল স্টাফ ও তার সামরিক সহযোগীদের সব চিঠিপত্র জার্মানরা প্রকাশ করুক।

জার্মান প্রকাশকরা দেখিয়েছিলেন যে, জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের দলিল সংগ্রহে প্রাপ্ত কিছু চিঠিপত্র যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন, যুদ্ধ মন্ত্রনালয়ের দলিল প্রকাশ করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছিলেন, যদি ফরাসী সরকার অনুরূপ সংগ্রহ প্রকাশ করে।

ফরাসী জার্মান দ্বন্দ্বের মধ্যে দুটি দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের উত্তেজনা প্রতিফলিত হয়েছে। এই উত্তেজনার আর একটি ইংগিত Poincare-র পদত্যাগের বিষয়ে ফ্রেডরিখ থিমের সন্তোষের মধ্যে স্পষ্ট, যে পদত্যাগ, থিমের

মতে, দেখিয়ে দিয়েছে যে, "আইনের প্যাঁচ ও বিকৃতিতে উপকৃত জনগণ ফ্রান্সেও তাদের জোর হারিয়ে ফেলছে।"

তাঁর বিদ্রূপোক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিছু আগেই রুরে ফ্রান্সের ব্যর্থতায় এবং ১৯২৪-এর তখনো অমীমাংসিত লণ্ডন সম্মেলনে অসফল হয়েছিল, যে লণ্ডন সম্মেলন ডস পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফ্রান্সকে তার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জবরদস্ত সমাধান পরিত্যাগে বাধ্য করেছিল।

ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের পরবর্তী অধ্যায়ও দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। যেমন, "মসিয়ে লেহুরেটিয়ের, যিনি প্রাকযুদ্ধ সময়ে গ্রীসের বিষয়ক পরিবর্জন তুলে ধরেছিলেন, তিনি দুঃখ করেছিলেন যে, "লোকার্নোর ফলাফল" যখন জার্মান প্রকাশনকে সংশোধন করতে পারত, তখন জার্মান প্রকাশন শুরু করা হয় নি। বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব সম্বন্ধে জার্মান আলোচনায় ফরাসী আগ্রাসী পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ঘটানো উচিত, এই বিবৃতি স্পষ্টতঃ তারই আবৃত পরামর্শ। বিশেষ যুক্তিগুলির উত্তর দেওয়ার পর জার্মানরা প্রস্তাব দিল যে, ফরাসীরা তাদের "লোকার্নো মনোভাব" সংক্রান্ত দলিল প্রকাশ করুক। এখন বৃটেন ফরাসী-জার্মান সম্বন্ধের মধ্যস্থ হওয়ার পর, ফ্রান্স ও জার্মানী তাদের নিজস্ব কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় স্থির করার চেষ্টা করল। সেই পরিস্থিতিতে জার্মান প্রস্তাবটিতে ছিল এক স্পষ্ট আবেদন যে, ভবিষ্যতের ফরাসী প্রকাশন যেন জার্মান বিরোধী না হয়।

এই মত বিনিময় যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে বৃহৎ সাংবাদিক আলোচনার প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়, যে আলোচনা লীগ অফ্ নেশনসে জার্মানীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উৎসাহের সংগে আলোচিত হয়েছিল, পরে বক্তৃতায় ফরাসী ও জার্মান রাজনৈতিক নেতারা এর উল্লেখ করেছিলেন এবং ফ্রান্সের সংগে জার্মানীর যোগাযোগের চেষ্টার মতই নষ্ট করে দিয়েছিলেন।

উইলহেলমসট্রাসের নিকটবর্তী সংবাদপত্র Kolnische zeitung "নতুন বক্তব্য-পুরনো দৃষ্টি" নামক এক প্রবন্ধে লিখেছিল, "লীগ অফ্ নেশনসে জার্মানীর অন্তর্ভুক্তি এবং জার্মান-ফরাসী সম্বন্ধের নতুন যে লোকার্নো ও থোয়ারিতে চোখে পড়ল, তাতে এই আশা করার কারণ আছে যে, ভার্সাই অপরাধের রায় দমিত হবে।"

এই আশা ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে বেশী দেরী হয় নি। যুদ্ধাপরাধ সমস্যার চূড়ান্ত বিন্যাসের জন্য লীগ অফ্ নেশনসে জার্মান বুর্জোয়া দলগুলির সমর্থিত রাইখস্টাগের আবেদনের সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত পূর্বের আশার মতই নিষ্ফল হল। আশা ছিল যে, যুদ্ধের উদ্ভব বিষয়ে উপাদান প্রকাশ করার জন্য লীগ অফ্ নেশনস তার সদস্যদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে এবং "নিরপেক্ষ আলোচনা ও জার্মান "যুদ্ধাপরাধ সমস্যার সমাধানের" জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করবে।

শীঘ্র, থোয়ারি নীতি পুনর্বিচারমুখী ধারা ফরাসী রাজনীতিতে সফল হয়ে ওঠার পর, Poincare স্টেটসম্যানের পনর্বিচারী বক্তৃতার উত্তরে এটা স্পষ্ট বললেন যে, তাঁর মন্ত্রীসভা জার্মান নীতি ও জার্মান সংবাদপত্রের এই ধরনের সব মনোভাবের বিরোধিতা করবে। লোকার্নো ও থোয়ারি নীতিতে প্রতিফলিত ফরাসী জার্মান সম্বন্ধের গোলক ধাঁধা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আশানুরূপ বজায় রইল না। যে ফরাসী সরকার তার পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই বদলায়নি, তারা ভার্সাই চুক্তির শর্ত পুনর্বিচারের জার্মান দাবীকে প্রত্যাখ্যান করল।

এই ফরাসী-জার্মান "পুনর্যোগাযোগ"-এর সময়ে এমিল বুর্জোয়া স্পষ্টতঃ অলার্ডের জার্মান প্রকাশন ফরাসীতে অনুবাদের পরিকল্পনার বিরোধিতা করছিলেন, যে পরিকল্পনা তার মতে অতি স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রচার! যা তিনি নিজে জার্মানদের শত্রুতা ভুলে যাওয়ার প্রচারের হাতিয়ার বলে মনে করেছিলেন, যা অন্ততঃ এমন বিষয়ে সন্দেহের বিপজ্জনক বীজ বপন করবে, যে বিষয় কোন সৎ ফরাসীর আলোচনা করাই উচিত নয়, তা ফরাসী জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা তার মূর্খতা মনে হয়েছিল।

যদি এইসব আপত্তি সত্ত্বেও ফরাসী অনুবাদ শেষ পর্যন্ত বেরোত, সেটা বুর্জোয়া-র যুক্তি ব ঝতে বা ভার্সাই রায়ের বিরোধিতায় অলার্ডের ব্যর্থতার কারণে ঘটে নি। দুজনের মনোভাব প্রকৃতপক্ষে একই ছিল, কিন্তু তাদের ভংগী আলাদা। অলার্ড উপাদানকে কালানুযায়ী সাজিয়ে ছিলেন। এটা শুধু তাত্ত্বিক অভ্যাস ছিল না। তিনি এর দ্বারা স্পষ্ট পরিবর্জনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করছিলেন, এর ফলে জার্মানীর দলিল সংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হেয় হবে এবং সেই সংগে তার নীতির প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পাবে। তার যুক্তি পরিষ্কার করার জন্য, তিনি ফরাসী অনুবাদের একটা নতুন শিরোনামা দিলেন. "জার্মানীর বৈদেশিক নীতি, ১৯৭০-১৮১৪।"

সংক্ষেপে, হামবুর্গে বৈদেশিক নীতি সংস্থার প্রায় একই শিরোনামায় বৃহৎ জার্মান প্রকাশনার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করলেন, "জার্মান রাইখের বৈদেশিক নীতি, ১৮৭১-১৯১৪।" এই সংগ্রহও কালানুযায়ী সাজানো হল। সম্পাদকরা, আলব্রেশ্ট মেণ্ডেলোসন-বার্থোল্ডি এবং ফ্রেডরিখ থিম ইউরোপে রাজনৈতিক-সামরিক গোষ্ঠীবদ্ধতার উদ্ভবের সমস্যার প্রসংগে ইংগ-জার্মানী সম্বন্ধের সাধারণ ধারণায় প্রধানতঃ জোর দিয়েছিলেন, যে সমস্যা তাদের মতে বিশ্বযুদ্ধের কারণ। উইমার সাধারণতন্ত্রের পশ্চিমী গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্তি এবং সেইহেতু বৈদেশিক নীতিতে যোগদান খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এটা শুধু প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রধান স্বার্থ হয়েই দেখা দেয় নি, সাধারণভাবে তা জনগণেরও স্বার্থ হয়েছিল।

আগে, থিম প্রকৃত জার্মান প্রকাশনের আলার্ড রচিত ফরাসী সংস্করণকে

প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছিল, তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফরাসী সরকার তার কূটনৈতিক ও সামরিক দলিল সংগ্রহের গোপন তথ্য সুরক্ষিত করছিল, যে ফরাসী সরকার মৈত্রী চুক্তির উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপের মত গুরুত্বপূর্ণ ও সাময়িক বিষয় প্রকাশ করার বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে অনিচ্ছুক ছিল।

রুশ-ফরাসী সম্বন্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত দলিলের এক সোভিয়েত প্রকাশন, যা সর্বত্র অত্যন্ত মূল্যবান বলে স্বীকৃত তা তবুও ফরাসীদের দ্বারা অবজ্ঞাত হল ফরাসীরা বলল যে এটার "উদ্দেশ্য হল জারবিরোধী প্রচার।"

জার্মানীতে, বৈদেশিক মন্ত্রণালয় প্যারিতে রুশ রাষ্ট্রদূত ইজভোলস্কির কূটনৈতিক চিঠিপত্র প্রকাশের প্রস্তাব দিল: Herman Kantorowicz দেখিয়েছিলেন যে এর স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী নীতি, বিশেষত: Poincare-র নীতিকে তুলে ধরা। শেষত: লণ্ডনে রুশ রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট বেংকেনডর্ফের কূটনৈতিক প্রকাশনার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের নিয়মগতভাবে "ঘেরাও" নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা। (বেংকেনডর্ফের চিঠিপত্র, প্রধানত: দলিলের নকল রুশ দূতাবাসের এক সচিব, বি. ফন. সিবার্ট চুরি করে পড়ে জার্মানীর কাছে দিয়েছেন বা বিক্রী করে দেন)।

৩

অস্ট্রিয়া দলিলের প্রকাশন জার্মানদের "যুদ্ধাপরাধ" বিষয়াসংক্রন্ত মনোভাব বদলাতে বাধ্য করল, আরো বেশী হল, কারণ, এটা ইয়ং-এর ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনার বিষয়ে ১৯৩০-এর হেগের নিয়মের প্রায় সমসাময়িক হল, যা কার্যত: অস্ট্রিয়াকে ক্ষতিপূরণ দান থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

এই সমসাময়িকতা ইঙ্গিত দিল যে, ক্ষতিপূরণের বিষয় "যুদ্ধাপরাধ" প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু, যেহেতু, ততদিনে জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে আসল দৃষ্টিভঙ্গী চালু হয়ে গেছে, অতএব জার্মান দলিলসংগ্রহে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ধারণাকে বাধা দিল এবং একই সংগে সহজ করল। জার্মান প্রগতিবাদী বুর্জোয়াদের মুখপত্র Berliner Tageblatt লিখল যে, "আমাদের আত্মীয় অস্ট্রিয়ার সংগে একত্রে আমরা আনন্দিত যে, তার প্রয়োজনের দ্বারা পরিচালিত চতুর নীতির দ্বারা সে সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, যে সিদ্ধান্ত অস্ট্রিয়ার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। ধারণা হতে পারে যে, ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট দাতাই একমাত্র অপরাধী।"

এই ধারণাকে যে যুক্তি ছিন্নভিন্ন করতে পারত সেই যুক্তি অস্ট্রিয়া প্রকাশনের দলিলগত প্রমাণের দ্বারা গঠিত, রাজনৈতিক ধারণায় নিহিত ছিল।

ন'খণ্ডের সংগ্রহটি অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হয়ে ইউরোপীয় সংবাদের জগতে একটা আলোড়ন তুলল। সংগ্রহটি সম্পূর্ণ গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল,

কারণ, পূর্বতন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অঞ্চলে গঠিত যে রাষ্ট্রগুলি তখন ফ্রান্সের বন্ধু ছিল, তারা এর সুযোগ নিতে পারত। অস্ট্রিয়া প্রকাশনের অন্যতম সম্পাদক লিখেছিলেন, তারা নিঃসন্দেহে তাই করবে এবং এমনভাবে উপাদান নির্বাচন ও বিন্যাস করবে যাতে অস্ট্রিয়ার নিজের দলিলের সাহায্যেই যুদ্ধ শুরুর বিষয়ে তার দায়িত্ব প্রমাণিত হয়।

এই জন্য অস্ট্রিয়রা সংগ্রহটি প্রকাশ করল। এর উদ্দেশ্য ছিল আশংকা এড়িয়ে সমস্যা উপস্থিত করা। সম্পাদকরা ১১,০০০-এরও বেশী দলিল প্রকাশ করলেন. ৪৩ বছর ব্যাপী ঘটনার ৪০ খণ্ডের জার্মান প্রকাশনের দলিলের চেয়ে এর সংখ্যা ঠিক ৩,০০০ কম। প্রাক্ যুদ্ধ ছয় বা সাত বছর ব্যাপী ঘটনা নিয়ে ন' খণ্ড সংগ্রহের পক্ষে এটা একটা কৌশলগত দুঃসাহসিকতা এই বিপুল পরিমাণের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত পুংখানুপুংখতাব ভার সৃষ্টি করা। তবুও যেখানেই সম্পাদকরা ভেবেছেন তাঁদের প্রকাশনার মূল নীতি সুরক্ষিত হবে, সেখানেই তারা দলিল সংক্ষিপ্ত করেছেন।

দলিলের প্রধান অংশ স্বভাবতঃই বলকান সমস্যার সংগে যুক্ত। স্বভাবতঃ রুমানিয় সংকটের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট অংশকে স্পষ্টকারী দলিল দিয়ে সংগ্রহ শুরু হয়েছে।

ঐ সময়ের প্রধান বিষয় ছিল বলকান অঞ্চলে নতুন রুশ কার্যকলাপ (দূরপ্রাচ্যের পশ্চাদপসারণের পর), তুরস্কে বিপ্লবাত্মক বিশৃংখলা এবং ফলতঃ বলকান রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ। পরবর্তী দিকটাকে সর্বাধিক জায়গা দেওয়া হয়েছে এবং সেই বিষয়টি প্রথম তিনটি অস্ট্রিয় খণ্ডের বিশাল দলিলের পটভূমিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে।

এইরকম ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে, যে, ১৯০৮-এ বসনিয়া ও হারজেগোভিনা নিতে যখন ঝুঁকেছিল অস্ট্রিয়া, তখন অস্ট্রিয় নীতি গঠন করা নোভি পাজার সঞ্জাককে মুক্ত করাতেই প্রধানতঃ ব্যস্ত ছিল: যদি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া ও হারজেগোভিনা অধিকার করা পর্যন্ত গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা সার্বিয় আগ্রাসী মনোভাবকে ঠেকানোর জন্যই করা হয়েছিল। এ কথা সত্য যে, ১৯০৮-এর গ্রীষ্মেই সার্বিয়াকে ভাগ করার যে পরিকল্পনার খসড়া ভিয়েনাতে রচিত হয়েছিল, সম্পাদকরা তা গোপন করেন নি। কিন্তু পাঠকদের এই কথা বোঝানোর জন্য অন্যদের দ্বারা তারা বাধ্য হয়েছিল যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর আঞ্চলিক ঐক্য সুরক্ষার একমাত্র পরিকল্পনার দ্বারা হাপসবুর্গ নীতি পরিচালিত হয়েছিল যে নীতির পিছনে বিদেশ জয়ের কোন বাসনাই ছিল না।

সম্পাদকরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, যখন অপ্রত্যাশিত গোপন বৃটিশ হস্তক্ষেপের ফলে অকস্মাৎ সংকটের আশংকা দেখা দিল, তখন ভিয়েনা ও পিতার্সবার্গের দ্বারা বসনিয় সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়েছে। বিষয়ের এই দিকটি সম্পূর্ণ খুঁটিয়ে দেখানো হয়েছে অন্যান্য দিকের কথা বাদ দিয়ে

প্রথমতঃ এই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে যে, বলকান রঙ্গমঞ্চে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় কার্যকলাপ সোজাসুজি অস্ট্রো-রুশ ও অস্ট্রো-সার্বিয় সম্বন্ধের সংগে জড়িত নয়, এমন উপাদানের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এইভাবে পৃথিবীর অন্যত্র ইঙ্গ-জার্মান বৈষম্যের বিস্তৃততর পটভূমিকায় ভিয়েনার বলকান নীতি খাপ খেয়ে গেছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই ধারণা করবেন যে, জার্মানির সংগে অস্ট্রিয়ার মৈত্রীর দ্বারা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া জটিল সমন্বয়ের দ্বারা অস্ট্রিয়ার স্বার্থ আচ্ছন্ন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বৈদেশিক মন্ত্রী Aehrenthal-র দ্বারা সাধারণতঃ এটা দেখানো হয়েছে যিনি এই ধারণা গড়ে তুলেছিলেন যে, ক্রমশঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে বৃটেন ও ফ্রান্সের সংগে আরো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য "যুক্তি" ভিত্তিক সম্বন্ধে জার্মানির সংগে তার মৈত্রীকে গড়ে তুলতে হবে। যে নিবেলানজীয় বিশ্বাসের উপরে অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী স্থাপিত ছিল, তার জায়গায়, তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে পারস্পরিক রক্ষাকবচ যথেষ্ট হবে।

প্রকাশনার মূল বিষয় সংক্রান্ত এই মূল ধারণা, অর্থাৎ অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রীর উপস্থাপনভঙ্গীর উপরে নির্ভর করে, এটা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের কেন্দ্র হয়ে উঠল।

যেহেতু Aehrenthal-এর উত্তরাধিকারী কাউন্ট লিওপোল্ড বার্শটোল্ড এই প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে কাম্য এবং ঐতিহাসিকভাবে সুদূরে স্থাপিত ধারণা কার্যকর করার সুযোগ পেলেন না, সেইজন্য অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজত্বের নীতিকে বৃহত্তর প্রভাবসম্পন্ন এবং অনেক বেশী কার্যকারীতার সুযোগসম্পন্ন বাহ্যিক শক্তির চাপের অধীন বলে বর্ণনা করা হল।

তবুও, প্রকাশিত দলিলগুলি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে—ঐ দেশটি "দমিত" বা বিভক্ত করার অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজনৈতিক পরিকল্পনার এক উল্লেখযোগ্য চিত্র উপস্থিত করে। অবশ্য এটাতেও এই সরকারী ধারণার ছাপ দেওয়া হয়েছে যে, বহুজাতিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক ঐক্য নিশ্চিত করবার আর কোন পথ ছিল না।

হাপ্সবর্গ নীতির সমর্থকরা প্রস্তাব দিলেন যে সার্বিয়ার বিষয়ে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর নীতি, বিশেষতঃ ১৯১৪-র জুলাই সংকটে, যদি অযথার্থ হয়, তবুও রাষ্ট্রকে রক্ষার প্রয়োজনে গঠিত। সব সময়েই অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর পরিকল্পনার এক অবশ্যম্ভাবী বলকান, শুধু বলকান যুদ্ধেরই সম্ভাবনা ছিল। এটা অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী ও ইউরোপীয় যুদ্ধের সম্ভাবনার মধ্যে এক বৈষম্যকে প্রকাশ করে। দলিলগুলো থেকে বিশেষতঃ বলকান অঞ্চলে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে অস্ট্রো-জার্মান বৈষম্যকে স্পষ্ট করে।

স্বভাবতঃই জার্মান বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা এই অস্ট্রো-জার্মান বৈষম্যের প্রশ্নটিকে আগ্রহের সংগে নাড়াচাড়া করেছেন, কারণ এখানে এই দাবীর অনু-

করলে প্রচুর যুক্তি রয়েছে যে জার্মানী যুদ্ধ ঘটায় নি এবং তাকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জার্মানীর সংগে অস্ট্রিয়ার মৈত্রীর সুযোগ সুবিধা জার্মান দায়িত্বের প্রশ্নটির উচ্ছেদ ঘটাল—যে সময়ে অস্ট্রিয়ার অধিকারের বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তখন এ সমস্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন ১৯২৯ ও ১৯৩০-এ আলোচনা শুরু হল, তখন ফ্রান্স ভানিয়ুর ফেডারেশনের এক পরিকল্পনার দ্বারা তীব্রভাবে জার্মানীর পরিকল্পনার বিরোধিতা করল।

এইভাবে অস্ট্রো-জার্মান সম্পর্কের সমস্যা রাজনৈতিক ছাঁচে মানিয়ে গেল। রাইখস্ট্যাগ কমিটির সাধারণ সম্পাদকই ফিশার যুদ্ধের উদ্ভব পরীক্ষা করে লিখলেন :

"অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী জাতীয়তাবাদের উনবিংশ শতাব্দীর মনোভাবের সংগে বিবাদ করে দেখল, সবদিক থেকেই তারা ভীত। শেষ পর্যন্ত এই বিপদ ও আক্রমণের ভীতির সম্মুখীন হয়ে সে প্রথমে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিল, ভাবল যে এটাই তাকে বাঁচাবে। এটা ভুল এবং ঠিক : তার ভাগ্য করুণ। বার্লিনের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ক্ষুদ্র জার্মানীর তার সংগে যুদ্ধ পরিচালনা করা উচিত কি না···এই হল প্রশ্ন।"

জার্মানি বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রের বিভিন্ন পরিবর্তনসহ যুক্তি কথা মন্তব্যকে জুড়ে ছিল যে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ধারণা, এটা তারই প্রকাশ। এইভাবে এক ঐতিহাসিক বিষয় অস্ট্রো জার্মানীর সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব দিল : যে জাতীয় প্রশ্ন হাপসবুর্গ সাম্রাজ্যকে ভীত করেছিল, আধুনিক অস্ট্রিয়ায় আর তার অস্তিত্ব নেই।

এবং তার থেকে এই ধারণা হয় যে, জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির এক অনুকূল পরিস্থিতি এসেছে।

জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্র প্রাক্তন হাঙ্গেরীর বৈদেশিক মন্ত্রী জি. গ্রাট্জকে অপ্রত্যাশিত বন্ধুরূপে পেলেন। হাঙ্গেরীর অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্য গ্রাট্জ এমন সব দলিল প্রকাশ করলেন যেগুলির এটা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, কাউন্টটিজা সশস্ত্র অস্ট্রো হাঙ্গেরী উত্থানে ততটা প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ করেছেন, যতটা ব্রিটিশ মন্ত্রী জন মর্লে গ্রেও অ্যাসকুইথের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, ব্রিটিশ সশস্ত্র কার্যকলাপের প্রতি আপত্তি করে পদত্যাগ করেছিলেন। যুদ্ধ ঘটানর জন্য কে বেশী দায়ী, এই বিষয়ে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর পারস্পরিক ভর্ৎসনার উল্লেখ করে গ্রাট্জ দেখাতে চেয়েছেন যে, উভয় পক্ষেই শুধু "তৃতীয় পক্ষের—রাজতন্ত্রের—স্বার্থের দ্বারা" পরিচালিত হয়েছিল। গ্রাট্জ আরো বলেছেন যে, যে টিজা আগে যুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু পরে তার সমর্থক হয়েছিলেন, তিনি ঘটনার করুণ বলি হয়েছিলেন (যুদ্ধের প্রতিবাদে তাঁকে হত্যা করা হয়)।

গ্রাট্‌জ্‌ ঐতিহাসিক আলোচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা মনে করি যে তিনি বরাবর সর্বাধিক ন্যায়বাদীদের একজন ছিলেন। এইসব কারণেঃ তাঁর বক্তব্যের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। ভিয়েনা ও বুদাপেস্তের বুর্জোয়া সংবাদপত্র অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর দায়িত্ব অস্বীকার করেছিল। সে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়েছিল, তারা পরে সুবিধামত হাপসবুর্গ রাজত্বের উপরে যুদ্ধাপরাধ চাপিয়ে দিল, ওদিকে রাজতান্ত্রিকরা যুক্তি দেখাল যে, অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার জন্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছে।

রাজতন্ত্রী যুগোশ্লাভিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কলহের বিষয়ে স্ট্যানোজ্‌ভিক ও জোভানোভিকের বিবরণ সারাজেভো হত্যার সংগে সার্বিয়ার গোপন সমিতি ব্ল্যাক হ্যাণ্ডের অনেক যোগসূত্র তুলে ধরেছে।

অস্ট্রিয়া সংগ্রহে (২৯:১, ২৯২১, ২৯২৮, ২৯৬৬, ৩০৪১, ৩২৬৪ ও ৩২৭০ নং) প্রকাশ পেল যে, ১৯১১-র নভেম্বর থেকে ভিয়েনা এই গোপন সমিতি সম্বন্ধে, এর রাজনৈতিক ভূমিকা ও পদ্ধতি, এর আবেগপূর্ণ বক্তব্য ও এর সংগঠক, সার্বিয় গোয়েন্দাগিরির প্রধান কর্ণেল ড্রাগুটিন দিমিত্রিজেভিক (এ্যাপিস) সম্বন্ধে অবহিত ছিল। যাই হোক, ১৯১৪-তে সার্বিয়ার কাছে দেওয়া চরমপত্রে অস্ট্রো হাঙ্গেরীর সরকার ব্ল্যাকহ্যাণ্ডের কোন উল্লেখ করে নি এবং প্রধানতঃ আইন সংস্থা নারোদনা ওদব্রানাকে আক্রমণ করেছিল। তবুও চরমপত্র রচনার সময়ে অস্ট্রিয়া অফিসাররা নিশ্চয়ই সচেতন ছিল যে, বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের দলিল সংগ্রহে ব্ল্যাক হ্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাওয়া যেত। আরো সম্ভব যে, অস্ট্রিয়া চরমপত্রের রচয়িতারা যে ব্ল্যাক হ্যাণ্ডের নাম উল্লেখ করে নি, তার কারণ, তারা এদের সম্বন্ধে, নেতৃস্থানীয় সার্বিয় রাজনৈতিক দলগুলি সংগে এদের দুমুখো সম্বন্ধের বিষয়ে এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে জানত, সে দ্বন্দ্ব ১৯১৭-র বসন্তে প্রকাশ হয়ে পড়ল যখন হোয়াইট হ্যাণ্ড নামক রাজনৈতিক চাতুরীর দল সালোনিকায় একটা বিচার করে দিমিত্রিজেভিককে শাস্তি দিল।

১৯১৪-তে ব্ল্যাক হ্যাণ্ডের উল্লেখ করা রাজনৈতিক কারণে অ-বাঞ্ছনীয় ছিল, কারণ তাতে সার্বিয় সরকার যার বিচার করছে, সেই দলের কার্যকলাপের দায়িত্ব এড়ানোর একটা সুযোগ ঐ সরকার পেত (কারণ অস্ট্রিয় সরকারের পক্ষে হত্যার সব তথ্য জানা সম্ভব ছিল না)। যে সব ঐতিহাসিক দলিল জোর দিয়ে বলছিল যে, হাপসবুর্গ সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে কারণ তারা বেলগ্রেডের আগ্রাসী পরিকল্পনার কথা জানত, সে সব দলিলের গুরুত্বও আরো বেশী ছিল।

স্ট্যানোজেভিকের আবিষ্কারের নিঃসন্দেহ উদ্দেশ্য ছিল সার্বিয় সরকারকে সমর্থন করা, অস্ট্রিয় চরমপত্রের অভিযোগগুলি যে ভিত্তিহীন এবং সার্বিয়

সরকারের ঘনিষ্ঠ সংগঠন নারোদ্‌না ওদ্‌ব্রানার হত্যার সঙ্গে কোন যোগ ছিল না, যে হত্যা সরকারবিদ্বেষী এক গোপন সংস্থার দ্বারা সংঘটিত- সেটা দেখানো।

কিন্তু প্রাক্তন সার্বিয় মন্ত্রী জোভানোভিক সব লেখাকে হাস্যকর প্রমাণ করে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, বেলগ্রেড সরকারের জানবার পর ব্ল্যাক হ্যাণ্ডের দ্বার অস্ট্রিয় আর্চডিউক নিহত হয়েছেন এবং বিশেষতঃ সার্বিয় প্রধানমন্ত্রী নিকোকা প্যাসিক এটা জানতেন। অস্বস্তিকর নীরবতার পর প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে এটা অস্বীকার করলেন, কারণ লণ্ডনস্থ যুগোশ্লাভ দূতের বক্তব্য অনুযায়ী জোভানোভিক কাহিনী লণ্ডনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, সেখানে- সে সময় রাজকীয় যুগোশ্লাভ সরকার ঋণের জন্য অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করছিলেন। জার্মান সংবাদপত্রে প্রচারও শুরু হয়েছিল। বেলগ্রেডকে ব্রিটেনে সংবাদপত্রে প্রচার সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের কাছে অভিযোগ করতে হয়েছিল এবং পরে জার্মানিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ. বিশেষতঃ সারাজেভো হত্যায় যুগোশ্লাভ রাজা অ্যালেকজাণ্ডারের জড়িত থাকা সম্বন্ধে বার্লিনে বেলগ্রেড অনুরূপ অভিযোগ করেছিল।

প্রচারের সম্মুখীন হয়ে যুগোশ্লাভ সরকার ঘোষণা করল যে, "সার্বিয়ার ইতিহাসের বৃহত্তম রক্তস্নানের দায়িত্ব চাপানোর" জার্মান প্রচেষ্টার জবাবে সে একটা নীল বই বার করবে। দীর্ঘদিন বইটি অবশ্য বেরোয় নি এবং সার্বিয় সরকারের ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিক বলেছিলেন, এবার থেকে অজানা তথ্য আশা করা উচিত এবং রাজকীয় যুগোশ্লাভ সরকারকে ১৮৭৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত দলিল প্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাঁর উপদেশ যুক্তিপূর্ণ। ১৯০৩ পর্যন্ত সময়ের দলিলের এক সংগ্রহ, M. Boghitschewitsch কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছিল; Boghitschewitsch-এর কথানুযায়ী যে যুগোশ্লাভ সরকার "তথাকথিত জাতীয় স্বার্থকে প্রধানতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তিশালী গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থ বলে দেখেছিল" সেই যুগোশ্লাভ সরকার তাড়াতাড়ি সরকারী সংবাদ সংস্থা আভালার মাধ্যমে ঘোষণা করল যে, Boghitschewitsch যুদ্ধের পূর্বে সার্বিয় কূটনৈতিক কাজে বার্লিনে ছিলেন, তাঁকে শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগের কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে।

Boghitschewitsch তাঁর অন্য সব রচনায় যে কাহিনী লিখেছিলেন যে, সার্বিয় জারপন্থী রাশিয়ার সাহায্যে বছরের পর বছর অবিরত যুদ্ধের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছে. সে গল্প অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর তির্যক রচনায়। উপাদানের অধিকাংশ ছিল ১৯০৮-১৪-র সময়সংক্রান্ত যখন সার্বিয় বৈদেশিক নীতি সবচেয়ে সক্রিয় ছিল। তাঁর উপাদানের বিন্যাসের দ্বারা তিনি দুটো স্পষ্ট রেখাকে তুলে ধরতে

চেয়েছিলেন· যে দুটি রেখা একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব যুদ্ধ ঘটিয়েছিল। প্রথমটি হ'ল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে সার্বিয় নীতি, বিশেষভাবে বসনিয় সংকটের পরে যা হিংস্র হয়ে উঠেছিল (যখন মনে হয়েছিল যে, যতই প্ররোচনামূলক ও দুঃসাহসিক পথ হোক ফলাফলেই তার যথার্থ বিচার) আর দ্বিতীয়টি হ'ল ফ্রান্সে, বৃটেন ও ইটালীরদ্বারা সমর্থিত রুশ নীতির প্রধান গতিপথ যা কখনো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে সার্বিয়াকে সংযত করছিল, কখনো বাধা দিচ্ছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও জার্মানির নীতি বনাম সার্বিয়ার কথা বলতে গিয়ে Boghitschewitsch ভেবেছিলেন সার্বিয় নীতির বিপদকে হাল্কা ভেবে ও তাদের শান্তিরক্ষার সুযোগকে প্রধান ভেবে উভয়ই ভুল করেছিল।

সার্বিয় কূটনৈতিক উপাদান ছাড়া, Boghitschewisch জারপন্থী রাশিয়ার বল্কান নীতি-ব্যাখ্যাকারী উপাদানও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি সোভিয়েত দলিলসংগ্রহ থেকেও দলিল ব্যবহার করেছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য দলিলগুলি পরীক্ষা করার পর আমরা আবিষ্কার করেছি যে, কয়েক ক্ষেত্রে সংকলক বিভিন্ন বিষয়ের অনুচ্ছেদগুলিকে জুড়েছেন, প্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দিয়েছেন বা সংক্ষিপ্ত করেছেন। অতএব যতক্ষণ না বেলগ্রেডে রক্ষিত দলিলগুলি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে, ততক্ষণ সার্বিয় নীতির কোন চিত্র সম্পূর্ণ হবে না।

৪

বছরের পর বছর বিজয়ী সরকারগুলি তাদের গোপন দলিল প্রকাশের কোন আগ্রহই দেখাল না। দশকের পর দশক কূটনৈতিক গোপনতাকে রক্ষা করার রীতি তখনো চালু ছিল। তাছাড়া, তাদের দলিল প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধের উদ্ভব ভার্সাই ও অন্যান্য যুদ্ধোত্তর চুক্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং তাদের শুধু ভার্সাই পদ্ধতিকে বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। যখন জার্মান সরকার ১৯২৫-এ লণ্ডন, প্যারি ও রোমকে (যে লোকার্ণো চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে জার্মানিকে পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে বসিয়েছিল, সেই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে) লোকার্ণো-র বক্তব্যের দ্বারা জার্মানির যুদ্ধাপরাধের ভার্সাই তত্ত্বের অযোগ্যতা দেখিয়ে দিয়েছিল, তখন তারা প্রায় এক ধরনের উত্তর পেয়েছিল : লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের সংগে যুদ্ধাপরাধ প্রশ্নটির আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আরো সম্পর্ক নেই কারণ চুক্তিটাকেই ভার্সাই যুক্তির সাহায্যে বিচার করতে হবে। শুধু ব্রিটিশ উত্তরটা একটু নরম ধরণের হ'ল, কারণ, জার্মানির সোভিয়েত বিরোধী লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর ক'রে তাকে ব্রিটিশ নীতির কক্ষপথে টেনে আনার

জন্য ব্রিটেন বেশী আগ্রহী ছিল। জার্মান সরকারী সংবাদপত্রের অসন্তোষ সৃষ্টি ক'রে জার্মান শ্রোতাদের কাছে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতায় এই কৌশল আরো স্পষ্ট হ'ল।

কয়েক বছর আগে, যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্রিটেনের ভূমিকা উন্মোচনকারী আগেকার প্রকাশনার (সোভিয়েত, জার্মান ও অস্ট্রিয়) দ্বারা উৎসাহিত হ'য়ে, ম্যাক ডোনাল্ড শেষ পর্যন্ত তাঁর সরকারের "শান্তিপূর্ণ যুগ" চিহ্নিত করার উদ্যোগ করেছিলেন, তিনি প্রাক্-যুদ্ধ ব্রিটিশ দলিল প্রকাশের প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪-এই সময়ব্যাপী এগারো খণ্ড সংগ্রহের প্রস্তাবিত প্রকাশনার সমর্থক ভঙ্গী এত স্পষ্ট ছিল যে, শ্রমিক সরকারের পরবর্তী রক্ষণশীল এটার অনুমোদন করল।

১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের সময়কে এড়িয়ে গিয়ে ব্রিটিশ প্রকাশকরা তাদের দৃষ্টি সেই সময়ের ওপরে নিবদ্ধ করল যখন জার্মানি তার বৃহৎ নৌপরিকল্পনা চালু করতে শুরু করেছিল এবং ফাশোডার দ্বন্দ্ব ইঙ্গ-ফরাসী সম্বন্ধকে উল্টে দিয়ে মৈত্রীচুক্তির পথ তৈরী করছিল। অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল যে মুদ্রণালয় থেকে প্রথম বেরিয়ে এল একাদশতম খণ্ড, অর্থাৎ শেষ খণ্ড, যাতে ১৯১৪-র তথাকথিত প্রাক্-যুদ্ধ সংকট- সারাজেভো হত্যা এবং যুদ্ধে ব্রিটেনের যোগদান ছিল বিষয়বস্তু। খণ্ডটির দায়িত্ব-গ্রহণকারী বৈদেশিক কার্যালয়ের ঐতিহাসিক উপদেষ্টা মার উ-ইক্লিক হেডলাম-মোর্লে ভূমিকায় বলেছিলেন যে, তিনি কাউট্স্কির বই-এর সংগে মিল রেখে প্রকাশের দিন বেছেছেন, যে বইতে Schloss Konopischt (Konopiste)-তে আর্চডিউক ফ্রানজ-ফার্ডিনাণ্ডের সংগে উইলহেলম ও অ্যাডমিরাল টার্পিটজের সাক্ষাৎ ও পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।

প্রকাশের দিন নির্বাচন ও ভূমিকার নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানির গোপন যোগাযোগ ও সারাজেভো হত্যার আগে তাদের প্ররোচনাকে তুলে ধরা। যদি ইঙ্গ-ফরাসী "ভদ্রলোকের চুক্তি" বা ইঙ্গ-রুশ নৌচুক্তির সংক্রান্ত দলিল দিয়ে খণ্ডটি শুরু হত, তা হ'লে বৃটিশ প্রকাশনের সংকলকরা যা চাইছিল, স্বভাবতঃই ধারণা তার বিপরীত হ'ত। সেই সময়ের ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক পারস্যে ইঙ্গ-রুশ বোঝাপড়ার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরত, আর সংকলকরা দেখাতে চেয়েছেন যে, ১৯১৪-র সংকটের সময়ে লণ্ডন ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্কে কোন উত্তেজনার চিহ্ন দেখেনি এবং ঘটনার অবনতি তাদের বিস্মিত করেছে।

দলিল নির্বাচন, প্রকাশকের টীকা ও পাদটীকায় এবং বিন্যাস ও সাধারণ ধারণাতেও বইটির সমর্থনের ভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য বুর্জোয়া সংগ্রহের মত বৃটিশ সংগ্রহটি শুধু তাৎক্ষণিক বৈদেশিক নীতির আলোচনা করেছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু এই সীমার মধ্যেও নির্বাচিত দলিলগুলো শুধু "বৃহৎ নীতি"-র প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা

করেছে। সরকারী প্রতিবেদন, ছাড়া, প্রকাশকরা পদস্থ ব্রিটিশ কূটনীতিক ও রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ব্যবহার করেছে, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্মতি পাওয়া গেছে।

খণ্ড শুরু করার আগে ঐ দেশের বৈদেশিক কার্যালয় ও সরকারের সরকারী প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা করার দরকার ছিল। সপ্তম এডোয়ার্ডের দলিল বা টীকার জন্য রাজা পঞ্চম জর্জের বিশেষ অনুমোদনের দরকার ছিল। সংক্ষেপে; পরীক্ষা করার স্পষ্টনীতি ছিল, এমন কি বিশেষ নির্বাচিত ও অনুমোদিত দলিল ও প্রায়ই সংক্ষিপ্ত বা শুধু সারসংক্ষেপ করা হচ্ছিল। বিভিন্ন কর্মচারীদের দ্বারা দলিলে লিখিত টীকা ও নির্দেশক-নীতি আদৌ ছাপা হয় নি।

একাদশ খণ্ডের সম্পাদক তাঁর টীকায় বাস্তব অসুবিধাজনিত দুর্বল যুক্তি দিয়ে বিকৃত 'নীল বই'কে ঢাকা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কার্যতঃ এটা গ্রে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে সমর্থনের সাধারণ প্রচেষ্টারই অংশ, উপাদানের বিন্যাসে যার প্রমাণ রয়েছে। একাদশ খণ্ডে কালানুক্রমিক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, আর পূর্বের খণ্ডগুলিতে কিছু কালানুক্রমিক উল্লেখ-সহ উপাদান ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে ঐতিহাসিক উপাদানকে কূটনৈতিক সমর্থনের কাজে লাগানো হয়েছে। ব্রিটিশ বই শুরু হওয়ার কাছাকাছি সময়ে বা ঐ সময়ে এডোয়ার্ড গ্রে-র যে স্মৃতিকথা ছাপা হল, সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃতভাবে এই সময়ে প্রকাশিত. তাতেও এই ইতিহাস ও রাজনীতির মিলন লক্ষ্য করা যায় এবং বইটির সাধারণ ভাবনাতেও তা স্পষ্ট।

মূলনীতি ছিল ব্রিটেনের শান্তির প্রতি খাঁটি ভালবাসা: এই নীতি কিছুই ব্যাখ্যা করে নি, কিছু প্রয়োজনীয় প্রচার কার্য করেছে। যখন বইটি ছাপার জন্য তৈরী হচ্ছিল, তখন এর উদ্দেশ্য ছিল এক গোপন স্মারকলিপিতে লুকানো নীতি সংক্রান্ত সাধারণ ব্রিটিশ নীতির সাময়িক দায়িত্ব ও পরিমাণকে ব্যাখ্যা করা।

যে সাধারণ ইউরোপীয় পরিস্থিতি প্রস্তাবিত রাজনৈতিক বিচারকের পূর্বকালীন, তার বিশ্লেষণে এই স্মারকলিপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দিক থেকে মূল ইউরোপীয় সমস্যাগুলিকে নির্ধারিত করেছে। এই লিপিতে বলা হয়েছে, এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দৃঢ় ব্রিটিশ স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। এই লিপিতে আরও বলা হয়েছে, অন্য কিছু বিবেচনা করা বা অন্য দিকে মন দেওয়ার পক্ষে পথ খুব অন্ধকার। প্রধান দায়িত্ব ছিল, চ্যানেল বা উত্তর সাগর বন্দরে আধিপত্য বিস্তারকারী কোন শক্তি বা শক্তি-গোষ্ঠীর দিক থেকে ব্রিটেনের প্রতি আসন্ন বিপদ নিবারণ করা। এই সামরিক কৌশলের যুক্তি তারপর মহাদেশে এক বিশাল পরিকল্পনায় বিস্তৃত হ'ল, যার লক্ষ্য হ'ল, যুদ্ধোত্তর চুক্তি ও সম পরিকল্পনার দ্বারা সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতি নতুন করে গড়া এবং শক্তিগুলি পুনরায়

মৈত্রীবদ্ধ করা। প্রত্যাভূতির সমস্যায় এক নতুন রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিল। বিতর্কের বিষয় হ'ল সম্বন্ধের এমন এক পদ্ধতি যাতে ব্রিটিশ নীতি প্রাধান্য পায়। ব্রিটেনের উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা বললেন যে, বিচ্ছিন্নতার অর্থ বিপজ্জনক, কদর্যতা ও অক্ষমতা। তাঁরা বললেন, জার্মানী যদি নিশ্চিতরূপে জানত যে, ব্রিটেন ফ্রান্সের সহযোগিতায় আসবে, তাহ'লে ১৯১৪-তে যুদ্ধ শুরু করত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অতএব আমরা দেখছি যে, ইচ্ছাকৃত "বিচ্ছিন্নতা"-র সমস্যা ব্রিটিশ নীতিতে আবার দেখা দিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা ও রাজনৈতিক কলহ সৃষ্টি করল। এই সময়ে গ্রে-র স্মৃতিকথা ঘটনাস্থলে দেখা দিল, ব্রিটিশ কূটনীতিতে অপেক্ষাকৃত "মুক্তনীতি" ও ইউরোপে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা, ব্রিটিশ নৌ-আধিপত্য সুদৃঢ় করাকে সমর্থন জানাল। এই সব চিন্তাধারায় ব্রিটিশ দলিল সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রে যদি ১৯১২-র ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-চুক্তিকে কৌশলে এড়াতে পারতেন, তাহ'লে সংগ্রহে জনসাধারণের জ্ঞাত সব তথ্য প্রকাশ করতে হ'ত। সবই শুধু ভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল।

জার্মানরা ১৯১৪-তে বেলজিয়ামে আটক দলিল প্রকাশ করল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স বেলজীয় নিরপেক্ষতাকে যে কত নস্যাৎ করেছিল, তা প্রকাশ করল। ব্রিটেন বিতর্কমূলক দলিলগুলি প্রকাশে বাধ্য হওয়ায় প্রকাশ পেল যে, ১৯০৬-এর শুরু থেকে নিরপেক্ষতা নীতির পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা চলেছিল। এইভাবে ব্রিটিশ প্রচারের অন্যতম যুক্তি হেয় প্রমাণিত হ'ল।

মুখ বাঁচানর জন্য ব্রিটিশ সম্পাদকরা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হলেন যে, গ্রে ইঙ্গ-বেলজিয় আলোচনার কিছুই জানতেন না, এর সংগে "শুধু বেলজিয়ামের উপরে সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের বিষয়টি জড়িত হল এবং সেই হেতু এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক। ব্যাখ্যাটি ফ্রান্স ভালভাবে গ্রহণ করল। Temps বিষয়টি নিয়ে একটি পৃথক প্রবন্ধ প্রকাশ করল আর জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রীসভার মুখপত্র ঠিক বিপরীত মনোভাব নিয়ে জবাব দিল।

বৃটিশ বই-এর ফরাসী সরকারী প্রত্যুত্তর একাধিক দিক দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ; এই জবাবে ইঙ্গ-জার্মান বৈষম্যের ওপরে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হল, ওদিকে বৃটিশরা ইঙ্গিত দিল যে, ফরাসী জার্মান বৈষম্যই যুদ্ধের কারণ। উইমার সাধারণতন্ত্রের উপরে প্রধান প্রভাবের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই দ্বন্দ্ব একটা রাজনৈতিক চেহারা পেল।

বৃটিশ দলিলগুলি ইঙ্গ-জার্মান নৌপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্যার ভালরকম পটভূমিকা হয়ে দেখা দিল, এই সমস্যা তখনো যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য ছিল।

নৌআধিপত্যের মতবাদসহ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের মূল্যে প্রথমশ্রেণীর

নৌবাহিনী গঠনের জার্মান পরিকল্পনাকে ভেঙে দিল, কিন্তু কষ্টকরভাবে তারা হয়রান হল যুক্তরাষ্ট্রের "সমুদ্র স্বাধীনতা"-র নৌশক্তি সাম্যের দাবির দ্বারা।

ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে নৌ-আধিপত্য বৃহৎ রাজনৈতিক তাৎপর্যসম্পন্ন সমস্যা হয়ে উঠল। ১৯১৬-তে বৃটিশ নৌ-অবরোধের ফলে আভাসিত ইঙ্গ-মার্কিন সংঘাতসংক্রান্ত দলিলের ওয়াশিংটনকৃত সংকলন তৎকালীন উত্তেজনাপূর্ণ নৌ-আলোচনাকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ-বিরোধী কাজরূপে গৃহীত হল। ওয়াশিংটনে শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পরিদর্শন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বইটিকে আটকে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি বৃটিশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

কিন্তু সেই ১৯৩০-এর নৌ-সম্মেলন বন্ধ হল, যে সম্মেলন সমুদ্রে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক নতুন অধ্যায় খুলে দিয়েছিল, তখনই ওয়াশিংটন সংগ্রহ দিনের আলোর মুখ দেখল এবং "নৌ-অস্ত্রীকরণ সীমাবদ্ধ করার" মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে স্বল্পজ্ঞাত ইঙ্গ-মার্কিন প্রাকযুদ্ধ আলোচনাসংক্রান্ত উপাদানসহ বৃটেন নিজস্ব এক বিশেষ খণ্ড তার জবাবে প্রকাশ করল।

এইভাবে কূটনৈতিক উপাদানের বিভিন্ন সংগ্রহের বিষয়বস্তু দৈনিক রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বারা নির্ধারিত এবং তার সংগে জড়িত হল। প্রকাশিত উপাদানের ব্যাখ্যার বিষয়েও এটা অনেক পরিমাণে সত্য।

৫

১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে ফ্রান্সের ভূমিকার উপরে এত সংগ্রহ আলোকপাত করার পরে ফরাসী সরকারের নিজস্ব একটি সংগ্রহ বার করতেই হল। শুধু ১৮৫২ সালের পূর্বের দলিলগুলি গবেষকদের কাছে উন্মুক্ত ছিল, কারণ তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজত্ব সংক্রান্ত দলিল সংগ্রহ উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রামাণ্য কূটনৈতিক দলিলগুলি সিন্দুকে বন্ধ ছিল। বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংকলিত হলদে বই ছাড়া আর কিছু প্রকাশিত হল না, এতে অন্তর্ভুক্ত হল বলকান সমস্যা, মরক্কো, ১৯০০-০২-এর ফরাসী-ইতালী আলোচনা এবং ফরাসী-রুশ মৈত্রীবিষয়ক তির্যক পুস্তিকাগুলি, যেগুলি প্রায় উপেক্ষিত ছিল। ফরাসী সিণ্ডিকেটবাদী ও শান্তিবাদী দলের বিবদমান দেশগুলিকে তাদের কূটনৈতিক দলিল সংগ্রহ প্রকাশের যে অনুরোধের দুর্বল প্রচার ১৯২০-তে শুরু হয়েছিল, সে প্রচার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয় কোলাহলে ঢাকা পড়ল

এবং কার্যতঃ সরকারের উপরে খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করল। বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভববিষয়ে Poincare-র বক্তব্য মতবাদে উন্নীত হল এবং শুধু জার্মানীর অপরাধ সম্বন্ধে ভার্সাই প্রমাণ রাজনৈতিকভাবে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠল।

১৯৪২-এর প্রথমে প্যারিতে Rene marchand কর্তৃক ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত ১৯১০-১৪-র ফরাসী-রুশ সম্বন্ধ সংক্রান্ত সোভিয়েত সংগ্রহ অতএব এক উত্তেজনা সৃষ্টি করল। সরকারকে চেম্বার অব ডেপুটিজে অস্বস্তিকর প্রশ্নের উদ্ভব দিতে হল। রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হল। সোভিয়েত সংগ্রহ তখনই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে গভীরভাবে আলোচিত হল। অপ্রত্যাশিত উন্মোচনে ফরাসী নেতারা মুস্কিলে পড়লেন। যে Poincare-র নাম জড়িত ছিল, তিনি অভিযোগ করলেন যে, দলিলগুলি মিথ্যা। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, ইজভোলস্কি, প্যারিতে রুশ দূত, যার প্রকাশিত প্রতিবেদন এত বিশ্বাসযোগ্য ছিল, তিনি বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ তার নিজস্ব রাজনৈতিক পরিকল্পনা তিনি Poincare-এর উপরে চাপিয়েছেন। ফলে Poincare সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের অধীনে কার্যকালে তাব নীতির যথার্থতা প্রমাণ করবার চেষ্টায় দশ খণ্ড স্মৃতিকথা লিখলেন।

তবুও সে তথ্য সকলে জেনেছে এবং যা শান্তিবাদী গোষ্ঠীতে Poincare-র রাজনৈতিক শত্রুদের দ্বারা ফ্রান্সে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার চাপে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে Poincare-কে, পূর্বে যে স্বীকৃতির সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছিলেন, সেগুলিকে আবার মেনে নিতে হল। প্রশ্নগুলি যেভাবে করা হয়েছিল, তার সুযোগ নিয়ে Poincare বৃটেন ও ফ্রান্সের বিষয় এড়িয়ে গেলেন, জারতন্ত্রী রাশিয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে মুখর হলেন এবং অধিকাংশ যুদ্ধাপরাধ অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর উপরে চাপিয়ে অংশতঃ জার্মানীর বিরুদ্ধে নিজের পূর্বের অভিযোগ বাতিল করে দিলেন। তিনি লিখলেন, "এ কথা সত্য যে, জার্মান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমি যত ভয়ানক মত প্রকাশ করেছিলাম, ১৯২৭-এ আমি তা করতে চাই নি, প্রধানতঃ দুটি কারণে: প্রথমতঃ জার্মানী পুনর্যোগাযোগের নীতি প্রয়োগের জন্য ডস পরিকল্পনায় যোগ দেওয়ার পরে এটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের উদ্ভবসংক্রান্ত আলোচনায় জার্মানীর যুদ্ধাপরাধের সংগে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুদ্ধাপরাধ প্রকাশ পেয়েছিল, যা কালানুক্রমিকভাবে বৃহত্তর।"

ঐতিহাসিক বিষয়বিচারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের এই প্রাধান্য স্পষ্ট হল যখন সেই সময়ে ক্ষমতাশালী Poincare ১৮৭১ ও ১৯১৪-র মধ্যবর্তী ফরাসী বৈদেশিক নীতিসংক্রান্ত কূটনৈতিক দলিলগুলি প্রকাশের এক সিদ্ধান্ত মন্ত্রীসভার মাধ্যমে করিয়ে নিলেন। ১৯২৫-এ হেরিওর মন্ত্রীসভার দ্বারা পরি-

কল্পিত যুদ্ধকালীন দলিলের বই-এর প্রকাশ বন্ধ করল, যার প্রথম ছ'খণ্ড বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের দ্বারা সংকলিত হয়ে ছাপার জন্য তৈরী ছিল।

অতএব আমরা দেখছি ফরাসী নীতি স্রষ্টারা তাদের নিজস্ব দলিলগত সমর্থন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল। প্রকাশনার দায়িত্ব ছিল ২৫৪জনের এক কমিশনের উপরে, তাতে মরিস পেলিওলোগ, জুলে কাম্বো, মরিস বপার্দের মত সব অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিকরা ছিলেন, হেনরি ফ্রোম্যাগিও ও ভিক্তর দে লাক্রোয়ার মত তখনো পর্যন্ত ফরাসী রাজনীতিতে উজ্জ্বল ব্যক্তিরা ছিলেন এবং শোনা যায় প্রভাবশালী ফিলিপ বার্থেলোর সংগে তার উপরন্তু Aristide Briand-এর সংগে মতপার্থক্য ঘটেছিল যিনি কিছুই না বুঝে ও জেনে ভাবতেন তিনি সব বোঝেন ও জানেন। "চিরজীবীদের" দলের দ্বারা সৃষ্ট শিষ্টতার ফলে কমিশনের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেল, যে কমিশনে এমিল বুর্জোয়া প্যারি ক্যাথলিক সংস্থার প্রধান অ্যালফ্রেড বাউড্রিলার্ট এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও ছিলেন।

ফরাসী সম্পাদকদের নীতির থেকে জার্মানদের নীতি ছিল আলাদা। ফরাসী সংগ্রহ আপাতদৃষ্টিতে বেশী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অত্যন্ত কালানুসারী, এতে সম্পাদকীয় টীকা ও ভাষ্য যতদূর সম্ভব কম। যাইহোক, সাধারণ ধারণা মূলতঃ এক ছিল। মৈত্রীশক্তি ও মৈত্রী বিরোধীদের নীতিকে ইউরোপীয় কূটনীতির প্রধান কেন্দ্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছিল, আর ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছিল।

কালানুক্রমিক বিন্যাসেই ইঙ্গিত ছিল যে, ফরাসী বইটি জার্মান বই-এর উত্তর। তৃতীয় ধারার প্রথম খণ্ড প্রথমে প্রকাশিত হল, তাতে মরক্কো এবং কংগোর বিষয়ে ফরাসী-জার্মান চুক্তির (৪ নভেম্বর, ১৯১১) সমাপ্তির পরের কয়েক মাস সংক্রান্ত বিষয় ছিল। ফরাসীদের পক্ষে প্রকাশের দিনের নির্বাচন নিশ্চিতরূপে ভাল হয়েছিল: সেই সময়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের আশংকাপূর্ণ ফরাসী-জার্মান সম্বন্ধের উত্তেজনা চুক্তির পথ তৈরী করল।

তাছাড়া, এইভাবে কমিশন এমন এক সময় সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপনে সক্ষম ছিল, যে দৃষ্টি ভঙ্গী ইজভোলস্কির চিঠিপত্রের সোভিয়েত বইতে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছিল। যাই হোক, এই বিশেষ সময়টিতে যে খুব কম দলিল তৈরী হয়েছে তার ইঙ্গিত ছিল—যে ইঙ্গিত সম্পর্কে সোভিয়েত সংগ্রহ থেকে জনসাধারণ যেটুকু জেনেছে, তার বেশী সংকলকরা বলতে চাননি। ফরাসী-রুশ সম্পর্কের দলিলোপকরণ আরো বিস্ময়কর, আরো তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটা কালানুযায়ী সেই সময়ের সংগে সংযুক্ত, যে সময়টা হল তুরস্কের ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে উদ্যত বলকান চুক্তির ঠিক আগে। প্রকাশকরা

ফ্রান্সের ও রাশিয়ার নীতির পার্থক্য বোঝাতে কষ্ট করেছিল, তারা বর্ণনা করেছিল যে, ফ্রান্স জার সাম্রাজ্যের আগ্রাসী নীতি ও "যথেচ্ছাচার" কে সংযত করেছিল, বিশেষতঃ বলকান অঞ্চলে।

প্রথম খণ্ড থেকেই শুধু স্পষ্টতঃ বিচার করা যায়, যে কে এবং কি বিশ্বযুদ্ধে ঘটিয়েছে সে প্রশ্নে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মান জনগণ এমনকি জার্মান কাইজারের শান্তিপূর্ণ মনোভাবের প্রমাণদাতা অল্প কিছু কূটনৈতিক রিপোর্ট ফরাসী সংগ্রহে রয়েছে—এ সত্য জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্র গভীর সন্তোষ ও অনেক প্রচার সহ গ্রহণ করল।

ইতিহাসের অন্যান্য দিকেও জোর দেওয়া হয়েছিল, যা জীবন্ত জনগণের উত্তর জাগিয়েছিল। ইংগ-জার্মান সম্বন্ধের সাময়িক প্রশ্ন একদিকে উপস্থিত হয়েছিল, তার সংগে ইংগ ফরাসী মৈত্রী দৃঢ় করার সাধারণ সমস্যা জড়িত ছিল, যেটা জার্মান ভানের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে নিজেকে বাঁচাতে সমর্থ করেছিল, এবং অন্যদিকে এর সংগে ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তির মাঝে ইটালির দোলায়মান নীতি, হওয়ার প্রশ্ন জড়িত ছিল। ইটালির প্রাক-যুদ্ধনীতি, তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ততা, তার একরোখা আগ্রাসী নীতি যা ইউরোপকে অসংখ্য রাজনৈতিক জটিলতা ও দ্বন্দ্ব ডুবিয়ে ছিল, তার উন্মোচন—এই সব বিশ দশকের শেষে ও ত্রিশ দশকের শুরুতে ইউরোপীয় রাজনৈতিক দৃশ্যকে উন্মোচনকারী ফরাসী ইটালীয় বৈষম্যকে গভীরতর করা—সবই এর মধ্যে প্রতিফলিত হল। এটা আদৌ বিস্ময়কর ছিল না যে, শতাব্দীর শুরুতে ইটালীয় নীতির মুখোশ খোলা ফরাসী ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন করে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এক জার্মান সংবাদপত্র বলেছিল :

"এই অতীতমুখী দৃষ্টি ঠিক সময় মত এখন দেখা দিয়েছে, যখন জার্মানিতে কিছু লোক ইটালীয় তাসেবাজি ধরার কথা ভাবছে।" নতুন বৈদেশিক নীতির নির্দেশের জন্য আগ্রহী জার্মানির শাসকদের কথা মনে রেখে জনগণ এই সতর্কবাণী শুনতে ইচ্ছুক ছিল।

অবশ্য একথা মনে করা ভুল হবে যে, ফরাসী বইতে যদিও তারা কিছু জার্মানির পক্ষে অনুকূল প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করেছিল, তবুও তারা জার্মান-বিরোধী আলোচনা ছেড়ে দিয়েছে। বরং- প্রথম ধারার প্রথম খণ্ডের শেষে শুধু আলোচনা করা হয়েছে যে, ফরাসী বিরোধী নিবারক যুদ্ধের জার্মান পরিকল্পনা তদন্তকারী ফরাসী নীতি এবং রাশিয়া ও বৃটেনের কূটনৈতিক চাপে বাধা পেয়েছিল। ফরাসীরা নতুন একগাদা প্রমাণ হাজির করে বিসমার্কীয় জার্মানিকে শাস্তি দিল এবং উইমার রাজত্বের জার্মান বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের যুক্তিকে অসার প্রমাণ করল।

মোটকথা, প্রথম তিনটি ফরাসী খণ্ড সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, এমন-

ভাবে সেগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে প্রাশিয়া, ইটালী ও বৃটেনের নীতির বিশেষ দিকগুলি স্পষ্ট হয়, আর ফরাসী নীতির ভূমিকাটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এটা বরাবর বজায় রাখা অসম্ভব। ১৯১২-র ফেব্রুয়ারী-মে সংক্রান্ত পরবর্তী খণ্ড (তৃতীয় ধারার দ্বিতীয় খণ্ড) হ্যালডেন মিশন ও বেলজীয় নিরপেক্ষতাসম্পর্কীয় আলোচনার মত বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করল। এখানে ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার সংগে সাম্য রেখে দলিল নির্বাচনের ঘোষিত নীতি থেকে ফরাসী কমিশন সরে এল। একগুচ্ছ দলিল বই থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া হল এবং পরিবর্তে এক সম্পাদকীয় টীকায় সেটা উপস্থিত করা হল। টীকায় ইংগিত দেওয়া হল, যে ফরাসী জেনারেল স্টাফ ১৯১২-তে বেলজীয় নিরপেক্ষতা ভাংগবার চেষ্টা করছিল। Poincane পরিকল্পনাটা সম্ভব করার জন্য চেষ্টা করছিলেন এবং বৃটিশ সম্মতি চাইছিলেন। তিনি ২৮ মার্চ, ১৯১২-তে লিখেছিলেন, যদি ফ্রান্স আক্রমণকারী হয় তাহলে ফ্রান্স ও জার্মানীর বিষয়ে বৃটেনের নিরপেক্ষতার ভার গ্রহণ করা উচিত নয়।

এতেই দেখা যাচ্ছে, যে, বাস্তব কালানুসারী নীতি সত্ত্বেও জার্মানী ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মত ফরাসী সম্পাদকরাও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল লুকিয়ে ফেলেছিলেন। উপরন্তু, তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, প্রকাশিত কিছু দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এর ফলে কি বাদ দেওয়া হয়েছে, তা নির্ধারণের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গেল, যদিও কেন বাদ দেওয়া হয়েছে, তা অনুমান করা সহজ। আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, কমিশন সমসাময়িক ফরাসী রাজনীতিক ও কূটনীতিকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পরীক্ষা করেছে। হাজার হোক, এই কমিশনে এইসব চিঠিপত্রে জড়িত কিছু উজ্জ্বল ফরাসী কূটনীতিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু, এই ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কোন রাজনৈতিক স্বার্থই জড়িত ছিল না, এ দাবী আমরা বিশ্বাস করি না।

ফরাসী কমিশনের অন্যতম সদস্য পাশর্ককে নিশ্চিত করতে চাইলেন যে, ১৮৭১-১৯১৪-র ফরাসী নীতিসংক্রান্ত কোন দলিল চেপে রাখা হবে না এবং বললেন যে, "পুরনো রুশ দলিল সংগ্রহের" নিয়ন্ত্রক বলশেভিক সরকার যে সব দলিল যে কোন মুহূর্তে প্রকাশ করতে পারে, তা চেপে রাখা নিরর্থক। তিনি বললেন যে, এতে স্বভাবতই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের সৃষ্টি হয়। যখন ১৯৩১-এর শীতে Poincare প্রকাশ্যে ইংগিত দিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত বৃহৎ সোভিয়েত সংগ্রহতে "অনেক অত্যন্ত বিতর্কমূলক আবিষ্কার থাকবে তা তখন এই সত্য প্রমাণ হল যে, সোভিয়েত বই *রাজকীয় যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক* পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী নীতির মুখোশখোলা সোভিয়েত বই-এর মত ভয় জাগিয়েছিল।

যুদ্ধাপরাধ সম্বন্ধে ফরাসীদের সরকারী ধারণা যে পরিবর্তিত হয়েছে, তা শীঘ্রই বোঝা গেল ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের পিয়ের রেনুভাঁ ও

সোরবোঁ-র অধ্যাপক ক্যামিল ব্লকের এক প্রবন্ধ থেকে। ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংবাদপত্রের কৌতূহল জাগালেন এই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে, যদিও বিজয়ীরা এক সময়ে ভেবেছিল যে কাইজার সরকার একমাত্র যুদ্ধাপরাধী তবুও তারা সমগ্র জার্মানীর নৈতিক দায়িত্ব অনুমান করে নি। প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে, বিজয়ীরা ১৯১৪-র আগস্টের জার্মান আক্রমণের বাহ্যিক তথ্যকে ক্ষতিপূরণ দাবীকারী ন্যায়সঙ্গত যুক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঝুঁকে পড়েছিল। আরো বলা হয়েছিল, ভার্সাই চুক্তির ২৩১ ধারা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ভিত্তিহীন, কারণ ওটা ভার্সাই দলিলের সরকারী জার্মান অনুবাদের দুর্ভাগ্যজনক ভুলের ফলে ঘটেছিল।

অবশ্য এটা উল্লেখযোগ্য যে, জার্মান সংবাদপত্র এইসব নিশ্চিত উক্তিকে মর্যাদা দেয় নি। পরবর্তী আলোচনায় দেখা গেল যে তারা পর্দার অন্তরালে অনুসন্ধানে ও আলোচনার প্রতিধ্বনি করছিল, যেটা, এখন নির্ভয়ে বলা যায় এক বছরের পরিশোধ বন্ধ রাখার শর্তের বিষয়ে ফরাসী মার্কিন চুক্তির পরেই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ঘটেছিল। ফরাসীপক্ষ এ ধারণা জন্মাতে দিল যে, তারা অপ্রধান বিষয় সম্পর্কে সুবিধা দিতে ইচ্ছুক এবং শুধু জার্মানীর যুদ্ধাপরাধের ভার্সাই রায় বাদ দিতে রাজী, যদি জার্মানী সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে, সে ভার্সাই চুক্তির বাস্তবভিত্তির পরীক্ষা করার সব চেষ্টা ত্যাগ করে এবং সেই সংক্রান্ত চুক্তি ত্যাগ করে। আংশিকভাবে জার্মানীকে "মুক্ত" করার চেষ্টা সাময়িক ব্যবস্থামাত্র। এই বিষয়ে নিয়ন্ত্রীকরণ সম্মেলনের উদ্বোধনে ১৯৩২, ৩১শে জানুয়ারীতে ইয়র্কের আর্চবিশপ যা বলেছিলেন, তা আরো অর্থপূর্ণ। আর্চবিশপ খৃস্টান ক্ষমা ও ভ্রাতৃত্বের নামে দাবী করেছিলেন যে পশ্চিমী শক্তিরা তাদের দ্বন্দ্ব থামিয়ে দিক জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ সম্বন্ধে ভার্সাই রায় পরিত্যাগ করুক, এবং পুঁজিবাদী জগতের সাধারণ সমস্যার সমাধানকল্পে ঐক্যের পথ সুগম করুক। ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী সংবাদ পত্র ক্রুদ্ধ হল এবং বৃটেনের রক্ষণশীল অংশ আরো ক্রুদ্ধ হল। টাইমস্ ভীষণ আক্রমণ শুরু করল, তারপর করলেন অস্টেন চেম্বারলেন। চেম্বারলেন বললেন, "এটা নৈতিক নয়, এটা খৃস্টান বিশ্বাসের প্রয়োগ নয়, বরং খৃস্টীয় নীতিকে অস্বীকার করা হল এই বলে যে, সব জাতি সমানভাবে অপরাধী। অবশ্যই একটা নৈতিক মতবাদ থাকা চাই, যার আক্রমণকারীর উপরে প্রতিক্রিয়া ঘটবে এবং তাকে আক্রমণে বাধা দেবে···কিন্তু অপরাধীর সংগে নিরপরাধকে গুলিয়ে ফেলা···আন্তর্জাতিক নীতির মূলকে ধ্বংস করা···যে কোন জাতি যে যুদ্ধ চায় তার দায়িত্ব ও অপরাধ স্থির করা··· ক্ষমতা লীগ অফ নেশনসের।"[৩]

৩। টাইমস, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২।

জার্মানীর প্রবেশ সংক্রান্ত বিষয় লীগ অফ নেশনসে আলোচনার ১৬ ধারায় চেম্বারলেন যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তা লীগ যেসব রাষ্ট্রকে আক্রমণকারী বলে অভিহিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনার জন্য লীগ সদস্যদের জায়গা ব্যবহারের কথা বোঝায়, সেটা যুদ্ধাপরাধের বিষয়ে তাঁর কথার রাজনৈতিক গুরুত্বের উপরে আলোকপাত করে।

ইয়র্কের আর্চবিশপ যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন তাঁর অসংখ্য বিরোধীদের কাছে, তাতে দেখা যায় তাঁর দৃষ্টির সংগে অস্টেন চেম্বারলেনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ নেই।

পূর্বের যুদ্ধের জন্য জার্মানীর অপরাধের কথাই শুধু ফিরে এল না, উপরন্তু যুক্তি তৈরী করা হল যে, জার্মানীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা প্রস্তুত নতুন যুদ্ধকে সমর্থন করতে হবে এবং লীগ অফ্ নেশনসের ১৬ ধারাকে মেনে চলবে যে ধারাকে বৃটিশ কূটনীতি নির্দিষ্ট, সুদূর প্রসারী উদ্দেশে ব্যবহার করতে চেয়েছিল—তাহল জার্মানীকে পশ্চিমী শক্তিব সোভিয়েত বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগদান করানো।

যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হল এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠল, তখন প্রায়শঃ দলিলগুলি রাজনৈতিক যুদ্ধের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। জার্মান সৈন্য বাহিনীর এক প্রাক্তক কর্ণেল B. Schwertfeger তাঁর বই ওয়ার্ল্ড ওয়ার অফ্ ডকুমেন্টস-এ লিখেছিলেন ১৯২৯-এ যে, "এখন আমরা জার্মানরা ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে···প্রকৃত বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য।" কিন্তু ইতিমধ্যে নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথার পিছনে সম্পূর্ণ নতুন লক্ষ্য দানা বাঁধছিল।

ঐতিহাসিক দলিল নিয়ে রাজনৈতিক যুদ্ধ অব্যাহত রইল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুনর্ব্যবস্থার দ্বন্দ্বযুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ, জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে খৃস্টীয় পদ্ধতিতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে মুক্ত করাব প্রচেষ্টা স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইয়র্কের আর্চবিশপ পরে মন্তব্য করেছিলেন যে, প্লেটো সেই ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন যখন গ্রীক শহরের মধ্যে যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ মনে করা হবে। এটা আসলে পুঁজিবাদী দেশের শাসক শ্রেণী, জয়ী ও পরাজিতের প্রতি সতর্কবাণী, যা তাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ও শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যদ্ধে মিলিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল।

জার্মান কূটনীতি ঃ
লোকার্ণো থেকে জেনেভা

১৯২৫-এর ১৬ই অক্টোবর সুইস স্বাস্থ্যকর জায়গা লোকার্ণোতে চার পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তি—বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি এবং জার্মানি ভার্সাইতে স্থিরীকৃত ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের এবং জার্মানির সীমান্তের প্রত্যাভূতি দিল।

জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের সীমান্ত সম্বন্ধে অনুরূপ প্রত্যাভূতি আদায়ের জন্য ফরাসী ও পোলিশ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ১৯২৫-এর ২৭শে নভেম্বর রাইখস্টাগ ১৭৪টা ভোটের বিরুদ্ধে ২৯১টা ভোট দিয়ে ৬টি আপত্তির সাহায্যে লোকার্ণো চুক্তিকে সমর্থন করল। ১লা ডিসেম্বর এই চুক্তি লণ্ডনেও সমর্থিত হ'ল এবং বুর্জোয়া সংবাদপত্র বিজয়ীরভঙ্গীতে পৃথিবীকে বলল যে, এখন থেকে "লোকার্ণোর মনোভাব" বজায় থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যবাদী পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৃটেনের প্রভাব রক্ষার সাফল্য হিসাবে বৃটিশ কূটনীতি চুক্তিটা গ্রহণ করল। মন্ত্রী সভার কাছে এক গোপন লিপিতে (দ্রুত প্রকাশিত) বৈদেশিক সচিব অস্টেন চেম্বারলেন লীগ অফ নেশানসের অধীনে পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েত বিরোধী সামরিক গঠনের প্রতি প্রথম পদক্ষেপ রূপে পারস্পরিক প্রত্যাভূতি ব্যবস্থার বর্ণনা দিলেন। চেম্বারলেন লিখলেন, স্থায়ী হওয়া দূরে থাক রাশিয়ার নিরাপত্তা হীনতার এক বিপজ্জনক উপাদান। তিনি আরো লিখলেন, অতএব রাশিয়া সম্বন্ধে এমনকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যাভূতি নীতি গঠন করা প্রয়োজন। লণ্ডনে তৈরী এই নীতিতে জার্মানিকে এক বিশেষ ছাঁচে ফেলা হ'ল।

ওয়াল স্ট্রীট ও সিটিতে রচিত ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা জার্মানিকে প্রচুর মার্কিন ও ব্রিটিশ ঋণ দানের পথ খুলে দিল। বার্লিন বা অন্য যে কোন বড় জার্মান শহরের যে কোন বাসিন্দা পুঁজিবাদী উদ্যোগ ও দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবের দ্রুত ফল দেখতে পেত। শ্রমিক শ্রেণীর যে বিপ্লবের বিস্ফোরণ ১৯২৩-এ জার্মানিকে কাঁপিয়ে

দিয়েছিল, তাকে রাইখসওয়্যার পিস্ট করল। অভূত পূর্ব মুদ্রাস্ফীতি, মার্কের দাম পূর্বের তুলনায় এককোটির একভাগে নেমে যাওয়া, শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরি শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ করার ব্যস্ততা, দেশজোড়া আত্ম-হত্যার ঢেউ আর মুনাফাবাজদের পকেট ভর্তি করা, এসব অতীতে মিলিয়ে গেল।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি আপাত স্থায়িত্ব লাভ করল। একচেটিয়া কারবার ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে প্রভাব-বিস্তারের পথ খুঁজতে লাগল। জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভেদ ভুলতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। আর ১৯২৩-এর পরাজয়ের পর শ্রমিকরাও নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুদ্ধের জন্য মিলিত হচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তার পদ ও শ্রেণী সংগ্রামের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা শ্রমিক ও পাতিবুর্জোয়াদের ওপরে তাদের প্রভাব দৃঢ় করার জন্য কাজ করছিল। বুর্জোয়া উইমার সংবিধানের কাছে প্রজাতন্ত্রবাদ ও আনুগত্য প্রচার করে তারা বামপন্থী বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক দল, ক্যাথলিক সেণ্টার দলের প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষ, এমনকি একচেটিয়া পুঁজিবাদী জার্মান পিপলস পার্টির সংগে সহযোগিতার তৎপরতা ঘোষণা করল।

ডস পরিকল্পনার প্রশংসায় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মত এত উৎসাহী আর কেউ ছিল না, তাদের মতে এই পরিকল্পনা শ্রেণী সংগ্রাম ও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের সব ত্রুটিকে সারিয়ে দেওয়ার যোগ্য। পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তির সংগে, "পশ্চিমী" সংগঠন নীতির সংগে আপসের জন্যও আর কেউ এত উৎসাহী ছিল না। এমনকি যে একচেটিয়া গোষ্ঠী এই পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, তারাও শেষ প্রতিশ্রুতি এড়াবার জন্য উদ্বিগ্ন ও নম্র হয়েছিল, তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ও পরে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির শেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষম্যকে কাজে লাগাতে চাইছিল, ভার্সাইচুক্তির স্তম্ভগুলি হয়মর্যাদা করে "পৃথিবীতে স্থান" পাওয়ার তালিকায় নাম আবার লেখাতে চাইছিল।

১৯২২-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত র‍্যাপালো চুক্তি পশ্চিমী শক্তির মধ্যে ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, যখন থেকে জার্মান কূটনীতি জার্মান সংবাদপত্রের কিছু অংশ নতুন "প্রাচ্য" সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকার জন্য দেশের তৎপরতার কথা পুনরাবৃত্তি করছিল, তখন থেকে ক্রোধ আরো বেড়ে গিয়েছিল। সত্য যে, জার্মানির শাসকদের মধ্যে, বিশেষতঃ 'প্রাচ্য' ধারার সময় থেকে অনেক প্রভাবশালী লোক র‍্যাপালো নীতিতে আপত্তি করেছিল,—'প্রাচ্য রীতি' অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পুনর্যোগাযোগের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়—যা জার্মান

শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী। যেসব পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা গোপন জার্মান-সোভিয়েত সামরিক মৈত্রীর ব্যাপারে সন্দেহ করেছিলেন তাদের দুঃখিত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, তাদের সন্দেহ ছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও রাইখসওয়্যার নেতৃত্বে জয়ী দেশগুলি থেকে সুবিধে আদায়ের জন্য। জার্মান শিল্পপতিদের (Otto Wolff, Walther Rathenau, ইত্যাদি), কূটনীতিকদের (Freiherr Maltzan, Count Brockdorff-Rantzau ইত্যাদি) এবং বুর্জোয়া চিন্তাশীলদের (অধ্যাপক Otto Hoetzsch ইত্যাদি) মধ্যে র‍্যাপালো মনোভাবের প্রবক্তারা রাশিয়ার সংগে ভালো প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের বিসমার্কীয় রীতি তার বিরোধী, বিশেষতঃ যারা আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবারের সংগে যুক্ত বা যুক্ত হতে ইচ্ছুক, তাঁরা "পশ্চিমী" সংগঠনের প্রস্তুতির চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা আশা করলেন যে, এতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মিটমাট হয়ে যাবে ও জার্মানিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। যে আন্তর্জাতিক বিরোধের আগুন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে জ্বলছিল, জার্মান বুর্জোয়া, তার সরকার ও সংবাদপত্র এর সুযোগ নিতে চাইছিল। বড জার্মান ব্যাংক ও একচেটিয়া কারবারগুলো বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন অংশীদারদের সংগে যোগাযোগ করার বা যোগাযোগ প্রসারিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শিল্পপতি ফরাসী একচেটিয়া কারবারের সংগে যোগাযোগ করতে চাইছিল এবং আশা করছিল যে, ফরাসী সরকার তাদের সমর্থন করবে। রুর অঞ্চলের শিল্পপতি, কনরাড অ্যাডেনাউর, কোলোনের ওবারবার্গেমাস্টার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী রাইন নীতির গোপন প্রবক্তার সম্বন্ধে এটা সত্য।

প্রধান মন্ত্রী Raymond Poincare-র আদেশ মত, ইউরোপে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য স্থাপনের জন্য রুর-এ ফরাসী দখল, ফ্রান্সের সংগে "পৃথক বোঝাপড়ার জার্মান সমর্থকদের এক আঘাতস্বরূপ। তারা দেখল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে" র‍্যাপালো চুক্তির মাধ্যমে পূর্বে অধিকারচ্যুত হয়ে জার্মানী ফ্রান্সের সংগে সংঘর্ষের আঘাত সহ্য করতে পারবে না। ইতিমধ্যে বৃটিশ কূটনীতি অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। যতক্ষণ না এটা স্পষ্ট হল যে, জার্মানী এবং ফ্রান্স—উভয়পক্ষই তাদের শক্তি শেষ করে ফেলেছে এবং রুর-এর আন্তর্জাতিক সংকটে জার্মানীর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটের আভাষ, ততক্ষণ বৃটেন এগিয়ে এল না। সম পরিকল্পনা, জার্মান পুঁজিবাদকে স্থায়ী হতে, যে একচেটিয়া কারবার ও সামরিক শক্তি ভার্সাইউত্তর বাস্তবতার সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে তাদের শক্তি ফিরিয়ে আনতে ও জার্মানীর সামরিক অবস্থা উন্নত করতে চেষ্টা করছিল, তাদের দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। তাদের প্রধান আগ্রহ ছিল দেখা যে, বিজয়ী দেশের দখলকারী বাহিনীরা

জার্মানী পরিত্যাগ করছে।[১] যাই হোক, জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ হওয়ার ওপরে ভার্সাই চুক্তির স্থানত্যাগের শর্ত নির্ভর করছিল। অতএব তারা দুটো পথে গেল, প্রথম নতুন চেহারায় সমরবাদকে লুকিয়ে ফেলা এবং দ্বিতীয়, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, সমরবাদের পুনর্জন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ভার্সাই-এর ব্যবস্থাকে বানচাল করা। লুকানো চুক্তি দু দিকেই জার্মান শাসকদের যথেষ্ট সুযোগ দিল। অবশ্য, পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তির দলে জার্মানীর প্রবেশের পথ অনেক গোলক ধাঁধা ও আভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ভরা ছিল, যা পশ্চিমকে মুস্কিলে ফেলেছিল।

১

যখন লোকার্ণো চুক্তির জমি তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, তখন জার্মান সরকার দাবী করল যে, বিজয়ীরা তাদের দখলকারী বাহিনীদের কোলোন অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করুক। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এর ফলে সরকারের দক্ষিণপন্থী ন্যাশন্যাল পার্টি থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট পর্যন্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ হত, কারণ, সৈন্যদের উচ্ছেদে "পশ্চিমী" সংগঠন ও "লোকার্ণো বক্তব্য"-এর সুবিধা দেখা যেত।

লোকার্ণোতে সম্মেলনের বিষয়ে জার্মানির সম্মতির কথা ১৯২৫-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর জার্মানির রাষ্ট্রদূতরা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, বৃটেন ও ইটালির সরকারকে জানালেন এবং এই রকম একটা নোট দিলেন যে, যতদিন জার্মানির এক বিশাল অংশ দখল চলবে, ততদিন শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধির কোন মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না, যার ওপরে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োগ নির্ভরশীল।

মিত্রদের প্রত্যেকে এই "এই বিশ্বাসী মনোভাবে" প্রস্তুত মৃদু দাবীর দ্রুত উত্তর দিল।

তিনদিন পরে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করল যে, সৈন্যদের স্থান ত্যাগের দিন সম্পূর্ণভাবে জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণের শর্ত পালিত হওয়ার ওপরে নির্ভর করছে। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উত্তরও প্রায় এক। কিন্তু ভাষার মিল থাকার অর্থ ভাবের মিল নয়; পর্দার অন্তরালে এক কূটনৈতিক কৌশল শুরু হয়েছিল।

১ প্রথম অঞ্চল (কোলোন) ছিল ৬০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং লোক সংখ্যা ২,৫০০,০০০ এবং ভার্সাই চুক্তিতে ১৯২৫-এ এই অঞ্চল ত্যাগের শর্ত ছিল, দ্বিতীয় অঞ্চল (৬,৪০০ বর্গ কিঃ মিঃ, জন সংখ্যা ১,২০০,০০০) ছাড়ার শর্ত ১৯৩০-এ এবং তৃতীয় অঞ্চল (১২,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ, জন সংখ্যা ৩,০০০,০০০) ছাড়ার কথা ছিল ১৯৩৫-এ।

লোকার্ণোতে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে দখলকৃত অঞ্চল ত্যাগের বিষয়ে কিছুই বলা হল না। কিন্তু সম্মেলনে যোগদানকারীরা মনোরম সুইস গ্রামাঞ্চলে মোটরে ভ্রমণের সময়ে বিষয়টা ভালোভাবে আলোচনা করলেন। স্ট্রেসম্যান অঞ্চল ত্যাগের ওপরে জোর দিলেন, তিনি দেখালেন যে তাঁকে রাজনৈতিক দলগুলি ও জার্মান জনমতকে শান্ত করতে হবে। লোকার্ণো আলোচনার জীবন্ত কেন্দ্রস্থল অস্টেন চেম্বারলেন স্ট্রেসমানকে খুশী করতে চাইলেন এবং জার্মানীকে পশ্চিমী ব্যবস্থায় আনায় সাহায্য করতে চাইলেন। বক্তা Aristide Briand বৃটেনের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিজয়ীদের রাষ্ট্রদূত পরিষদে বিষয়টা নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল, যে পরিষদ ঠিক করবে জার্মানি তার নিরস্ত্রীকরণ শর্ত পূর্ণ করেছে কি না। পরিষদের অধিবেশনের ভিত্তি প্রস্তুত লোকার্ণো সম্মেলন শেষ হওয়ার সংগে সংগেই রাইনের দুই তীরে শুরু হল।

যদিও ফ্রান্স এখনো চাইছিল যে জার্মানীর দাবী মেনে নেওয়ার আগে জার্মানী তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুক, তবুও জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্র একপ্রস্থ নতুন দাবী উপস্থিত করল, কোলোনত্যাগ যার অন্যতম। অন্যান্য দাবীর মধ্যে ছিল, Saargebiet (স্বায়ত্তশাসন) এর অবস্থা পরিবর্তন, দখলীকৃত অঞ্চলে বিদেশী বাহিনীর শক্তি এমনভাবে কমানো যাতে তা প্রাক-যুদ্ধ জার্মান বাহিনীর সমান হয়, মিত্রপক্ষীয় সামরিক ট্রাইব্যুনাল ভেঙে দেওয়া, রাইন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা বাদের ফরাসী প্রচার বন্ধ করা, রাইন জাহাজী ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করা এবং মিত্রপক্ষের সামরেক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বন্দী জার্মানদের মুক্তিদান।

১৯২৫-এর ৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রদূতে পরিষদ মার্শাল ফকের সামরিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রতিবেদন বিবেচনা করতে শুরু করল। পরিষদ বসার আগে এটা ঠিক হয়ে ছিল যে, নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে নীতিগতভাবে মিত্রপক্ষ ও জার্মানীর মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই। ভার্সাই কমিশন যা কর্তব্য মনে করেছিল, তা হল, (১) রাইখসওয়্যারের কমাণ্ডার জেনারেল ফন সিটের ক্ষমতা সীমিত করা, (২) প্রাক্তন অফিসারদের স্পোর্টস ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত সামরিক প্রশিক্ষণ বন্ধ করা, (৩) পুলিশকে সামরিক শক্তি বিহীন করা, তার সংখ্যা ১৫০,০০০ লোকে নামিয়ে আনা উচিত এবং আর কিছু ছোটখাট বিষয়।

রাষ্ট্রদূত পরিষদ ফকের প্রতিবেদন অনুমোদন করল। প্যারির জার্মান দূতকে এই সব দাবীর বিষয়ে তার সরকারের মনোভাব জানাতে বলা হল। বৃটেন সরকারীভাবে এরকম মনোভাব প্রকাশ করল যে, যদি জার্মান কথা রাখে, তাহলে তার বাহিনী ১৯২৫-এর ১লা ডিসেম্বর কোলোন অঞ্চল ছেড়ে দেবে।

বার্লিনের জবাব এল দ্রুত। বার্লিন বলল, জার্মানী কথা রাখবে। এ বিষয়ে একমাত্র অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হল- এর বাগাড়ম্বর।

সত্য যে ভার্সাই কমিশন জার্মানীর উত্তরকে যথেষ্ট প্রাঞ্জল মনে করল না। কিন্তু শেষ মতামত দিল রাষ্ট্রদূত পরিষদ। ১৪ই নভেম্বরে এই পরিষদ জার্মানীর উত্তরকে সন্তোষজনক বলে ঘোষণা করল। জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত অতিকূটনৈতিক চাপদানের পদ্ধতির বিষয়ে লণ্ডন ও প্যারির উদ্বেগের ফলে এই দ্রুততা ঘটল, যে জাতীয়তাবাদীরা ১৫ই নভেম্বরে লোকার্ণো চুক্তির বিরুদ্ধে এক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল। স্পষ্টতঃই প্রদর্শন সজ্জিত ও গণআন্দোলনের ধরনে ছিল। রাষ্ট্রদূত পরিষদ হয় দৃঢ় হয়ে থাকত, অথবা জার্মান পশ্চিম সংগঠিত মন্ত্রী সভাকে স্বস্তি দিতে পারত। পরিষদ পরবর্তী পথ গ্রহণ করল এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ১লা ডিসেম্বর কোলোন অঞ্চল মিত্র পক্ষের বাহিনী থেকে মুক্ত হবে।

যাই হোক, "লোকার্ণো মনোভাব" এইভাবে ভার্সাই চুক্তিকে নামমাত্র ব্যবস্থার দ্বারা অচ্ছেদ করল যে, জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ পরে আলোচিত হবে।

এবারে জার্মান সমরবাদীরা এগিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা যে যথেষ্ট জয়লাভ করেছে তা স্পষ্ট, কারণ দখলের সমস্যা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রদূত পরিষদের চেয়ারম্যান Aristide Briand ১৬ই নভেম্বর জার্মান বাহিনীকে এক চিঠি দিলেন, এটা স্বীকার করে যে, জার্মানী ভার্সাই চুক্তির ৪২৯ ধারা বস্তুতঃ পূর্ণ করেছে এবং কোলোন অঞ্চল ত্যাগ ঘোষণা করলেন। চিঠিতে এটাকে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের "নতুন যুগ"-এর শুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৯২৫-এর ১লা ডিসেম্বর প্রথম অঞ্চলের সৈন্য ত্যাগ শুরু করে বৃটিশ দখলদারী বাহিনী কোলোন ত্যাগ করল।

ইতিমধ্যে Briand অন্যান্য দখলীকৃত অঞ্চলে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন জার্মান দূতকে জানালেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই "লোকার্ণো ভাষ্য" নামে পরিচিত হল। লোকার্ণো চুক্তির অধীনে জার্মানী বৃহৎ পুঁজিবাদী পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলির সংগে যোগদানের পর যে, "সমৃদ্ধ ও বিশ্বাসের মনোভাব" বজায় ছিল তার প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত পরিষদ ও অমিত্র পক্ষীয় কমিশন ঘোষণা করল যে, পশ্চিমীশক্তিরা দখলের কর্ম-সূচীর পুনর্বিন্যাস করবে। তারা রাইনল্যাণ্ডের দখলীকৃত অঞ্চলে জার্মান সরকার কর্তৃক কমিশনার নিয়োগে তাদের সম্মতি জানাল, তারা দখলদার বাহিনীর সংখ্যা কমাবার, পুলিশের নিয়ম বদল ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিল। যাই হোক, রাইনল্যাণ্ড ঘোষণার দশদিনের মধ্যে জার্মান সরকার ট্রায়ার ও জুলিখে ফরাসী সরকারের দখলদার বাহিনীকে জোরদার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। মেইনজ আর কোবলেনজেও দখলদার বাহিনী জোরদার

করা হল। নভেম্বরের শেষে জানা গেল যে, মিত্রপক্ষ তখনো দখলীকৃত অঞ্চলে ৭৯,০০০ জন সৈন্য রাখতে চায়। জার্মান সরকার ৪২,০০০-এর বেশী সৈন্য না রাখার জন্য জেদ করল যা প্রাক যুদ্ধ জার্মান সৈন্য সংখ্যার সমান। জার্মান কূটনীতি "লোকার্ণো মনোভাব"-এর আবেদন জানাল ও বৃটেনের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করল।

লোকার্ণো আলোচনায় জার্মান সরকার দখলদার বাহিনীর সংখ্যা কমানোর দাবী জানিয়েছিল। অবশ্য ফ্রান্স নিমরাজী হয়েছিল এবং সম্মতি স্পষ্ট ছিল না। যখন জার্মান কূটনীতিকরা ৪২,০০০ সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ করল Briand তখন আপত্তি করলেন। ক্ষমতাশালীরা লোকার্ণো চুক্তির কাজ শুরু করে দখলদার বাহিনীর বিষয়টা অমীমাংসিত রেখে দিল। যখন লণ্ডনে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর শুরু হল তখন আবার আলোচনা শুরু হল, সেখানে স্ট্রেসমান আপসের জন্য পরামর্শ দিলেন যে, রাইন দখলদার বাহিনীতে ৫০,০০০ জন সৈন্য থাকুক। Briand এই কথা বলে প্রসংগটা এড়িয়ে গেলেন যে, তিনি ফরাসী জেনারেলদের সংগে আলোচনা না করে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না। এটা স্বাভাবিক যে, ফরাসী জেনারেলরা জার্মান প্রস্তাবটা "অবাস্তব" মনে করলেন। জার্মান কূটনীতিকরা ১৯২৫-এর ১৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রদূত পরিষদের নোটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসহ ফরাসী মনোভাবকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষণা করলেন। তখন দখলদার বাহিনীকে "স্বাভাবিক পর্যায়"-এ নামিয়ে আনার ফরাসী প্রতিশ্রুতিকে প্রাকযুদ্ধ জার্মান সৈন্যের সংখ্যায় নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি বলে ব্যাখ্যা করা হল।

রাইখস্ট্যাগ বৈদেশিক বিষয়ক কমিটি ফরাসী মনোভাবের প্রতিবাদ করে এক প্রস্তাব গৃহীত হল, ওদিকে জার্মান সরকার নতুন কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু করল। লণ্ডন, প্যারি ও ব্রাসেল্‌সে জার্মান প্রতিনিধিরা ভার্সাই চুক্তির ৪২৯ ধারা ও "লোকার্ণো মনোভাব" তুলে ধরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দখলীকৃত অঞ্চলে সৈন্যসংখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন (৬০,০০০ ফরাসী, ৮০০০ বৃটিশ ও ৭০০০ বেলজীয়), বৃটেনের পক্ষে ভার্সাই চুক্তির চেয়ে "লোকার্ণো মনোভাব"-এর উল্লেখ বেশী বিশ্বাসযোগ্য। লণ্ডন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, চুক্তির ধারাগুলি অসংলগ্ন, কিন্তু জার্মানি যা চাইছে তা ডস পরিকল্পনা ও লোকার্ণো চুক্তি দ্বারা খুবই সম্ভব। কিন্তু বৃটিশ কূটনীতিকরা বললেন যে তাঁরা কিছুতেই ফ্রান্সের দৃঢ় মনোভাব বদলাতে পারছেন না। ফরাসী কূটনীতিকরাও আবার ঘোষণা করলেন যে, শেষ সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্রদূত পরিষদ অবশ্য এটাও বলল যে, বার্লিনের সামরিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভার্সাই কমিশনের চেয়ারম্যান মার্শালফকের কাছে প্রতিবেদনে জানাচ্ছে যে, "জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হয় নি।" কিন্তু দখলদার বাহিনী কমানোর ব্যাপারে ফ্রান্সের বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল। চেম্বারলেন ও Briand-এর মধ্যে

আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত হল যে; সংখ্যাটা হবে ৬০,০০০ জন সৈন্য এবং লীগ অফ নেশনসে জার্মানী প্রবেশ না করা পর্যন্ত আরো সৈন্য কমানোর বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। এটা হল সম্পূর্ণ বৃটিশ ধাঁচের মীমাংসা। ফরাসী দাবী একেবারে প্রত্যাখ্যাত হল না, আবার জার্মানিকেও তার দাবী পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হল। জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সরকারী বুলেটিন Deutsche diplomatisch-politische korrespondenz ১৯২৬-এর জানুয়ারির শেষে প্রকাশ করল :

"লোকার্ণো চুক্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এখনো সিদ্ধ হয় নি ; দখলদার বাহিনীর সংখ্যা ৫০ হাজার বা আরো কম করে তা সিদ্ধ হবেও না।" এই বিষয়েও বৃটেন জার্মানির সামনে লীগ অফ্ নেশনসে যোগদানের সম্ভাব্য সুবিধার লোভ দেখিয়ে চাপ সৃষ্টির সুযোগ ছাড়ল না। যখন থেকে লীগ সংবিধানের ১৬ ধারায় ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, আগ্রাসী বলে কথিত সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্য দিয়ে বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী যেতে পারবে, তখন থেকে লোকার্ণোর বৃটিশ স্থপতিরা রাইন দখলের বিষয়ে সামান্য আপসের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানির রাজনৈতিক পন্থাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিলেন।

২

লোকার্ণো পরিকল্পনায় লীগ পরিষদে সমশক্তির আসনসহ লীগ অফ নেশনসে জার্মানির প্রবেশ বোঝানো হয়েছিল। অতএব জার্মানির শাসকরা লীগে যোগদানের অনেক আগে তাঁদের বৃহৎ শক্তিরূপী ভঙ্গীর মহড়া শুরু করলেন। তাঁরা ভাব দেখালেন যে, যেখানেই হোক না কেন, তাঁরা সব জার্মানভাষী জনগণ ও জাতির দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক। যে সরকারী ভাষায় এই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে জার্মান জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য রাইখের দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কার্যতঃ এটা বোঝাল যে, বিশ্ব জার্মান ভাবধারার পুরনো রাজনৈতিক রীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভার্সাই পরবর্তী বাস্তবতার সংগে খাপ খাইয়ে নিয়ে আবার ফিরে আসছে। এই পুনর্জাগরণ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে প্রমাণিত হল, যেখানে বিশ্বজার্মান পরিকল্পনা ও সংগঠন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে দৃঢ়মূল হয়ে হাপ্সবুর্গ সাম্রাজ্যের পতন ও ভাঙ্গনের পরেও বেঁচেছিল। ফ্রান্স ও ইটালির শাসক-শ্রেণী নিশ্চয়ই আশঙ্কিত হয়েছিল। যখন অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন চ্যান্সেলার ডঃ সাইপেল, আদি খৃস্টযুগের পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরূপে যিনি পরিচিত তিনি যখন জার্মান সাংস্কৃতিক ঐক্যের মহিমা নিয়ে প্রকাশ্যে বার্লিনে বক্তৃতা দিলেন, যে ঐক্য তাঁর মতে জার্মান রাষ্ট্রের বিধ্বস্ত ঐক্যের ক্ষতিপূরণ

করেছে, তখন প্যারি ও রোমের সংবাদপত্রগুলি ভাবতে লাগল, জার্মান-অস্ট্রিয়া একত্র হওয়ার পরিকল্পনা করছে কি না।

ডস পরিকল্পনানুযায়ী মার্কিন ও বৃটিশ মূলধন আমদানীর সাহায্য পেয়ে, এবং বিশেষ করে জার্মানিকে বৃহৎ শক্তি বলে স্বীকার করে নেওয়ার বিষয়ে লোকার্ণো আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ যখন ক্রমশঃ তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরে পাচ্ছে, তখন বিশ্বজার্মানবাদ শুধু বৈদেশিক নীতিপ্রচারকেই নয়, সেই সংগে কিছু বাস্তব কূটনৈতিক পদক্ষেপকেও প্রভাবিত করল। বৈদেশিক নীতির বিষয়ে জার্মান নীতি আরো আকস্মিক ও সোজাসুজি হয়ে উঠল, কিন্তু বাধা পেলে তা সাধারণতঃ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে বেশী হিংস্র হয়ে উঠত। লোকার্ণো ব্যবস্থায় জার্মানি ও ইতালির যোগদানের পর তাদের সংঘর্ষ থেকে এটা আরো প্রমাণিত হয়।

অস্ট্রিয়ার সংগে সম্পাদিত পশ্চিমী শক্তিগুলির সাঁৎ-জার্মে চুক্তি অনুযায়ী টাইরল বিভক্ত হ'ল, উত্তর দিক রইল অস্ট্রিয়ার আর দক্ষিণ গেল ইতালির হাতে। টোমাসো টিটোনি সংসদে বললেন, "নতুন ইতালীয় অঞ্চলের অ-ইতালীয়দের জানানো উচিত যে, তাদের ওপরে অত্যাচার করা বা তাদের মিশ্রিত করার চিন্তাও আমাদের মনে নেই, তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কথা সব সময়েই বিবেচিত হবে এবং আমাদের ন্যায্য গণ-তান্ত্রিক সংবিধানের সব অধিকার তাদের প্রশাসকরা পাবে।"

তবুও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী সরকার ইতালীর তৈরীর নীতি মেনে চলেছিল। ফ্যাসিস্ট কেন্দ্রিকতা ও তার শাখা-প্রশাখা স্বায়ত্তশাসনকে উচ্ছেদ করেছিল। ফ্যাসিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী হ'ল, ফ্যাসিস্ট জাতীয় সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং ইতালীয় ভাষা বাধ্যতামূলক হ'ল। জার্মান নাম ও পদবীর ইতালীয় পরিবর্তনের জন্য আদেশ জারী হ'ল। অস্ট্রিয় ও জার্মান সংবাদপত্র প্রতিবাদ করল। ইতালী বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে জবাব দিল। যথারীতি প্রচারবাদীরা ইতিহাসের নজীর দেখাল। জার্মান ও অস্ট্রিয় সংবাদপত্র জনগণের দেশত্যাগের কথা স্মরণ করাল। ইতালীয় ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্র বলল যে, যে জায়গা বরাবর ইতালীয় অঞ্চল এবং যেখানে সম্প্রতি "অন্য ভাষাভাষী" লোকের দল এসেছে, সে জায়গা যথার্থ মালিককে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্বজার্মান উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোন পুনর্জাগরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে করবেই। একটি ইতালীয় সংবাদপত্র লিখল, "৮০,০০০০০ জার্মানকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা রাজনৈতিক ভাবে বিপজ্জনক ও অসহনীয় হয়ে উঠবে।"

জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্র ইতালী, সে দেশের ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ ও বাণিজ্য বর্জন করার আহ্বান জানাল। বর্জন কার্যকরী করার জন্য দ্রুত এক সংগঠন তৈরী হ'ল। যদিও এই ভীতি প্রদর্শন মুসোলিনীকে ক্রুদ্ধ

করেছিল, তবুও ওটা ফাঁকা, মুসোলিনী ঘোষণা করেছিলেন যে ইতালি "তিন গুণ বর্জন ও অত্যাচার" করে জবাব দেবে। ব্যাভারীয় মন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট হেল্ডের ব্যাঙ্গাত্মক বক্তৃতার উত্তরে ফ্যাসিস্ট দলের সাধারণ সচিব রবার্তো-ফারিনাচ্চি-ইতালীয় পরিষদে হস্তক্ষেপ করলেন। ১৯২৬, ৫ই ফেব্রুয়ারি এক কলহাত্মক বক্তৃতায় মুসোলিনী বললেন যে, ইতালীর নীতি বদলাবে না। তিনি ঘোষণা করলেন, "ইতালী ব্রেনার গিরিবর্ত্ম থেকে তার পতাকা কখনো নামাবে না এবং দরকার হলে আরো এগিয়ে যাবে।"

এটা ইতালী-জার্মান দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত সীমা, যাতে "তরুণ, গর্বিত, ফ্যাসিস্ট ইটালীর" প্রকৃত ইচ্ছার জবাব পাওয়া গেল। নীতি ও বিষয় বস্তুতে এটা জার্মানির প্রতি দ্বন্দ্বের আহ্বান। যে অস্ট্রিয়াকে ইতালীয় একনায়ক সবচেয়ে ভয় পেতেন, সে আপসেরভঙ্গীতে নেমে এল। ভিয়েনা সংবাদপত্র ইতালীর সংগে "প্রকৃত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের" ইচ্ছা জানাল। জার্মান সংবাদপত্র, এমনকি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। মুসোলিনীর যে বক্তৃতা কূটনৈতিক কৌশলের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল, তার তীব্রতার জন্য সংবাদপত্রগুলি ফ্যাসিস্ট স্বরাষ্ট্রনীতিকে দায়ী করল এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে জানাতে চাইল যে, জার্মানি ব্রেনার গিরিবর্ত্মের জন্য কম চিন্তা করে না।

১৯২৬, ৯ই ফেব্রুয়ারি রাইখস্ট্যাগে বক্তৃতার সময়ে, স্ট্রেসমান সরকারের সরকারী নীতির আভাস দিলেন। ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের চরম ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, "দক্ষিণ টাইরলের জনগণের সংগে আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান জনমত আবেগের সংগে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। অতিরঞ্জন ও ভুল প্রতিবেদন আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। সরকার শুধু সংবাদপত্রকে সতর্ক করা পর্যন্ত এগোল এবং অত্যধিক উত্তেজনায় কি ক্ষতি হয়েছে দেখাল।"

এটা স্পষ্ট কূটনৈতিক পশ্চাদপসারণ। উপরন্তু স্ট্রেসমান ইতালীকে বর্জন করার জন্য ব্যাভেরীয় সংগঠনকে ভর্ৎসনা করে বললেন যে, বর্জনের আবেদনের সংগে সরকারী নীতির কোন সম্বন্ধ নেই। লীগ অফ নেশনসের অন্যতম সদস্য ইতালী জার্মানির সংগে এত রূঢ় ব্যবহার করার পরেও তিনি জার্মানিকে লীগ অফ নেশনসে ঢোকাতে চাইছিলেন। এইজন্য তিনি বুর্জোয়া ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট সংবাদপত্রের চেয়ে মৃদু ভঙ্গীতে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট ইটালী তার কূটনৈতিক জয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী মুসোলিনী ইতালীয় সেনেটে স্ট্রেসমানকে জবাব দিলেন। এখন তাঁর সুর অত ঝগড়াটে নয়, কিন্তু এমন এক বিষয়ে ইতালীয় মনোভাবকে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করলেন, যে বিষয়ে ডিউসের মতে প্রকাশ্যে আলোচ্য নয়।

বক্তৃতাটি শুধু একদিক দিয়ে আগ্রহোদ্দীপক : লোকার্ণো চুক্তির বিষয়ে ইটালীয়-জার্মান আলোচনার পর্দা এই বক্তৃতা খুলে দিল। স্পষ্টতঃ ইটালী জার্মান আধিপত্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আশংকায় তার উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা চাইছিল। কিন্তু জার্মান কূটনীতি ইটালীকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, জার্মানী নয়, অস্ট্রিয়াই রয়েছে ব্রেনার গিরিবর্ত্মের সীমান্তে। এই ভাবে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে জার্মান সরকার সেই বিশ্ব জার্মানবাদীদের খুশী করল, যারা নিজেদের নতুন ব্যবস্থায় মানিয়ে নিয়ে উইমার সাধারণতন্ত্রের প্রায় সব দলে স্থান পেয়েছিল। অস্ট্রিয়ার "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" বিষয়ে তাদের প্রচারে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্য জয়ের মনোভাবের পুনর্জাগরণ দেখা যায়, এই সাম্রাজ্যবাদীরা ভাষা সীমান্তের সংগে রাষ্ট্র সীমান্তের মিলন ঘটাতে তাঁদের আলোচনায় মানবজাতিসম্বন্ধীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

যে সব পুরানো বৈষম্য কোন শান্তি আলোচনাতে দূর হচ্ছিল না এবং যা বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে নতুন বিপদ সৃষ্টি করছিল, সেই বৈষম্য লোকার্ণোর পর্দার অন্তরাল থেকে আবার দেখা দিল। "লোকার্ণোর আত্মা"-র প্রধান অগ্রদূত, সরকারী ব্রিটিশ সংবাদপত্র ইচ্ছাকৃত সংযমের সংগে ইটালী-জার্মান মতপার্থক্য সম্বন্ধে মন্তব্য করল এবং এই বিশ্বাস প্রকাশ করল যে, এই সংঘর্ষের ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে গভীর পার্থক্য দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্র স্পষ্টতঃ গর্ব প্রকাশ করল, তারা মুসোলিনীর মনোভাবে বিশ্ব জার্মানবাদের আতংকের সচেতনতা এবং এই সতর্কতা দেখতে পেল যে, জার্মানী একবার লীগ অফ নেশনসে ঢুকলে আগে অস্ট্রিয়া ও পরে ব্রেনার গিরিবর্ত্ম অধিকারের চেষ্টা করবে। ইটালীয় সংবাদপত্র ফরাসী-ইটালীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে এর জবাব দিল, এমন কি তারা এরকম ধারণা পর্যন্ত করল যে, ইটালী-জার্মান সংঘর্ষকে তীব্র করার পেছনে ফরাসী কূটনীতির হাত আছে।

লোকার্ণো চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার এত অল্প পরে এবং লীগ অফ নেশনসে জার্মানীর প্রবেশের পূর্বে এই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা এবং তার ফলে উদ্ভূত পরিবেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৩

যে ফ্যাসিস্টরা দক্ষিণ টাইরলকে ইতালীয় তৈরী করতে চাইছিল তাদের দ্বারা এবং জার্মান সরকারের রাজ্যলোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা সৃষ্ট ইতালীয়-জার্মানী দ্বন্দ্বের মত এত নির্দিষ্ট ইউরোপীয় বিবাদ ও ঔপনিবেশিক অধিকারের পুনর্বিভাগসংক্রান্ত শক্তিদ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত হল। বৃটিশ সংবাদপত্র ধারণা করল যে, দক্ষিণ টাইরল নিয়ে রোম বার্লিন দ্বন্দ্বের পিছনে আরো কোন উদ্দেশ্য ছিল, উদ্দেশ্যটা হল, জার্মানীর দাবী মিটবার আগে

কিছু ঔপনিবেশিক অঞ্চললাভের জন্য ইতালীর ইচ্ছা। আমরা বলতে পারি জার্মানী জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এই প্রতিবেদন বিশ্বাস করল এবং এই বক্তে ইতালীয় বিরোধী প্রচার বাড়িয়ে তুলল যে, "লোকর্নোর মনোভাব" ভেঙ্গে পড়বে যদি না জার্মানীকে ঔপনিবেশিকবাদী শক্তি হিসাবে প্রথম স্থান দেওয়া হয়।

তবুও ভার্সাই চুক্তির ১১৯ ধারায় বলা হল: "জার্মানী তার সমুদ্র পারের সম্পত্তির অধিকার এবং স্বত্ব প্রধান মিত্রশক্তি ও সম্মিলিত শক্তির পক্ষে ছেড়ে দিল।"

১৯১৪-১৮-র যুদ্ধে জার্মানী ২৯,৫৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা হারাল— ঔপনিবেশিক নীতিতে চলার আগে এই সব জায়গা সে অর্জন করেছিল। কিন্তু শীঘ্র, যখন ক্ষতিপূরণের বিতর্ক ১৯২১-এ অচলাবস্থায় এসে পৌঁছাল, তখন জার্মান বুর্জোয়াদের কিছু অংশ প্রস্তাব দিল যে, ঔপনিবেশিক জনগণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। যাই হোক, রুরে ফরাসী অধিকারের সময়ে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে পারল না। কাজেই, ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজি সম পরিকল্পনা রূপায়িত না করা পর্যন্ত ও লোকার্ণোতে একমত না হওয়া পর্যন্ত জার্মান বুর্জোয়া আবার প্রশ্নটা তুলতে পারল না। ১৯২৪-এর শেষের দিকে জার্মান সরকার আগ্রাসী হয়ে উঠল। লীগ অব নেশনস প্রদত্ত এক স্মারকলিপি সে দেখিয়ে দিল যে, সংবিধানের ২২ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিজেরা শাসনে অসমর্থ, এমন জনগণকে অগ্রগামী জাতির হাতে রাখা হবে। নিজের ঔপনিবেশিক কার্যকলাপে বাধা পেয়েও পরাজিত, জার্মান সরকার স্মারকলিপিতে বলল, জার্মানী আশা করে যে, ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থায় অংশ-গ্রহণের জন্য উপযুক্ত সময়ে লীগ তাকে ডাকবে। গোপন আলোচনার সময়ে জার্মান কূটনীতি আবার ঔপনিবেশিক ম্যাণ্ডেটের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ সংবাদপত্র Wellwiatschaft বলল: "যদিও লোকার্ণো আলোচনায় জার্মানীর জন্য ঔপনিবেশিক ম্যাণ্ডেটের প্রশ্নটাও উপর উপর আলোচিত হয়েছিল, তবুও তার উত্তর আনুমানিক হলেও সুদৃঢ়। ম্যাণ্ডেট মঞ্জুর করা হবে কিনা, সেটা শুধু সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির উপরেই নির্ভর করে না, জার্মানীর সিদ্ধান্তের উপরেও নির্ভর করে।"

প্রধান বুর্জোয়া পার্টিগুলি (ন্যাশনাল পার্টি, পিপ্‌লস পার্টি, ইকনমিক পার্টি, দ্য সেণ্টার ইত্যাদি) জার্মানির উপনিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচার চালাতে লাগল। উপনিবেশবাদীরা বলতে লাগল যে, ডজ পরিকল্পনার সাফল্য জার্মান রপ্তানীর ওপরে নির্ভর করে, যে রপ্তানী কাস্টম-সের বাধা অন্যান্য দেশের শিল্পোন্নতি ইত্যাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। অতএব জোর পড়েছিল দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপরে, যে বাজারকে উপনিবেশ অধিকারের মাধ্যমে বাড়ানো যেত। "জার্মানির কি উপনিবেশের প্রয়োজন?"

এই নামের এক প্রবন্ধের রচয়িতা জেনারেল স্নী পাশা বলেছিলেন যে, জার্মান জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি ও আরো বৃদ্ধির জন্য উপনিবেশের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন। তিনি লিখেছিলেন, "উপনিবেশের যে সব ভোগ্য দ্রব্য আমাদের ঔপনিবেশিক জনগণের ওপরে নির্ভরশীল, তা যথেষ্ট নির্দিষ্ট নয়, আমাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের ভূমিকা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট······জার্মান উপনিবেশ আমাদের প্রধান বস্তুগুলির দাবী মেটাবে না···কিন্তু উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত কাঁচামাল বিশ্বের বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

লোকার্ণো সম্মেলনের সময়ে জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্র টোগা আর ক্যামেরুনের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। সমব্যথার ভাব দেখিয়ে সংবাদপত্র ইঙ্গিত দিল যে, স্ট্রেসমান বার্লিন থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছেন। বৃটিশ সংবাদপত্র এর উত্তরে প্রস্তাব দিল যে, যদি জার্মানির জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতার প্রশ্ন আদৌ ওঠে, তা হলে এর সংগে বরং বৃটিশের চেয়ে ফরাসী ম্যাণ্ডেটের প্রশ্ন জড়িত থাকবে। এটা ফরাসী সরকারকে উত্তেজিত করায় ১৯২৫-এর ১৯শে ডিসেম্বর চেম্বার অফ ডেপুটিজে বিতর্কের আশংকা দেখা দিল। ফ্রান্স স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, কোন অবস্থাতেই সে আফ্রিকাতে অর্জিত ঔপনিবেশিক ম্যাণ্ডেট জার্মানিকে দেবে না। যদি লণ্ডন আশা করে যে, ফ্রান্স আফ্রিকাতে তার প্রাক্তন উপ-নিবেশগুলির ফরাসী অংশ জার্মানিকে ফিরিয়ে দেবে, তা হলে, প্যারি বলল যে, সে ভীষণ ভুল ভেবেছে। এটাও স্পষ্ট হল যে, যদি বৃটেন কখনো "মহত্ত্বের উদাহরণ" দেখায়, তাহলে ফ্রান্স তা অনুসরণ করবে না। ঔপনি-বেশিক বিষয়ক মন্ত্রী লিঁয় পেরিয়ের ভার্সাই চুক্তির ১১৯ ধারার ওপরে নির্ভর করে বললেন যে, ফ্রান্স তার কোন উপনিবেশ ছাড়বে না।

এই কথা জার্মানির উত্তপ্ত মস্তিষ্কদের মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। তা ছাড়া এতে বৃটেনের গোপন কূটনীতি জটিল হয়ে গেল, এই কূটনীতি সোভি-য়েত ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, পশ্চিমী জগতে বার্লিনকে যোগদানে বাধ্য করার জন্য জার্মান ঔপনিবেশিক দাবী সংক্রান্ত পরিদর্শন, ইঙ্গিত, দরকষাকষি এবং আলোচনাকে সতর্কভাবে কাজে লাগাচ্ছিল। এটা নির্ভয়ে ধারণা করা চলে যে, ঔপনিবেশিক ম্যাণ্ডেটের আবেদন নিষ্ফল হওয়ায় জার্মান কূটনীতি লীগ অফ নেশনসে যোগদানের মাধ্যমে সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখল।

১৯২৬-এ জানুয়ারির প্রথমে বার্লিনে এক সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী ঔপ-নিবেশিক সমিতি প্রস্তাব করল যে, সমিতির দাবী না-মানা পর্যন্ত লীগ জার্মা-নির প্রবেশকে বিলম্বিত করুক: ১) উপনিবেশে জার্মানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সংক্রান্ত সব নিয়ম এখনই বাতিল করা হোক এবং জার্মানদের দেশত্যাগ,

বাসস্থান, বাণিজ্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী সব নিয়ম লুপ্ত করা হোক আর ২) ক্যামেরুণ আর টোগোর জন্য জার্মানিকে ম্যাণ্ডেট দেওয়া হোক।

এই সব নয়। যে সব দাবীর ওপরে জার্মানির লীগে প্রবেশ নির্ভরশীল, তা যদি প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তবুও জার্মানি লীগে যোগদান করতে বাধ্য হয়, তা হলে জেনেভাতে জার্মান মুখপাত্রের জন্য এক বিস্তারিত নির্দেশিকা রচিত হল: ১) যতদিন জার্মানির ঔপনিবেশিক সম্পত্তি ফিরে পাবার আশা নেই, ততদিন ম্যাণ্ডেটের নিয়ম বজায় রাখা ২) বিজয়ী শক্তির সম্পত্তিতে প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশগুলি যাতে অন্তর্ভুক্ত না হয় তার ব্যবস্থা, ৩) জার্মানির অর্থনৈতিক সাম্য অর্থাৎ জার্মানির সব প্রাক্তন উপনিবেশে মূলধন ও পুঁজির অনুকূল ব্যবস্থা।

যখন জার্মানির লীগে প্রবেশের দিন এগিয়ে এল, তখন তার ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা প্রসারিত হল। তাদের ক্রমবর্ধমান দাবী ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী-দের ঈর্ষাপূর্ণ উদ্বেগের সৃষ্টি করল, যাদের উপনিবেশক্ষুধা ১৯১৯ সালের প্যারি শান্তিসম্মেলনে তৃপ্ত হয় নি। তারা নিজেদের দাবী প্রচার করতে শুরু করল। ফ্যাসীবাদ তার মনোভাবকে শক্ত করল। এতএব এটা বিস্ময়-কর নয় যে, বৃটিশ সরকারী সংবাদপত্র দক্ষিণ টাইরলের সংঘর্ষকে অন্যান্য ক্ষেত্রে, সর্বোপরি উপনিবেশের ক্ষেত্রে ইটালীয়-জার্মান বিরোধিতার চিহ্ন বলে ব্যাখ্যা করল। যাই হোক, ঐ সংঘর্ষে দেখা গেল যে, "লোকার্ণো মনোভাব" ইউরোপ থেকে উত্তেজনা, ক্রোধ ও অবিশ্বাস দূর করতে পারে নি। লীগ অফ নেশনসে জার্মানির যোগদানের পরিবেশ এই ধারণাকেই দৃঢ় করল।

৪

লীগে যোগদানের ক্ষেত্রে জার্মানীর চেষ্টা ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগে যুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করা ও পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে জার্মানীকে অন্তর্ভুক্ত করার বৃটিশ চেষ্টা এতে বোঝা যায়।

জার্মানীর প্রথম ভার্সাই-এর শান্তি সম্মেলনে লীগ অব নেশনসে অনুমোদন চেয়েছিল। তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯২৪-এ লণ্ডন সম্মেলনে জার্মানীর সদস্যভুক্তিরও প্রশ্ন আবার ওঠে, তখন বৃটিশ কূটনীতি জার্মান প্রতিনিধিদলের সামনে কিছু প্রলোভন তুলে ধরে।

১৯২৪-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর জার্মান প্রেসিডেণ্ট ফ্রেডরিখ এবার্ট লীগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রবেশের চেষ্টা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ছ'দিন পরে জার্মানী লীগ পরিষদে উপস্থিত দেশগুলিকে সরকারীভাবে জানাল যে, "লীগ অব নেশনস কর্তৃক গৃহীত মহান প্রচেষ্টায় জার্মানীর সহযোগিতা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট প্রস্তাবযুক্ত" দাবী তার রয়েছে। দাবীগুলি হল: (১) লীগ পরিষদে

একটি স্থায়ী আসন এবং সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য লীগ বিভাগে সমানসংখ্যক আসন (২) আক্রমণকারী বলে প্রমাণিত যে কোন দেশের বিরুদ্ধে লীগ সদস্যদের নিয়মানুযায়ী ১৬ ধারার প্রয়োগ, (৩) আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনের আশ্বাসমূলক ১নং ধারার প্রয়োগ (জার্মান সরকার বলে দেয় যে, এই ধারার অর্থ এই নয় যে, জার্মানী ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের জন্য "জার্মান জনগণের নৈতিক অপরাধ"কে মেনে নিয়েছে) এবং (৪) ঔপনিবেশিক ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ।

পরিষদ লীগ পরিষদে জার্মানীর সদস্য হবার ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিল, কিন্তু জার্মান দাবীগুলিকে প্রত্যাখ্যান করল, বিশেষতঃ ১৬নং ধারাসংক্রান্ত দাবীটি- এই যুক্তিতে যে, একমাত্র লীগ অব নেশনস এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

তখন জার্মান সরকার লীগের মহাসচিব স্যার এরিক ড্রামণ্ডের কাছে এক নোট পাঠায় ১৯২৪-এর ১২ই ডিসেম্বর যে, সে ১৬নং ধারা মেনে চলতে পারবে না, কারণ ভার্সাই চুক্তির চুক্তির শর্তানুযায়ী সে অস্ত্রত্যাগে বাধ্য হয়েছে। ড্রামণ্ড উত্তর দিতে তিনমাস সময় নিলেন। প্রতিশ্রুতি শর্তসংক্রান্ত কথাবার্তা যথেষ্ট না এগোন পর্যন্ত তার উত্তর এল না। ১৯২৫-র ১৪ই মার্চ লীগ পরিষদ জার্মান সরকার একটি নোটে জানালেন যে, চুক্তি অনুযায়ী লীগ কর্তৃক সংঘটিত সশস্ত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ স্বভাবতঃই বিভিন্ন দেশের সামরিক অবস্থানুযায়ী আলাদা হয়েছে। এই বক্তব্যের আশ্বাসজনক অস্পষ্টতা এক নতুন কূটনৈতিক বিবাদের সূচনা করল। অবশ্য বৃটিশ কূটনীতিকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হল, প্রথমতঃ লীগে জার্মানীর প্রবেশে ফরাসী সহযোগিতার জন্য চাপ সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোন সক্রিয় প্রচেষ্টায় জার্মানীর অংশগ্রহণের শর্ত না ভেঙেই জার্মানীর লীগে যোগদানের একটা উপায় খুঁজে বার করা।

দীর্ঘ, গোপন চেষ্টার পর এই উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। নিম্নলিখিতভাবে ফরাসী সরকার এটা প্রকাশ করলেন: মিত্রশক্তির বিশ্বাস যে, লীগ অব নেশনসের সদস্যপদ লীগে জার্মানীর প্রবেশের পর জার্মানীর জন্য কাজের সবচেয়ে ভাল সুযোগ করে দেবে, যেমন অন্য দেশের ক্ষেত্রে ঘটেছিল; লীগে জার্মানীর প্রবেশ পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি ও ইউরোপীয় বিশৃঙ্খলার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। জার্মান সরকারকে আলোচনা ত্বরান্বিত করার জন্য চাপ দেওয়া হল। যখন লোকার্নোতে প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হল, তখন বোঝা গেল যে, জার্মানীর লীগ অব নেশনসের সদস্য না হওয়া পর্যন্ত ওরা অস্ত্রধারণ করবে না।

১৯২৬-এর ৩রা ফেব্রুয়ারীর রাইখস্ট্যাগের বৈদেশিক দপ্তর লীগে জার্মানীর প্রবেশ সম্বন্ধে ১৮-৮ ভোট দিল। বৃটিশ সংবাদপত্র এ ঘটনাকে বৃটিশ কূট-

নীতির আর একটি জয়রূপে স্বাগত জানাল। ১০ই ফেব্রুয়ারী জেনেভাতে জার্মান কন্সালজেনারেল আশমান স্ট্রেসম্যানের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত মহা-সচিব ড্রামণ্ডকে দিলেন। ঠিক হল, মার্চের শুরুতে লীগ সংসদ ও পরিষদ এ বিষয়ে আলোচনা করবে। তারপরে এমন একটা খবর এল যাতে কূটনীতি-ক্ষেত্রে তুমুল কলহ শুরু হয়ে গেল। জানা গেল পোল্যাণ্ড, স্পেন, ব্রাজিল ও জার্মানীর সংগে লীগ পরিষদে স্থায়ী আসন দাবী করার কথা ভাবছে। বৃটিশ সংবাদসংস্থা হতবুদ্ধি ও বিরক্ত হয়ে উঠল। ফেব্রুয়ারীর শুরুতে জার্মানীর সরকারী আবেদনের আগের সংবাদসংস্থার কাছে খবর ফাঁস হয়ে গেল যে, ব্রিয়ান্ড যখন হোয়েসক্ নামে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সংগে কথা বলছিলেন, তখন পরিষদকে বড করার প্রশ্নটি প্যারিতে উঠেছিল। তখন ফরাসী সরকারী সংবাদসংস্থা লোকার্ণো সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরূপে পোল্যাণ্ডের জন্য, "নিরপেক্ষ" দেশগুলির প্রতিনিধিরূপে স্পেনের জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে ব্রাজিলের জন্য পরিষদে স্থায়ী আসনের দাবী জানাতে শুরু করল। দেখা গেল এ বিষয়ে ফরাসী কূটনীতির পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন রয়েছে, সে লীগের বাইরে থাকলেও বৃটেনের প্রভাব কমাতে আগ্রহী।

প্রথম বৃটিশ প্রতিক্রিয়া হল কঠোর। লণ্ডন বলল যে, বর্তমান অবস্থায় পরিষদের স্থায়ী আসনগুলি থাকা উচিত বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান ও জার্মানীর, আর কারোর নয়। "র‍্যাপালো লাইন" থেকে জার্মানীর বিদায় গ্রহণ ও সেই সংগে তার দৃঢ়তর "পাশ্চাত্য" শিক্ষা এবং লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষরের পরে লীগে যোগদানে আনন্দিত বৃটিশ বুর্জোয়া সংবাদ সংস্থা লীগে সম্ভাব্য জটিলতায় কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ল, এটা অনেকটা বৃটেনের বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার। ইংগ-ফরাসী কূটনৈতিক খেলা চলতে লাগল। বরং তা তীব্রতর হল। এ বিষয়ে সচেতন হয়ে, জার্মান সরকার অনেকটা নিশ্চয়তার সংগে দর কষাকষি করতে লাগল। জার্মান সংবাদপত্রের মন্তব্যে বার্লিন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে যে সব বৈপ্লবিক দাবী জানাচ্ছিল, তার উল্লেখ করা হতে লাগল। ফরাসী সংবাদসংস্থা এটা ভালভাবে বুঝতে পারল। সে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে যে শুধু জার্মানীর বিরুদ্ধেই কাজে লাগাল, তাই নয়, অনেক পরিমাণে বৃটেনের বিরুদ্ধেও কাজে লাগাল। বৈদেশিক দপ্তরের মুখপত্র কূটনৈতিক সংবাদাতার লিখিত এক প্রবন্ধের দ্বারা ১১ই ফেব্রুয়ারি জবাব দিল, যে সংবাদদাতা অবশ্যম্ভাবী বিপদের জন্য দোষীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছিলেন : "ল্যাটিন ও স্লাভ দেশগুলির" বৃহৎ কূটনৈতিক সমঝোতার প্রধান সংগঠক ফ্রান্স লীগ অফ নেশনসের ভেতরে ও বাইরে বৃটেনের গুরুত্ব কমাতে ঝুঁকে পড়েছে। বৃটিশ মন্ত্রীসভা নিজের অবস্থার বিবরণ দিয়ে এটা এড়িয়ে গেছে। প্যারিতে অস্টেন চেম্বারলেন ব্রিয়াণ্ড ও পোলিশ রাষ্ট্রদূতকে প্রতিশ্রুতি দিলেন না। কিন্তু লণ্ডন সংবাদসংস্থা "লীগ অফ নেশনসের আসন্ন

সংকট" সম্বন্ধে লিখে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি জার্মানী লীগে যোগদান না করে বা যদি আভ্যন্তরীণ মত পার্থক্যের জন্য তার লীগ প্রবেশে জটিলতা দেখা দেয়, তা হলে লোকার্ণো চুক্তি সংক্রান্ত সুদূর প্রসারী বৃটিশ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বা অংশতঃ ভেস্তে যাবে। চুক্তিটা ইউরোপে বৃটিশ নীতির পথ-প্রদর্শকরূপে রচিত এবং যেহেতু এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে ব্যবহার করা, অতএব জার্মানীর ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা পূর্বাভিমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে জার্মানীর স্থান ও ভূমিকার প্রশ্ন মনে রাখার দরকার ছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জার্মানীতে আভ্যন্তরীণ শক্তির ভারসাম্য। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগণ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা সমর্থিত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি জার্মানীর যে কোন সোভিয়েত বিরোধী কাজের প্রবল বিরোধী ছিল। অন্যদিকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, সেন্টার পার্টি, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং পিপ্‌লস্‌ পার্টির একটা বড অংশ "পাশ্চাত্য" লোকার্ণো আলোচনার সমর্থক ছিল এবং সেইজন্য লীগ অফ নেশনসে জার্মানীর প্রবেশকে সমর্থন করত। কিন্তু পিপল্‌স্‌ পার্টি, প্রধান একচেটিয়া পুঁজি সম্প্রদায় এবং প্রধানতঃ ন্যাশনাল পার্টিতে এমন লোক ছিল, যারা জার্মান পুঁজির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে আশ্রয় করেছিল। জার্মান সমরবাদের দ্রুত পুনর্জন্মে ইচ্ছুক এবং এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সংগে আলোচনায় আরো ভাল দর পেতে সচেষ্ট এই লোকগুলি খুশী হল যে, এতে জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লববাদ বাড়িয়ে তুলল। উপরন্তু, এই সময়েই ব্রেনার গিরিবর্ত্ম নিয়ে ইতালি জার্মান বিরোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল এবং সেইজন্য, লীগে জার্মানীর প্রবেশ বিষয়ে ইতালির মনোভাব আরো সন্দেহজনক হয়ে উঠল। এ সত্ত্বেও, বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই কারণেই জার্মান সরকার ভাব দেখাল যে, লীগ পরিষদে স্থায়ী আসনের দাবী সে ত্যাগ করবে না, উপরন্তু পরিষদের আরো বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সে আপত্তি জানাল।

ঠিক হল, মার্চের ১০ তারিখে জার্মানীকে যথাযথভাবে লীগে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু লীগের সর্বোচ্চ প্রশাসক ও আশাবাদীরাও খুব ভয় পেলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি পরিষদ সম্মেলনের দিন ঠিক করতে বসল, কিন্তু স্থায়ী আসনের জন্য নতুন দাবীর উত্তপ্ত আলোচনায় সেকথা ডুবে গেল, জার্মানীর প্রবেশের কথা একরকম চাপা পড়ে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল নতুন সমস্যা পরিষদ বাডানোর সমস্যা। বিরোধের ফলে দেখা দিল অনিশ্চয়তা। বৃটেন জার্মানীকে সমর্থন জানাল, আর ফ্রান্স প্রকাশ্যে পোল্যাণ্ডের স্থায়ী আসনের আবেদনকে সমর্থন করল, কারণ সে লক্ষ্য করল যে, জার্মানি তার পূর্বসীমান্ত পুনর্বিন্যাস করতে চায়, অতএব পরিষদে, ভারসাম্য আনা যুক্তিযুক্ত ও জরুরী। শীঘ্রই

স্থায়ী আসনের দাবীতে চেকোশ্লোভাকিয়া আর বেলজিয়াম যোগ দিল এবং দক্ষিণ টাইরল সম্বন্ধে ইটালির ব্যবহার আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। পরিস্থিতিকে গুরুতর বলে ঘোষণা করা হল। এমনকি জার্মান জাতিয়তাবাদী সংবাদসংস্থা ভয় পেয়ে ব্যর্থতা এড়াবার জন্য সরকারকে কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাল।

১২ই ফেব্রুয়ারি বাতিল হওয়া অধিবেশনে পরিষদ পরিষদবৃদ্ধির সম্ভাবনা মেনে নিয়ে আলোচনার কার্যক্রম গ্রহণ করল। ফ্রান্স তার পথ কামড়ে পড়ে রইল। দ্রুত ফরাসী পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল : (ক) স্থায়ী পরিষদ সদস্যের সংখ্যা ৪ থেকে ৭-এনিয়ে যাওয়া (জার্মান স্পেন ও পোল্যাণ্ড) বা ৮-এ (বেলজিয়াম) এবং (খ) তিনটি অস্থায়ী আসন ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে, একটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিকে এবং একটি এশীয় দেশগুলিকে মঞ্জুর করা। ফরাসী সংবাদসংস্থা লক্ষ্য করল যে, বৃটেন এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করবে না। অবশ্য, বৃটেনের অতিরক্ষণশীল সংবাদজগৎ এই সন্দেহ নিরসন করল। ইতিমধ্যে বৃটিশ অফিসাররা প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলেন না। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি স্পেন ও পোল্যাণ্ডের প্রতি বৃটেনের ব্যবহারে একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল। জার্মানীর পক্ষে এর অর্থ হল যে, পরিষদে তার দাবীর বিষয়ে সাহায্য করবে না। পোল্যাণ্ডের জন্য স্থায়ী আসনের বিষয়ে ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে গোপন আলোচনা লোকার্ণো চুক্তির সময় থেকে চলে আসছে, উদারপন্থী ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার এই চাঞ্চল্যকর সংবাদে এক গভীর প্রভাব দেখা গেল। এরপর বলা হল যে, লীগে জার্মানীর প্রবেশের আগেই যদি পরিষদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে জার্মান সরকার তার দরখাস্ত ফিরিয়ে নেবে। এরিক ড্রামণ্ড তাড়াতাড়ি বার্লিনে গেলেন। তাঁর পৌঁছনোর দিনে জার্মান রাজধানীতে খবর পৌঁছল যে, স্পেনকে পরিষদে স্থায়ী আসন না দিলে, সে জার্মানীর প্রবেশের বিপক্ষে ভোট দেবে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী এক ফরাসী জার্মানি "বন্ধুত্বপূর্ণ মত বিনিময়ে" ব্রিয়াণ্ড ফরাসী অবস্থা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, লীগ পরিষদে পোল্যাণ্ডের প্রবেশের জন্য এবং পরিষদের আরো বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্স চাপ দেবে। বৃটেন তখন ডোমিনিয়নগুলির সংগে আলোচনা করছিল এবং তাদের মতামত নিয়ে ভাবছিল, সে তার অনিশ্চিত মনোভাব বজায় রাখল। এর উপরে, জার্মান উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি লক্ষ্য ইটালির জন্য ঔপনিবেশিক ম্যাণ্ডেট ও ক্যামেরুণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ইংগিত আবার মাথা চাড়া দিল লীগের ম্যাণ্ডেট কমিটি চালু হওয়া উপলক্ষ্যে।

একটি প্রভাবশালী ইটালীয় সংবাদপত্র মন্তব্য করল, "লোকার্ণোর মধুযামিনী বিগত।"

লীগ অফ নেশনস থেকে জার্মানির দরখাস্ত প্রত্যাহার করার বিষয়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাইখস্ট্যাগের বৈদেশিক কমিটিতে উত্থাপিত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে

গেল। সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হল, ক) লীগ পরিষদে একটি স্থায়ী আসন, খ) পরিষদে আর কোন শক্তির প্রবেশ চলবে না এবং গ) লীগে প্রবেশের সংগে সংগে আসন্ন মার্চ অধিবেশনে জার্মানি আসন পাবে,—এই দাবী জানাতে।

অন্যান্য পরিকল্পনা দেখা দিল। শোনা গেল, পোল্যাণ্ড শরৎকালীন অধিবেশনে একটি স্থায়ী বা অস্থায়ী আসন পাবে। এটা হল আপসমূলক মীমাংসার ব্যবস্থা। তবু পোল্যাণ্ড তার দাবী আঁকড়ে রইল এবং ফ্রান্স তাকে সার্বিক সমর্থন জানাতে লাগল। ইটালী ফ্রান্সের পথ অনুসরণ করল। স্ট্রেসমানের বক্তৃতা এবং রাইখস্ট্যাগ ঘোষণার উত্তরে দুই দেশের সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান বলল যে, লোকার্ণোতে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি, যে, জার্মানি একাই পরিষদে স্থায়ী আসন পাবে। উপরন্তু, ব্রাজিল ঘোষণা করল যে, পরিষদ বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত লীগে জার্মানির প্রবেশের প্রশ্নের মীমাংসা করা যাবে না এবং স্পেনও একই সুরে প্রচার চালাতে লাগল।

২৩শে ফেব্রুয়ারী জার্মান মন্ত্রী সভা চ্যান্সেলার লুথার ও স্ট্রেসমানকে জেনেভায় যাওয়ার ক্ষমতা দিল। সেখানে ওরা বহু পরিকল্পনার কথা জানতে পারলেন। ফ্রান্স পোল্যাণ্ড, ব্রাজিল ও স্পেনের জন্য স্থায়ী আসনের দাবী জানাতে লাগল। বৃটেন তার সতর্ক মনোভাব সত্ত্বেও স্পেনকে স্থায়ী ও পোল্যাণ্ডকে অস্থায়ী আসন দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ইটালী পোল্যাণ্ডের জন্য স্থায়ী আসনের দাবী জানাল। স্পেন, পোল্যাণ্ড আর ব্রাজিল নিজেদের দাবী জানাতে লাগল, চেকোশ্লোভাকিয়া নিজে একটা স্থায়ী আসন পাওয়ার উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ডের দাবীকে সমর্থন জানাতে লাগল। চীন স্থায়ী আসন দাবী করল। উরুগুয়ে স্পেনের বিরোধিতা করে ব্রাজিলের জন্য অস্থায়ী আসনের প্রস্তাব করল। জাপান পরিষদের আরো বৃদ্ধিতে আপত্তি জানাল, কিন্তু খুব দৃঢ়ভাবে নয়। সুইডেন একা জার্মানির দাবীকে সমর্থন করল।

জার্মান বুর্জোয়া সংবাদ সংস্থা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মনে মনে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে সে আপাততঃ যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল।

মার্চের শুরুতে জেনেভার ওপরে অশুভ ছায়া ঘনিয়ে এল। বৃটিশ মন্ত্রী-সভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কিন্তু বৈদেশিক দপ্তর ফরাসী দাবীর দিকে খুব বেশী আগ্রহী হল। প্যারিস স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, যদি জার্মানি এগিয়ে যায়, ফ্রান্স তার বিরুদ্ধে ভোট দেবে। এই কূটনৈতিক গোলযোগের সম্মুখীন হয়ে জার্মান সরকার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উন্মত্ত হয়ে সমর্থন খুঁজতে লাগল। ২রা মার্চ লুথার হামবুর্গের টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলেন, পূর্ব বা পশ্চিমের যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে জার্মানি তার ভবিষ্যৎ গড়তে চায় না। একই সংগে তিনি লীগের প্রতি আনুগত্য জানালেন। কার্যতঃ, তিনি লোকার্ণো চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে

ফেললেন। পরের দিন, ব্রিয়ানড চেম্বার অফ ডেপুটিজকে বললেন, ফরাসী সরকারের মনোভাব দৃঢ় থাকবে। বৃটিশ কূটনীতিক আপসের চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন, সমাধানের জন্য লীগ পরিষদের একটি বেসরকারী অধিবেশন এবং জার্মান প্রতিনিধি দলের সংগে গোপন আলোচনার প্রস্তাব দিল। তার আপস পরিকল্পনা ছিল, প্রথম অধিবেশনে পরিষদে জার্মানিকে একটা স্থায়ী আসন দেওয়া এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে, জার্মানির উপস্থিতিতে পোল্যাণ্ডকে একটা অস্থায়ী আসন দেওয়া। জার্মানি এই পরিকল্পনায় রাজী হল না। জাতীয়তাবাদী সংবাদসংস্থা "জার্মানির নতুন বিপদের" কথা বলল। বৃটেনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ লীগ অধিবেশনের প্রাক্কালে বললেন, পরিষদে জার্মানির বক্তব্যকে সমর্থন না করার ষড়যন্ত্র চলেছে।

মার্চে ব্রিয়াণ্ডের পতনের পর জেনেভাতে কিছুটা বিশৃংখলা দেখা দিল। ফ্রান্সে সরকার সংকটের ফলে বিষয়টা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখার সুযোগ ঘটল। স্থগিত রাখার চিন্তা গৃহীত হল, কিন্তু সেটা অন্যরকম পরিস্থিতির চাপে।

৭ই মার্চ সারাদিন ধরে জেনেভাতে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের মধ্যে উৎসাহ-ব্যঞ্জক আলোচনা চলতে লাগল, কিন্তু ৮ই মার্চ অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত কোন মীমাংসায় পেঁছিনো গেল না। "যে লোকার্ণো মনোভাব জার্মানিকে এখানে টেনে এনেছে," এবং "যে মৈত্রী সূত্র সব জাতিকে বেঁধেছে" সে বিষয়ে চেয়ারম্যান, কস্টা অফ পর্তুগালের উদ্বোধনী বক্তৃতা সাধারণ সরকারী বিবৃতি। কোন পথ পাওয়া গেল না। পরিষদ যদি বাড়ানো হয়, তা'হলে ফ্রান্স ও তার বন্ধুরা জার্মানিকে একটা স্থায়ী আসন মঞ্জুর করতে ইচ্ছুক। বার্লিন প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল যে, জার্মানি প্রতিনিধি দল কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই জেনেভাতে গেছে। তবু সে বলল যে, প্রস্তাবিত মীমাংসা গ্রহণযোগ্য নয়। ১০ই মার্চ স্ট্রেসমান ও ফরাসী প্রতিনিধি দলের আলোচনা নিষ্ফল হ'ল। স্পেন আর ব্রাজিল দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল, তারা জার্মানির বিরুদ্ধে ভোট দেবে। ইটালীর প্রতিনিধিরাও সে কথা বলল। ফ্রান্সে সরকারসংকট অবসানের পর তারা আবার পরিষদের প্রসারকে সমর্থন জানাল। এই অবস্থায়, অস্টেন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে লীগের রাজনৈতিক কমিটির জার্মানিকে লীগে প্রবেশ দানের সিদ্ধান্ত প্রায় অলক্ষ্যে গৃহীত হ'ল।

যদি জেনেভাতে ব্রিয়াণ্ডের প্রত্যাবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে, তা হল ফ্রান্সের বন্ধু পোল্যাণ্ডের হাত শক্ত করা। এটা হল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে আপসের ফল, যাদের মনোভাব আগে এই দু দেশের সমর্থন জুগিয়েছিল, এখন এরা তাদের ওপরেই চাপ দিতে বাধ্য হল। নতুন পরিকল্পনা হল, পরিষদ থেকে চেকোস্লোভাকিয়া বা সুইডেন, বেলজিয়াম বা উরুগুয়েকে সরিয়ে দিয়ে সেই শূন্য আসন পোল্যাণ্ডকে দেওয়া। ১৫ই মার্চ সুইডেনের

বৈদেশিক মন্ত্রী জার্মান প্রতিনিধি দলকে বললেন যে, তাঁর দেশ সরে গিয়ে পোল্যাণ্ডকে আসন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। চেকোস্লোভাকিয়াও চাপে পড়ে পোল্যাণ্ডের জন্য সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত জানাল। অবশ্য ব্রাজিল দৃঢ়ভাবে জানাল যে, তাকে স্থায়ী আসন না দেওয়া হলে সে জার্মানির বিরুদ্ধে ভোট দেবে। এতে আবার বাধা পড়ল। স্পষ্ট বোঝা গেল, ব্রাজিলের ঘোষণার পিছনে কোন নিপুণ হাত রয়েছে এবং ঘোষণাটা এমন সময়ে করা হয়েছে, যখন মনে হচ্ছিল সব মীমাংসা হয়ে গেছে এবং যখন ব্রিয়াণ্ড জার্মান ও ফরাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে বোঝা পড়ার কথা বলছিলেন। আশার শেষ সম্ভাবনাও মিলিয়ে গেল। সমস্যাটিকে কূটনৈতিক চালে সমাধানের সব চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেল। লোকার্ণো চুক্তির প্রধান হোতাদের এই সত্য স্বীকার করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না, ১৬ই মার্চ প্রকাশিত এক তিক্ত মধুর ঘোষণায় ওরা এই আশা প্রকাশ করলেন যে, সেপ্টেম্বরে লীগের পরবর্তী অধিবেশনে বাধা-গুলি দূর হবে। পরের দিন লীগের একটি সভা হল, তাতে ব্রাজিলের প্রতিনিধি তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন, তারপর বললেন চেম্বারলেন ও ব্রিয়াণ্ড। এইভাবে অধিবেশন শেষ হ'ল এবং লোকার্ণো চুক্তির রূপায়ণ স্থগিত রাখতে হ'ল।

৫

"লোকার্ণো মনোভাবের" এই শিক্ষা পেয়ে জার্মান সরকার নিরপেক্ষতা চুক্তি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আলোচনায় এগোল। পরে, এটা পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামনে প্রমাণ করার জন্য জার্মান সংবাদ-সংস্থা বলল যে, ১৯২৪-এর ডিসেম্বরে সোভিয়েত-জার্মান আলোচনা শুরু হয়েছিল। সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিসম্পাদন সম্বন্ধে লণ্ডনের টাইমস্‌[১] পত্রিকার প্রথম খবরে পশ্চিম ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যে দুঃখের সৃষ্টি হল। শ্রেষ্ঠ জার্মান রাজনীতিকরা বুঝিয়ে দিলেন যে, লোকার্ণোতে জার্মানির পশ্চিমাভিমুখী গতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাঁদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে রাজনৈতিক চুক্তির প্রয়োজন ছিল। থিওডোর উল্‌ফ্‌ নামে এক তথ্যাভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী প্রচারবিদ লিখলেন, "রাশিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে আমাদের বিপজ্জনক সংঘর্ষে জড়িয়ে পরার প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদিকে, লীগ সংবিধানের ১৬ এবং ১৭নং ধারা গ্রহণ করাও আমাদের পক্ষে সমান অসম্ভব, কারণ এতে আমাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের স্বাধীনতা দিয়ে এবং অর্থনৈতিক বর্জনে অংশ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।" ফরাসী সংবাদ-সংস্থা র‍্যাপালোর যুগের কথা তুলে আবার ভার্সাই

১। টাইমস, ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৫।

চুক্তির বিরুদ্ধে রুশ-জার্মান গোষ্ঠী গড়ার কথা বলতে লাগল। লোকার্নো চুক্তির যে উদ্দেশ্য ছিল, জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি এবং কোন সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি এতে বাধা দিলে লোকার্নোর হাতিয়ারকে বাতিল করা, এ কথা তারা আর গোপন করল না। ফ্রান্স ও বৃটেনকে বোঝাবার জন্য জার্মান সংবাদ সংস্থার এক অংশ সরকারের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আলোচনার নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থিত করল। বলা হল, চুক্তি সীমিত নিরপেক্ষতা প্রয়োগ করবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি অন্য দেশকে আক্রমণ করে, তাহলে জার্মানির স্বাধীন আচরণের সুযোগ থাকবে। বৃটিশ কূটনীতি পরবর্তী অধিবেশনে পরিষদে জার্মানিকে স্থায়ী আসন দেওয়ার এবং পোল্যাণ্ডকে বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোভিয়েত-জার্মান আলোচনা বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে জার্মান সরকার আর সন্তুষ্ট হল না। সরকার সংবাদ প্রতিষ্ঠান উষ্মার সংগে উত্তর দিল, যে, জার্মানি লোকার্নোতে প্রবঞ্চিত হয়েছে, সেখানে ফ্রান্স ও বৃটেন গোপনে পোল্যাণ্ডকে পরিষদে আসন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বৈদেশিক দপ্তরের পত্রিকা Deutsche Allgemeine Zeitung বলল, "সোভিয়েত-জার্মান আলোচনা দেখিয়ে দিল যে, জার্মানি আবার স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণে সক্ষম। লোকার্নোতে বৃটেন জার্মানির ওপরে আধিপত্য করেছিল, বৃটেন তার লক্ষ্য পূরণের জন্য জার্মানিকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছিল, অথচ রাশিয়ার সংগে আলোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জার্মানি এমন এক নীতি অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সক্ষম, যে নীতি প্রথম নজরে পশ্চিমী শক্তি-বর্গের স্বার্থবিরোধী বলে মনে হয়।

১৯২৬-এর ২৪শে এপ্রিল বার্লিনে চারটি ধারা ও দুটি নোট সমন্বিত এক নিরপেক্ষতা চুক্তিতে সই করল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানি। দলিলে দেখা গেল যে, র‍্যাপালোতে সম্পাদিত চুক্তি এখনো সোভিয়েত জার্মান সম্বন্ধের ভিত্তি। জার্মান সরকার ও সোভিয়েত সরকারের এক নোটে বলা হল, "উভয় সরকারেরই ধারণা যে, দুটি দেশের সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত চুক্তি বিশ্বশান্তিতে সহায়তা করবে। "২নং ধারা যাতে নিরপেক্ষতানীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটি চুক্তির প্রাণ। "যদি শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সত্ত্বেও অন্যতম পক্ষ তৃতীয় কোন শক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহলে চুক্তির অন্য দেশটি সমগ্র সংঘর্ষকালীন অবস্থায় নিরপেক্ষতা পালন করবে।"

সত্যিই নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি সীমাবদ্ধ এবং এতে জার্মানির লীগে প্রবেশে বাধা ঘটল না, লীগের সদস্য হোক বা না হোক, লীগের সংবিধানে "আক্রমণকারীর" বিরুদ্ধে অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। অথবা, বড় প্রশ্ন হল, কে "আক্রমণকারী"কে চিনবে। জটিলতা ঘটলে, লীগ চাপে পড়ে সোভিয়েত

ইউনিয়নকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে দাবী করতে পারে যে, ঐ দেশের সদস্যরা সামরিক ও অর্থনৈতিক অনুমোদনের আবেদন জানাক। তখন জার্মানিকে বিদেশী রাজনৈতিক লক্ষ্যের হাতিয়ার হতে হবে। এটা এড়ানোর জন্য জার্মান সরকার নিম্নলিখিত বিবৃতি দিল :

"যদি······যে কোন সময়ে লীগ সদস্যদের মধ্যে শান্তির মূলনীতি বিরোধী কোন ইচ্ছা একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চালিত হয়, তাহলে জার্মান সরকার সাগ্রহে এরকম ইচ্ছার বিরোধিতা করবে।"

আরও বলা হল : "এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণকারী কি না, এ প্রশ্ন শুধু জার্মানীর সম্মতি সাপেক্ষই স্থির করা যাবে এবং সেইজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অন্য শক্তিবর্গের যে কোন অভিযোগকে জার্মানী অন্যায় মনে করলে ১৬নং ধারায় গৃহীত ব্যবস্থায় সে অংশ নিতে বাধ্য থাকবে না।"

আমরা দেখছি, জার্মানী লীগের কাঠামোর মধ্যে যে কোন সোভিয়েত বিরোধী গোষ্ঠী বা কার্যকলাপেরই শুধু বিরোধিতা করেনি, উপরন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অনুমোদনের আবেদনেও অংশ নেয় নি। বার্লিন চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা রাজী হল যে, শান্তির সময়ে এবং তৃতীয় পক্ষের সংগে সংঘর্ষের সময়ে যে কোন এক পক্ষ অর্থনৈতিক বর্জনের মাধ্যমে এর বাইরে থাকবে। জার্মানী ও সোভিয়েতের মধ্যে বিবাদের বিষয়ে চুক্তিতে মধ্যস্থতার ব্যবস্থা রইল।

চুক্তিটি সোভিয়েতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই চুক্তি পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলির লোকার্ণো চুক্তি এবং লীগে জার্মানীর ধারণার প্রতিক্রিয়াকে নষ্ট করে দিল। এই চুক্তি শুধু সোভিয়েতের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যই উপযুক্ত নয়, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তারও উপযোগী, কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ বন্ধ করা। অতএব এটা জার্মানীর পক্ষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ফরাসী দক্ষিণপন্থী সংবাদ সংস্থা তার বিরক্তি জানিয়ে বলল যে, লীগে প্রবেশের পূর্বে জার্মানীর আন্তর্জাতিক অবস্থা দৃঢ়তর হ'ল। ব্রিটেন আর ফ্রান্স ভয় পেল যে, এই চুক্তি সোভিয়েত-জার্মান মৈত্রীর ভিত্তি হতে পারে। লয়েড জর্জ প্রস্তাব করলেন যে, জেনেভা সংগঠনে জার্মানীকে সরাসরি প্রবেশ করতে দিয়ে লীগের মার্চ অধিবেশনের ভুল সংশোধন করা হোক।

এই দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রইল। ব্রিটেন চেষ্টা করতে লাগল, ইউরোপের ওপরে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে; ফ্রান্সকে দুর্বল ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করতে। ঐ অবস্থায়, জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের আক্রমণের প্রস্তুতি ক্ষেত্র হতে পারত। কিন্তু মূলধনের আপেক্ষিক স্থায়িত্বের সংগে সংগে, যে জার্মানী আঁতাত নীতির লক্ষ্য থেকে ঘুরে স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণ

করতে যাচ্ছিল, সে নিজের লক্ষ্যে পেঁছিনোর চেষ্টা করতে লাগল। জটিল ধারাবাহিক কূটনৈতিক কৌশলের দ্বারা সে বিজয়ী শক্তিদের বৈষম্যগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে লাগল, সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বৈষম্যগুলিকে কাজে লাগাতে। এই অবস্থায়, সোভিয়েত-জার্মান নিরপেক্ষতাচুক্তি, "র‍্যাপালো নীতি"-র প্রতিক্রিয়া, লীগে জার্মানীর প্রবেশ এবং "লোকার্নো নীতি"-র প্রতিক্রিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জার্মানীর রাজনৈতিক খেলার অংশ।

১৯২৬

১৯২৮-এ সরকারী কোয়ালিশনের পতন

জার্মানী নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাইখস্ট্যাগের চার বছরের মেয়াদ ১৯২৮-এর ৭ই ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে, কিন্তু সরকারী কোয়ালিশন নির্বাচন আগে করতে রাজী হয়েছে।

দক্ষিণপন্থী দলগুলির শাসকগোষ্ঠীর সংকট বিরোধী পক্ষের কোন সংসদীয় আক্রমণ দ্বারা সূচিত হয় নি, সূচিত হয়েছে কোয়ালিশনের মধ্যেই এক দুর্ঘটনার দ্বারা। এক কথায় ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। এর আপাত-কারণ হল, হেসেন ও ব্যাডেন অঞ্চলে ক্যাথলিক ও ইভাঞ্জেলিকাল বিদ্যালয়গুলি সংক্রান্ত শিক্ষাবিষয়ক বিলের একটি সামান্য বিষয় নিয়ে বিরোধ।

কোয়ালিশন ভেঙেগ যাওয়ার জন্য এই কারণকে যেন আমরা প্রাপ্যের চেয়ে বেশী গুরুত্ব না দিই। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া ও জাংকার পার্টির গোষ্ঠী টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙেগ গেল, জার্মানীর শাসকগোষ্ঠী ভাঙেগ নি। রাজনৈতিক শক্তির ধাঁচ লক্ষ্য করলে দুটি মূল ধারা দেখা যায়, যা বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী কিন্তু আসলে সমন্বয়ী। এক দিকে, আমরা এক দক্ষিণপন্থী সরকারী কোয়ালিশনের পতনের সাক্ষী, যে সরকার রাইখস্ট্যাগ ভেঙেগ দিয়ে নতুন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, একচেটিয়া পুঁজি স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাষ্ট্রযন্ত্রে তার প্রভাব খুব গভীর হয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও তার প্রহরী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই জটিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সরকারী যন্ত্রকে পরিচালিত করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীও সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আরও প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করছে।

এই সাম্প্রতিকতম ধারাগুলি থেকে বোঝা যায়, কেন লীগ অফ রেনোভেশন নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। এর সরকারী উদ্দেশ্য হল, জার্মান রাষ্ট্র (রাইখ) এবং স্বাধীন, সার্বভৌম দেশগুলির (ল্যাণ্ডার) মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ কমানো। উদ্দেশ্যটা হল, জার্মান রাষ্ট্রকে দৃঢ় করা এবং যে সব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অসুবিধার জন্য একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী নীতির ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারছে না, সেই বিভিন্ন প্রযুক্তিগত,

শাসনসংক্রান্ত, বিচার বিভাগীয় ও বিশেষ ধরনের বাধাকে সরিয়ে দেওয়া ; একচেটিয়া পুঁজির সাহায্যপ্রাপ্ত প্রচারে প্রমাণ করার চেষ্টা হতে লাগল যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সত্ত্বেও, কারেন্সির স্থায়িত্ব সত্ত্বেও এবং ভাল বৈদেশিক বাণিজ্য সত্ত্বেও জার্মানীর ঘরে বাইরে বিপদ দেখা দিয়েছে।

লীগের ঘোষণায় বলা হল, বিপদের সময়ে রাষ্ট্রকে দৃঢ়করা ব্যতীত আর কোন ঘোষণা করা যায় না। সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই। বৈদেশিক নীতি, আইন ও সামরিক বিষয় ছাড়াও, এর সংগে অর্থ ও অন্য সব নির্ধারক অর্থনৈতিক বিষয় জড়িয়ে আছে। এ রাজ্যের সেই ক্ষমতা থাকা চাই যা দিয়ে একদা সে বিগত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল এবং সেই ক্ষমতা সাধারণের কাজে লাগানো উচিত।"

লীগ অফ রেনোভেশন জার্মান শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন দলকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করল। তার সদস্যদের মধ্যে ছিল, বিশিষ্ট কৃষিবিদ, ব্যাংক-ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী এবং প্রচুর সংখ্যক শিল্পকর্পোরেশনের প্রতিনিধিবর্গ। এই নতুন সংগঠন তখনি সাম্রাজ্যবাদী ও প্রুশীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করল, এর পরিচালনায় ছিলেন, প্রাক্তন চ্যান্সেলর ও জার্মান ভারী শিল্পের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ডাঃ লুথার। এতে আমাদের মনে করার কারণ ঘটেছে যে, লীগ প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনে জার্মান বুর্জোয়া ও জাংকারতন্ত্রের একটি সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠান, তার উদ্দেশ্য হল, বিদেশের বাজারে যথেষ্ট প্রসারের জন্য এবং সব দক্ষিণপন্থী শক্তির দৃঢ়-তার জন্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

"জাতীয় ঐক্য" ও "সংঘর্ষ" নিরোধের আহ্বানকে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন ঐকাবদ্ধ কাজকে ভেংগে ফেলার অস্ত্ররূপে গড়ে তোলা হল। কিন্তু এই নতুন লীগ শুধু একটি ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া ও জাংকারফ্রণ্ট গড়ে তোলা ও রাষ্ট্রকে একচেটিয়া পুঁজির অধীনে নিয়ে আসার কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখল না। এর অন্য লক্ষ্য হল শ্রমিকদের সংগঠন ভেংগে দেওয়া এবং তাদের কিছু অংশকে পাতি বুর্জোয়াদের সংগে একত্রে নিজের রাজনৈতিক ও ভাববাদী প্রভাবের ক্ষেত্রে নিয়ে আসা, সেইজন্য এই সময়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ওপরে এত প্রশংসা বর্ষিত হয়েছিল। ভারী শিল্পের মুখপত্র Deutsche Allgemeine Zeitung-এর ১৯২৮, ১০ই জানুয়ারীর সংখ্যায় লেখা হল, "যদি মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং মার্কের স্থায়িত্বের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা ও জরুরী আইনের দরকার হয়ে থাকে এবং আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও গভীর সংকটের বিগত বছরে জার্মানিকে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নিতে হয়ে থাকে, তা হলে এখন সম্ভাব্য স্বাভাবিক উপায়ের প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটানো খুবই কাম্য। অবশ্য এর একটি উপাদানেই নিহিত আছে আমাদের রাজনৈতিক বিজ্ঞতা ও আশা— সেটি হল, যে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতা পেতে হবে। ওরা না

থাকলে রাইখস্টাগে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগুরুত্ব থাকে না এবং তা না হলে সংবিধানে যে কোন পরিবর্তন অসম্ভব। অন্যান্য দলের তুলনায় যে দলে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শ্রমিক আছে, নতুন রাষ্ট্র গঠনে তার সক্রিয় ও সানন্দ সহযোগিতা থাকা উচিত।"

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিকদের প্রতি আমন্ত্রণের সংগে জড়িত রহিল অসংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণের গোপন ধমকানি। সংসদীয় রূপ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতার পণ হয়ে উঠল এবং কয়েকজন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের (যেমন নোসকে) এই টোপ গেলার খুবই সম্ভাবনা ছিল। সব মিলিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের অদূর ভবিষ্যতে ঐ আদর্শ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। নির্বাচনী প্রচারের কারণে সেই মুহূর্তে ওটা অনুকূল ছিল না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ১৯২৭-এর মে মাসে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলের এক সম্মেলনে হিলফার্ডিং একটি ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের (Einheitsstaat) আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাতে একটি কোয়ালিশন সরকারে প্রবেশের প্রস্তুতির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

একটা বিষয় স্পষ্ট : সাম্রাজ্যবাদী নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে লীগ প্রাণপণে বুর্জোয়া ও তাদের কয়েকটি গোষ্ঠীর এবং জাংকারদের মাধ্যমে কৌশল বিস্তারের চেষ্টা করবে, নির্বাচনী প্রচারে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে দৃঢ় করবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, এটা এমন সময়ে ঘটবে, যখন জার্মানীর শাসকশ্রেণী গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসুবিধার দিকে এগিয়ে চলেছে।

সরকারী কোয়ালিশন ভাঙার অল্প আগে কর্পোরেশন পুঁজিতে এই নতুন সংগঠন গঠিত হল। লীগের প্রাধান্য পেয়ে শিল্পপতিদের একটি দল, পিপলস পার্টি সরকারী কোয়ালিশন ভাঙায় উৎসাহ দেওয়ার সংগে সংগে নিজেদের অনেকটা নিরাপদ করে ফেলল। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সংকটে ইস্পাত ও কয়লা শিল্পে জোরদার ধর্মঘট ও লকআউটের মাধ্যমে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিল।

সরকারগোষ্ঠী এক শিক্ষাসংক্রান্ত বিল নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়ল। এখানে আগুন জ্বলে উঠে ক্যাথলিক সেন্টার পার্টি (ব্যাভারিয়ান পিপলস পার্টি ও জার্মান ন্যাশন্যাল পার্টি কর্তৃক সমর্থিত) ও জার্মান পিপলস পার্টির মধ্যে লড়াই শুরু হল। অদ্ভুত ব্যাপার হল যে, জার্মানী পিপলস পার্টির সংবাদপত্র ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে এই মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগল যে, আগ্রাসী মধ্যবিত্ত মনোভাবে বাধা দেওয়ার পক্ষে শিক্ষাবিলের বিবাদ হল একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এটা স্পষ্টতঃ অতিশয়োক্তি। পিপলস পার্টি ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়ের অর্থাৎ চার্চের সংগে বিদ্যালয়ের বিচ্ছেদের বামপন্থী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল, ঠিক যেভাবে সে সেন্টার

পার্টির বিরোধিতা করেছিল। আধুনিক যুগের উপরে ধর্মশিক্ষার আদর্শ-বাদী প্রভাব সে মুছে দিতে চায় নি—বহুভাবে সে কথা বলা হয়েছিল—ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত মনকে "আভিজাত্যহীন" করতে বাধ্য, যা ওদের ভাষায়, অসহ্য।

বিরোধী (সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) কৌশলগত কারণে বিদ্যালয়গুলির ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য যথেষ্ট চাপ দেয় নি বলে, পিপলস পার্টির লাভ হল, কারণ, প্রধান আক্রমণ চালিত হল দক্ষিণ দিকে, বিদ্যালয়গুলির তথাকথিত ধর্মীয়করণের বিরুদ্ধে, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা হল, যে অবস্থায় দুটি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী, ক্যাথলিক আর ইভাঞ্জেলিক্যালের শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব আছে।

উইমার সংবিধান বিদ্যালয়গুলির পরিবর্তনের জন্য কিছুই করে নি। কনফেশনাল (অর্থাৎ, ক্যাথলিক বা ইভাঞ্জেলিক্যাল) বিদ্যালয়গুলির প্রাশিয়া আর ওয়ার্টেমবুর্গে প্রাধান্য এবং তথাকথিত যৌথ (অর্থাৎ, মিশ্রিত) বিদ্যালয়-গুলি ছিল হেসেন, ব্যাডেন স্যাক্সনি আর থুরিংগিয়াতে। ব্যাভারিয়াতে রাষ্ট্র ও চার্চের এক চুক্তি চালু ছিল, যা সম্পন্ন করেছিল ১৯২৫-এর জানুয়ারীতে রোমান কিউরিয়া।

বিদ্যালয়ের দুটি প্রধান ধরনের মধ্যে পার্থক্য আদৌ মৌলিক নয়। সেইজন্য ব্যাভারিয় প্রতিক্রিয়াশীল ও জার্মান ন্যাশনাল পার্টি কর্তৃক সমর্থিত ক্যাথলিক সেণ্টারের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে পিপলস পার্টির বিরোধিতা, যৌথ বিদ্যালয়গুলিকে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে চাওয়া গীর্জার-বিরোধী বা প্রগতি পুনর্জীবনের কোন অসাধারণ কাজ নয়, যেটা পিপলস পার্টির সংগে যুক্ত পুঁজিবাদী সংবাদপত্র আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল। উল্লেখ-যোগ্য হ'ল যে, বামপন্থী বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সংবাদপত্রও একই মত পোষণ করে। অত্যন্ত স্পষ্ট বোঝা গেল যে, সে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর পতনে কিছু লাভ করার এবং তার ফলে গঠিত কোয়ালিশনে জায়গা পাওয়ার আশা রাখে। সেইজন্য, পিপলস পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল ভঙ্গীকে সমর্থনের উদ্দেশে সে, ধর্মীয় প্রভাব থেকে বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার পরিকল্পনা একেবারে ভুলে যেতে প্রস্তুত।

ক্যাথলিক সেণ্টার পার্টি যখন যৌথ বিদ্যালয়গুলিকে ধর্মীয় বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের এক নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য প্রচার চালাচ্ছে, তখন পিপলস পার্টি শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দল যখন অন্য পথে গিয়ে নিজেদের দাবীকে অস্পষ্ট করে তুলল, ততই পট-ভূমিকার আকার বিকৃত হতে লাগল। ঘটনাক্রমে, সেণ্টার পার্টি, জার্মান ন্যাশনাল পার্টি ও ব্যাভারীয় পিপলস পার্টির দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিক্রিয়াশীল

ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে পিপলস পার্টি হ'ল যুদ্ধের উদ্যোক্তা।

জার্মান পিপলস পার্টির যুক্তিগুলি প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত, প্রতিটিই বিরোধী সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্দেশে। তার মতে, চার্চের খরচ অত্যন্ত বেশী ; বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী, খরচ পড়ে ২৫ থেকে ৬০ কোটি মার্কের মত, শুধু প্রুশিয়ারই খরচ ৬০ থেকে ২০ কোটি মার্কের মধ্যে। পাতি বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের যে অনুন্নত শ্রেণী এখনো চার্চের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেণ্টার ও দক্ষিণপন্থী জার্মান দলগুলিকে সমর্থন করছে, তারা নিশ্চয়ই এতে এই বিরাট অংকে অভিভূত হবে। তাদের স্তম্ভিত করে পিপলস পার্টি বেশী ভোট পাওয়ার আশা করল। উপরন্তু, একচেটিয়া পুঁজির মুখপত্র পিপলস পার্টি সংবাদপত্রের সাহায্যে এই মনোভাব সৃষ্টি করতে চাইল যে, সে অনমনীয় ক্যাথলিক সেণ্টারের সংগে আপস করতে প্রস্তুত। এইভাবে পিপলস পার্টি দক্ষিণপন্থী সরকারী কোয়ালিশনের পতনের দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

দক্ষিণপন্থী সরকারে ন্যাশনাল পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার মূল্যস্বরূপ তারা সেণ্টার পার্টিকে সমর্থন জানাল। তাছাড়া, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বিল সাধারণতন্ত্রী সরকারের এই প্রধান দলের সাধারণ ধারণা ও সামাজিক প্রকৃতির সংগে মিলে যায়। শিক্ষাবিলের ব্যর্থতা সেণ্টার পার্টির পক্ষে বেদনাদায়ক আঘাত, ফেব্রুয়ারি ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে সে কোয়ালিশনের সংগে নিজের ভাগ্য জড়াতে বাধ্য হল। তার ভীতি প্রদর্শনে কোন ফল হ'ল না। সংকট তৈরী ক'রে পিপলস পার্টি কাজ শুরু করল। সে শুধু সেণ্টার নয়, জাতীয়তাবাদীদেরও বিরোধিতা করল।

গৌণ কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি অদ্ভুত হয়ে উঠল। বুর্জোয়া শিবিরের কোন গভীর বৈষম্য এর কারণ নয়, এ ঘটল শুধু পিপলস্ পার্টির কৌশলে। আধুনিক জার্মানিতে সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই কৌশলের প্রয়োজন ছিল। সেন্টার পার্টির কার্যকলাপ অত্যন্ত স্পষ্ট, কারণ, তার নির্দিষ্ট সামাজিক বৈচিত্র্য, মূল গঠন ও ভোট সংরক্ষণের বৈচিত্র্য দেশের সাধারণ সামাজিক প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি প্রকাশ পায়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদ ফিরে আসছে।

ক্যাথলিক বুর্জোয়া পাতি বুর্জোয়ার বিরাট অংশ, শিল্পে জড়িত প্রলেতারিয়েতদের কয়েকটি গোষ্ঠীর ওপরেও প্রভাব বজায় রাখার জন্য তার সুগঠিত যন্ত্রকে প্রাণপণে ব্যবহার করতে লাগল ; কিন্তু জার্মান মূলধনের স্পষ্ট শ্রেণীনীতি, সাম্প্রতিককালের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ ধর্মীয় নীতিতে সংগঠিত সেন্টার পার্টিতেও শ্রেণীবিভেদ ঘটাল।

১৯২৩-এ ফরাসী জার্মান সংঘর্ষের কষ্টের বোঝা পড়ল রুর অঞ্চলের

শ্রমিকদের ওপরে, যারা অধিকাংশই ক্যাথলিক। তখন জার্মানী শিল্পপতিরা আট ঘণ্টা কাজের সময় বাতিল করে দিল। শ্রমিকদের শোষণ ও ভুল পরিকল্পনার বোঝা প্রলেতারিয়েতের ওপরে চাপানোর জন্য তারা তাদের প্রোটেস্টাণ্ট ভাইদের মতই আগ্রহী ছিল। ক্লোকনার ইত্যাদি ব্যক্তিরা সেণ্টার পার্টির নেতৃত্বের সংগে স্টিল ট্রাস্ট ও কোল সিণ্ডিকেটে সমান বড় পদ দখল করলেন এবং বলা বাহুল্য, কখনও রাজনীতির উদ্দেশ্য ভুললেন না: কয়লা আর ইস্পাতের নীতিই দলকে চালনা করতে লাগল। যাই হোক, আট ঘণ্টা কাজের দিনের পরিবর্তন, উৎপাদনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার শুধু ধর্মীয় ও দলীয় ক্ষেত্রেই নয়, শ্রেণীগত ক্ষেত্রেও ভাঙন ধরাল।

যে শ্রেণী সংগ্রাম সেণ্টার পার্টিকে পরিবর্তিত করেছিল, অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক ঘটনায় তার ফল দেখা দিল। ১৯২৬-এর সেপ্টেম্বরে ক্যাথলিক শ্রমিক ইউনিয়নের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেণ্টার পার্টির এক মুখপাত্র ইউস বলেছিলেন যে, শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি ক্যাথলিক শ্রমিকদের মনোভাব বদলাচ্ছে।

বুর্জোয়াদের যে ব্যবহার, সরকার গোষ্ঠীর যে নীতিগুলি সেণ্টার পার্টি প্রচারে সাহায্য করল, তা এমনকি জার্মান প্রলেতারিয়েতদের অনুন্নত শ্রেণীকেও উত্তেজিত করল, যাদের উপরে ক্যাথলিক মূলধন সর্বদা নির্ভর করত। শ্রমমন্ত্রী, সেণ্টার পার্টির ব্রুন্স তাঁর সামাজিক নীতি এবং শ্রম সংক্রান্ত বিরোধে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার ব্যবস্থা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন যে, তাঁর সাধারণ নীতি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চালিত হয়। সেণ্টার পার্টির বুর্জোয়া রাজনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত ভূমিকা ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে ক্রমশঃ মুছে যেতে লাগল, ওরা সেণ্টারের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির মুখপত্র Der Deutsche বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সেণ্টার সংক্রান্ত নীতিকে আক্রমণ করে লিখল: "রাজনৈতিকভাবে যা প্রয়োজন বলে মনে করা যায়, তা শ্রমিক নয়, তাদের ভোট। এই ভোটের জন্য আমাদের বন্ধুত্বের হাসি এবং নিন্দা জোটে, অথচ তখন আসল ব্যাপার একেবারে আলাদা…বাইরের অভিনয় দেখে শ্রমিকদের খুশী হওয়ার সময় চলে গেছে…নেতৃত্ব শ্রমিকদের বিরুদ্ধে চালিত না হওয়াই শুধু এখন আর যথেষ্ট নয়। শ্রমিকরা নেতৃত্বে অংশ নিতে চায়।"

সরকার কোয়ালিশনে যোগ দিয়ে সেণ্টার পার্টির দক্ষিণপন্থী দল, বড় শিল্পপুঁজির প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া এবং কৃষিবিদদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সংগে হাত মিলিয়েছে। ক্যাথলিক শ্রমিকদের অজ্ঞাতে, তাদের ক্ষতিকারক এই নীতি অনুসরণ করে সেণ্টার পার্টি নিজের দলে প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। যখন এই প্রতিরোধকে ভাঙার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল,

তখন তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেণ্টার পার্টির শ্রমিক গোষ্ঠী ও বড় পুঁজিবাদী অংশের মধ্যে সংঘর্ষ জ্বলে উঠল, যখন দক্ষিণপন্থী নেতারা দলের উপযুক্ত অংশকে না জানিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, রাজকীয় জার্মান ন্যাশনাল পার্টির একই গোষ্ঠীতে যোগদান করল এবং তার ফলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে তুলে ধরল এবং দলের সামনে তাদের দাঁড়াতে হল।

সেণ্টার পার্টির সংকটের পূর্বে দলীয় নেতা রাইখস চ্যান্সেলার উইলহেলম্ মার্কস এবং ক্যাথলিক ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম নেতা ইম্‌বুশের মধ্যে পত্র বিনিময় ঘটেছিল। তার সংগে আরো রাজনৈতিক পরিকল্পনা জড়িত ছিল। যে দলীয় .সংকটে জার্মানীতে শ্রেণী সংগ্রামের সাধারণ বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, তার চূড়ান্ত ঘটে মার্কসের এই বিবৃতিতে যে, "সেণ্টার বামপন্থীও নয়, সাধারণতন্ত্রীও নয়, এই হল সাংবিধানিক দল।" নির্বাচন কাছে এসে পড়ায়, এর অর্থ হল যে, দলের পুঁজিবাদী অংশ জাতিয়তাবাদীদের সংগে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল এবং তার দ্বারা সে তার শ্রেণী নীতির স্বার্থে ক্যাথলিক শ্রমিক ও পাতিবুর্জোয়াদের কাজে লাগাতে পারে। ক্যাথলিক শ্রমিকদের চাপে পড়ে স্টেগারওয়াল্ড এবং বিশেষতঃ ইম্‌বুশ সরকারে তাদের প্রতিনিধিদের তীব্র সমালোচনা করলেন। ইম্‌বুশ দেখালেন যে, উইলহেলম্ মার্কসের নীতি হ'ল "সমাজ বিরোধী," অর্থাৎ, প্রলেতারিয়েত-বিরোধী এবং শ্রেণী স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত। দ্রুত এই সংঘর্ষ তীব্র হয়ে উঠল, তারপর মার্কস দলীয় কর্মী ও রাইখস্ট্যাগ সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন তালিকাভুক্ত করলেন, এই সদস্যরা সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান জেবাচে'র নেতৃত্বে আপসের প্রচলিত পথে যখন উত্তেজনা নষ্ট করার কাজ শুরু করলেন, তখন এই সংঘর্ষ কমে গেল।

১৯২৮-এর জানুয়ারির শেষে নেতৃত্ব এই মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করল যে, দল সংকটাবস্থা পেরিয়ে ঐক্য ফিরে পেয়েছে। এটা করতে গিয়ে, মার্কস মুখে "বিদ্রোহীদের" সমবেদনা জানালেন। বললেন যে, সাধারণতন্ত্রের প্রতি দলের আনুগত্য নিয়ে আলোচনা চলে না। তিনি ভাব দেখালেন যে, জাতীয়তাবাদীদের সংগে যে কোন ভবিষ্যৎ কোয়ালিশন অসম্ভব, বক্তৃতায় বললেন যে, সেণ্টার শেষ সিদ্ধান্তে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ এক "সামাজিক নীতি" অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্বভাবতঃই ছাড় দিতে হল। রাজনৈতিকভাবে, ক্যাথলিক শ্রমিকদের ভোট পাওয়ার এক কৌশল, তারা আসন্ন নির্বাচনে নিজস্ব প্রার্থী মনোনয়নের ভয় দেখাচ্ছিল। মার্কস ও তাঁর গোষ্ঠী মৌখিক সুযোগ দিলেন, যার ফলে তাঁরা দলের উপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারলেন এবং সেইজন্য পূর্বের রাজনীতি চালু রাখতে পারলেন।

প্রাক্তন রাইখ্‌স্‌ চ্যান্সেলের জোসেফ ওয়ার্থের মনোভাব তীব্র শ্রেণী বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যখন দক্ষিণপন্থী কোয়ালিশন গঠিত হল, তখন ওয়ার্থ তার বিরোধিতা করলেন বিশেষতঃ রাইখ্‌স্‌ চ্যান্সেলার মার্কসের স্বরাষ্ট্রনীতির। কিন্তু তবুও তিনি একটা বাণী প্রকাশ করলেন, "বন্ধু ইমবুশ; আপনি কোথায় চলেছেন," এতে তিনি দেখলেন যে, সামাজিক ভারপ্রবণতা সেণ্টার পার্টিকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেবে এবং ইমবুশকে সতর্ক করে দিলেন : "এতদিন প্রযুক্তিগত বাহ্যিক পরিবেশের জন্য কাজ বাধা পাচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘদিন এভাবে চলবে কি না, আমার সন্দেহ আছে।"

এতে বোঝা যায়, তখনো শ্রমিকরা ক্যাথলিক মতবাদ ও ক্যাথলিক বুর্জোয়াদের দ্বারা ভাববাদী ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুগ্ধ হয়ে, বামপন্থী হয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্থের আকস্মিক প্রচার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কর্মীদের এত প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ফেলল যে, ভোরওয়ার্ট ঐ বিষয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হলেন, "আপনি কোথায় চলেছেন; জোসেফ ওয়ার্থ?" এই নামে।

অবশ্য সেণ্টার পার্টির এই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষকে খুব বড় করে দেখা উচিত নয়। এসব হল সরকার কোয়ালিশন "পতনের" দ্বারা উদ্ভূত এবং ফলস্বরূপ রাজনৈতিক বৈষম্যবৃদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট সাধারণ দলীয় কৌশল। শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করার কাজে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মনোভাবের ফলে যে ব্যর্থতা ঘটেছে, পিপলস পার্টি তা লক্ষ্য করেছে এবং আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করেছে ধূর্ত কৌশল এবং উদারপন্থী ধারার বাহ্যিক পুনর্জাগরণের দ্বারা সে বর্তমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে যারা বামপন্থী হয়ে যাচ্ছে, তাদের ভোট জিতে নেবে, তারা আশা করে যে, এতে ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভায় তাদের দলের দৃঢ়তা আসবে। সেণ্টার পার্টির আভ্যন্তরীণ গোলযোগে তাদের কৌশলের সুবিধা হল। যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতির উপরে সরকারী গোষ্ঠী দাঁড়িয়েছিল - সেটা খুব সুবিধাজনক, কারণ এর ভরসা ছিল ভাববাদী মনোভাবের স্বার্থ।

১৯২৭-এর ২০শে ডিসেম্বর সংখ্যায় Rote Fahne পত্রিকা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, জার্মান পিপলস পার্টি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বের সংগে মৈত্রীর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী ন্যাশনাল পার্টির বড় বুর্জোয়া ও কৃষিবিদরা তখনো একনায়কত্বের কথা ভাবছে এবং এই উদ্দেশ্যে স্টালহেলমের মত আধাসামরিক সংগঠনে শক্তি সঞ্চয় গড়ে তুলছে। আরো বলতে পারি যে, পিপলস পার্টির বামপন্থী পরিবর্তন প্রয়োজন মাত্রই প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সমর্থন পেতে পারত। পিপলস পার্টির নেতা মার্কস এবং বৈদেশিক মন্ত্রী স্ট্রেসম্যান, যিনি চেয়েছিলেন যে, পশ্চিমী

শক্তিবর্গ রাইন অঞ্চল থেকে তাদের বাহিনী তুলে নিয়ে যাক. এদের মনোভাব বিচারের সময়ে এসব কথা মনে রাখতে হবে। স্ট্রেসম্যান ও ব্রিয়াণ্ডের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও জার্মানীর নির্বাচনের দ্বারা আসন্ন হয়ে উঠল।

স্ট্রেসম্যানের কড়া ভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয়তাবাদী ভঙ্গী ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ সরকারের মধ্য থেকে ন্যাশনাল পার্টি .যা কিছু করছিল, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষিবিদদের স্বার্থোন্নতি। ১৯২৭-এর সেপ্টেম্বরে কোনিগসবার্গে ন্যাশনাল পার্টির কংগ্রেসে মন্ত্রী স্কীলের প্রতিবেদনের কথা ধরুন, তাতে তিনি কৃষিবিদদের সরাসরি সমর্থন দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। ন্যাশনাল পার্টি মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণের প্রাণপণ সুযোগ নিয়েছে। তা করতে গিয়ে. সে মন্ত্রীসভার সমর্থন চেয়েছে এই আশায় যে, এতে সে আসন্ন রাইখস্ট্যাগ নির্বাচনের ফলাফলকে চাপা দিতে পারবে। জাতীয়বাদীদের বাইরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না. কারণ স্থানীয় নির্বাচনে দেখা গেছে—দক্ষিণপন্থী কোয়ালিশন, বিশেষতঃ তার জাতীয়তাবাদী শাখার সম্মানহানির ফলস্বরূপ ওরা ভোট হারাচ্ছে এবং তার ফলে. আসন হারাচ্ছে। সেইজন্য ন্যাশনাল পার্টির এই সব নির্বাচনী কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল হারানো জায়গা ফিরে পাওয়া এবং ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভায় স্থান লাভ।

যেহেতু, বৈদেশিক নীতি হল পিপলস পার্টির বিষয়. অতএব নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল পার্টি লোকার্ণো নীতি সম্পর্কে সাধারণ অসন্তোষ, লীগে জার্মানীর প্রবেশ এবং ফ্রান্সের সংগে আপস চেষ্টাকে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক। কিন্তু এখানে তার সংগে পিপলস পার্টি, বিশেষতঃ স্ট্রেসম্যানের বিরোধিতা। নিজেদের রাজতান্ত্রিক মনোভাবের প্রচার এবং সেই সংগে বাহ্যতঃ সাধারণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা বলে যে সরকারের তারাও অংশীদার. জাতীয়তাবাদীরা তৎকালীন অবস্থার সংগে মানিয়ে নেওয়া. নরম হওয়া অথচ জাতীয়তাবাদী জিগির তুলে যা হারাবার ভয় ছিল, তাকে বাঁচানোর খুব চেষ্টা করতে লাগল। তাদের নীতিতে দুটি স্পষ্ট, আপাতবিরোধী ধারা রয়েছে: একদিকে, তা রাজতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষতঃ স্টালহেলমের সামরিক মজুতের সমর্থনের সংগে জড়িত, অন্যদিকে, তারা শ্রমিকদের মধ্যে সমর্থনলাভে সচেষ্ট। ১৯২৪-এর নির্বাচনে আমরা একই ঘটনা ঘটতে দেখেছি, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এবারের চেষ্টা আরো তীব্র। তাদের নেতাদের দ্বারা প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে, "যদি জার্মান ন্যাশনাল পার্টি তার লক্ষ্যে পৌছতে চায় এবং যদি আসন্ন নির্বাচনে বেশী শক্তির পরিচয় দিতে চায়. তাহলে তাকে উপযুক্ত জায়গায় নতুন সমর্থক খুঁজতে হবে, জার্মানী শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল মজুত লাভজনক হবে।"

যখন সরকার কোয়ালিশনের দলগুলি সংকটের জন্য কে অপরাধী, তাই নিয়ে ঝগড়া করছিল—বিষয়টার প্রচার গুরুত্ব ছাড়া আর মূল্য নেই—তখন ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিরূপে প্রকাশ্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ নিলেন: তিনি রাইখসচ্যান্সেলার মার্কসকে একটা বার্তা পাঠিয়ে বললেন যে, কয়েকটি আইন অনুমোদন করানোর জন্য জার্মানীর কার্যকরী সরকারের প্রয়োজন এবং রাইখস্ট্যাগ বাতিলের বিষয়ের সংগে শিক্ষাবিলটি জড়ানো উচিত নয়।

হিণ্ডেনবুর্গের হস্তক্ষেপ ঘটেছিল ন্যাশনাল পার্টির স্বার্থে, এই দল সরকারকে অংশভোগ করতে চাইছিল এবং "কৃষিসহায়ক" ইত্যাদি কয়েকটি বিল সংজে অনুমোদন করতে চাইছিল, অবশ্যই বড় জমিদারদের লাভের জন্য। স্বভাবতঃই সেণ্টার পার্টিকে মন্ত্রিসভায় রাখার জন্য সে খুব চেষ্টা করতে লাগল। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল যে, 'শিক্ষাবিল নিয়ে ঐক্যমতে বাধাদানকারী সব অসুবিধা দূর করার জন্য' সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কিন্তু জবাবে পিপলস পার্টি সব সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সব দলকে বাধ্য করল স্বীকার করাতে যে কোয়ালিশন ভেঙে যাচ্ছে।

পরবর্তী দলীয় আলোচনায় ঠিক হল যে, রাইখস্ট্যাগ তখনি ভেঙে দেওয়া হবে না, যাতে হিণ্ডেনবুর্গের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার মত সরকারের ক্ষমতা থাকে। এই আলোচনায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরাও জড়িত ছিল। মধ্য জার্মানীতে ধর্মঘট ও লকআউটের এই আমলে এক ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েত আন্দোলন গড়ে তোলার বদলে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক নেতারা রাষ্ট্রপতির প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনা এবং এক অদ্ভুত বিষয়ে সংসদীয় আলোচনা শুরু করল: যত বেশীদিন দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকবে ততই শ্রমিকদের পক্ষে ভাল।

স্পষ্টতঃ এই মনোভাব বুর্জোয়া দলগুলির সংগে পাতিবুর্জোয়াদের বিচ্ছেদকে স্পষ্ট করে এবং পাতিবুর্জোয়াদের ভোট পাওয়ার আশা দেখা যায়। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক মুখপত্র জোর দিয়ে বলেছিল, সে পাতিবুর্জোয়াদের সমর্থিত আইন রচনাকে (পেনশন প্রাপকদের সাহায্য) সমর্থন জানাবে, অথচ শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত হিণ্ডেনবুর্গের পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

একটা বিষয় নিশ্চিত: নির্বাচন শীঘ্র হবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রতি সব মৌলিক বিরোধিতা থামিয়ে দিয়ে তথাকথিত উত্তেজক দাবী না তোলায় সম্মতি দিয়েছিল, অর্থাৎ কার্যতঃ বুর্জোয়াদের প্রধান দাবী বাজেট অনুমোদনের বিরোধিতা করবে না। এই ভাবে নেতা হার্মান মুলার রাইখস্ট্যাগের এই মনোভাবকে প্রকাশ করেছিলেন:

"বাজেটের জন্য ভোট না দিলেও আমরা জানিয়েছি যে, কোন বিশেষ

অনুবিশ্ব সৃষ্টিতে আমরা বিরত থাকব, কারণ আমরা চাই যে বাজেটের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে, নতুন নির্বাচনের আগেই তার অনুমোদন হোক।"

আমরা দেখতে পাচ্ছি, একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক সাম্যের কৌশলের জন্য যে বুর্জোয়া সরকার গোষ্ঠী ভেঙে পড়েছিল, তাকে বাইরে থেকে কৃত্রিম সমর্থন জোগানো হচ্ছে, একদিকে জাতীয়তাবাদীদের প্রধান রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের দ্বারা এবং অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির আনুগত্যপূর্ণ বিরোধিতার দ্বারা। শিক্ষা বিষয়ে পিপলস্ পার্টির মনোভাবকে সমর্থন জানানোর জন্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় সম্পর্কে নিজেদের দাবী পর্যন্ত ত্যাগ করল, যদিও কিয়েলে সাম্প্রতিকতম দলীয় কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে এ দাবী বাতিল হয়ে গেছে। নিজেদের দাবী সম্বন্ধে এই অমনোযোগ এবং পিপলস্ পার্টি সম্পর্কে এই আনুগত্যের উদ্ভব হয়েছে কিয়েল কংগ্রেসের সাধারণ ধারা থেকে—বুর্জোয়াদের সংগে সহযোগিতা। রাজনৈতিক ভাবে কোয়ালিশন সরকারে অংশগ্রহণ, "অর্থনৈতিক গণতন্ত্র" যা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রধান নীতি, তার প্রভাব সাম্প্রতিক নীতির সব নির্দিষ্ট বিষয়ে। জনগণের মৌল সংস্কার সাধন এবং পাতিবুর্জোয়াদের ভোট লাভ, অথচ ভবিষ্যতে বুর্জোয়াদের সংগে কোয়ালিশনের সম্ভাবনা নষ্ট না করার জন্য আসন্ন রাইখস্টাগ নির্বাচনের আগেই ওদের এসব বিষয়ে সমাধানের কৌশল করতে হ'ল।

ল্যাণ্ডটাগ ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচনে দেখা গেছে যে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা প্রভাব বজায় রাখতে এবং কয়েক জায়গায় ক্ষমতা দখল করতে পারলেও অন্যত্র তারা পরাজিত হয়েছে (যেমন, হেসেনে), ওদিকে তখন কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট বেশী ভোট জোগাড় করেছে। তবু ও শক্তিশালী দল হিসাবে ভবিষ্যৎ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ত্রিশটির বেশী আসন পাওয়ার আশা রাখে।

তাদের দক্ষিণপন্থী আকর্ষণের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক যুদ্ধ থেকে তারা শ্রমিকদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে ভোট যুদ্ধে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে।

যে নির্বাচনী প্রচার শুরু হতে চলেছে, তাতে দেখা যায়, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কোন ভাববাদী ও রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করতে চায়। ভোরওয়ার্টস'র পত্রিকার ১৯২৮-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় কার্ল সেভেরিং-এর পরিকল্পনামূলক প্রবন্ধ "আমাদের দায়িত্ব" একবার দেখা যাক। তাতে বলা হয়েছে, জার্মানীর রপ্তানী বাড়াতে গেলে এবং ১৯২৭-এর অর্থনৈতিক উন্নতি বজায় রাখতে গেলে, পরিবেশ তৈরী করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কৌশল এবং শিল্পপতি ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামের মূলে রয়েছে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক নীতির এই সংজ্ঞা।

কোয়ালিশন সরকারের ব্যর্থতা ঘোষিত হবার পর মধ্য জার্মানিতে যে সাম্প্রতিক শ্রেণী সংঘর্ষের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই সময়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মনোভাব এই সত্যের বিশিষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া, বুর্জোয়া কোয়ালিশনের পতনকে ঢেকে ফেলল, এক ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব, এই গোষ্ঠী মধ্য জার্মান ইস্পাত শিল্পে সাম্প্রতিক শ্রেণী সংঘর্ষের সময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। শ্রমিকদের প্রতি ঘণ্টার মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, তা এক বৃহৎ সংঘর্ষের রূপ নিল যখন ইস্পাত শিল্পপতিদের সমগ্র জার্মানী ব্যাপী ইউনিয়ন ভয় দেখাল যে, ২২শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোন চুক্তি না হলে লকআউট হবে।

এই লকআউটের অর্থ কি হতে পারে, তা বোঝার জন্য মনে করা যাক যে, ইস্পাত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হল ৪,৪৭৪ জন এবং ইস্পাত কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিক হল ৮,১৫,০০০ জন। ইউনিয়নে রয়েছে এ.ই.জি. সিমেন্স শুকার্ট, বোর্সিগ, শোয়ার্টজকফ্ ইত্যাদি। ভোরওয়ার্টস লিখল, "এই সিদ্ধান্ত হয় পাগলামি নয় মিথ্যা কথা," আর ধাতু কর্মীদের ইউনিয়ন পরিষদ ঘোষণা করল: "লকআউট জার্মান অর্থনীতিতে আঘাত করবে এবং শিল্পপতিদের তার দায়িত্ব নিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন শান্তভাবে তাদের ইচ্ছা পালন করছে, কারণ সে জানে যে তার মজুরির দাবী ন্যায্য এবং তা জাতির অর্থনীতির অনুসারী।"

কিন্তু লকআউটের আশংকা এগিয়ে এল, তখন শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক মধ্যস্থ সভা দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি স্থির করল। উভয় পক্ষ এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করল এবং এটা বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষিত হল।

প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন এই মজুরি বৃদ্ধিকে তুচ্ছ ও অসন্তোষজনক বলে বর্ণনা করল, কিন্তু ভাল করে ভেবে তাড়াতাড়ি ওটা মেনে নিতে এগিয়ে গেল এইভাবে সে সরকারের সম্মান বাঁচাতে চাইল। পরিস্থিতি শ্রমিকদের পক্ষে অনুকূল ছিল, কিন্তু তাদের সংস্কারক নেতারা এড়িয়ে গেলেন, যদিও তারা শিল্পপতিদের মনোভাবকে কাজে লাগাবার ভয় দেখিয়েছিলেন এবং সাধারণ ধর্মঘটের দ্বারা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অতএব, জার্মান শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আরো লড়াইয়ের ভয় ছিল।

যাকে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সংকট বলে মনে হয়, তা আসলে বুর্জোয়া দলগুলির শক্তিজোট, যে জোটকে একচেটিয়া পুঁজিবাদী দল, পিপলস্ পার্টি নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছিল, অর্থাৎ, বামপন্থীদের সংগে হাত মেলানোর জন্য ছোটখাট বিষয়ে "প্রগতিশীল" ও আপাত ধর্ম বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলা এবং শাসক শ্রেণীর দক্ষিণপন্থী দলগুলির সংগে সম্পর্ক বজায়

রাখা। এতে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ছিল তারা শ্রেণী সংঘর্ষ নষ্ট করার এবং এক "বিরাট কোয়ালিশন" সরকারের প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

এই পরিস্থিতিতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কাজের বিরাট ক্ষেত্র ছিল। যখন কৃষিজীবী ও একচেটিয়া পুঁজির সরকারে পাতি বুর্জোয়া অসন্তোষ নতুন জোট তৈরী করতে যাচ্ছিল, তখন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের প্রতি জনগণের আকর্ষণ এবং একঝাঁক ছোট, স্থানীয় দলের উদ্ভব, শ্রমিকদের বামপন্থী ঝোঁক স্পষ্টতঃ কমিউনিস্ট পার্টির আর সেণ্টার পার্টির প্রভাব বাড়িয়ে দিল। যদি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কোন ভোট পেয়ে থাকে, সে হল পাতি বুর্জোয়া ভোট, আর কমিউনিস্ট পার্টির বৃদ্ধিতে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি ও যৌথ-গোষ্ঠীর কৌশলের সাফল্য প্রমাণ হয়। আলটোনা, হামবুর্গ, কোনিগস্‌বার্গ ও অন্যত্র যেসব নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভোট যথেষ্ট বেড়েছিল, সে সব নির্বাচন কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ধারার শক্তির গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হয়ে দেখা দিল।

এই নির্বাচনের পর Rote Fahne প্রশ্ন করল,"আমাদের কি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত? আমাদের যৌথ কৌশলকে আরো সুসংহত, সংগঠিত রূপে ব্যবহার করতে হবে; জনগণের সংগে আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করতে হবে।"

জার্মানি রাইখস্ট্যাগ নির্বাচনের জন্য তৈরী হচ্ছে। ফল যাই হোক, জার্মান শ্রমিকরা বিরাট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে।

১৯২৮

শক্তির পুনর্মিলন ও ফ্যাসিবাদী আক্রমণ

[১৯৩০-এর নির্বাচন]

১৯৩০-এর ১৪ই সেপ্টেম্বরে রাইখস্ট্যাগের নির্বাচন উইমার সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়, কারণ তার ফলাফল বুর্জোয়া সংসদবাদের সংকটকে এর অতি গোঁড়া সমর্থকের কাছেও তুলে ধরেছে। রাজনৈতিক দলগুলির জিতে নেওয়া আসনের পরিবর্তন অভাবনীয় মনে হয়, যদি না আমরা নির্বাচনী ফলাফলে ইঙ্গিত-দানকারী সামাজিক রাজনৈতিক গভীর পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করি, এই নির্বাচনী ফল রাজনৈতিক ঘটনাও প্রচণ্ড শ্রেণী বিস্ফোরণের ইঙ্গিত দেয়। রাইখস্ট্যাগ নির্বাচনের ফল দেখে, সেইসব লোক হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, যারা সংসদীয় সমন্বয় অনুযায়ী চলতে অভ্যস্ত এবং রাজনৈতিক দলগুলির পরিবর্তনের অন্তরালে শ্রেণী শক্তির পুনর্বিন্যাস ও সংগ্রামকে দেখতে পায় না—এই পুনর্বিন্যাস ১৯১৮-র নভেম্বর বিপ্লব থেকে শুরু হয়েছিল।

নির্বাচনের প্রভাবকে কমানোর আগ্রহে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সংবাদ-পত্র ব্রুনিং সরকারের সমর্থক সংবাদপত্রগুলির সংগে যোগ দিয়ে দাবী করল যে, জনগণের সংস্কার ক্ষণ স্থায়ী। এর উদ্দেশ্য হল, স্টক এক্সচেঞ্জের উদ্বেগ থামানো, নির্বাচনের ফল হিসাবে জার্মান কাগজের দাম পড়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ ডজ ও ইয়াং পরিকল্পনায় তৈরী কাগজের দাম, উদ্দেশ্য হ'ল, বৈদেশিক বিশেষতঃ মার্কিন আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, কারণ এখন তারা জার্মানিকে খুব সামান্য ঋণ দিচ্ছে এবং জার্মান বুর্জোয়ার যে অংশ দ্রুত তাদের সম্পত্তি বিদেশে পাঠাচ্ছিল আর নিজেরা হল্যাণ্ড বা সুইটজারল্যাণ্ডে চলে যাচ্ছিল, তাদের মনে স্বস্তি নিয়ে আসা। স্বভাবতঃই, শ্রেণী শক্তির তীব্র মতবাদ, যা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সামনে অপ্রতিরোধ্য ও স্বাভাবিক, তা লোকের চোখে কম দেখানোর উদ্দেশে প্রচার চালানো হয়েছে।

ডজ পরিকল্পনার কয়েকটি নিয়ম ইয়ং পরিকল্পনা কিছু বদলালেও

জার্মানির অর্থনৈতিক ও আর্থিক দুর্দশা কমাতে পারে নি, জার্মান পুঁজিবাদের বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে, কারণ সংকটের সময়ে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে। প্রায় নিষ্ক্রিয় ব্যয়ভার নিয়ে জার্মানি এতদিন শুধু বিদেশী, প্রধানতঃ মার্কিন ঋণ থেকে খরচ জোগাচ্ছিল। ইয়ং পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে স্বদেশ থেকে খরচ জোগাতে গেলে তার রপ্তানী ৫,০০ কোটি মার্কে তুলতে হবে, অর্থাৎ জার্মান পুঁজিবাদীদের বর্তমানের সংকটগ্রস্ত বাজারের অত্যন্ত কম দামের চেয়েও কম দামে জিনিস বেচতে হবে।

অন্যদিকে, জার্মান পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য নির্ভর করছে উৎপাদন সংগঠনের উপরে। সংকটের ফলে উদ্ভূত তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য জার্মান বুর্জোয়া পুঁজিবৃদ্ধি ও ফলতঃ লাভের মাত্রা বজায় রাখার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এটা করতে গিয়ে তাকে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে এবং মজুরি কমাতে হবে। লক্ষ্য স্পষ্ট: ইয়ং পরিকল্পনা ও গভীর অর্থনৈতিক সংকটের ভারী বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে চাপানো।

উক্ত পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রচারিত ১৯২৮-এর ২৩শে নভেম্বরের এক ইস্তাহারে জার্মান সরকার বললেন যে, "ব্যয় সমস্যার চূড়ান্ত মোকাবিলা সম্ভব······যদি জার্মানির জনগণের জীবনযাত্রার মান না কমানো হয়।" এ শুধু ফাঁকা কথা। ইয়ং পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের জীবনযাত্রাব মানেব ওপরে নির্দিষ্ট আক্রমণ শুরু করল আর সরকার ১০০ কোটি মার্কের ঘাটতি পূরণের জন্য এক আর্থিক সংস্কার চালু করল। সংবিধানের ৪৮ ধারায় জরুরী বিলে (১৯৩০, জুলাই-এ প্রকাশিত) ব্রুনিং সরকার কর্মী ও সরকারী কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক দান, বাজেটের কয়েকটি বিষয়ের পুনর্বিন্যাস, মোট ১১ কোটি মার্কের হিসাবে অবিবাহিত নাগরিকদের উপর কর এবং আয়করের ৫ শতাংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করল।

এতে ৪০ কোটি মার্কের ব্যবস্থা হ'ল, বাকীটা সামাজিক আইন সংক্রান্ত ব্যয় কমিয়ে তুলবার কথা। যেমন, দক্ষ শ্রমিকরা কার্যতঃ বেকার ভাতা থেকে বঞ্চিত হ'ল. ঐ ভাতার জন্য প্রয়োজনীয় শেষে চারধারে সময় অনেক বাড়ানো হ'ল এবং উচ্চতর মজুরি প্রাপ্ত কর্মীদের বেকার ভাতা কমানো হ'ল, অথচ নতুন কর্মীরা প্রধানতঃ বাদ পড়ল। সমগ্র ব্যবস্থা এমন করা হ'ল, যাতে বেকারদের অধিকাংশই সব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়, সাহায্য অনেক কমানোও হ'ল। চিকিৎসা সংক্রান্ত জীবন বীমার ওপরে আঘাত হ'ল আরো গুরুতর।

সরকার বড় পুঁজির ওপরে কর কমাল, কিছু করের বোঝা জনগণের ওপরে চাপিয়ে দিল (বিয়ার, তামাক ইত্যাদির কর) এবং আশা করল, নতুন কর থেকে ৫২.৬ কোটি মার্ক পাওয়া যাবে। সস্তা জমানো গরুর মাংস আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হল এবং বড় ও মাঝারি চাষীর স্বার্থে বাঁচাতে অন্য সব খামারের উৎপাদনের ওপরে কর বাড়ানো হ'ল।

শ্রমিক'দের মজ্নুরির ওপরে আঘাত হানা হল। সংখ্যাতত্ত্ববিদ রবার্ট কুজিনস্কি লিখলেন, "১৯২৯-এর প্রথম দশ মাসে জার্মান শ্রমিকদের আয় ছিল জীবনযাত্রার ৮৫ শতাংশ। ১৯২৯-এ কর্মরত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজ্নুরি তাদের পরিবারের খাদ্যবস্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্রমিকের আয় তার জীবন-যাত্রার ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ নীচে ছিল।"

যতদিন যেতে লাগল, ততই ব্রুনিংএর আক্রমণ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতায় শ্রমিকদের সমস্যা বাড়াতে লাগল। ইয়ং পরিকল্পনা গ্রহণের পর গৃহীত ব্যবস্থার ভিত্তিতে হিসাব (মজ্নুরি হ্রাস, উচ্চতর অপ্রত্যক্ষ কর, খামার উৎপাদিত দ্রব্যের উপরে করের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, সামাজিক জীবনসীমা ছাঁটাই ইত্যাদি) থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃত মজ্নুরি ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নেমে গেছে।

সংকটের ক্রমাবনতির অর্থ হ'ল বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব কর্মরত মানুষের বৃহত্তর অংশকে প্রভাবিত করে, পাতি বুর্জোয়াদের স্বাচ্ছন্দ্য কমিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে কৃষিসংকট প্রচুর কৃষিশ্রমিক ও ছোট চাষীকে জাগিয়ে তুলল।

ভার্সাই ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য এবং ইয়ং পরিকল্পনার চাপে পড়ে জার্মানিতে যুদ্ধোত্তর মূল বৈষম্যগুলি দেখা যায়। শ্রেণীসংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল। মে মাসের যুদ্ধ, বিপ্লবী কর্মীদের অগণ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘটের জোরদার, একটানা প্রবাহ, ট্রেড ইউনিয়নের প্রবলতর বিরোধিতা এবং অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ ও পুলিশীভীতি, তার সংগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতায় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের ওপরে সাধারণ পুঁজিবাদী আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং স্যাক্সনি নির্বাচনের ফলাফল—এই সব কিছু ১৪ই সেপ্টেম্বরের অশুভ নির্বাচনের পূর্বে পরিস্থিতিকে প্রকাশ করল।

ঠিক মার্কিন সংস্কারবাদীরা যেমন "সমৃদ্ধি"কে মার্কিন পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বলে ভাবত, সেরকম জার্মান সংস্কারবাদীরা তো বটেই, জার্মান বুর্জোয়ারা প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকটকে সম্পূর্ণ স্থানীয় ঘটনা বলে বর্ণনার চেষ্টা করল, যে ঘটনা জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থাকেও একটু আশা-প্রদ করতে পারে। এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি ছিল, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণকারী ইউরোপীয় মূলধন ইউরোপে ফিরে যাওয়ার পর সেখানকার আর্থিক বাজারের সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী উন্নতি। বাস্তব দ্রুত এই ভুল ভেঙে দিল। যুক্তরাষ্ট্রের সংকট সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে জার্মানির অর্থনৈতিক সংকট প্রবলভাবে বাড়িয়ে তুলল, এর সংগে মার্কিন পুঁজিবাদের সহস্র যোগসূত্র ছিল।

জার্মান নীতির রচয়িতারা জার্মানির গভীর অর্থনৈতিক সংকট এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের এই যোগসূত্রের কথা স্বীকার করলেন। যে বার্লিন অর্থ-

নৈতিক সংস্থা নির্বাচনী প্রচারের চূড়ান্ত অবস্থায় তার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, সে সম্ভাব্য উন্নতির কোন লক্ষণ দেখে নি। বরং, আরো অবনতির অশুভ লক্ষণের উল্লেখ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়বে, ১৯৩০-এর ডিসেম্বরের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৩,৫০০,০০০-তে পৌঁছবে। সংস্থার এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব ও নির্দিষ্ট হিসাব করার পদ্ধতি থেকে মনে হয়, ঐ সংখ্যা অনেক ছাড়িয়ে যাবে, এ কথা বলাই নিরাপদ।

সংস্থা পরিস্থিতিকে "গভীর অবনতির" বলে বর্ণনা করল, এদিকে সব তথ্য থেকে দেখা যায়, জার্মান পুঁজিবাদ ১৯২৯-এর শেষের দিকে সংকটে পড়ল। সব অর্থনৈতিক ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠছে, বেকারত্ব বাড়ছে, মূলগতভাবে আরো বেশী শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, পাতি বুর্জোয়াদের অবস্থা আরো সংকটময় হয়ে উঠছে। কৃষি সংকট কৃষি শ্রমিক ও ছোট চাষীদের বিপদে ফেলছে চড়া কর, বড় চাষীদের স্বার্থে কাস্টমস্ শুল্কে অভাবনীয় বৃদ্ধি, সামাজিক জীবনবীমার হ্রাস এবং কয়েক জায়গায় সম্পূর্ণ ছাঁটাই এবং ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মজুরি হ্রাস—এ সব ঘটনায় সংকট আরো বাড়ল, এদিকে একচেটিয়া পুঁজি বড় ভূস্বামীদের নিয়ে গোষ্ঠী পুনর্গঠনের এবং সংকটের বোঝা জনসাধারণের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হল, ১৪ই সেপ্টেম্বরের নির্বাচনের পর সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসে এবং জার্মানির প্রধান শক্তি একচেটিয়া পুঁজির গৃহীত সাধারণ পন্থায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতা পেলেও একচেটিয়া পুঁজি ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের পরিকল্পনা ছাড়ে নি এবং স্টালহেলম্ ধরনের সামরিক সংগঠনকে সাহায্য করছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সরকারে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে একচেটিয়া পুঁজি আশা করল যে, ওরা উইমার সংবিধানের সংশোধনে এবং আইনসঙ্গত উপায়ে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। কোয়ালিশনে অংশ নিয়ে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা জার্মান মূলধন তোলার নিম্নতম পরিকল্পনা রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারত। ইতিমধ্যে, একচেটিয়া পুঁজি সামাজিক শক্তিগুলিকে সচল করল এবং ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের দ্বারা দ্রুত চালনা ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা করল। সংবিধানের ৪৮ ধারার প্রয়োগ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা, জার্মান শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে জরুরী আইন প্রয়োগ—তার সংগে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের প্রবল প্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে, তীব্র শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যে জার্মানি নির্বাচন ঘটাতে চলেছে (পিপ্‌ল্‌স্ পার্টির সদস্য জনৈক জার্মান শিল্পপতির ভাষায় জার্মানি দক্ষিণ বা বামপন্থী একনায়কত্বের স্তরে প্রবেশ করছে)।

পুঁজিবাদী নীতির রচয়িতারা তাদের শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে অন্ততঃ আসন্ন শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে ভদ্র মনোভাব দেখাল। নির্বাচনী আবেদনে ইম্পিরিয়ল ইউনিয়ন অফ জার্মান ইণ্ডাস্ট্রি বলল, "রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস বিপজ্জনকভাবে দুর্বল হয়ে গেছে এবং বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বেকারত্ব শীতে কুৎসিত আকার নেবে। "ইউনিয়ন যৌথ পরীক্ষার" বিরুদ্ধে সব সামাজিক শক্তি ও শাসকশ্রেণীর সব রাজনৈতিক দলকে যৌথ সংগ্রামের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দিল। সে "সংস্কার সাধনে প্রস্তুত কার্যকরী সরকারের "আহ্বান জানাল যা "ব্যক্তিগত উদ্যোগকে রক্ষা করবে ও বজায় রাখবে।" তার আবেদনে বলা হল, এই সরকারের উচিত "ত্রুটিপূর্ণ অর্থ-নৈতিক ও আর্থিক নীতিকে" ত্যাগ করা এবং সমাজ সংস্কার এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে বশীভূত করা।

এই আবেদন নির্বাচনের পূর্বে জার্মানির পরিস্থিতির পর্যালোচনা মাত্র নয়, শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে আক্রমণের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনার একচেটিয়া পুঁজির দাবী।

অবশ্য, অর্থনৈতিক সংকটে পুঁজিবাদী সমাজের মূল শ্রেণীবৈষম্য আরো তীব্র হয়ে উঠল বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের মধ্যে। বুর্জোয়া শিবিরের মধ্যেও বৈষম্য এই সংকটে প্রকাশ পেল। কৃষিসংকট পূর্ব-জার্মান ভূস্বামীদের ও উত্তর জার্মানির *কুলাকদের* স্বার্থে আঘাত করল। উচ্চতর খাজনার জন্য তাদের প্রচারে এটা উৎসাহ যোগাল। রাজনৈতিক অর্থে এরা ল্যাণ্ডবাণ্ডকে কাজে লাগাল, যে ল্যাণ্ডবাণ্ড আমদানীকৃত খাদ্যের ওপরে বেশী শুল্ক বসানোর জন্য সরকারকে প্রভাবিত করেছিল এবং বড কৃষকদের প্রচলিত মুখপাত্র পুরনো ন্যাশনাল পার্টির নেতাকে উপেক্ষা করে এক স্বতন্ত্র নীতি বজায় রেখেছিল। কিন্তু যখন পূর্ব জার্মানিতে বড ভূস্বামীরা আরো শুল্ক চাইছিল, তখন দক্ষিণ, বিশেষতঃ পশ্চিম জার্মানির পশুপালন অঞ্চলের কৃষকরা পশু-খাদ্যের জন্য আরো কম দাম চাইছিল।

তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকদের বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো পুঁজিবাদী দলগুলি ভূস্বামীদের সমর্থন করতে বাধ্য হ'ল এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাহায্যে যথাযথরূপে আইন প্রয়োগ করল। তবু খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত মূল্যে হস্তক্ষেপের জন্য ভূস্বামীদের চেষ্টায় কয়েকজন জার্মান শিল্পপতি বিরোধিতা করলেন। কারণ, ইম্পিরিয়াল ইউনিয়ন অফ জার্মান ইণ্ডাস্ট্রি উচ্চতর খাদ্যকরের প্রতিবাদ করল, ওদিকে রাইন আর ওয়েস্ট ম্যালিয়ার প্রভাবশালী শিল্পপতিরা কৃষকরা যা চায় তা পেতে সহায়তা করল।

এটাই প্রমাণ যে, অর্থনৈতিক সঙ্কট শুধু শ্রমিক ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যকেই তীব্র করে নি, শাসকশ্রেণী বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠনের মধ্যেও

বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছিল। বিরোধিতা তীব্রতম হয়েছিল ভারী শিল্প ও নির্মাণ শিল্পের মধ্যে এবং ইস্পাত ও রাসায়নিক শিল্পের মধ্যেও। রাসায়নিক শিল্প নিজস্ব একটা রাজনৈতিক দল পর্যন্ত করে ফেলল। সেই সংগে, সংকটের ফলে সংঘটিত পুনর্বিন্যাসে পুরনো বুর্জোয়া দলগুলি এবং জার্মান পুঁজিবাদের কয়েকটি শ্রেণীর নীতির অযোগ্যতা প্রকাশ গেল। যখন পুরনো রাইখ স্ট্যাগের জার্মান বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিভূস্বরূপ রাজনৈতিক দলগুলি গোষ্ঠী তৈরী করার চেষ্টা করাতে এই অযোগ্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। উইমার জার্মানির প্রধান একচেটিয়া পুঁজিবাদী দল পিপ্‌লস্‌ পার্টি নির্বাচনী প্রচারে এবং নতুন রাইখ স্ট্যাগে একটা সাধারণ সূত্র বজায় রাখতে বুর্জোয়া দলগুলি একটি যৌথ ফ্রন্টের প্রস্তাব দিল। ফ্যাসীবাদী আন্দোলনের সহায়ক কয়েকটি একচেটিয়া গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনায় দেখা গেল, পুরনো দলগুলি পরাজয়কে ভয় পেত। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল, সব পুঁজিবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জন্য সাধারণ নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করা। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রথম চেষ্টাতেই বৈষম্য দেখা দিল।

ন্যাশনাল পিপল্‌স্‌ পার্টি থেকে উদ্ভূত ইকনমিক পার্টি ও কনজার্ভেটিভ পিপল্‌স্‌ পার্টি মধ্যবিত্ত ও পাতি বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অংশে গভীর সামাজিক মূল সহ পিপল্‌স্‌ পার্টির নেতৃত্বের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে নাকচ করল। যতদিন না প্রত্যক্ষ আলোচনায় একটি চুক্তিতে পৌঁছনো গেল, ততদিন এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা জার্মান পিপল্‌স্‌ পার্টি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয় নি। যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু হল, তখন এই বুর্জোয়া কৃষিজীবী গোষ্ঠী, "অর্থে, সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থ-নীতি ও রাষ্ট্রে হিণ্ডেনবুর্গের সংস্কার পরিকল্পনা দৃঢ় করা ও বজায় রাখার" সাধারণ লক্ষ্যের আপাতভিত্তিতে মিলিত হল।

ত্রিদলীয় গোষ্ঠী ৪৮ ধারার জরুরী ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াশীল ব্রুনিং পরিকল্পনার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করল। গোষ্ঠীর মতে, ব্রুনিং পরিকল্পনা "জার্মান অর্থনীতি, বিশেষতঃ জার্মান কৃষির উন্নতির জন্য, পূর্ব জার্মানিকে বাঁচানোর জন্য......রাষ্ট্রের সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য স্বরাষ্ট্র নীতির অতি জরুরী প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ'।

গোষ্ঠী গঠিত হওয়ার পরে, রক্ষণশীল ভূস্বামীদের দল তার রাজনৈতিক অবস্থাকে বাঁচানোর জন্য জার্মান কুলাকাদের রাজনৈতিক দলগুলি সংগে আলোচনা করতে লাগল, ওদিকে শিল্পপতিদের দল এক নতুন রাজনৈতিক দল স্টেট পার্টির সংগে আলোচনায় শুরু করল।

যেহেতু সেন্টার পার্টি (সহযোগী দল ব্যাভারিয়ান পিপল্‌স্‌ পার্টির দ্বারা সমর্থিত) ব্রুনিং মন্ত্রীসভায় প্রধান দল, অতএব নির্বাচনের আগে এইসব

রাজনৈতিক কৌশলগুলি হল আসলে জার্মান শাসক শ্রেণীর সব পুরনো রাজনৈতিক মৈত্রীকে নিয়ন্ত্রণের এক বেপরোয়া একচেটিয়া পুঁজিবাদী প্রচেষ্টা। এই মিলনের সাধারণ পটভূমিকা হত "হিণ্ডেনবুর্গ পরিকল্পনা" এবং সরকার যে পরিকল্পনাটা কার্যকরী করতে শুরু করেছে, তা মনে হল সাফল্যের সূচনা অবশ্য প্রথম বাধা দেখা দিল, যখন কৃষিজীবী দল বলল যে, তারা অপ্রধান সদস্য হয়ে কোন গোষ্ঠীতে ঢুকবে না, আরেকটা বাধা দেখা দিল, যখন শিল্পগত স্বার্থে পরস্পর সংঘর্ষ দেখা দিল : হিণ্ডেনবুর্গ পরিকল্পনার সমর্থক যেকোন গোষ্ঠীতে যোগদান জার্মান স্টেট পার্টি অসম্মত হল, যদিও এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সরকারের প্রতিনিধিরা পরিকল্পনাটি রূপায়িত করছিল। কাজে ও কথায় এই যে আপাতবৈষম্য বুর্জোয়া দলগুলি মধ্যে এত সাধারণ ঘটনা, তার মূল ছিল জার্মান রাজনৈতিক দৃশ্যে নতুন দলের ভূমিকায়।

নতুন দলের কেন্দ্রস্বরূপ যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ১৯১৮-র নভেম্বর বিপ্লবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থকরূপে এগিয়ে এসেছিল, সে উইলহেলমীয় যুগের বুর্জোয়া দলগুলির সাহায্যে ১৯১৯-এর জানুয়ারির নির্বাচনে পঞ্চাশ লক্ষের বেশী ভোট এবং ৭৫টি আসন পেল। কিন্তু বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির মৈত্রী এগিয়ে যেতেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রভাব কমতে লাগল। শেষ রাইখ স্ট্যাগে সে মাত্র ২৫টি আসন পেল এবং শ্রেণীসংঘর্ষের উত্তাপে যে সে শুকিয়ে যাবে, তার সব ইঙ্গিতই দেখা দিল। এটা আরো সম্ভব হল, কারণ, ব্রুনিং সরকারে অংশ নিয়ে সে তার সব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল। এমনকি তার নাম ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ফ্যাসিবাদী আক্রমণের পটভূমিকায় মানাচ্ছিল না। কাজেই ভেঙে পড়া এই দল নতুন স্টেট পার্টি নামে দেখা দিল।

এই দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডিয়েট্রিচ্ ব্রুনিং-এর প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, প্রুশীয় অর্থমন্ত্রী হোপকার-এ্যাসাচফ্ এবং অগণ্য সমিতির সদস্য ইউজিন ফিশার। কিন্তু এর সামাজিক মূল্য এসেছিল, ফার্বেনিনডাসট্রি-র প্রতিনিধি বক্তা, ইয়ং পরিকল্পনার আর্থিক কার্যকলাপে জড়িত ব্যাংক ব্যবসায়ী মেল্‌চিওর এবং রাসায়নিক শিল্পের সাহায্য প্রাপ্ত আধা ফ্যাসিবাদী সংগঠন ইয়ং জার্মান অর্ডারের নেতা আর্টার মাহরণের কাছ থেকে।

পুরনো ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ইয়ং জার্মান অর্ডারের সংগে মিশে নতুন স্টেট পার্টিতে পরিবর্তিত হওয়ায় প্রমাণ হয় যে, পুরনো বুর্জোয়া পার্টিগুলি একটা সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছেছে, তারা পূর্বের কার্যকলাপ ছাড়তে পারছে না এবং ফ্যাসীবাদী হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। এ কথা বলছি কারণ, ১৪ই সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে দেখা গেল যে, যুদ্ধোত্তর যুগের যুবকরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় এবং ফ্যাসিবাদই একমাত্র

পুঁজিবাদীদের বজায় রাখতে পারে, কারণ তীব্র শ্রেণী সংঘর্ষের সংগে তাল রাখতে গিয়ে তারা বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রকে ত্যাগ করছিল।

স্টেট পার্টি যদি দক্ষিণ বুর্জোয়া দলে যোগদানে রাজী না হয়ে থাকে, তাহলে, তা হিগুেনবুর্গ পরিকল্পনার সংগে তার পরিকল্পনা পার্থক্যের জন্য নয়। সে পরিকল্পনা বিশেষত্বহীন, অস্পষ্ট। তার প্রচলিত "সামাজিক পুঁজিবাদের" ধারণা, কার্যতঃ পুঁজিবাদী সম্পর্কের সেই পুরনো ব্যবস্থা, যাকে বাঁচাতে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট পর্যন্ত সব দলই আগ্রহী। একমাত্র তফাৎ হল, কৌশলগত সম্বন্ধ। হিগুেনবুর্গ পরিকল্পনা গোষ্ঠীতে যোগদানে স্টেট পার্টির অসম্মতির (অবশ্য ব্রুনিং সরকারে থেকে তাকে এই পরিকল্পনার অংশীদার হতে হয়েছে) মূল কারণ হল, বড় জার্মান পুঁজির দুটি আলাদা দল এবং আধিপত্য লাভের জন্য দুটি ধারার সংঘর্ষের বৈষম্য।

আসলে ব্যাপারটা হল কয়েকটি একচেটিয়া গোষ্ঠী, প্রধানতঃ স্টেট পার্টিতে উপস্থিত রাসায়নিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা পিপলস্ পার্টিতে ভারী শিল্পের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি বজায় রাখতে চায়। ত্রিদলীয় গোষ্ঠীর পরিকল্পনার সব বিষয়ে রাজী হলেও স্টেট পার্টি সই করতে চাইল না এই যুক্তিতে যে, এর সংগে হিগুেনবুর্গের নাম জড়িত আছে। অতএব সব বড় বুর্জোয়া সংসদীয় দলের জোট বাঁধার চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেল।

পুঁজিবাদী শ্রেণী স্বার্থ এবং রাজনৈতিক মৈত্রীর মূল ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যর্থতার ফলে আরও কৌশলের সুযোগ পাওয়া গেল। জার্মান বুর্জোয়ারা এখনো সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সংগে সব সম্পর্ক নষ্ট করতে রাজী নয়। একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র বলল- "ভবিষ্যৎ বিপদে এই সম্পর্ক দরকারে লাগবে।"

জার্মানীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের জটিলতম ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ক্যাথলিক সেণ্টার পার্টির বিচিত্র গঠন ও ভোট ক্ষমতার পটভূমিকায় আধুনিক জার্মান সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের সাধারণ গতি বোঝা যায়। এই বড় দল, যার শক্তি শুধু ক্যাথলিক চার্চই নয়, উপরন্তু রয়েছে নানারকমের বহু সংগঠন, সে পাতিবুর্জোয়া ও শিল্প শ্রমিকদের বড় অংশকে তার প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। কিন্তু শিল্পপতি এবং বড় একচেটিয়া কারবারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত অংশই দলকে চালিত করে।

তিন বছর আগে, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিয়মনিষ্ঠ বুর্জোয়া আক্রমণ সেণ্টার পার্টির সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে ক্যাথলিক শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।[১] দলের শ্রমিক শাখার নেতারা জনগণের চাপের

১। পূর্বের অধ্যায়, "১৯২৮-এ কোয়ালিশন সরকারের পতন" দ্রষ্টব্য।

ফলে দলীয় নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে এবং একটি "সামাজিক নীতির" আনুগত্য দাবী করতে বাধ্য হয়েছিল। পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেল যে, সেণ্টার পার্টির নেতারা শ্রমিকদের মনোভাবের প্রতিফলক ক্যাথলিক ট্রেড-ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনের "বামপন্থী" ধারাকে উপেক্ষা করে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে প্রতিক্রিয়াশীল পথ নিলেন। সেণ্টার পার্টি ব্রুনিংকে বেছে নিল, তিনি রাইখসচ্যান্সেলর রূপে রাইখস্টাগ ভেংগে দিয়ে ৪৮ ধারার জরুরী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ওপরে আঘাত হানলেন। এই ব্যবস্থায় স্টেগার ওয়াল্ডকে শ্রম মন্ত্রীর ক্ষমতার দ্বারা শ্রমিক স্বার্থে আঘাত করার দায়িত্ব দেওয়া হল।

দলে সংকটের সময় থেকে সামান্য সময়ের মধ্যেই দলের রাজনৈতিক পথের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা গেল। সময়ে আরও দেখা গেল, কোন পথে সে যেতে চায়: স্টেগারওয়াল্ড ক্যাথলিক শ্রমিকদের চাপে "ক্ষিপ্ত" হওয়ায় তাঁকে সরকারে প্রবেশের একটা সুযোগ দেওয়া হল এবং সেণ্টার পার্টির নেতারা যে আন্দোলন শুরু করেছিল, শ্রমিকদের দাবী তাতে বাধা দিল। এই দাবী শুধু বৈষম্যের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলল: ১৪ই সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে দেখা গেল, ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে কয়েকটি বড় শ্রমিক অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি লাভবান হ'ল। যে ক্যাথলিক ইউনিয়নগুলি মাত্র দু-তিন বছর আগে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক শ্রমিকদের ঠকানোর অভিযোগ করেছিল, তারা এখন স্টেগারওয়াল্ডের নীতিকে প্রবল সমর্থন জানাল, ব্রুনিং-এর একনায়ক সুলভ আচরণকে সমর্থন ও সেমেটিক বিরোধী বক্তৃতা দিল যাকে হিটলার-পন্থীদের ইহুদী বিতাড়ন কৌশলের সমান বলা যায়। আচরণের এই পরিবর্তন জার্মানীর শ্রেণীগত ধর্ম।

ব্রুনিং এবং সেণ্টার পার্টির অন্যান্য নেতারা এই আশায় রাইখস্ট্যাগ ভেংগে দিলেন যে, দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া গোষ্ঠী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সাহায্য ছাড়া শক্তি অর্জন করবে ও পুঁজিবাদী আক্রমণের মধ্যেই কাজ চালাতে সমর্থ সরকার গঠন করতে পারবে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ব্রুনিং মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করল, কিন্তু নির্বাচন এগিয়ে আসতে তারা কাজ করার জন্য ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে ওঠায় বোঝা গেল, ব্রুনিং-এর প্রতি তাদের আক্রমণটা একটা ছল। ইতিমধ্যে ব্রুনিং পূর্বের রাইখস্ট্যাগ থেকে জানতেন যে, জাতীয়তাবাদীদের তুলনায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা সংসদে অনুপস্থিত থেকে সরকারকে বাঁচাচ্ছে। নির্বাচনের অল্প আগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটব্রন, প্রুশীয় সরকারের প্রধান, ব্রুনিংকে "নির্দিষ্ট সহযোগিতা"-র প্রস্তাবসহ "সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির সাহায্য" দিতে চাইলেন। সেভেরিংও একই প্রস্তাব করলেন এবং বেতারে তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় "জাতীয় দৃঢ়তা", সব শ্রেণীর "চূড়ান্ত উপকার ও গুণের" জন্য শাসক সম্প্রদায়ের সংগে সহযোগিতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করলেন।

নির্বাচনের পূর্বে এক প্রবন্ধে বৃদ্ধ কাউটস্কিও তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে বললেন যে, বুর্জোয়া দলগুলির সংগে চুক্তি করা প্রয়োজন, তাঁর সাম্প্রতিকতম তাত্ত্বিক মতের মত তাঁর ব্যাখ্যাও নীচু মানের। তিনি বললেন, চুক্তির প্রয়োজন, কারণ, "ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টরা ধ্বংসের একই লক্ষ্য অনুসরণ করছে।" নোংরা কথা। কাউটস্কি "পুরনো দলগুলির" সংগে চুক্তির আহ্বান জানালেন, কারণ, তিনি বললেন, "স্বাভাবিক উৎপাদনে শুধু সম্পদশালী শ্রেণীরাই আগ্রহী, এ ধারণা ভুল।" তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই সত্যের দিকে চোখ বুজে রইলেন যে, "পুরনো দলগুলি" প্রভাব হারিয়ে শুধু বুর্জোয়া গণতন্ত্রতেই নয়, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল, আগ্রাসী নীতির সমর্থনেও মুক্তি খুঁজছে।

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের প্রধান মুখপত্র, *ভোরওয়ার্টস* নির্বাচনের দিনে "সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি দীর্ঘজীবী হোক" নামে এক প্রবন্ধে লিখল :

"পুরনো রাইখস্ট্যাগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আপস নীতি অনুসরণ করেছিল এবং নতুন রাইখস্টাগেও তাই করতে প্রস্তুত····· যদি মধ্যপন্থী দলগুলি নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক পথে ফিরে যেতে চায়, যেটা অর্থনীতির পক্ষে সবচেয়ে ভাল, তাহ'লে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

অবশ্য, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা শুধু প্রত্যক্ষ আলোচনাতেই থেমে রইল না এবং জার্মান পুঁজিবাদকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দিল। *ভোরওয়ার্টস* বলল, যদি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সহযোগিতার আহ্বান না জানানো হয়, তা হলে সাংঘাতিক ফল দেখা দিতে পারে, "যুদ্ধ ঘটতে পারে, যার আকার কল্পনা করা এবং অর্থনীতির উপরে তার প্রভাব বিচার করা খুব কঠিন।"

এইভাবে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের নেতাদের চেয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভাগ্যের প্রতি বেশী সমর্থন দেখাল। দেবতাদের পক্ষে দৃশ্যটা উপভোগ্য ছিল, কিন্তু জার্মান একচেটিয়া কারবারের রাজনৈতিক অলিম্পাসে সে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। ব্রুনিং উত্তর দিলেন যে, ওরা হয় তাঁর পুরো পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, নয় গ্রহণ করবে না। নির্বাচনের পরে যদিও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা জানাল যে, ৪৮ ধারায় চালিত তার সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনাকে ত্যাগ করবে, তব ও ওরা আমন্ত্রিত হ'ল না।

একচেটিয়া পুঁজি-ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের উদ্দেশ্যে অন্য রাজনৈতিক কৌশল অনুসরণ করল। পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্টির সংগে জড়িত ভারী শিল্পের মুখপত্র Deutsche Allgameine Zeitung প্রশ্ন করল "এখন কি হবে?" সে দৃঢ় উত্তর দিল : "যে কোয়ালিশন কোথাও, এমন কি ন্যাশনাল-

সোশ্যালিস্টদের মধ্যেও বিরক্তি ছাড়া আর কিছুর জন্ম দেয় না, তার সম্বন্ধে কোন নতুন আপস বা অনন্ত আলোচনা নয়, কারণ কোয়ালিশন আরো বেশী ঘৃণা সংসদে জাগাবে। আমাদের প্রয়োজন দৃঢ়, কার্যকরী সংস্কার। নির্বাচনের, জাতীয় প্রতিবাদের শিক্ষা···এ রকম হবে: ফল শুধু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদেরই বিরোধী নয়, যারা এই সংস্কারের বিরোধিতা করেছে এবং এখন কমিউনিস্টদের ভয় পায়, উপরন্তু সব দল ও সংসদের বিরুদ্ধে এই সংস্কার।"

শ্রেণী সম্পর্কের পটভূমিকায়, এই নীতির অর্থ হ'ল যে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির অস্তিত্বের জন্য জার্মান পুঁজিবাদের মোট ব্যয় বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের এবং বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার পটভূমিকায় খুব বেশী মনে হল। যদিও ওরা এখনি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে নি. তবুও একচেটিয়া কারবারীরা তাদের সহায়তা প্রাপ্ত নতুন রাজনৈতিক শক্তি; ফ্যাসিবাদী ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট দলের উপরে নির্ভর ক'রে আক্রমণ সামলালো।

আক্রমণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফ্রণ্টে যৌথভাবে এগিয়ে চলেছে। নির্বাচনের অল্প আগে. ইস্পাত শিল্পপতিরা কারখানা ও অফিস কর্মীদের গণ-ছাঁটাই ঘোষণা করলেন। বামপন্থী বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই আন্দোলনে একটা রাজনৈতিক উপাদান খুঁজে পেয়েছে।

নির্বাচনের পর জার্মান খনি শিল্পের মুখপত্র Bergwerks Zeitung লিখল. অতি গণতান্ত্রিক এবং সংসদীয়বাদের পদ্ধতি ক্রমশঃ প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ (সর্বাগ্রে বুর্জোয়া অংশ) সংসদীয় কৌশল চায় না, চায় কাজ: তারা সংসদীয় অক্ষমতা চায় না, চায় নিরঙ্কুশ নিশ্চয়তা এবং তাতে প্রচুর বৈচিত্র্য থাকা চাই। তারা জানিয়ে দিল যে, তারা জটিল ব্যবস্থার কিছু জানতে চায় না, 'সমস্যা' ইত্যাদি জানতে চায় না। তারা চায়. একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা আর এমন জাতীয় ঘোষণা যা অত্যন্ত সহজ এবং ঠিক এই কারণেই তার অন্তর্নিহিত কারণগুলি তারা দেখতে পাবে। নির্বাচনের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী চিন্তা জার্মানিতে বজায় থাকবে, বর্তমান রাইখস্ট্যাগ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।"

জার্মান পুঁজিবাদের ভাগ্যের প্রতি এই একমুখী মনোভাব নিয়ে Bergwerkszeitung বুর্জোয়াদের শান্ত ভাব এবং আত্মরক্ষামূলক কৌশলের জন্য দোষারোপ করে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছিল:

শিল্পপতিদের অতিবর্ধিত রাজনৈতিক গতির কাছে আবেদন জানানো ছাড়া কোন উপায় নেই···কঠিন ব্যক্তিত্বের অগ্রগতিতে তাকে প্রকাশ করতে হবে।"

যদি আমরা খনি মালিকদের সংবাদপত্রের এই সংজ্ঞা ব্যবহার মনে করি যে, "রাজনীতি হ'ল ক্ষমতা লোভ," তা হ'লে বড় একচেটিয়া পুঁজিবাদী সংগঠনগুলি তাদের শ্রমিকদের উপরে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আঘাত হানতে চায় এবং যে রাজনৈতিক শক্তিকে তারা সমর্থন করতে চায়, তার পদ্ধতি সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। এটা হ'ল জাতীয়তাবাদী-সমাজতন্ত্র, "জাতীয়তাবাদ" আর "সমাজতন্ত্রের" আড়ালে তার ভয়ংকর প্রকৃতি লুকোনো রয়েছে। অবশ্য, ১৪ই সেপ্টেম্বরের নির্বাচনের ফলে প্রতিফলিত রাজনৈতিক শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস থেকে শ্রেণীশক্তির পুনর্বিন্যাসও বোঝায়, যাতে জার্মান বুর্জোয়া নেতারা স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জটিল রাজনৈতিক ও কৌশলগত সমস্যার মুখোমুখী হ'লেন।

২

শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক বৈষম্যের তীব্রতা জনগণের আরো বড় অংশকে নির্বাচনী যুদ্ধে টেনে আনল। আবহাওয়া সমস্যাকুল হয়ে উঠল। যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রথম রাজনৈতিক যুদ্ধে প্রবেশ করল, তার মধ্যে কুড়ি লক্ষের বেশী লোক সবেমাত্র ভোট দেওয়ার বয়সে পৌঁছেছে এবং প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক আগে আগে নিষ্ক্রিয় ছিল। প্রধানতঃ শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকার ভোটার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়ে গেল। কয়েক জায়গায় (যেমন, থুরিঙ্গিয়ায়) শতকরা একশ ভাগ ভোটারই ভোট দিতে এল। প্রধানতঃ পাতি বুর্জোয়া অধ্যুষিত শহরগুলিতে (যেমন, উইসব্যাডেন) পরিচালিত এক গবেষণানুযায়ী, মেয়েরা অধিকাংশ পুরানো বুর্জোয়া দলগুলি বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দিল। বার্লিন নির্বাচনের পরিসংখ্যান এটাকে আরো প্রমাণ করে। অবশ্য, কমিউনিস্টরা অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশী পুরুষদের ভোট পেল।

নির্বাচনে দেখা গেল যে, পূর্বতন জার্মান বুর্জোযা দলগুলি ভোটারদের বিশ্বাস হারিয়েছে, ব্রুনিং সরকারের দলগোষ্ঠী বা তার সমর্থকদের প্রচণ্ড পরাজয় হয়েছে। যদি ভোটের সংখ্যা এবং সংসদে আসন সংখ্যা দিয়ে শুধু রাজনৈতিক শক্তি মাপা যায়, তাহলে নির্ভয়ে বলা যায়, নতুন সংসদে ব্রুনিং-এর গোষ্ঠী পুরনো সংসদের চেয়ে অনেক দুর্বল। নির্বাচনে ভূ-স্বামীদের ও কিছু শিল্পপতিদের পুরনো দল জার্মান ন্যাশনাল পার্টি'রও অবনতি ঘটল, সে প্রায় কুড়ি লক্ষ ভোট হারাল। যদিও তার ক্ষতির বেশীটাই বহন করল কনজার্ভেটিভ পিপলস পার্টি'র পিজেন্ট ইউনিয়ন ইত্যাদির মত কালগ পাতি-বুর্জোয়া গোষ্ঠীরা, তবুও ওদের প্রভাব যথেষ্ট কমে গেল। তাছাড়া, পুরনো ন্যাশনাল পার্টি'র পতন এবং ছোট স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলির উদ্ভবকে হাল্কাভাবে

দেখলে চলবে না। জার্মান একচেটিয়া পুঁজির প্রধান দল, স্ট্রেসম্যানের পিপলস পার্টি'ও অর্ধেক ভোটার হারাল, সমগ্র ভোটের শতকরা ৪'৫ ভাগ পেল এবং শ্রমিক অধ্যুষিত জেলা ওপেলন থেকে শতকরা ১'৫ ভাগে ভোট। একই অবস্থা হল ডেমোক্রোটিক পার্টি'র। ফ্যাসিবাদের দিকে তার ঝোঁক এবং স্টেট পার্টি' নাম নিয়ে ইয়ং জার্মান অর্ডারে মিশে যাওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন হল না।

এই তিন বুর্জোয়া দলের প্রভাবসংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পাতি-বুর্জোয়ারা দ্রুত ন্যাশনাল ও পিপলস পার্টি'তে বিশ্বাস হারাচ্ছে। নভেম্বর বিপ্লবের পর, পুরনো পুঁজিবাদী দলগুলি ছেড়ে আসা নির্বাচকদের বাধা দিয়েছিল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'। কিন্তু আর চলল না। সেপ্টেম্বর নির্বাচনে দেখা গেল যে, রাজনৈতিক দলগুলির পুনর্বিন্যাসে বাধা ভেঙে গেল, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' কোনক্রমে ১,৩,০০,০০০ ভোট পেল। পরবর্তী ঘটনার পতন দেখা দিল: "ডেমোক্র্যাটরা" ইয়ং জার্মান অর্ডার ত্যাগ করে যেমন আশা করা গিয়েছিল, সেইভাবে স্টেট পার্টি'র অবসান ঘটিয়ে পিপলস পার্টি'র অংশস্বরূপ পুরনো বাসায় ফিরে গেল।

যদি আমরা নির্বাচনী প্রচারের অভাবনীয় উৎসাহ এবং যুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগদানকারী কুড়ি লক্ষের বেশী ভোটারের উদ্ভব যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে স্মরণ করি, তাহলে এই তিনটি বড় বুর্জোয়া দলের পরাজয় আরো ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়। অসংখ্য ছোট ও স্থানীয় দলের উদ্ভব (Deutschides Landvolk, Sachsisches Landvolk, Landbund, Deutschese Bauernpartai, ইত্যাদি) প্রমাণ করে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে তীব্র বৈষম্যে রয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল পাতিবুর্জোয়া *কুলাকদের* অংশ পুরনো দল ছেড়ে শুধু স্থানীয় স্বার্থ বাঁচাতে বৈশিষ্টা প্রথার ভিত্তিতে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়তে চেষ্টা করছে।

ইকনমিক পার্টি'র আপেক্ষিক স্থায়িত্বও একই প্রমাণ দেয়, সে ৮৫.০০০-এর মত ভোট হারালেও প্রায় ১৩,০০,০০০ ভোট পেল ? এই নির্বাচনে যখন ভোটার সংখ্যা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী, তখন যে কোন সংখ্যক ভোট হারানো একটা বিরুদ্ধ প্রমাণ। যে একমাত্র পুরনো বুর্জোয়া দল লাভবান হল (৪০০.০০০-র মত ভোট) সে ক্যাথালিক সেণ্টার পার্টি', কিন্তু সার্মাগ্রকভাবে সেও পিছিয়ে পড়ল, কারণ ১৯২৮-এর নিব াচনে সে পেয়েছিল শতকরা ১১'৯ ভাগ ভোট এবং এবারে শতকরা ১১'৭ ভাগ।

নির্বাচনী এলাকায় লোকসানের পরিসংখ্যানে সেণ্টার পার্টি'র শ্রেণীগত কাঠামোয় অশুভ পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক জায়গায় কৃষকদের কাছে যথেষ্ট ভোট পেলেও, প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানী, যেখানে সে সাংগঠনিক-ভাবে ব্যাভারিয়ান পিপলস পার্টি'র সংগে যুক্ত, শ্রমিক অধ্যুষিত কয়েক জায়গায়

সেণ্টার পার্টির প্রভাব অনেক কমে গেল। যে সব জায়গায় সেণ্টার পার্টির প্রভাব অনেক কমে গেল। সে সব জায়গায় জনগণের বর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা এবং ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় ভোট অনেক কম বলেই সেণ্টার পার্টির পূর্বের অবস্থা রইল না। ভোটার সংখ্যার তুলনায় ভোট সংখ্যা ১৯২৮-এর তুলনায় সেইজন্য অনেক বেশী লক্ষণীয়। ওপেলন, ডুসেল-ডর্ফ-ওয়েস্টের মত শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে অল্প ভোট সত্ত্বেও ক্যাথলিক সেণ্টার ওখানে সমগ্র ভোটের শতকরা ৩, ৫, ৭, বা আরো বেশী হারল। এটা ক্যাথলিক শ্রমিকদের মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্ন, যাদের সেণ্টার খৃস্টান ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করেছিল। তবুও, কিছু ক্যাথলিক শ্রমিক সেণ্টার ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করছিল, পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিক অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির লাভ থেকে তাই মনে হয়, ও সব অঞ্চলে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের ক্ষতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এই লাভ।

২১ মাস ধরে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দলগুলির অধীনে থেকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা যে অন্যায় করেছিল, কয়েক মাস সংসদে অস্থায়ী বিরোধী হয়ে সে দোষ স্খালন হল না, ওদিকে নির্বাচনের সময়ে তাদের সামাজিক বক্তৃতা এবং আরো সহযোগিতার জন্য খোলাখুলি চেষ্টায় তারা ম্যুলার ও ব্রুনিং মন্ত্রী-সভার মধ্যে কোন পার্থক্যের বিষয়ে জনগণকে নিশ্চিত করতে পারল না। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরাই কোয়ালিশন সরকারে যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করেছিল, তারাই মালিকের স্বার্থে মধ্যস্থতা করে হামবুর্গ, রুর্ ও অন্যত্র শ্রেণী সংঘর্ষ ঘটিয়েছিল। তারা বেকার ভাতা কমাবার প্রশ্ন তুলেছিল, সামাজিক জীবন বীমায় আঘাত হেনেছিল এবং প্রত্যেকের উপরে কর বসাবার রাস্তা তৈরী করে-ছিল—এই সব ব্যবস্থা শ্রমিকদের উপরে চাপ সৃষ্টিকারী হয়ে দাঁড়াবে।

উপরন্তু, রাইখস্ট্যাগে তাদের ভোট ব্রুনিংকে বাঁচিয়েছিল এবং তারা নির্বা-চনের আগে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা সহযোগিতা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। মোট কথা, তারা ইয়ং পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংকট ও যুদ্ধ ব্যয়ের পুরো বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে চাপাতে তৈরী ছিল। এই সব কারণে তা ৬০০,০০০ ভোটে হারায় এবং সমগ্র ভোট শতকরা ১৪ ভাগ ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও অন্যান্য বুর্জোয়া পার্টির প্রাক্তন সমর্থকরা এবার এদের ভোট দিয়েছে বলে শ্রমিকদের মধ্যে ওদের ক্ষতি দশলক্ষ মার্কের বেশী।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কোন নিজস্ব এলাকা রইল না। লিপজিগ, ওয়ার্টেমবার্গ, ব্যাডন এবং হেসেন-ডার্মস্টাটে সামান্য লাভ ধর্তব্য নয়, কারণ ১৯২৮-এ ওখানে অনেক বেশী ভোট পাওয়া গিয়েছিল। কার্যতঃ, ওখানে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা যথাক্রমে ১০.১, ৯.৫, ১০.৭ এবং ১.৬ শতাংশ ভোটে হেরেছিল। বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ওদের পরাজয় আরো বেশী। যদি নতুন পঞ্চাশ লক্ষ ভোটদাতাকে ধরা হয়, তাহলে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের হার হয়েছে

বার্লিনে ২৮.২ শতাংশ, ফ্রাংক ফুর্ট অন ওডারে ২৫.৫ শতাংশ, ব্রেসেল-তে ২৮.১, ওপ্পেলনে ২৫.৪, দক্ষিণ ওয়েস্টালিয়ায় ৩১, পূর্ব ডুসেলডর্ফে ২৯.৯ এবং পশ্চিম ডুসেলডর্ফে ৩০.৬ শতাংশ। কৃষি অঞ্চলেও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, যেমন, পূর্ব প্রাশিয়া (৩১ শতাংশ) যেখানে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা লক্ষণীয়ভাবে এগিয়ে গেছে। তাহলে দেখছি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ভেবেছিল, বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে ওরা কিছুটা লাভ করেছে, শ্রমিকদের উপরে প্রভাব হারিয়েছে এবং নিরাপদে বলা যায়, যে, শ্রমিক শ্রেণীর বৃহৎ অংশ কমিউনিস্ট পার্টির দিকে চলে গেল। ১৪ই সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে শুধু দুটো দল—কমিউনিস্ট ও ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা সফল হল। ফলাফল বিচার করে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা, যারা সাধারণতঃ কমিউনিস্ট পার্টিকে গালাগালি দিত, তারা স্বীকার করল যে, "বহু শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে সি পি জি দুর্বল তো নয়ই বরং পুরনো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ে দৃঢ় (ছটি এলাকায়)। এই অপ্রিয় সত্য বিনা ভণিতায় আমাদের স্বীকার করার সাহস থাকা উচিত।" "অপ্রিয় সত্য" হল যে সেপ্টেম্বর নির্বাচন সব শিল্পকেন্দ্রে ইংগিত দিল যে, শ্রমিক শ্রেণী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট থেকে প্রচুর পরিমাণে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে চলে যাচ্ছে।

সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-র সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেল, এখন সে আরো বেশী পাতি বুর্জোয়া উপাদান গ্রহণ করছে, ওদিকে শ্রমিক শ্রেণীর উপরে কমিউনিস্ট প্রভাব বেড়ে চলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির ভোট সব অঞ্চলেই প্রচুর বেড়েছে, বিশেষতঃ শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে, যেখানে শ্রেণী শক্তির পুনর্বিন্যাস খুব বেশী স্পষ্ট। বহু জায়গায় কমিউনিস্টরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। যেমন, ওপ্পেলনে কমিউনিস্টদের মোট ভোট ১১১,০০০ আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিদের ৬২,৭০০, মার্সিবুর্গে ২০৫ এবং ১৬০ হাজার, পশ্চিম ডুসেলডর্ফে ১৭৬ এবং ১১৯ হাজার এবং পূর্ব ডুসেলডর্ফে ৩২১ এবং ১৬৯,৫ হজার। গ্রামের কৃষি অঞ্চলের শ্রমিক এবং কয়েক শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট না হলেও কিছু লাভ কমিউনিস্টদের হয়েছিল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের উপরে তাদের প্রভাব খুব বেড়ে গেল, কয়েক জায়গায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এবং কয়েক জায়গায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের মিলিত প্রভাবের চেয়েও বেশী। বার্লিনের শ্রমিকাঞ্চলে ভোটের ফল অনেক প্রমাণ দেয়, কারণ ওখানে এই দুই দলের মিলিত ভোট কমিউনিস্টদের চেয়ে কম। বার্লিনের সমগ্র ফলে দেখা যায় যে, প্রতি তৃতীয় ভোট কমিউনিস্টদের এবং তাদের মত ভোট কেউ পায় নি (৭৩৮,৯৮৬)।

জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির যে কমিউনিস্ট পরিকল্পনা জার্মান ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংগে লড়বার পথ, ভার্সাই চুক্তি ও ইয়ং প্ল্যানের সংগে লড়বার বিপ্লবাত্মক পথ দেখাল, সে মোট ৪,৬০০,০০০ ভোট পেল।

ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরদের সমর্থক বৃদ্ধি এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে বোঝা যায় যে, শ্রেণী শক্তির বিভেদ দ্রুততর হচ্ছে।

ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের অভাবনীয় সাফল্য (গত নির্বাচনের পরে যারা প্রায় ৭০০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল) এক জটিল বিষয়। পাতি বুর্জোয়াদের বিরাট অংশ, কৃষি শ্রমিক, কিছু কৃষক এবং অনুন্নত শ্রমিক যারা আগে পুরনো বুর্জোয়া ও জাংকার দলকে ভোট দিয়েছিল, তারা নাৎসীদের সমর্থন জানাল। বেশ কিছু যুবক (প্রধানতঃ ভদ্র শ্রমিক) যারা জীবনে প্রথম ভোট দিল, তারাও তাই করল।

সমাজের এই অংশকে অর্থনৈতিক সংকট, বিজয়ী শক্তি ও বুর্জোয়াদের দ্বারা জার্মানীর ওপরে চাপিয়ে দেওয়া ইয়ংপরিকল্পনার কঠিন শর্তাবলী চালিত করেছিল। ভোট ছিল এক প্রতিবাদ, অর্থাৎ জনগণ বর্তমান অবস্থাকে আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্টকে যারা ভোট দিয়েছে, তাদের অধিকাংশ এইভাবে বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও তাদের আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অস্পষ্ট এবং বিভিন্ন—তাদের সামাজিক পটভূমিকার মতই। নাৎসী সামাজিক ও জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা এবং একচেটিয়া কারবারগুলির ঢালাও আর্থিক সাহায্যের ফলে ফ্যাসিবাদী জয়ের উদ্ভব হল।

জার্মান পুঁজিবাদীরা ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসন্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে এক নতুন রাজনৈতিক দলকে উৎসাহিত করছে। তাদের উদ্দেশ্য শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের সংরক্ষক কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রিত করার মত এক প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

নির্বাচনের পরেই Deutsche Allgemeine Zeitung লিখল, "কাজের সময় আর আধঘণ্টা বাড়ালে অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে।" কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার পথকে তৈরী করতে হবে শ্রমিকদের জাগ্রত সামরিক প্রস্তুতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সামনে বিপ্লব আন্দোলনকে হিংসার দ্বারা চূর্ণ করে। ঠিক এইটাই নাৎসী সৈন্যবাহিনী চাইছিল, তারা জাতীয়তাবাদী ভাব প্রবণতায় আঘাত দিয়ে ৬,৫০০,০০০ ভোট সংগ্রহ করেছিল। আন্তর্জাতিক বাজার অস্বস্তিতে পড়ল; একদিকে, নাৎসী ও কমিউনিস্ট জয়কে ব্যাখ্যা করার মত তার যথেষ্ট কারণ ছিল, অন্যদিকে এটাকে শ্রেণী বৈষম্যের চূড়ান্ত ফল এবং জার্মান সংবাদপত্রের চাপ সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া বলা যেত। কিন্তু যে সুদূর প্রসারী নাৎসী বক্তৃতার ফল নির্বাচনে এত বিস্ময়কর হয়েছিল, তা নাৎসী প্রধানদের অস্বস্তিতে ফেলল এবং কয়েকটি বুর্জোয়া গোষ্ঠীকেও অসুবিধায় ফেলল।

Deutsche Allgemeine Zeitung লিখল, "ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা নিজেদের উত্তেজনারই শিকার হয়েছে। আরও কম সংখ্যায় তারা রাইখস্টাগে ঢুকলে ভাল হত। ৫০ বা ৬০টি আসন নিয়ে তারা আরও সহজে অন্তত: অর্থ-

নৈতিক বিষয়ে নিজেদের জায়গা থেকে সরে আসতে পারত। ১০৭টি আসন নিয়ে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা মেনে চলতে হবে, কারণ ঐ সংখ্যাই তাদের বাধ্য করবে।" এটা হল একভাবে নাৎসী আন্দোলনকে বলা যে, সে বরং অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে বক্তৃতা না দিয়ে স্বরূপ প্রকাশ করুক।

বার্লিনে "বিপ্লবী" স্ট্রেসারগোষ্ঠী থেকে হিটলারের বেরিয়ে আসা তাৎপর্য-পূর্ণ : নাৎসীদের একটি ছোট গোষ্ঠী বুঝতে পারল যে, তাদের নেতারা যাদের সংগে যুদ্ধ করছে বলে প্রচার করে, তাদের কাছেই নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। কিছু শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে অসুবিধায় পড়ল : তাদের লক্ষ্য ছিল হিটলারের সব উপ-সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা বন্ধ করায় সাহায্য করা এবং জনগণের মধ্যে প্রভাব যতদূর সম্ভব বজায় রেখে পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার রাজ-নৈতিক হাতিয়াররূপে কাজ করা। Deutsche Allgemeine Zeitung লিখল, "অনেকে ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টকে ভোট দিয়েছে কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল যে, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে হতাশ হওয়া উচিত নয়। সত্যিই যদি ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা ক্ষমতায় আসে, তাহলে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক রূপ প্রকাশ পাবে।" ভারী শিল্পের মুখপত্র ভয় পেল যে, হিটলারও তার সঙ্গীরা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি বিরোধীদের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। সে বলল, "সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা অন্ততঃ একবার সমাজতন্ত্রের সংগে কিছুটা ঘুরেছে, কিন্তু ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টরা সবে শুরু করছে। ওরা দক্ষিণা পর্যন্ত দেয় নি।"

দেখা গেল, শ্রমিক শ্রেণীর সংগে যুদ্ধের জন্য সৃষ্ট হিটলার ও তাঁর কৌশলের কাছে প্রতিশ্রুতির আশা করা হচ্ছে যে, তাঁরা প্রবঞ্চিত জনগণের সংগে তাল মিলিয়ে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী আক্রমণ চালিয়ে যাবেন।

নির্বাচনের পরে Bergwerkszeitudng লিখল, "যারা এই পরিকল্পনায় অংশ নিতে চায়, তাদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত······গত নির্বাচনে যে দলের বৃহত্তম সাফল্য ঘটেছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটা সমান প্রযোজ্য, তারা তখন সংসদীয় পদ্ধতি অনুযায়ী নতুন সরকারে প্রবেশ করবে এবং ইতিমধ্যে সে সম্মতিও দিয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে দেখা গেল যে, জাতীয়তাবাদী-সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র থেকে শক্তি আহরণ করে না, করে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে। যত তাড়াতাড়ি এরা রাজনৈতিক ভাবে দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়, তত বেশী ইহা বজায় থাকার সম্ভাবনা···রাজনৈতিক দিক দিয়ে সহনীয় সীমার মধ্যে। আবার যদি এদের ওপরে কোন দায়িত্ব না পড়ে,···তাহলে কোন না কোন সময়ে এরা আরও সাফল্য লাভ করবে এবং একটা বড় পরিবর্তন ছাড়া রাজনৈতিক দায়িত্ব নিতে পারবে না, কারণ তখন বাহ্যতঃ এদের বিপ্লবীদল হতে হবে, অথচ এখনও এরা রক্ষণশীল আদর্শবাদী মনোভাব গ্রহণ করতে পারে।"

হিটলার প্রস্তাবিত সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন। রাইখস্ট্যাগে যৌথ দল তৈরীর জন্য আলফ্রেড হুগেনবার্গের জাতীয়তাবাদীদের প্রস্তাবের জবাবে

হিটলার গর্বিতভাবে বললেন যে, "তাঁর 'সামাজিক বিপ্লব' পন্থীদলের সংগে হ্যুগেনবার্গের 'সামাজিক প্রতিক্রিয়াপন্থী' দলের কোন সম্পর্ক নেই। নির্বাচনের কয়েকদিন পরে তাঁর শুধু এই টুকুই বলার ছিল। তখনো ক্ষমতার জন্য নাৎসী সংগ্রাম একেবারে প্রারম্ভিক স্তরে ছিল এবং অত তাড়াতাড়ি তিনি আবার নির্বাচনী বক্তৃতা শুরু করতে পারতেন না।

তবু প্রভাবশালী বুর্জোয়া দলগুলি ভয় পেল যে, নাৎসী বক্তৃতা আরো বহুদূর গড়াতে পারে। ফ্যাসিবাদী বিপ্লবের মূল্য খুব বেশী হতে পারে। কনসেলিডেটেড প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং বার্লিনের সর্বোচ্চ আর্থিক ও শিল্পগোষ্ঠীর সংগে ঘনিষ্ঠ চার্লস স্পিয়ার জার্মানীর নির্বাচন দেখে তাঁর একটি প্রতিবেদনে বলেন যে, শিল্পপতিরা ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টদের ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছে, যদিও যে আগুন তারা জ্বালিয়েছে তাতে সব বদলে যেতে পারে।

বুর্জোয়ারা দুঃখিত হয়েছিল, কারণ তারা নির্বাচনে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট সাফল্যের অর্থ বুঝেছিল। স্পিয়ার লিখলেন, বার্লিনের ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা এই মর্মে তারবার্তা পান যে, নিউইয়র্ক, লণ্ডন ও প্যারিস ব্যাংক গোষ্ঠীর ধারণা, কমিউনিস্টরা ১৯২৮-এর চেয়ে ১,৩০০,০০০ বেশী ভোট পেয়ে দারুণ জয়লাভ করেছে। তিনি বললেন, কিন্তু ন্যাশনাল স্যোশালিস্টরা কমিউনিস্টদের বিরোধী এবং হিটলারের জন্য পুঁজি বা সম্পত্তির কোন ভয় নেই।

এটাই জার্মান সরকার পৃথিবীময় জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমনকি হিণ্ডেনবুর্গ পুলিস ও রাইখসওয়ারকে আইনের নির্ভরযোগ্য রক্ষক বলে উল্লেখ করলেন। যে রাইখসওয়ার অফিসাররা সেনাবাহিনীতে নাৎসীদল গড়েছিল, লিপজিগে তাদের বিচারে হিটলারও ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর মনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোন চিন্তা ছিল না এবং সামরিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল "জার্মান জাতির হৃদয়" জয় করার জন্য। হিটলার যদি বলতেন যে, তাঁর ফ্যাসিবাদী তৃতীয় রাইখের অর্থ ঈশ্বরের রাজত্ব, তাহলে কেউ অবাক হত না, কারণ উনি ছিলেন জার্মান পুঁজিবাদীদের সবচেয়ে কলহপরায়ণ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ইচ্ছার রূপদাতা, পুঁজিবাদীরা সব পরিস্থিতি—বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র, প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ঘটাবার সাহস পাচ্ছিল না। ততদিন, নাৎসীবাদ ভিতরে ভিতরে শক্তি দৃঢ় করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে জয় করছিল। নাৎসীরা সৈন্যবাহিনী জয়ের চেষ্টা করছিল এবং নির্বাচনের পরে বৈদেশিক বা অর্থমন্ত্রীর পদ চায় নি (কারণ তাহলে লোকের সামনে অপদার্থতা প্রকাশ পাবে), চেয়েছিল এমন পদ যাতে সৈন্য ও পুলিশের ওপরে নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ইতিমধ্যেই ওরা থুরিঙ্গিয়ার দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া সরকার এবং নির্বাচনের পরে ব্রুন্সউইগের সরকারে যোগ

দিয়েছিল ও পুরনো দক্ষিণপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক বন্ধুদের সংগে এক যোগে স্যাক্সনি-সরকারে উঁচু পদ পাওয়ার চেষ্টা করছে।

ভবিষ্যতের জন্য হিটলার যে কৌশল ছকে ছিলেন, তা এই রকম :

(১) ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টদের রাষ্ট্রযন্ত্রে ঢোকানো ;

(২) সৈন্য ও পুলিশের উপরে দৃঢ়তর প্রভাব বিস্তার ;

(৩) সশস্ত্র দলীয় সংগঠন গড়ে তুলে পীড়নের পদ্ধতি দ্বারা ক্ষমতার পথ তৈরী ;

(৪) লক্ষ লক্ষ ভোটদাতার সংগে যোগাযোগের জন্য প্রসারিত "অতিদলীয়" সংগঠন গড়ে তোলা।

যতদিন জার্মান বুর্জোয়ারা প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের সময় এসেছে বলে মনে করে ততদিনে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা রাষ্ট্রযন্ত্রে এবং বিভ্রান্ত জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক প্রভাব বাড়াতে চায় এবং একই সংগে বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সার্বিক প্রচার চালাতে চায়।

এতদিন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তাদের দলের সর্বস্তরের দাবী সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট দলের সংগে যৌথ ফ্রন্ট-গড়ার কথা ভাবে নি। প্রাশিয়ায় বুর্জোয়াদলগুলির সংগে কোয়ালিশন বজায় রাখার জন্য তাদের চেষ্টা, কার্যতঃ প্রতিক্রিয়াশীল ব্রুনিং সরকারকে বাঁচাচ্ছিল। নির্বাচনে পরাজয়ের পর রাইখস্ট্যাগে ফিরে চরম মুহূর্তে তারা ব্রুনিং মন্ত্রীসভাকে বাঁচাল, উপরন্তু, ৪৮ ধারার জরুরী ভিত্তিতে ব্রুনিং যা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সব তারা অনুমোদন করল. অথচ তারা ভোটদাতাদের কথা দিয়েছিল যে, ব্রুনিং মন্ত্রীসভা ভেঙে দেবে। তাদের এই আচরণের মূল পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সংগে তাদের গোপন আলোচনায়, যার ফলস্বরূপ কার্ল সেভেরিং, এস.ডি পি'-র "কড়ালোক" প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙে ফেলল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের এই সংগ্রাম চলতে লাগল কারখানাগুলিতে। বার্লিনের ধাতু শ্রমিকদের বিশাল ধর্মঘট জানিয়ে দিল যে, বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ এগিয়ে চলেছে। এত বিশাল জনতার সমর্থিত এই ধর্মঘটকে মেনে নেওয়া ছাড়া সংস্কারবাদী ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের আর কোন উপায় ছিল না, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের উদ্দেশ্য ছিল একে থামিয়ে দেওয়া। ব্রুনিং-এর প্রতি সংস্কারবাদীদের সমর্থন এবং সংকটের কুফল ও ইয়ংপ্ল্যানের বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপানোর জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থায় প্রকাশিত রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংগে এই সংস্কারবাদী নীতি জড়িত ছিল।

শ্রেণী শক্তির বিভেদ এবং জার্মান পুঁজিবাদের বৈষম্যের গভীরতা অর্থনৈতিক সংকটে বেড়ে গেল। ১৯৩০-এর অক্টোবরে জার্মান শিল্প তার ক্ষমতার

মাত্র ৫৩৪ শতাংশ ব্যবহার করে। সেই অনুযায়ী বেকারত্ব বেড়ে যায়। সরকারী অর্থব্যবস্থায় প্রচণ্ড সংকট দেখা দেয়, তাতে শিল্প ও কৃষি সংকট বেড়ে যায়। জনগণ ও বেকারদের শোষণ করে ১০০ কোটি মার্কের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য ১৯৩০-এর জুলাই-এর শেষে ব্রুনিং এর জরুরী ব্যবস্থা ছিল সাময়িক প্রতিকার। নির্বাচনের পর সংকট তীব্রতর হল, এর একটা কারণ হল, জার্মানি থেকে ১৫০ কোটি মার্কের বহির্গমন, অথচ ক্ষতিপূরণে মাসিক ২৪ কোটি মার্ক লাগে। ডজ প্ল্যানের "স্বর্ণ আইন" ইয়ং প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে কার্যত: সোনার দাম বাড়ার ফলে ক্ষতিপূরণ ২০ শতাংশ বেড়ে গেছে। অনুন্নত অঞ্চলের দ্রব্যমূল্য জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তার রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াতে বাধ্য করেছে। উপরন্তু, শীঘ্রই যে বৈদেশিক ঋণ ২৭,০০ কোটি মার্কে পৌঁছবে, তা এখনো বেড়ে চলেছে, কারণ, কিছু জার্মান বুর্জোয়া চায় জার্মানির পুঁজি রপ্তানী করে বিদেশী মধ্যস্থতায় জার্মানিতে ফিরিয়ে আনতে, যাতে তারা বেশী সুদ পায়—বর্তমানে এতে বছরে জার্মানির খরচ হচ্ছে ১০০ কোটি মার্কের বেশী। ২০০ কোটি মার্ক ক্ষতিপূরণ ও ১০০ কোটি মার্ক বৈদেশিক ঋণের সুদ—জার্মানির এই বার্ষিক ঋণকে জার্মান বুর্জোয়ারা শ্রমিক শোষণ করে মেটাবার জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন।

শিল্প কৃষি সংকট এবং তার সংগে আর্থিক সংকট আর বাজেট ঘাটতি জার্মান বুর্জোয়াকে প্ররোচিত করল শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান স্বার্থ আক্রমণে। ১৯৩০-এর ১লা ডিসেম্বর ব্রুনিং সরকার ৪৮ ধারার সংগে এক নতুন জরুরী আইন চালু করলেন। ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে চালু এই আইনে সরকারী কর্মচারীদের আরো ৬ শতাংশ বেতন কেটে নেওয়া হল, তরুণ বেকারদের ভাতা বন্ধ করা হল এবং বিভিন্ন স্তরের বেকার, অসুস্থদের সামাজিক বীমা কমানো হল। আইনে আরো বেশী করে ব্যবস্থা করা হল এবং সামাজিক বীমার বোঝা শ্রমিকদের উপরে চাপানো হল।

খুচরো দাম কমানোর প্রচারে বিশেষ ফল হল না। মজুরী হ্রাস, বেশী কর, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত কর, সামাজিক ভাতার অত্যন্ত হ্রাস ইত্যাদির ফলে ১২২৯ সালের তুলনায় ১৭ শতাংশ মজুরী কমে গেল। ব্রুনিং-এর কঠোর আর্থিক পরিকল্পনাকে সমর্থন করে সমাজতন্ত্রীরা সরকারী ও নাগরিক কর্মীদের মজুরী হ্রাসে এবং পরিকল্পনার সেই ধারাটিতে সহায়তা করল যাতে বলা হয়েছে যে, বর্তমান মজুরীর হার "জার্মান অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত বেশী ব্যয়" ঘটাচ্ছে। এই দিক থেকে দেখলে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নের ধর্মঘটে বাধা দেওয়ার ও শ্রমিকদের কারখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল হল ব্রুনিং সরকারকে সমর্থনের এবং শ্রমিকদের স্বার্থে ফ্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যৌথ কাজে কমিউনিস্টদের সংগে সহযোগিতা করতে অরাজী হওয়ার সাধারণ সামাজিক

গণতান্ত্রিক নীতির অংশ। অটো ব্রন যে এক "অপ্রিয় নীতি"কে সমর্থনের আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বুর্জোয়াদের চেয়ে ভাল কেউ জানে না যে, কমিউনিস্ট দলই একমাত্র শক্তি যারা পুঁজিবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে। বুর্জোয়ারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কাজকে অস্বীকার না করলেও ফ্যাসীবাদের উপরেই নির্ভর করছে, এই ফ্যাসীবাদ বার্লিনের ধাতু কর্মীদের ধর্মঘটের সময়ে ধর্মঘট ভংগকারী রূপে নিজেদের কৃতিত্ব পুঁজিবাদীদের সামনে তুলে ধরেছে।

যতই শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হবে এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতাদের "অপ্রিয় নীতি" আরো অপ্রিয় হবে, ততই আরো বেশী শ্রমিক এস. ডি. পি-কে ত্যাগ করবে। ইতিমধ্যে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি ভাবছে কতদিন বক্তৃতা দিয়ে নাৎসীরা জনগণকে ধোঁকা দেবে। Kolnische Volkszeitung লিখল, "সম্ভবতঃ জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের ঢেউ আরো বাড়বে, কিন্তু কমিউনিস্ট তীরে ধাক্কা খেয়ে তার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব।

এখন জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের সংগ্রাম সর্বপ্রধান এবং জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। নাৎসীবাদ জার্মান শ্রমিক এবং সমগ্র জাতিরই প্রধান শত্রু।

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় রাইখ

আগ্রাসন ও পতন

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক অভিসন্ধি

১

জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের নিকটবর্তী ফ্রেবার্গের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় শহরের এক ঔপনিবেশিক কংগ্রেসে, ১৯৩৫-এর জুনে, শ্রোতারা শুনলো ব্যাভেরিয়ান স্ট্যাটহল্টার ফ্র্যান্জ্ জেভার ফন্ এপ্, একজন পাকা জার্মান সামরিক নীতিবাদী এবং পুরোনো ফ্যাসিস্ট রক্ষী দলের সক্রিয় সদস্যের ভাষণ। আর একবার, জার্মানির ঔপনিবেশিক দাবী পৃথিবীর বুকে সোচ্চার হ'ল। প্রায় একই সময়ে, আর এক দূরতম প্রান্তে, জার্মানীর উত্তর-পূর্ব সীমায় কনিগশবার্গ শহরে, অনুষ্ঠিত হ'ল বার্ষিক জমায়েত, সমুদ্র-পারের জার্মান পিপল্স লীগ, একটি নাজি সংগঠন, যার নেতৃত্বে ছিলেন রাদলফ্ হেস্, আলফ্রেড রোজেনবার্গ এবং জোসেফ গোয়েবল্স।

লীগের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে চাউর করে দেওয়া। সুতরাং, দু'টি জমায়েতের একই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়াটা হয়ত বা অনিচ্ছাকৃতই ছিল। তবুও এটা ইঙ্গিতময় ছিল। যখন দু'টিরই মূল লক্ষ্য ছিল, ফ্যাসিস্ট জার্মানীর পরিকল্পনা রূপায়ণ যে পথ ধরে করতে চলেছে তাকে সংকেতায়িত করা। যখন পূর্বাভিমুখী ঝাঁপিয়ে পড়ার খসড়া তৈরী চলেছে—বাল্টিক রাজ্যের অধিকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ তখনই—হিটলারের জার্মানির যে বিপরীত অভিমুখী চক্রান্তের পরিকল্পনা ত্যাগ করে নি তারই লক্ষণ। এর ওপর আবার বিরাট আকারের ঔপনিবেশিক দখলের খসড়া প্রস্তুতও চলছিল।

"কথা হ'ল রূপো, নিস্তব্ধতা আর কাজ হ'ল সোনা," ম্যানফ্রেড সেল্ একটি বইতে লিখেছেন নাজি ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে আলোড়ন জাগাতে। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি নির্ভুল। নাজী জার্মানী কতকগুলি কৌশলীকারণ-বশতঃ এই সংকটে নিজের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষার পরে খুব গুরুত্ব আরোপ করতে অনিচ্ছুক। যে হারেই হোক, সম্প্রতি ফ্রেবার্গের কংগ্রেস তুলনায়

সংবাদপত্রে প্রায় প্রচারহীন রইলো : জার্মান কূটনীতি আগে থেকেই ব্যস্ত ছিল বৃটেনের সংগে নৌঘটিত সমস্যার আলোচনায় এবং স্পষ্টতঃই, নাজি প্রচার পত্র-গুলি ঔপনিবেশিক দাবী তুলে অবস্থা জটিল করে তুলতে চাইলো না, যা আবার চূড়ান্ত বিচারে বৃটেনের দিকেই প্রধানতঃ তাক করা হয়েছিল। জার্মান নৌশক্তির নতুন করে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা স্পষ্টতঃ হয়ে উঠছিল বাল্টিকে ঘাঁটি করে পূর্বাভিমুখী বিস্তার ঘটানোর ইচ্ছে থেকেই। কিন্তু এটা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, নৌশক্তির বিস্তার ঘটানোর নবোদ্যম শুধু সর্বস্তরে পুনর্গঠনের একটা প্রথম পর্যায় মাত্র। নাজি জার্মানীর, যা কিনা অভূত-পূর্ব আঘাত হানবার শক্তি গড়ে তুলছিল, সুদূর বিস্তারী পরিকল্পনা ছিল, পূর্বের দিকে এগুনোর চেয়ে অনেক গুরুতর। তার অন্য লক্ষ্য ছিল এবং উপনিবেশ গঠনের চেষ্টা যা কিনা ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাধা পেয়েছিল তা এর অন্যতমও বটে। নাজিরা পৃথিবীকে নতুন করে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে প্রস্তুত হচ্ছিল।

কয়েক দশক আগে, ২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৪, প্রথম চ্যান্সেলার যুবরাজ ফন্ বিসমার্ক, ঘোষণা করেছিলেন যে, জার্মান সরকার দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার লুডারিৎজ-এর ঔপনিবেশিক সংস্থাকে রক্ষা করবে. এইভাবে দ্রুত বিস্তারলোভী জার্মান পুঁজিবাদের মাথায় চড়ে, যা অন্যদের পরবর্তী কালে ঔপনিবেশিক শক্তির জোটে যোগ দেয় এবং সেই হেতু আরও জোর গলায় খোলাখুলি জায়গা দখলের দাবী জানায়। আনুষ্ঠানিক ভাবে জার্মান ঔপনিবেশিক নীতির জন্ম হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবী এমনিই বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে এবং জার্মানী-পেল সবচেয়ে কম লাভজনক অংশ, যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উপযুক্ততার দিক থেকে বিভাজনের ফলে মূল্য কমে গেছে। এর ফলে ব্যবহারের দিকে, সংযোগ ব্যবস্থার প্রতিরক্ষা সাধন এবং বিপক্ষীয় ঔপনিবেশিক শক্তির সংগে বিরোধ ইত্যাদির ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিল। করদাতাদের পকেট থেকেই উপনিবেশগুলির প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক ও রাজনীতি সংক্রান্ত খরচের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রচুর সরকারী অনুদানের টাকা তুলে নেওয়া হতে লাগল, যা বলা যেতে পারে, উন্নতির পথে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিল এবং যা কিনা ভেবে রাখা সীমাহীন অর্থনৈতিক সুবিধার বদলে ঘটেছিল।

কিন্তু, যে পর্যন্ত না বার্নহার্ড বুলো. তখনকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী, রাইখ-স্ট্যাগে একদিন পৃথিবী পুনর্বিভক্ত করার সাধারণ সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করলেন, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বেড়ে ওঠার সংগে সংগে. তার ঔপনিবেশিক ক্ষুধাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটি স্পষ্টতঃই গুরুত্ব লাভ করল এবং পুনর্বিভাগের ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী এক যুদ্ধের যে খোলাখুলি ধারণা ছিল তা বাড়ছে

থাকা স্থলবাহিনীর শক্তির সংগে একহয়ে বিশাল নৌশক্তি গড়ে তোলার নৌঘটিত নীতির সমর্থন লাভ করল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, জার্মান সরকার, ঔপনিবেশিক নীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বিবাদ আর যুদ্ধে আতঙ্কিত হয়ে ঔপনিবেশীয় আন্দোলনে আর উৎসাহ দেখাল না। প্রথম দিকে এটা চালু করেছিলেন কয়েকজন রাজনৈতিক উন্মাদ, ঔপনিবেশিক দুঃসাহসী এবং হামবুর্গের ধনকুবের। এর আদর্শবাদী নেতারা হলেন মিশনারী আর ধর্মতত্ত্বে পণ্ডিতব্যক্তিরা। ১৮৭০-এর শেষদিকে প্রবন্ধগুলি প্র[illegible]শিত হয়, ঔপনিবেশিক দখলের কথা বলা হয়, ধর্মতত্ত্ব এবং "নীতি" থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক এবং সুপরিকল্পনা পর্যন্ত সব যুক্তি নির্ভর করে, জার্মান প্রচারের ফলে কিছু তফাৎ হওয়া ছাড়া প্রায় একই রকমভাবে যা আজও চালু কিছু অদল বদল করে সম্পূর্ণটাই নাজিরা গ্রহণ করে।

নাজি দখলের পরিকল্পনা, সরকারী নথিপত্রে যেমনভাবে সাজানো হয়েছিল তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরিকল্পিত জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের পুনর্বিভাগের ছকের সংগে মিল রেখেই তৈরী হয়েছিল, যদিও দুটি একেবারে এক নয়। তবু আগেকার ছকটি এত বিস্তৃত ছিল যে, উদাহরণস্বরূপ, এর ঔপনিবেশিক অংশটি এখনও সরকারী পর্যায় গোপন রয়েছে। এটা সর্বসাধারণের মধ্যেই প্রকাশিত ছিল যে, ১৯১৬-তে সরকারের কাছে ঔপনিবেশিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিস্তারিত কার্যসূচীর মধ্যে কয়লা যোগানোর কেন্দ্রগুলির, তার বয়ে নিয়ে যাওয়া পোস্ট এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সংগে সংযোগকারী ব্যবস্থার বাজেয়াপ্তকরণ এবং এর প্রত্যেক জায়গাতে একটি বৃহৎ ঔপনিবেশিক পশ্চাৎভূমি দখলের কথা বলা ছিল। আসলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা একটি বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্বাধীন সামরিক বাহিনী সমেত আফ্রিকার বুকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা লালন করে আসছিল, যাতে, যদি দরকার হয়, ঐ বাহিনী নিজেই যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে দেশের সাহায্য ছাড়াই।

বিশ্বরাজনীতিতে যদিও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের "মহাদেশীয়" নীতি থেকে পরিবর্তন বাঁধা পড়ে গিয়েছিল দূর প্রাচ্যে সুবিধাজনক সমরাবস্থা দখলেই তবু তার ইতিহাসের সর্বত্রই তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ আফ্রিকাকে কেন্দ্র করেছে বরাবর। এর মানে অবশ্য এ নয় যে, অন্য জায়গা তার শোষণের আওতার দৃষ্টি এড়িয়েছে। বছর পনেরোর মধ্যে সে চীনে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অববাহিকার কিছু অংশে যথেষ্ট অনাধিকার প্রবেশ ঘটিয়েছিল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষতঃ ব্রেজিল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'দিক থেকেই এশিয়া মাইনরের প্রায় সর্বত্র। কিন্তু সর্বদাই আফ্রিকায় তার ক্ষমতালাভের লড়াই সবচেয়ে তীব্র ছিল। সেখানকার যে কোন অভ্যুত্থানই নৃশংসভাবে দমিত হয়েছে—তবু জার্মান উপনিবেশবাদীরা

অভিযোগ করেছে যে তাদের সমাজতান্ত্রিক বিপক্ষ—বৃটেন ও ফ্রান্স—একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার পদ্ধতি ঐ একই পরিস্থিতিতে।

আফ্রিকা উপনিবেশে তার শাসনের সিকি শতাব্দীর মধ্যেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদ বহু উপজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনে সমর্থ হয়েছিল, বিশেষতঃ আমরা জানি, বিরাট হেরারো উপজাতিটির ত' বটেই। কিন্তু এই দ্রুত অর্থনৈতিক শোষণ সত্ত্বেও, জার্মানী তুলনায় বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নি। বাণিজ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, তার উপনিবেশ[illegible]ায়তনে, স্বদেশের চেয়ে পাঁচগুণ বড় হয়েও জার্মান অর্থনীতিতে খুব ছোট অংশই অধিকার করেছিল, ১৯১৪-১৮-র বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পনেরো বছরে ৪৬,৬,০০,০০০ মার্ক থেকে বেড়ে মাত্র ৩১৯,১৭০.০০০ মার্কে দাঁড়িয়েছিল। বিদেশী বাণিজ্যে, যদি শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ধরা হয়, তাহলে আফ্রিকা ঔপনিবেশের অংশ তেমন কিছু নয়। বিভিন্ন উপনিবেশীয় উদ্যোগে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার মোট অংক ১৯১২-তে ৫০ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কের স্ফীত চেহারা নেয়। এ সত্ত্বেও, অথবা যথাযথভাবে এই কারণেই, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা অসাধারণ রোখ নিয়ে আফ্রিকা মহাদেশে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য যুদ্ধ চালিয়েছিল। যদিও, আগে যেমন বলেছি, সব মিলিয়ে সেখানে জার্মান স্বার্থের মাত্রা তুলনায় ও বাহ্যতঃ তুচ্ছ, তবু অর্থনৈতিক উন্নতির হার প্রতিশ্রুতিময়। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৬ থেকে ১৯১৩-এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.০০০ হেক্টর থেকে ১,৭৯,০০০ হেক্টর। ঔপনিবেশীয় উদ্যোগে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল তাও এই সময়ের মধ্যে ন'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। রেলপথ বৃদ্ধি পেয়েছিল সর্বাধিক, কুড়ি বছরে, ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে ১৪ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ৪.১৭৬ কিলোমিটার হয়েছিল। বাণিজ্যও, তার গুরুত্বহীন পরিমাণ সত্ত্বেও, এক অসম বৃদ্ধির হার গড়ে তুলতে পেরেছিল। জার্মান ঔপনিবেশীয় নীতি প্রণেতারা যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক কম জার্মানীই স্বদেশ ছেড়ে উপনিবেশের মাটিতে গিয়েছিল। দেশত্যাগের তরঙ্গের চরমে ও হ্রাসে জার্মানী থেকে আগত প্রবাসীরা আবহাওয়ার দিক থেকে আকর্ষণহীন উপনিবেশগুলিকে এড়িয়ে চলেছিল। বেশীরভাগ চলে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুদ্ধের অল্প আগে ব্রেজিলে।

যুক্তভাবে এই সব কারণই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের খুঁচিয়ে তুলেছিল আরও অধিক হারের একচেটে শোষণে, মূলধন রপ্তানী, বাজার বাড়িয়ে তোলা, কাঁচামালের উৎস এবং শেষ কিন্তু অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দিক থেকে মূল্যবান কৌশলগুলি কব্জা করতে। এর উপর তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম চালাচ্ছিল নতুন উপনিবেশ দখল করে নেওয়ার জন্যে। এটা

খুব আশ্চর্যের নয় যে, ঐ পরিস্থিতিতে জার্মানী বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে আফ্রিকা ঘন ঘন তীব্র সংঘাতের জন্মস্থল হয়ে দেখা দেবে যার বুকে আরও বিরাট যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে। লেনিন দেখিয়েছিলেন, এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, প্রধানতঃ এ্যাংলো-ফরাসী জোট "আর একদল পুঁজিবাদীর সম্মুখীন হয়েছিল, যারা আরও লুব্ধ, আরও হিংস্র এবং যারা পুঁজিবাদীদের ভোজসভায় প্রবেশ করেছে যখন আর একটি আসনও খালি নেই, কিন্তু তবুও তারা দখলের লড়াইতে নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলল যা পুঁজিবাদী উৎপাদনকে বাড়াবে উন্নত ধরনের যন্ত্রকৌশল এবং উঁচুস্তরের সংগঠনকে সম্ভব করবে, যা পুরোনো পুঁজিবাদকে বদলে দেবে, সেই স্বাধীন প্রতিযোগিতার পুঁজিবাদকে রূপান্তরিতকরণে বিশাল ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট এবং কারটেলের পুঁজিবাদে।"[১]

জার্মানীর ঔপনিবেশীয় মালিকানা ১২.৩০০,০০০ জন মানুষ অধ্যুষিত মোট ২,৯০০,০০০ বর্গ কি.মি. জোড়া ভূমিখণ্ড ঘিরে যা আসলে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের যতটা দখলে রাখতে চাইত তার চেয়ে ঢের কম। তারা শাসন করত টোগোল্যাণ্ড, ক্যামারুণ, চলতি জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা (টাঙ্গানাইকা), উইলহেলম্ ল্যাণ্ড, বিসমার্ক আর্কিপেল্যাগো, সোলোমন্ দ্বীপপুঞ্জ, সামোয়া, প্যালে, নিউগিনির এক অংশ, কায়াওচাও এবং ক্যারোলিন, মার্শাল এবং মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ। তারা তাদের প্রভাব বিস্তৃত করেছিল বাগদাদ রেলপথের সুযোগে এশিয়া মাইনরেও। পারস্য আর ভারতেও প্রভাব বিস্তার করতে বাড়িয়ে ধরেছিল তারা তাদের থাবা এবং সেই সংগে শ্যাম লাইবেরিয়া, মিশর ও মরোক্কোর ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও। কিন্তু তাদের চাহিদা আরও বেশি এবং তারা তাদের মূলধনকে নতুন জায়গায় লাগাতে, নতুন বাজার তৈরী করে তাতে তাদের পণ্য বেচতে চাইলো এবং কাঁচা মালের উৎস নিয়ে আসল নিজেদের মুঠোয়।

কিন্তু যুদ্ধ ও ভার্সাই শান্তি চুক্তি তাদের পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটালো। এছাড়া, তারা তাদের উপনিবেশগুলি হারালো যেগুলি সংগে সংগে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল বিজেতা দেশগুলির মধ্যে জাতিসংঘের ক্ষমতাবলে। রুয়াণ্ডা এবং উরুন্ডি বেলজিয়ামের ভাগে পড়েছিল, তা বাদে বৃটেনের ভাগে এসেছিল পশ্চিম টোগোল্যান্ড, ক্যামেরুনের কিছু অংশ এবং জার্মান পূর্ব আফ্রিকার (টাঙ্গানাইকা) অধিকাংশ অঞ্চল। পূর্ব টোগোল্যান্ড ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হল এল জার্মান দখলীকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে পরিণত হল। নিউজিল্যান্ড পেল সামোয়া, অস্ট্রেলিয়ার হাতে গেল নিউ-

১। লেনিন সংগৃহিত রচনাবলী, খণ্ড ২০, পৃঃ ৪০৩।

গিনির জার্মান অধিকারভুক্ত অংশ; সেই সংগে ক্যারোলিন, মার্শাল এবং মারিয়ানা জাপানের দাবীভুক্ত হল।

যদিও সে তার সমস্ত উপনিবেশীয় জমিদারী হারালো, তবু জার্মান সাম্রাজ্যবাদ টিঁকে রইল এবং উপনিবেশীয় পৃথিবীর পুনর্বিভাগের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করলো।

২

জার্মানীতে ১৯১৮ উত্তরকালে ঔপনিবেশিক আন্দোলনের উন্নতিকাল প্রায় একই সময়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের তার পরাজয়ের তাণ্ডব থেকে সামলে ওঠার সংগে যুক্ত হয়েছিল। জার্মান বুর্জোয়ারা সামাজিক পরিবেশ থেকেই এটার ইঙ্গিত গ্রহণ করলো কিংবা বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে, সেই মুহূর্তে তার উপনিবেশের দাবীকে স্থগিত রেখে। এটার দরকার হয়েছিল, তার দীর্ঘমেয়াদী খসড়াগুলি ঢেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে, তার অর্থনৈতিক মূল্যায়নের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চেপে রেখে তার ঔপনিবেশীয় নীতির দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখতে কিংবা উল্টোভাবে বললে, অত্যুক্ত চাহিদা তুলে ধরে অল্প কিছু ছাড়া পাওয়ার জন্যে।

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দিকগুলিও এই কৌশলের অন্যতম কারণ ছিল। যেমন, জার্মান সরকার শ্রমিক আক্রোশে খুব ভীত ছিলেন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বুর্জোয়া গোষ্ঠীর পরিচালিত উপনিবেশীয় আন্দোলনকে জোরদার করে তুলবার জন্যে আরম্ভ হওয়া যুদ্ধের প্রথম বছরগুলিতে। উপনিবেশবাদ গোষ্ঠীগুলি নিশ্চয় জানত যে ভার্সাই চুক্তির প্রথমদিকে জার্মান বুর্জোয়ারা খুবই ব্যস্ত ছিল জেগে ওঠা বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে; উপনিবেশ দখলের কথা চিন্তা করার অবসর ছিল না মোটেই। সুতরাং তারা নিজেদের পুনঃসংগঠনের কাজেই নিয়োজিত রইল, ব্যস্ত রইলো নেতৃত্ব শক্তিশালী করে গড়ে তোলায় এবং অল্প কিছু ঔপনিবেশিক স্লোগান পরিস্থিতি অনুযায়ি কেটে ছেঁটে নিয়ে ব্যবহার করতে লাগল।

জার্মান উপনিবেশবাদী গোষ্ঠীর উৎসাহদাতাদের মধ্যে ছিল—বিভিন্ন রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বৈজ্ঞানিক, উপনিবেশীয় শাসনব্যবস্থার অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী, জাহাজডুবীর পর কর্মহীন নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ,—এরা সবাই ছিল বিভিন্ন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের সদস্য। এমন কি অত্যন্ত অনুগতদেরও হারিয়ে, যারা বিগত ৩৬ বছর ধরে শুরু থেকেই নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল এর সংগে, উপনিবেশবাদী গোষ্ঠী এবার কতকগুলি সহযোগী সংস্থার জন্ম দিতে উদ্যমী হল। ১৯২১-এ বিভিন্ন "ঔপনিবেশিক লীগ ও উপনিবেশে আগ্রহী লীগ" নিয়ে একটি কেন্দ্রীয়

সংস্থা গঠিত হ'ল। ১৯২২-এ তৈরী হ'ল ঔপনিবেশিক যুদ্ধে অভিজ্ঞদের নিয়ে আর একটি সংগঠন। ঐ বছরের শরৎকালে উপরে বর্ণিত সবগুলি সংগঠন সমেত একটি মহিলা লীগ, উপনিবেশীয়-সৈন্য-লীগ, একটি উপ-নিবেশীয় অর্থনৈতিক কমিটি, জার্মান জাতীয়তাবাদী ইউনিয়ন, উপনিবেশে বসবাসকারী জার্মানদের জন্যে গঠিত একটি মহিলা রেডক্রশ লীগ এবং একটি জার্মান উপনিবেশ স্থাপন ও ভ্রমণ সংক্রান্ত সংস্থা নিয়ে তৈরী হ'ল একটি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক সমিতি। এদের সংগে যুক্ত হ'ল বাণিজ্যিক সংস্থা, পরিবহণ কোম্পানি এবং শিল্প সংস্থা, যারা আসলে উপনিবেশীয় প্রচারকার্যে আর্থিক সাহায্য যুগিয়ে ছিল এইভাবে, একটি সুসংবদ্ধ এবং অতি উন্নত কলাকৌশল সমেত সংস্থা জার্মান ঔপনিবেশীয় সংস্থার অধীনে গড়ে উঠল।

একই মানসিক গঠন সম্পন্ন বহু বুর্জোয়াদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, ঐ সংস্থা ভার্সাই চুক্তির ঔপনিবেশিক শর্তগুলির বিরুদ্ধে কর্মশীল একটি প্রচার উদ্যমে নেমে পড়ল। আর সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা সরকারী ভাবে গঠন করা হয়েছিল, এই দিকে নির্দিষ্ট হ'ল। বিজেতা আতাঁত জার্মানির ঐ ঔপনিবেশিক দখল হারানোকে, তার সমগ্র ইতিহাসে উন্নত ঔপনিবেশিক নীতির পরিকল্পনায় তার সম্পূর্ণ ব্যর্থতাই কারণ বলে দেখালো। জার্মান বুর্জোয়া ঐতিহাসিক এবং সাংবাদিকদের অনুসরণ করে বলতে গেলে, যারা নিন্দিত যুদ্ধাপরাধের ব্যাপারটিকে ভার্সাই চুক্তি সংস্কার করতে প্রচারযন্ত্র হিসাবে কাজে লাগিয়েছিল এবং নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী করতে চেয়েছিল, এই উপনিবেশীয় সংস্থাটি প্রেস ও অন্য মাধ্যমগুলিকে দেশে ও বাইরে 'ঔপনিবেশিক গুজবে'-এর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালানোর কাজে লাগিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-যুদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি জোর করা। সত্যি বলতে কি, এর প্রচার প্রথম দিকে খাস জার্মানীর মানুষের ওপর অল্পই প্রভাব বিস্তাব করতে পেরেছিল, বাইরের কথা ত' ছেড়েই দেওয়া যায়।

বারে বারে বিজয়ী মৈত্রী চুক্তিব কর্মকর্তারা ভূতপূর্ব জার্মান উপনিবেশ-গুলি লীগ অব্ নেশনের অধিকারে বিধিবদ্ধভাবে ঢুকিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। এটা ছিল পূর্ণভাবে ও আইনগত দিক থেকে সংযুক্ততার ইঙ্গিতের পরিপন্থী, যে ইঙ্গিত জার্মান উপনিবেশীয় সংস্থা বারংবার প্রেসের মাধ্যমে সোজাসুজি ছড়িয়েছে, যখনই ঘটেছে কোন না কোন কারণ। এটা জার্মান 'জন-অভিমত'-এর প্রতিনিধি হিসাবে সরকারকে কাজে নাবিয়েছে: কূটনৈতিক মধ্যস্থতায় আর নিরপেক্ষ প্রতিবাদে। ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে যদিও এটা জাতিসংঘ প্রদত্ত ক্ষমতার ও ঐ নিয়মের বিরোধিতা করেছিল সেটা জার্মানীকে তার ঔপনিবেশিক অধিকার থেকে বঞ্চিত

করার গোপন চক্রান্ত বলে অভিহিত করে, তবু এখন সেই সংস্থাই ঐ নিয়মের একজন নিবেদিতপ্রাণ অনুগামী।

প্রথম দিকে, জার্মান উপনিবেশীয় সংস্থার প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘের নিয়ম ইত্যাদি নিজের কাজে লাগানো। কিন্তু নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়ার এবং উপনিবেশীয় ক্ষমতা জাতিসংঘের অধিকারে ভাগ হয়ে যাওয়ার আগে অন্যান্য স্বার্থজড়িত শক্তিগুলি জার্মান সরকারকে দিয়ে বিশ্ব সম্মেলনে অন্ততপক্ষে কিছু একটা নিয়ম ইত্যাদির প্রচলনের জন্যে আরও জোরদার আপীল করাতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার ছিল শক্তিহীন। যে অদূর ভবিষ্যতে উপনিবেশগুলিকে আবার হস্তগত করবার অধিকার অর্জন করছে এ ঘোষণা ছাড়া আব কিছুই করতে পারল না। প্রচার অভিযানের উদ্যোক্তারাও সত্যিকারের কিছু ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করে নি। তারা শুধু এইটুকু চেয়েছিল দেখাতে যে, যদিও পরাজিত জার্মান বুর্জোয়া অনবনত এবং শক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত, শুধু উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছে যখন তারা তাদের দখলকে প্রকাশ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে।

জার্মান উপনিবেশীয় সংস্থার পিছনে থাকা পুঁজিবাদী গোষ্ঠী বৃটিশ কিংবা ফরাসী উদ্যোগ ঐ মেনডেটকে সম্পূর্ণ সৎ যুক্তিতে বদলে দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন ছিল। যখন শোনা গেল, ফ্রান্স টোগো আর ক্যামেরুণ নেওয়ায় উদ্যত, আসন, সংস্থাটি রাইখস্ট্যাগে প্রতিবাদ গড়ে তুলল এবং নিয়মমাফিক দাবী উত্থাপিত হল যে ম্যানডেটের নিয়ম সম্মানজনকভাবে মেনে চলতে হবে।

এছাড়া, সংস্থাটি সাহায্য আর সুবিধার হস্ত প্রসারিত করলো ম্যানডেটের অধিকার ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী জার্মান প্রজাদের দিকে এবং ঔপনিবেশীয় বাণিজ্যে নিক্ষেপে উদ্যত জার্মান পুঁজির উদ্দেশ্যে।

কিন্তু মোটামুটিভাবে, উপনিবেশ অধিগ্রহণের ব্যাপারটি যুদ্ধোত্তরকালের প্রথমদিকে আদর্শ হয়ে দেখা দিয়েছিল, যখন বৈপ্লবিক সংঘাত চূড়ান্ত যখন জার্মানী মুদ্রাস্ফীতির কবলে, যখন তার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বার মুখে এবং বুর্জোয়া গোষ্ঠী বিজেতা দেশগুলির সংগে যে কোনও মূল্যে বোঝাপড়ায় আসতে চায় জেগে ওঠা বৈপ্লবিক স্রোত কাটিয়ে উঠবার জন্যে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক সমস্যা অত্যন্ত তুচ্ছ ভূমিকাই গ্রহণ করতে পেরেছিল, অন্ততঃ তা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ছিল। এটি ঔপনিবেশিক আন্দোলনের নেতাদের কৌশলকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তারা Wilsonism-এর নীতিগুলির প্রতি আবেদন জানিয়েছিল, কৌশলের দিক থেকে যা চালু শক্তি সাম্য ও জার্মান বুর্জোয়াদের অবস্থার পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যাদের সামরিক ও নৌশক্তি অনেকখানি যুদ্ধে অবক্ষয়িত হয়েছিল। সেদিনের কৌশলী আওয়াজ হল: জাতি সংঘকে সাহায্যের মধ্য দিয়ে উপনিবেশীয় নীতির পরিবর্তন করা হোক।

নিশ্চিতভাবেই, এমনকি ক'টি বিশেষ বুর্জোয়া গোষ্ঠী সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক শাসনের প্রথম ও দুর্বল পদক্ষেপে উদ্যমী হয়েছিল। সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই, জার্মানী তাঁর বাণিজ্যিক বন্ধন অন্য দেশের সংগে নতুন করে গড়ে তুলতে এবং বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে একটা চুক্তিতে আসতে অগ্রসর হল যার মধ্য দিয়ে তার ঔপনিবেশিক স্বার্থের একটা স্পষ্ট ইংগিত প্রতিফলিত হচ্ছিল।

উপনিবেশীয়গোষ্ঠীর সংগে জড়িত জার্মান প্রেস, জার্মান জাহাজ চলাচল সংস্থাগুলির অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হামবুর্গ আমেরিকা লাইন ও তার আমেরিকার সহপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে নতুন চুক্তিটিকে প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের গুরুত্বপূর্ণ আঘাত বৃটিশ নৌচলাচল ব্যবস্থার উপর বলে স্বাগত জানাল। ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে বৃটেন একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তবুও সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল জার্মানীর মুদ্রাস্ফীতির সময়ের শিল্পপতি Hugo-Stinnes-এর বিশেষ কয়েকটি বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নেদারল্যাণ্ডে একটি বিশেষ উপনিবেশীয় সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা, যার লক্ষ্য হবে পূর্ব আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ। কম প্রতিষ্ঠাশালী শিল্প গোষ্ঠীগুলি চেষ্টা চালাচ্ছিল আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে ফরাসী ও বেলজিয়াম পুঁজির সহায়তায় কিভাবে শোষণ করা যায়। এর উপর, বিশেষ কিছু জার্মান পুঁজিবাদী ঘাঁটি আমেরিকার সহায়তায় কিভাবে হামবুর্গ ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করছিল। এইসব এবং আরও অন্য তথ্য ফরাসী উপনিবেশ প্রেসের খবর অনুযায়ী দেখা যায় যে মার্কিন পুঁজিপতিদের সংগে এ্যাংলো-ফ্রাংকো-বেলজিয়ান প্রভাব ঠেকাবার জন্যে একটা চুক্তিতে আসার চেষ্টা চলছিল। ফরাসী প্রেসের খবর অনুযায়ী, জার্মান-মার্কিন এই গোষ্ঠীগুলি বিশেষ কিছু নিগ্রো সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল যাতে ভবিষ্যতে কোন উপনিবেশ দখলের বেলায় তাদের সমর্থন লাভ করা যায়। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, মার্কিন মিশনারীরাও, যারা বেলজিয়ান কঙ্গোতে তাদের কর্মব্যস্ততা বাড়িয়ে তুলেছিল, আসলে তারা ছিল জার্মান এজেন্ট মাত্র। এটা সত্যি যে, এইসব সংবাদ, যার কিছু আবার সত্যি মজার হতে পারে, উপনিবেশের নতুন মালিকদের বানানো। ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক শাসনকর্তা এবং উপনিবেশীয় সংস্থার প্রধানদের অন্যতম এক Hons Zache জার্মান গবেষকরা আফ্রিকার তখনকার মারাত্মক রোগ স্লিপিং সিকনেসের যে প্রতিষেধক বার করেছিলেন তার খবর, জার্মানী তার উপনিবেশগুলো আবার ফিরে পাওয়ার আগে পর্যন্ত গোপন রাখতে চাপ দিচ্ছিলেন যদিও তা, নতুন মালিকদের বর্মে এতোটুকু আঁচড় লাগাতে পারত না। তা সেই ধরনের "সতর্কতা" কাউকেই বিচলিত করে নি এবং আমরা যদি তার উল্লেখ করি এখানে তাহলে

তা শুধু এইটাই দেখাবে যে জার্মান বুর্জোয়ারা সে সময়ে কত অক্ষম ছিল।

১৯২৩-এ বুর্জোয়াদের পক্ষে এক সংকটময় এবং বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণ, যখন এক নতুন বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘনিয়ে উঠছে, উপনিবেশ দাবীর কথা শোনা যাচ্ছে না আর, শুধু জার্মানীর ও বাকি পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় স্থিতাবস্থা লাভের পর দ্বিগুণ হয়ে সোচ্চার হওয়ার অপেক্ষায়। পূর্বের আদর্শের এবং একবারে ফেলে রাখা চাহিদা তখন ক্রমশঃ অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ ও ঔপনিবেশিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে তাতে কলমে কাজের মধ্যে দিয়ে উৎখাৎ হয়ে যাচ্ছিল। বছরের শেষদিকে জার্মান শিল্প সংস্থাগুলো আবার পূর্ব আফ্রিকার মাটিতে কাজে লেগে পড়ল। ফ্র্যাংকলিন নামে একজন বৃটিশ কর্ণেল বলেছেন যে ১৯ ৫-এর গোড়ার দিকে অন্তত দশটি বৃহৎ জার্মান রপ্তানিকারক সংস্থা আগেকার জার্মান-পূর্ব-আফ্রিকায় প্রচণ্ডভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে, যাতে যুদ্ধে ছিঁড়ে যাওয়া যোগাযোগ আবার গড়ে তোলা যায়, বিশেষতঃ সেইসব জায়গায় যেখানে তারা আগে একচেটে কারবার করত— প্রধানতঃ টাঙ্গানাইকা।

উপকূলবর্তী স্থানে বিশেষ করে জার্মান শিল্প সংস্থাগুলি পুরনো ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে প্রধানতঃ খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে পুনরায় বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। জার্মানীতে প্রস্তুত লেখা লোহা ও ধাতব পদার্থ আফ্রিকার বাজারে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলো—বৃটিশ আমদানী ধাক্কা খেতে লাগল, বারো মাস সময়ের মধ্যে তা প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেল। জাঞ্জিবারে বিশেষ অগ্রগতির চেষ্টা না হলেও, সেখানকার জার্মান ব্যবসায়ী তাদের এজেন্ট ও দালালদের তৎপরতা বৃটিশ শাসনকর্তাদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠল, ১৯২৫-এর প্রথম তিন মাস কেনিয়া আর উগাণ্ডায় আমদানী উপরের দিকেই ছিল। বাণিজ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ছিল বৃটেনের হাতে এবং দেখা গেল তার ভাগ যেন আর বাড়ছে না। তবু জার্মানীর শতকরা ৫ ভাগ (আয়তন এমন কিছু নয়) একটা উন্নতির আভাস দিল (শতকরা ৭ ভাগের মত)। যাই হোক, জার্মানীর বৃটেনের পর দ্বিতীয় স্থান (প্রধানতঃ রপ্তানির জিনিস ছিল, ধাতববাসন আর তুলোর জিনিস)।

১৯২৫-এর বৃটিশ সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে, টাঙ্গানাইকায় সর্বাধিক আমদানীর ক্ষেত্রে জার্মানীর স্থান তৃতীয়। কিন্তু যদি হল্যাণ্ড থেকে আগত পণ্যদ্রব্য (জার্মানীতে তৈরী) হিসাবে ধরা হয় তাহলে, বোধহয় ভারতবর্ষ আর জার্মানী মিলে তাদের স্থান হবে দ্বিতীয়, (পুরো আমদানীর শতকরা ১৭ ভাগ) প্রথম বৃটেনের পরই (শতকরা ৩৯ভাগ)।

পুঁজিবাদীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত চাঞ্চল্যহীন বছরগুলোর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, জার্মানী অর্থনৈতিক দিক থেকে যেখানেই আইনের দিক

থেকে নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব- হয়েছে তৎপরতা চালিয়েছে। ১৯২৭-এ সে আগের বছরের চতুর্থ স্থান থেকে তৃতীয়ে উন্নতি করেছে টাঙ্গানাইকার আমদানীকারিদের মধ্যে, বৃটিশ প্রেস বিপদের সংকেত পেল যখন. এর ওপর, জার্মানী ধাতব বাসনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো. স্পষ্টতঃই বৃটেনকে টেক্কা দিয়ে যাওয়ার বাসনা নিয়ে। জার্মানীর অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ তার আগেকার উপনিবেশ, দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার বুকেও বোঝা যাচ্ছিল ; যখন এদিকে মোট আমদানী বিশ দশকের শেষের দিকে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে—আর জার্মানীর বখরা তিনগুণেরও বেশি।

যদিও নতুন শাসনকর্তারা চিন্তিত, তবং ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের কাছে খোয়া যাওয়া উপনিবেশগুলোতে ঘাঁটি গড়ে তোলার জার্মান প্রচেষ্টা খুব কমই সফল হল। কারণ জার্মানীর যোগাযোগ বা যাতায়াত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে এই সব উপনিবেশগুলিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফরাসী ক্যামেরুন ও টোগোর বেলাতেও তাই। তবু এই নিষেধ সত্ত্বেও, তাদের ব্যবসায়িক মূলধনে জার্মানীর অংশ ছিল শতকরা ১০ ভাগ এবং যদিও ফরাসীরা খুব দৃঢ়তার সংগে জার্মান দ্রব্য এবং পুঁজির স্রোতকে ঠেকাতে চাইছিল, তবু জার্মান ব্যবসা উন্নতির লক্ষণই দেখাতে লাগল।

ভার্সাই চুক্তির মীমাংসার অল্প পরেই যে সব উপায় নেওয়া হ'ল তখন সেগুলো নীচের ঘটনা দিয়েই বোঝা যাবে : ফরাসী কর্তৃপক্ষ কোন জার্মান মালবাহী জাহাজকে টোমো বন্দরে প্রবেশ করতে দেবে না এবং সেই সংগে যে কোন জাহাজকে- যাতে জার্মান পতাকা উড়বে- ধরে নেওয়া হবে আইনলঙ্ঘনকারী বলে এবং সেইভাবেই তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যখন একটি নরওয়ের পতাকা চিহ্নিত জাহাজ বন্দরে ভিড়লো তাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হল যেহেতু সেটি একটি জার্মান সংস্থার ভাড়া করা ছিল।

কিন্তু পুরোনো জার্মান সংস্থাগুলো খুব তাড়াতাড়ি এই সংকট মানিয়ে নিল। যেখানে তাদের পূর্বের জায়গা ফিরে পেতে দেওয়া হল না, তারা সেখানে অন্য পথ দেখলো—জিনিস তৈরী করতে লাগল বিদেশী ট্রেড মার্ক এবং ঐ জাতীয় নামের আড়ালে। এ ব্যাপারে কিছু ঔপনিবেশিক শিল্প সংস্থার কাছে কৌতূহলজনক প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

জার্মান টোগো সংস্থা, উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, "অত্যন্ত বেদনার" সংগে তাদের অংশীদারদের জানালো যে, "দীর্ঘদিনের দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা এখন কবরের তলায়।" কিন্তু পরিস্থিতি অন্যভাব নিলো। জার্মান সরকার আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে সংস্থার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির দরুণ টাকার সাহায্য দিতে লাগল। আর শেষোক্ত সংস্থাটি চটপট কলম্বিয়ায় তাদের সহ প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত হয়ে ব্যবসা সরিয়ে ফেলল। তার কলম্বিয়ার উদাম, প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, একরকম লাভজনকই, টোগোর প্রতি এতটুকু আসক্তি

কমায় নি। জার্মান কৃষকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারকেই, যারা পূর্বের ক্যামারুনে কর্মব্যস্ত ছিল এবং পুনরায় ব্যবসা চালু করলো ১৯২৫-এ এদের মধ্যে বিশেষত: Oliwe Pflanzungs Gesellschaft. ক্যামারুনের ভূতপূর্ব জার্মান সম্পত্তির বিরাট অংশ লণ্ডনে বিক্রির জন্যে দেওয়া হল এবং এইভাবে সেগুলো জার্মানদের উদ্ধার করলো, বিশেষত: A. Borsig, একটি বিরাট জার্মান একচেটে শিল্প সংস্থা। ঔপনিবেশিক উদ্যমের লভ্যাংশকে সরকারী হিসাবে দেখানো হল "living up to expectations," এবং অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মান পুঁজি ক্যামেরুন থেকে টোগোতে ছড়িয়ে পড়লো।

জার্মান পূর্ব আফ্রিকা সংস্থা, অন্যতম বৃহৎ জার্মান শিল্প সংস্থা, দ্রুত নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাপখাইয়ে নিলো। জার্মানী যে তার উপনিবেশগুলো হারাবে তা বুঝতে পেরে এটি পূর্বাহ্নেই চাইলো উৎসের সঞ্চয়কে তখনকার জাতিসংঘের অধীন অঞ্চলে নিয়ে আসতে। একাধিক রাইন ব্যাংক সহযোগিতায় এটি জার্মান সরকারের কাছে আফ্রিকায় হারানো সম্পত্তির জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবী করলো। ভর্তুকি পেল বটে, যদিও তা দাবী করা অর্থের চেয়ে পরিমাণে কম ছিল, তবু তারা কিছু বৃটিশ মূলধন যোগাড় করতে সমর্থ হল এবং ছড়িয়ে পড়লো টাংগানাইকা এবং বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা থেকে পর্তুগিজ পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে। যখন ১৯২৬-এ বিরাট কফিক্ষেত্রে দখল (প্রধানত: টাংগানাইকাতে) পাওয়ার সুযোগ এলো তখন এই সংস্থা নতুন শেয়ার ছাড়লো এবং অল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে গেল সহযোগী সংস্থা। কিন্তু যদিও এটি বৃটিশ পুঁজি আত্মসাৎ করেছিল তবু সংস্থাটি প্রধানত: যুক্ত ছিল Darmstadt ব্যাংকের সংগে।

Otavi Minen-und Eisenbahn Gesellschafts-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে যে এর ব্যবসা উঁচুর দিকেই ছিল, কারণ এর অধিকার বৃটিশ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকার অনুমোদন লাভ করেছিল।

তবু, এমনকি যুদ্ধোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ বছরগুলিতেও, জার্মান ঔপনিবেশিক উদ্যম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল মূলধনের অভাবে। উপরতলার জার্মান ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীগুলি ব্যাংকগুলির স্বার্থকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছিল। তারা বিদেশী, সবার উপর আমেরিকান, বিভিন্ন ধরনের মিলিত উদ্যমের মূলধন যোগাড় করতে লাগল। নিউ ইয়র্কে কেন্দ্রায়িত ইউরোপীয়ান কোয়ারস্ ইনকরপোরেটেড ও অন্যান্যদের মধ্যে জার্মান ব্যাংকগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় চলত। বড় বড় শিল্প সংস্থার সৃষ্ট অন্যান্য সংস্থা জার্মান উপনিবেশীয় গোষ্ঠীগুলির সংগে যুক্ত থাকলেও ওগুলি মিলিত উদ্যমের একটি বিশেষ গঠন, প্রধানত: এ্যাংগোলা এবং মোজাম্বিকের পর্তুগিজ উপনিবেশগুলি জুড়ে।

এ্যাংগোলা ছিল একটি আকাঙ্ক্ষিত উপনিবেশ। গোপন চুক্তির মাধ্যমে

দু'বার ১৯১৪-১৮ র যুদ্ধের আগে বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে এটি পর্তুগালের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা ঠিক হয়ে ছিল। যুদ্ধের পরেও লোকার্ণো এবং জাতি সংঘের ব্যাপার নিয়ে এ্যাংলো জার্মান চুক্তির সময়েও এমন ইঙ্গিত ছিল যাতে এ্যাংগোলা কোন না কোনভাবে জার্মান উপনিবেশে পরিণত হয়। জার্মান বুর্জোয়া প্রেস এর ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা চালিয়েছিল। কিন্তু যদিচ বৃটিশ হাবভাব বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও জার্মানীর খোলাখুলি আন্দোলন পর্তুগালকে সতর্ক করেছিল ; সে এ্যাংগোলায় জার্মান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ফুলে ফেঁপে ওঠায় বাধা দিতে শুরু করলো। উপনিবেশগুলির ভিতর প্রবেশ করা বেশ মুশকিলের হয়ে দাঁড়ালো, বিশেষতঃ সেগুলির কর্তৃত্ব কার্যতঃ আমেরিকার হাতে থাকার কারণে, যেমন সিনক্লেয়ার অয়েলের ব্যাপার। তবুও জার্মানী সেখানে যথেষ্ট শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হল। ব্যাংক অব এ্যাংগোলা, প্রধান জার্মান শিল্পসংস্থা, কৃষিসংস্থা এবং কয়লা খনি সংস্থার সংগে যুক্ত, যদিও সেটি পূর্বে ওলন্দাজ ছিল, বর্তমানে ফরাসী প্রেসের বক্তব্য অনুযায়ী প্রধানতঃ জার্মান স্বার্থের সংগে জড়িত। কিন্তু জার্মানীর হাতে আরও অনেক তুরুপের তাস তখনও রয়েছে—মোজাম্বিক, স্প্যানিশ গিনি, ফারনান্দোপু ইত্যাদি। আগেকার সম্পত্তির অনেকটা আবার টোগোর বৃটিশ অংশে, ক্যামেরুনে এবং টাঙ্গানাইকায় ফেরৎ পাওয়ার পর জার্মান পুঁজি বেশ সুচিন্তিত পদ্ধতি ধরে এইসব জাতি সংঘ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। Deutscher Afrikadienst নামের একটি বিশেষ সংস্থা কাজে নেমে পড়ল শুধু এই জরুরী কারণে। Ostasiatischer Verein-এর খবর থেকেও দেখা যায় যে জার্মান পুঁজি দূর প্রাচ্যেও ফেঁপে উঠছিল, বিশেষতঃ চীনেতে, যদিও স্পষ্টতঃই এর কোনও কল্পনা ছিল না কিয়াওচাও আবার দখলের এবং সে ভাল করেই জানত যে চীনের সাম্রাজ্যবাদী হাতাহাতির মধ্যে যুক্ত হয়ে কোনও লাভ নেই।

সংক্ষেপে, বিশদশকের শেষ দিকে যখন জার্মান পুঁজিবাদ তুলনায় ভালভাবেই কাজ করছিল এবং আংশিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যখন জার্মান বুর্জোয়া গোষ্ঠী এক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণের জন্যে শক্তিসঞ্চয় করতে শুরু করেছে ঠিক তখনই জার্মানীর ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডানা মেলতে শুরু করলো।

সামরিক দিক থেকে দুর্বলতা একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর অভাব এবং তারচেয়ে বড় একটি নৌবাহিনীর অভাব নিয়ে জার্মান বুর্জোয়া গোষ্ঠী একটি আগ্রাসী ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণে সমর্থ হতে পারছিল না। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তখনও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে পৃথিবীকে, বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক বিশ্বকে নতুন করে ভাগ করে ফেলার যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত ছিল না। সে যতরকম সুযোগ পাওয়া যায়, উপনিবেশগুলির উপর

অর্থনৈতিক দখল কায়েম করতে তাই গ্রহণ করতে লাগল এবং নিজের পরিস্থিতি আরও জোরদার ও বিস্তার করে তুলবার উপায় ঠাউরাতে লাগলো। Schacht এর ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা এ ব্যাপারে একটি খুব অকাট্য পদক্ষেপ। এর নতুনত্ব হল এই যে, জার্মানী কখনোই অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে তার উপনিবেশগুলি দখল করার বা একটি স্বাধীন ঔপনিবেশিক নীতি পরিচালনার কথা আশা করতে পারে না। Schacht দেখিয়েছেন যে, জার্মানীর উপনিবেশীয় স্বার্থ এ পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবেই অর্থনৈতিক এবং তা একটি আন্তর্জাতিক উপনিবেশীয় সংস্থা গঠনের ইঙ্গিত করেছে যার মাধ্যমে জার্মান পুঁজি আগেকার জার্মান সম্পত্তি শোষণ করতে সক্ষম হতে পারে। তিনি এমনকি এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে উপরের সারি ব্যাংকগুলির সংগে সরাসরি চুক্তি করার কথাও বলেছেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, কারণ, জাতিসংঘের অধীনস্থ অঞ্চলগুলির দখলদাররা নিজেদের শাসিত অঞ্চলগুলি জার্মানীর হাতে ছেড়ে দিতে কোনমতেই রাজি ছিল না। জার্মানীতেও ঐ পরিকল্পনাটি খুব জোরের সংগে সমালোচিত হল কারণ ভূমি মালিকরা এবং বুর্জোয়ারা যাদের সমুদ্রপারে বিশেষ কিছু স্বার্থ জড়িত পরিস্থিতি দানা বাঁধেনি তখন, একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল যে দেশ বড় ধরনের ঔপনিবেশিক তৎপরতায় মোড় নেয়। একই সংগে আবার যারা ঔপনিবেশিক পুনরভ্যুত্থানের সমর্থক ছিল তারাও এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি নয় যেহেতু এটি তার লক্ষ্যকে শুধু অর্থনৈতিক দিকে সীমিত করেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে আবার গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন জোর দেয় নি।

ইতিমধ্যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সংগে সংগে সমস্ত ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার উপর রাজনৈতিক প্রলেপ বেড়ে উঠতে লাগল। ১৯২৪ থেকে শুরু করে জার্মান যুদ্ধোত্তর কালের পুঁজিবাদের ইতিহাসে সে এক পরিবর্তনের দিন। ঔপনিবেশিক প্রশ্ন তখন বুর্জোয়া প্রেসে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। জার্মানীর ঔপনিবেশিক রঙ্গমঞ্চে পদার্পণের ৪০তম বর্ষে, প্রেস পূর্বের জার্মান উপনিবেশগুলি পুনর্দখলের সমর্থনে এক প্রবলতর প্রচার অভিযান চালু করলো।

১৯২৪-এর এপ্রিলে যখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সংঘ জাতি সংঘের কাছে এক তারবার্তায় জার্মানীর উপনিবেশগুলি ফেরৎ পাওয়ার দাবী জানালো, তখন সেই অর্থহীন দাবী প্রায় সবাই উড়িয়ে দিল। কিন্তু ক্রমশঃ জার্মান ঔপনিবেশিক দাবী আন্তঃসরকারী চুক্তির মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগলো। ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীগুলি ক্রমশঃ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। রাইখস্ট্যাগ নির্বাচনে তারা চেষ্টা করল তাদের সমর্থকদের তুলে ধরার। দাওয়েস পরিকল্পনার সময়, তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল এই বলে যে, এটি নাকি সরকারীভাবে ঔপনিবেশিক প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছে। যাই

হোক, এটা স্পষ্টই ছিল যে, দাবীটি লাভজনক প্রশ্নের ভিত্তিতেই উত্থাপিত হয়েছিল। নীতি-নির্ধারকরা জানত যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আবার শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে এবং এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হ'ল দখলদার বাহিনীর হাত থেকে জার্মানীকে মুক্ত করা। জার্মান সরকার এই উপনিবেশ পুনঃ অধিকারের দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানাল বটে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যে এটির বিষয়টি আলোচিত হ'তে পারে, তা মনে করল না।

দাওয়েস পরিকল্পনা গ্রহণের সংগে সংগে জার্মান ঔপনিবেশিক প্রচার বৃদ্ধি পেল। এর মূল নির্দেশ ছিল যে, শুধু উপনিবেশগুলিই একা জার্মানীকে সস্তা কাঁচা মাল যোগান দিতে সক্ষম, আর যার ফলে বৃহৎতর রপ্তানীর পথ খুলে যাবে—দাওয়েস পরিকল্পনা সফল করার একমাত্র পথ। ঔপনিবেশিক নীতির পক্ষে ঐটাই ছিল প্রধান যুক্তি এবং একটি জার্মান ব্যাংক সম্মেলনও এই একই যুক্তির পক্ষে রায় দিল।

যতদিন না বৃটিশ চেষ্টা জার্মানীর ক্ষেত্রে "লোকার্ণো নীতি" গ্রহণে সফল হ'ল, ততদিন সরকারী পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার একটি উদ্দেশ্যই ছিল, ঔপনিবেশের প্রশ্নটি। যবনিকার আড়ালে সরকারীভাবেও বোঝান হচ্ছিল যে, বৃটেনের কাছ থেকে টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনের ব্যাপারে একটা সুবিধাজনক চুক্তি আশা করা হচ্ছে। প্রেসেও এমন খবর ছিল যে বৃটিশ কূটনীতি জার্মান দূতকে ঔপনিবেশিক উপহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠকাতে চেয়েছিল। যদিও এটি কোন সোজাসুজি প্রতিশ্রুতির কথা ধরে নি। এরপর, উপযুক্ত বৃটিশ গোষ্ঠীগুলি এর কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিল এবং সে আদর্শগত সহানুভূতির মধ্যে নিজেকে সীমিত করে ফেলল।

জাতি সংঘে জার্মানীর যোগদানের পর কমিটির মধ্যে একটি জার্মান প্রতিনিধি দল এল যারা জাতি সংঘের অধিকৃত ঔপনিবেশগুলি ভাগ করে দেওয়ার ভার হস্তান্তর করল। এর মধ্যে দিয়ে এটাই স্পষ্ট হ'ল যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বেড়া শক্ত করে বেঁধে নিয়ে, জার্মান বুর্জোয়া গোষ্ঠী দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তার ঔপনিবেশিক দখল কায়েম করতে চাইল। যুদ্ধের পর ক'বছর যে জার্মান উপনিবেশীয় সংস্থা অস্পষ্টভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, এখন তাই একবারে রাজনৈতিক প্রসিদ্ধির তুংগে এসে দাঁড়ালো। যখন গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, বৃটেন আগে-ভাগেই জার্মান পূর্ব আফ্রিকা তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সংগে যুক্ত করতে চায়, তখন ঐ সংস্থা জাতীয়তাবাদী থেকে গণতান্ত্রিক সমস্ত জার্মান রাজনৈতিক দলের সাহায্যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করল যাতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পুনরুত্থান বাস্তবায়িত করতে পারে এরকম একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা সম্ভব হয়। একটি ঔপনিবেশিক খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশিত হ'ল ১৯২৮-এ, ছাপা হল বহু ঔপনিবেশিক সংগঠন, বিভিন্ন মালিক ইউনিয়ন এবং উপর তলার জার্মান একচেটে পুঁজিপতিদের

স্বাক্ষর সমেত। এর আশু সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি জোটে জার্মানীর পুনরায় স্থানলাভ এবং এটি কৌশলগত দিক থেকে আত্মরক্ষামূলক হলেও এর একটি আক্রমণাত্মক দিকও ছিল। এটি পূর্বের জার্মান ঔপনিবেশগুলি সমেত জাতি সংঘের অধিকৃত জায়গার দখলদার শক্তিগুলি বিরোধিতা করেছিল এবং জার্মানীর উপনিবেশ অধিকার করে থাকার পুরোন যুক্তিগুলি পচা আবর্জনা ঘেঁটে বার করেছিল—যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার ফলে নতুন জায়গার আশু প্রয়োজন। নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎস আর খাদ্যের যোগান। সব শেষ, পরিকল্পনাটি কম বেশি প্রকাশ্যভাবেই যুদ্ধের পর থেকে এই প্রথম ঘোষণা করল, আসলে সাম্য বলতে জার্মান বুর্জোয়ারা যা বুঝতো : ঔপনিবেশীয় বিশ্বের এক পুনর্বিভাগ।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পেশী যত শক্ত হয়ে উঠতে লাগল তত বিরুদ্ধ ঔপনিবেশিকদের মুঠো আলগা হয়ে যেতে থাকল। জার্মান বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরে জার্মান ঔপনিবেশিক নীতির ব্যাপারে মত পার্থক্য ছিল, কিন্তু একটি ব্যাপারে সবাই ছিল একমত যে, এটি অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন স্তরে আলোচিত আসল কিংবা কল্পিত যুক্তিগুলি আমাদের কাছে আসল আগ্রহের বস্তু নয়। আমাদের আগ্রহ সেই সব কৌশলগত দিক যেগুলির উদ্ভব জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আশু ও দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা নির্ধারণের বিভিন্ন প্রশ্নে। এটা যদিও ঠিক যে, কেউ কেউ এমনও ছিলেন যাঁরা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে পূর্বের জার্মান ঔপনিবেশগুলি কত অসহায় ছিল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার কথা আশংকা করে পুনরায় উপনিবেশ দখলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে লাগলেন। তারা এই সব ছাড়া আর একটি জিনিসের কথাও তুলে ধরলেন যে, জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনের প্রকাশোন্মুখ ঢেউ উপনিবেশীয় দেশগুলিতে নতুন অযাচিত এবং অদৃষ্টপূর্ব ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে খাস জার্মানীর বুকে শ্রমিক বিপ্লবকে উৎসাহিত করার মতই বাজে পরিস্থিতি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সম্মুখীন হতে পারে। এই মতগুলি যার কিছু আড়াল আবডালে কিছু একেবারে নগ্ন, শান্তিবাদীদের অনাবশ্যক অত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে বেশ ভাল ভাবেই এমন সব লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল যারা একদিকে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিতে ভয় পেত এবং অন্যদিকে পাতি বুর্জোয়াদের চাপে পড়ে এ ব্যাপারে যে মূলধন বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক ব্যয় আবশ্যক তার বিরোধী ছিল।

বেশী শক্তিশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি, বিশেষত: রাইন শিল্প সংস্থার সংগে জড়িত গোষ্ঠীগুলি, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে জাতি সংঘ অধিকৃত উপনিবেশের হয়ে পরিশ্রম করাটা যুক্তি যুক্ত হবে বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু তা বলে উপনিবেশগুলির পূর্ণ দখলের পরিকল্পনা—চরম,

রাজনৈতিক যে উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলা নয়। এরই মধ্যে আবার চরম দক্ষিণ-পন্থীরা সব রকম সন্ধি প্রস্তাব অনুপযুক্ত মনে করলো এবং সম্মানের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানীর জাতি সংঘ অধিকৃত অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার ওপর জোর দিতে লাগল। চরম জাতীয়তাবাদীদের, প্যান-জার্মান আন্দোলনের একদা প্রাণ কেন্দ্র, দৃষ্টিতে যদি জার্মানী অধিকৃত উপনিবেশগুলির ব্যাপারে সম্মতি দেয়, তা হলে সেটা হবে এক রকমের বিজেতা-শক্তির "লুণ্ঠন কে" সমর্থন করারই সামিল। তাদের মতে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশই যুক্তিসংগত এবং প্রকাশে৷ ঘোষণা করা যে জার্মানীর, নিজেকে আবার ঔপনিবেশিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে. সামনে যুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

কিন্তু, বিভিন্ন গোষ্ঠী উপনিবেশ বিস্তৃতির সেই মুহূর্তের ঝুঁকির ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিল, যদিও এক নজরে তা আশ্চর্য মনে হতে পারে। তারা এমন এক নীতির আশ্রয় নিতে চাইল যাতে সবচেয়ে কম রাজনৈতিক ঝুঁকি এবং সর্বাধিক অর্থনৈতিক সুরাহা। তারা জানত যে. রাজনীতি যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ এবং তার লভ্যাংশকে গোড়া জাতীয়তাবাদী ও অতি স্বাদেশিক স্লোগানের পেছনে তারা খরচ করতে রাজি ছিল না। যাদের স্লোগান হ'ল. এই মুহূর্তে জার্মানীকে সব ফিরিয়ে দিতে হবে, যা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই গোষ্ঠীগুলি. হামবুর্গ ও ব্রিমেন রপ্তানীকারক সংস্থাগুলির সংগে জড়িত, বিশেষ অর্থে যথেষ্ট সংযত সতর্ক ছিল। বিশেষ কতকগুলি শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থার দ্বারা জড়িত হয়ে এই সংযম ও সচেতনতা কৌশলগত দিক থেকেই বিশেষতঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের মত. আরও উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই ভাল. স্বাধীন ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপের পূর্বে. কারণ অপরিণত চেষ্টা হয়ত নষ্ট করে ফেলবে সে সুযোগ অবশ্যম্ভাবী-ভাবে যা একদিন দেখা দিত। তাছাড়া, সতর্ক রাজনীতিক বুঝেছিলেন যে. জার্মান বুর্জোয়াদের পক্ষে অধিকৃত উপনিবেশের সংগে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে বিভিন্ন দিকে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলা আরও লাভজনক হবে।

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা. জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মাথা চাড়া দেওয়াই ঔপনিবেশিক ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুললো এবং একটা সাধারণ প্রচারের থেকেই উপনিবেশ দখলের প্রশ্নটি অত্যাবশ্যক রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হ'ল, আর তা বুর্জোয়া কণ্ঠে. যার উদ্দেশ্য ছিল সামরিক ও কৌশলগত পন্থার মাধ্যমে জার্মানীকে যাতে আবার সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

স্বাভাবিক ভাবেই, বিভিন্ন ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা ক্রমশঃ জার্মান বৈদেশিক নীতির কাঠামোর সাথে জুড়ে যেতে লাগলো। জার্মান সাম্রাজ্য-

যাদের মধ্যে বিপরীত ধর্মী প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। ঐ প্রচারের মধ্যে দিয়ে এবং উপনিবেশগুলি ফিরে পাওয়ার বাস্তব চেষ্টা জার্মান অর্থনীতির অবনতির কালে (১৯২৯-৩৩) কমার চেয়ে বরং দ্বিগুণ হয়ে উঠলো এবং উপনিবেশ গুলিতে অর্থনৈতিক বিস্তার এই সময়ে রীতিমত বাধার সম্মুখীন হয় (পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক বিশ্বে জার্মান বাণিজ্য সেই কালে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল)।

দাওয়েস পরিকল্পনার ব্যর্থতা নতুন দাবী আদায়ের সুযোগ হয়ে উঠলো। যদিও ব্যাপারটি কখনও সরকারী পর্যায়ের কূটনীতিতে না উঠলেও, সেটি শক্তিশালী আধা-সরকারী গোষ্ঠীর সমঝোতার মধ্য দিয়ে উত্থাপিত হচ্ছিল বারংবার। যেমন ইয়ং পরিকল্পনার প্রারম্ভিক পর্বে অর্থ ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন। Schacht, যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিশেষত: ব্যাংক ও শিল্প জগতে, নতুন দাবীর কথা রেখেছিলেন। তিনি ক্ষতিপূরণের টাকা দেন এই শর্তে যে, জার্মানী তার নিজস্ব ঔপনিবেশিক কাঁচামালের যোগান আদায় করবে, যা কিনা তৈরী এবং উন্নত করে তোলা যেতে পারে জার্মান উৎপাদন, পুঁজি এবং জার্মান দায়িত্বের মাধ্যমে। তাঁর খসড়া চাপা পড়ে গেল, সত্যি, জার্মান সরকার বাধ্য হ'ল ইয়ং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে, Schacht-এর শর্ত যাই থাকুক না কেন।

বিশ্বের সমস্যাকুল মুহূর্তে, জার্মান ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা একেবারেই রাজনৈতিক সমস্যার চেহারা নিল, স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলগুলি, বিশেষত: জার্মান উপনিবেশীয় সংস্থা কর্তৃক তীব্রভাবে সোচ্চার হয়ে উঠতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে, প্রায় সবগুলি বুর্জোয়া গোষ্ঠীই একটা ঔপনিবেশিক আন্দোলনের সমর্থন জানাচ্ছিল। রাইখস্ট্যাগে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারায় বকবকানীতে ভরা তর্কের আয়োজন চলছিলই। জার্মান বুর্জোয়াদের নাজি এবং অতি জাতীয়তাবাদীতে রূপান্তরের সংগে সংগে পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে সহজাত প্রতিশোধ স্পৃহা উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং পুরানো বুর্জোয়া দলগুলি তাদের ক্ষমতার মুঠো দৃঢ় রাখতে বেপরোয়া হয়ে দ্রুত জাতীয়তাবাদীদের পথ মাড়িয়ে এগোতে এবং গণ আন্দোলনকে বাড়িয়ে তুলতে চায় যা কিনা নাজীদের কাম্য ছিল।

ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সর্বোচ্চ গুরুত্ব না পেলেও যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল। Von Papen-এর ফ্যাসিস্ট সরকার ঔপনিবেশিক গণ্ডগোল চাপা দিতে চেষ্টা করছিল সে সময় Papen গোপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও বৃটেনের সংগে পরিকল্পনা চালানোয় ব্যস্ত ছিলেন এবং সরকারীভাবে জার্মানীর আগেকার উপনিবেশসংক্রান্ত প্রশ্নটি তোলার তার কোন সাহস ছিল না। কিন্তু তিনি দেশে বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে আশ্বাস দিলেন যে, সে দিনের আর দেরী নেই যখন সরকার এ ব্যাপারে অংশ নেবে এবং 'জায়গার' দাবী জানাবে। ঔপনিবে-

শিক প্রশ্নটি, দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়ার মুখে, লক্ষণ হিসাবে, কিছু পরিমাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে সম্পর্কের প্রশ্নটির সংগে জড়িত ছিল। উঠতি জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, মেহনতী মানুষের উপর প্রচণ্ড ও প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে অগ্রসর এবং নাজিগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন যোগাতে আগ্রহী. যে গোষ্ঠী চরম প্রতিক্রিয়াশীল. সমরবাদী, তখন আরও তীব্রভাবে পৃথিবীর পুনর্বিভাগ দাবী করছিল। যেহেতু জাতীয় সমাজতান্ত্রিকরা. যারা ব্যাপারটার একটা হিংস্র বর্ণনা দিয়েছিল, শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, ঔপনিবেশিক আন্দোলনের সরকারী মুখপাত্ররা হিটলারের সাথে যোগাযোগ করতে সুরু করল, যার অন্তিম বোঝাপড়া জার্মান উপনিবেশ ফেরৎ পাওয়ার জন্য এক যুক্ত রাজনৈতিক চেষ্টার চুক্তিতে শেষ হল। নাজী গোষ্ঠী ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা খাতে নতুন উৎসাহের জোয়ার আনল—সে ব্যাপারের দূরতম আনাচ কানাচ, পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে। উপনিবেশ হয়ে উঠল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের এক মূল বাস্তব লক্ষ্য।

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকট ভার্সাই চুক্তির এক প্রধান শর্ত অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটির উপর কালির দাগ টেনে দিল। ফ্যাসিস্ট প্রচারপত্রে "জার্মানীর জন্য সমতার" শ্লোগান, সাম্রাজ্যবাদীদের জার্মানীর স্থল ও নৌশক্তি লাভের অন্তরায় সব বাধা দূর করে ফেলবার দৃঢ় সংকল্পেরই ইঙ্গিত করল। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কাছ থেকে আগত শ্লোগান আসলে এক নতুন সশস্ত্র বিশ্বজয়ের আদর্শগত হুংকার ছাড়া কিছু নয়। নাজি সরকার খুব তৎপরতার সংগে উপনিবেশকে তার বৈদেশিক নীতির কৌশলী লক্ষ্য হিসাবে তুলে নিল।

ক্ষমতায় আসার আগে নাজি দল নিজেদের প্রাচ্য অভিমুখী শক্তি, সোভিয়েত বিরোধী লড়াইয়ে দল বলে ঘোষণা করেছিল এবং এখন উপনিবেশের প্রশ্নে নিজেদের কর্মসূচী তৈরী করে নিল। হিটলার তার Mein Kampf-এ বলেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ জার্মানীর আঞ্চলিক সীমানা প্রাক-যুদ্ধকালীন সীমানার চেয়ে যথেষ্ঠ অন্য ধাঁচের হবে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি তার কাজকে শুধু পূর্বের জার্মানীর সীমানার মধ্যেই গড়ে তোলার কাজে সীমিত রাখবেন না। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি ঔপনিবেশিক অধিকারের প্রশ্নটি, জার্মান ঔপনিবেশিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেতারা পূর্ববর্তী সময়ে তার কাছে যেমন আশা করেছিলেন তার চেয়ে অন্যভাবে তিনি ভেবেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল, জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যা হারিয়েছে তাই শুধু ফেরৎ পাওয়া, কিন্তু, হিটলার চাইলেন প্রাকযুদ্ধকালে ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়িক নীতিগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন। তিনি "নতুন ভূমি দখলের" প্রতিজ্ঞা করলেন এবং সোজাসুজি যা বোঝাতে চান তা বললেন: "আমরা যখন ইউরোপে নতুন

ভূমির কথা বলি তখন আমাদের অবশ্যই প্রধানভাবে রাশিয়া এবং তার সীমান্ত দেশগুলির কথা ভাবতে হবে।"

এই পূর্বাভিমুখী অভিযানের পরিকল্পনা, বাল্টিক দেশসমূহকে জার্মান প্রভাবের ঘাঁটিতে পরিণত করার চক্রান্ত, উক্রাইনকে একটি উপনিবেশে পরিণত করার এই লোভই ছিল নাজি বৈদেশিক নীতি এবং সমর চিন্তার প্রধান বিষয়। প্রসঙ্গতঃ, ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট পার্টি ও উপর সারির জার্মান উপনিবেশীয় সংগঠনের মধ্যেও নাজিরা ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই এটা ছিল আলোচনার বিষয়। ঔপনিবেশিকদের ভয় ছিল যে, এই পূর্বাভিমুখী অভিযানের বাড়াবাড়ি সম্পূর্ণ না হলেও হয়ত খানিকটা ঢেকে দেবে তাদের ঔপনিবেশিক প্রশ্নটিকে, তাদের অক্লান্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যটিকে। নাজি প্রেস তক্ষুণি তাদের আশ্বাস দিল যে, যেভাবেই হোক, নাজীগোষ্ঠী "পূর্বের ব্যাপারটা" উপনিবেশিক নীতির সংগে জড়িত করবে না।

কথাটা সত্যি। Mein Kampf-এ হিটলার, পূর্বাভিমুখী অভিযানটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার দ্বারা আফ্রিকা বা অন্য উপনিবেশ দখলের চেষ্টাকে বাতিল করেন নি। অত্যাধিক জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান হিসাবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের প্রস্তুতি চালানোর মধ্য দিয়ে তার সর্বাভিমুখী অভিযানের ইচ্ছাকে স্পষ্ট করেছিল। ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট পার্টির বক্তব্যানুযায়ী: "আমরা আমাদের জনসাধারণকে খাওয়াতে এবং অতিরিক্তদের বাসস্থান দিতে অন্য দেশ এবং ভূমি (উপনিবেশ) দাবী করি।" ১৯৩১-এ একটি বিশেষ প্রস্তাবে হিটলার দেখিয়েছেন তার দল কাজ করবে "প্রধান জার্মান উপনিবেশ ফেরৎ পাওয়ার জন্য," তিনি বলেছিলেন: "আমরা বাসস্থান ও আমাদের অর্থনীতিকে সাহায্যকারী ঔপনিবেশিক উৎপাদন ও কাঁচা মালের জন্য সমুদ্রপারের উপনিবেশের গুরুত্ব অস্বীকার করি না। কোন কিছুতেই আমরা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য উপনিবেশ দখল ত্যাগ করব না, কেননা সেটাই আমাদের উপর বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সফল করবে।" কিন্তু তিনি একথাও আবার বলতে লাগলেন যে, ইউরোপের কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেইসংগে, উপনিবেশসংক্রান্ত প্রশ্নটি সাধারণ দিক থেকে বিশ্বের পুনর্বিভাগের ব্যাপারে বিশদ করে বলা হত এবং যার প্রথমেই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। নাজিরা ভূমি সমস্যা সমাধানের দুটি সম্ভাব্য রাস্তা দেখিয়েছিল।

একটি রাস্তা, যদিও প্রধানটি, প্রাচ্যের উপনিবেশে রূপান্তর—"প্রাচ্যনীতি" যার নাজি সংজ্ঞা হল: "বর্তমান পূর্ব সাম্রাজ্যের সীমান্তের বিস্তৃতি।" এর অর্থ হল, অভিযান চালানো, নতুন ভূমি জুড়ে নেওয়া আর উক্রাইন এবং বিস্তৃত রাশিয়াকে দাসত্বে বাধ্য করা।

অন্য পথটি হল, সমুদ্র পারের ঔপনিবেশিক নীতি। প্রধান আঘাতকে পূর্বের দিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে, স্থির রেখে হিটলার ঔপনিবেশিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে সাবধান করেছিলেন, যা সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নোংরামী ও প্রচারযন্ত্র হিসাবে পরিশ্রমের সংগে ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী ব্যবহার করতো। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় ফিরে গিয়ে নাজি প্রকাশন দেখালো যে জনসংখ্যার দিক থেকে উপনিবেশগুলি আশানুযায়ী কোন সুরাহা হয়ে উঠতে পারে নি—যুদ্ধের আগে মাত্র ৫,০০০ শ্বেতাঙ্গ বাস করতো জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় এবং তার পরবর্তী পনেরো বছরে ৭,০০০ দাঁড়ায়, আর জার্মান অনুপ্রবেশের ফলে যে তা যথেষ্ট বাড়বে তার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এটা আশা করা যায় না যে, ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে লক্ষ কিংবা এমনকি শত বা হাজার জার্মানের জায়গা হবে। খুব বেশি হলে ঐ সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার দাঁড়াতে পারে। নাজিদের মতে উপচানো জনসংখ্যার মোটা অংশই এখনও জয় করতে বাকি, যে পূর্ব ইউরোপ তা উপনিবেশে পরিণত করবে।

এর মানে অবশ্য এ নয় যে নাজিদের, এমনকি একেবারে প্রথমদিকেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের কোন ইচ্ছে ছিল না। তারা প্রথম থেকেই উপনিবেশের দাবী করে আসছিল, তাদের যুক্তি ছিল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপনিবেশগুলি কাম্য। যদি ঐ সব উপনিবেশগুলিতে জার্মান মানুষ নাও পাঠানো যায় অন্ততঃ জার্মান পণ্য ত' পাঠানো যাবেই এবং জার্মানী যদি কাঁচামাল চায় (রবার, তুলো, চামড়া ও ঐ জাতীয় জিনিস) তার রপ্তানী বাড়াতে, তাহলে সে সব জিনিসের জন্যে উপনিবেশগুলি হবে উপযুক্ত উৎস। শেষ হলেও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তাদের মতে, যদি জার্মানী খাদ্যদ্রব্য চায়, সে ক্ষেত্রেও উপনিবেশগুলি কোকা, চাল, মেজ, কলা, চা, তামাক, কফি, গোমাংস ইত্যাদির যোগান দিতে সক্ষম। এ সব যুক্তিই, চিরাচরিত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও সংস্থাগুলির ঔপনিবেশিক নীতির সংগে মিলে যায়। কিন্তু নাজিরা সেগুলো এমনভাবে আবৃত করেছিল যাতে, তা অর্থনৈতিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর স্বার্থকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষের সুর বাঁধা নাজি সংগঠন জোর চাপ দিচ্ছিল যে, ঔপনিবেশিক নীতিতে এগোনোর পূর্বে জার্মানীর দরকার অনেক, অনেক বেশি অস্ত্র কি মাটিতে কি সমুদ্রে। ইউরোপে একাধিপত্যের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের ক্ষেত্রেই নয় শুধু পৃথিবীর এক নতুন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুনর্বিভাগের যুদ্ধের জন্যেও বটে একটি শক্তিশালী পদাতিক বাহিনী গড়ে তোলার নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরও প্রত্যক্ষ কারণে একটি

প্রথম শ্রেণীর নৌশক্তি গড়ে তোলার নাজি প্রচেষ্টা পরের উদ্দেশ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে।

ঔপনিবেশবাদের একজন ফ্যাসিস্ট সমর্থক, ম্যানফ্রেড সেল লিখেছেন, "স্বদেশের সংগে সমুদ্র পারের উপনিবেশের যোগাযোগ সমস্ত ঔপনিবেশিক নীতিরই মূল লক্ষ্য।" "যদি এই যোগাযোগ সাময়িক ভাবে ছিন্নও হয়, শুধু নৌশক্তিই তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করবে। ঔপনিবেশিক নীতির একটি প্রাক পর্বই হ'ল নৌশক্তি।"

যাই হোক, এই অ্যাডমিরাল টারপিট্জের ফ্যাসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী সমর নৈতিক-পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন কিম্বা পুনঃপ্রদর্শন ছিল না। জার্মান নৌবাহিনীর সৃষ্টি করেছিলেন যে টারপিট্জ তাঁর ধারণা ছিল যে, জার্মানীর তার বৃটিশ প্রতি পক্ষের ওপর টেক্কা, দিতে হ'লে চাই সর্বাগ্রে এক-প্রথম শ্রেণীর নৌশক্তি। তাঁর মতে, জার্মানীকে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজের অংশ বাঁচতে হয় তাহলে বেশ কিছুদিনের জন্যে পূর্ব ইউরোপে তার আক্রমণাত্মক সজ্জা ত্যাগ করতে হবে। নাজিদের ছিল একেবারেই অন্য দৃষ্টিভঙ্গী এবং তারা পুরোনো উইলহেলমীয় নৌসজ্জার নীতিকে উড়িয়ে দিত। তাদের মত হল, অ্যাডমিরাল টারপিটজের অধীনে উচ্চ-হারে নৌবাহিনী গঠন একেবারেই অযৌক্তিক। ১৯৩৫-এ কৃত এ্যাংগলো-জার্মান চুক্তির পর তৈরী হিটলারের নৌ-পরিকল্পনা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নৌবহরের নিষ্ক্রিয়তার কারণে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সমস্যার অপসারণ মানসে খসড়া করা হ'ল। নৌবাহিনী আবার গড়ে তুলে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আবার তার বিশ্বযুদ্ধে হারানো উপনিবেশগুলি ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় মাতলো। কিন্তু তাহলেও তার লক্ষ্য বস্তুর তালিকার নিচের দিকে ছিল এর স্থান; তার ঔপনিবেশিক দাবীর মূল লক্ষ্য তখন নতুন উপনিবেশ পত্তন।

নিঃসন্দেহে, আরও বেড়ে ওঠা সামরিক ও নৌ-বাহিনী, জার্মানীর উপনিবেশ দখলের ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলবে, যদি তা শুরু থেকেই সংযত ছাড়া আর সব কিছুই ছিল। সত্য, নাজিরা এটা নিয়ে খুব বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে নি, কারণ তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এ নিয়ে ঘাঁটাতে চায় নি। তারা আগে থেকেই তাদের ইউরোপীয় এবং বিশেষতঃ সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনার সাড়ম্বর প্রচারে খুবই ব্যস্ত ছিল। তবুও নাজি প্রেস প্রতিষ্ঠাপন্ন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত জাতি সংঘ অধিকৃত উপনিবেশগুলি যে মোটের উপর অকেজো হবে একথা ঘোষণা করতে কখনও ক্লান্তিবোধ করে নি। কারণ, ঐ দাবী ঔপনিবেশিক নীতির লক্ষ্যকে সংকুচিত করবে। সেল বলেছেন, "জার্মান ঔপনিবেশিক নীতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। এর ধারক ও বাহকরা, বনেদী ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী, বিশেষ করে জার্মান উপনিবেশীয়

সংস্থা, আশা করেছিল যে শান্তিপূর্ণ মতবিনিময়ের মাধ্যমে ভার্সাই চুক্তির ঔপনিবেশিক পর্যায়ে একটা সমাধান সম্ভব হবে। সমস্ত আশা জাতি সংঘকে ঘিরেই দানা বেঁধে ছিল।"

নাজি জার্মানী জাতি সংঘের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রইল। সে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে ভ্রূকুটি করল। ম্যানফ্রেড সেল লিখছেন, "জার্মান উপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা জাতি সংঘকে ঘিরে একটা বাজে দিবাস্বপ্ন মাত্র এবং এবং জার্মানীর জাতি সংঘ অধিকৃত উপনিবেশ ফিরে পাওয়ার মতই বাজে আশা। কোন অধিকৃত উপনিবেশই মুক্ত নয়, এবং কোনটাই মুক্ত হবে না কোনদিন।" তিনি পুনরায় তুলে ধরলেন অতি আক্রমণাত্মক গোষ্ঠীর গবেষণার ফসলকে : অধিকৃত উপনিবেশ জার্মানীর সমস্যার সমাধান করবে না। কারণ, এর ফলে হয়ত জার্মানীকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাক-যুদ্ধ উপনিবেশ-সীমানা মেনে নিতে হবে, যখন কিনা পুনর্বিভাগের পরিকল্পনাকে নাজিরা সযত্নে লালন করে আসছে।

জার্মান ফ্যাসিবাদ তার ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার ওপর প্রচুর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। নাজিদের ধারণা ছিল তাদের জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদের আদর্শ প্রচার, তাদের জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সমর-রাজনৈতিক বিভবময় সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট কাজে দেবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাসকে স্বদেশে বাড়িয়ে তোলা এবং যুদ্ধ ও প্রতিশোধের প্রচারমূলক আগুনকে জিইয়ে রাখাই সব নয়। নাজিদের ধারণা ছিল যে, একবার যদি তারা একটি শক্তিশালী পদাতিক ও নৌ-বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যদেশের সাথে আলোচনার সময়ে তারা লাভজনক চুক্তিতে তাদের ঔপনিবেশিক দাবীকে কাজে লাগাবে, সম্ভাব্য বন্ধুদের এবং পুঁজিবাদী গোষ্ঠীভুক্ত অবশ্যম্ভাবী শত্রুদের প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে। নাজি প্রেসের বিশ্বাস যে, এই বেড়ে ওঠা জার্মান সমরবাদের ওপর নির্ভরশীল প্রচার যথেষ্ট উন্নতির সহায়ক। নাজি-ঔপনিবেশিক নীতির উদ্দেশ্য, যার উপর তারা যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করতো, অনেক বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল এইভাবে তার পূর্বের অবস্থার চেয়ে, যদিও কৌশলগত কারণে সরকারীভাবে কোন প্রকাশ্য বিবৃতিতে এই ব্যাপারের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না। আগে জার্মানীর হওয়া চাই একটি বিশিষ্ট সামরিক শক্তি যে কিনা তার গলার স্বরকে যতদূর ইচ্ছে জোরালো করতে এবং তা শুনতে বাধ্য করতে সক্ষম হবে। সেল বলেন, "ঐ লক্ষ্য আজকের অথবা আগামীকালের নয়। এটি সময়সাপেক্ষ। কিন্তু··· একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট হওয়া চাই, যখন আমরা ওটি পালন করতে শুরু করব। সময় এখন অধিকৃত উপনিবেশ মালিকদের পক্ষে। জার্মানীর গড়িমসি করা করা উচিত নয়, কারণ বিলম্বই পরিস্থিতিকে আরও সহায়ক করে তুলবে না।"

সত্যিই যেদিন থেকে জার্মানী ক্ষমতায় এল, নাজিগোষ্ঠী তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিল, তার ভূমি, আকাশ আর নৌ-বাহিনীর নীতিকে অনুসরণ করতে, ভার্সাই চুক্তির সমরনীতিকে পরিত্যাগ করে এবং বিশ্বের বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক বিশ্বের নতুন সীমা নির্দেশ করে তোলার পরিস্থিতি তৈরী করতে।

নাজি এক নায়কত্বের প্রথম বছরে ঔপনিবেশিক প্রচারে তেমন কোন সাংগঠনিক নতুনত্ব দেখা গেল না। উল্টোটাই ঘটলো। প্রথম কয়েকমাস নাজি সরকার প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্ব মঞ্চে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল এবং বৃটেনের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের আশায় ঔপনিবেশিক দাবীকেও সীমিত করল। এর উপর ঔপনিবেশিক গোষ্ঠীর লোভের আতিশয্যে তাদের মুশকিলে পড়তে হ'ল। যখন তার সমস্ত প্রচার অস্ত্রগুলির নিশানা পূর্ব ইউরোপের বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে নাজিরা স্থির করছিল, তখনই তারা উপনিবেশের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে রইল। প্রথম দিকে বিশেষ কয়েকটি বুর্জোয়া গোষ্ঠী এবং নাজি একনায়কত্বের রাজনৈতিক সদরদপ্তরগুলি পর্দার অন্তরালে সোচ্চার হয়ে উঠল জার্মানীর স্বল্পমেয়াদী ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে।

বিরুদ্ধতা দেখা দিতে লাগল এবং এমন কি তা প্রকাশ্যেও ঘটতে লাগল—অবশ্য বেশির ভাগই খুব রেখে ঢেকে মিষ্টি করে—ফ্যাসিস্ট এবং বুর্জোয়া প্রেসের মাধ্যমে। সেই সব নাজি যারা সামাজিক গণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য-পূর্ণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ জয়ের জার্মান পরিকল্পনাকে জার্মান কৃষকদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ বলে বর্ণনা করতে লাগল; Bauernschaft স্পষ্টতঃই ভূমির অভাবে ভেঙে পড়তে লাগল এবং ব্যাপকভাবে জমি দখলের দরকার হয়ে পড়ল, ঔপনিবেশিক প্রচারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হ'ল। তারা এতটুকু কুণ্ঠিত হ'ল না সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ফর্মুলার প্রবর্তন করে "প্রতিক্রিয়াশীল চক্র"-কে দোষী সাব্যস্ত করতে তাদের বাতিল করা ঔপনিবেশিক প্রচারকে উৎসাহ দেওয়ার কারণে, তারা বলতে লাগল যে "জার্মানীর" গন্তব্যস্থল হ'ল পূর্ব এবং এটা আমাদের পক্ষে দ্বিগুণ গুরুতর কারণ জার্মানীই হ'ল ইউরোপের মর্মকেন্দ্র।"

তারা নিঃসন্দেহে ভীত হয়ে পড়েছিল কারণ, আফ্রিকা এবং অন্যান্য জায়গায় জার্মানীর খোলাখুলি লোভ হয়ত Drang nach osten নীতিকে দূরে সরিয়ে রাখবে এবং সেই সংগে সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনাকেও। লক্ষণগত দিক থেকে যে ভাবেই হোক, এই গোষ্ঠীগুলি নাজি বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক নীতির ব্যাপারে নিরপেক্ষ মতামত গুলিকে সমর্থন জানানোর চেয়ে সেগুলোর দিকে ঢের বেশি লক্ষ্য রেখেছিল; শেষ বিশ্লেষণে তারা দেখিয়েছিল যে, ব্যাপারটা সরকারী পর্যায়ে সাধারণ স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকরী হবে।

তবুও, ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে না এই দৃষ্টিভঙ্গী অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমর্থন পেল না। হিটলার সানডে এক্সপ্রেসের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে, ক্ষমতা গ্রহণের কয়েকদিন পর বলেছিলেন যে, তিনি আগে ভাগেই উপনিবেশ দাবী করার প্রশ্নটি ত্যাগ করার চিন্তা থেকে বহুদূরে রয়েছেন। ডেলি মেল পত্রিকার সংবাদদাতা ওয়ার্ড প্রাইসকে হিটলার ১৯৩৩-এ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, জার্মানির জনসংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে উপনিবেশের প্রশ্ন তুলতে পারে, তার আশা, এ প্রশ্ন "শান্তিপূর্ণ আলোচনার" দ্বারা স্থির হবে। রাজত্বের একেবারে প্রথম দিকে (১৯৩৩), নাৎসী সরকার লণ্ডনে এক বিশ্ব অর্থনীতি সম্মেলনে আলফ্রেড হুগেনবুর্গ কর্তৃক নিবেদিত এক প্রস্তাবে উপনিবেশ সম্বন্ধে সরকারীভাবে বলারও চেষ্টা করে। হুগেন-বুর্গের প্রস্তাবের প্রকাশ্য সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের সোভিয়েত সরকার দৃঢ় বিরোধিতা করেন। নাৎসী ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফরাসী ও বৃটিশ সংবাদপত্রে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। ফলে, ফ্যাসীবাদী সরকার কিছুটা অসম্মানের সংগেই হুগেনবুর্গের উদ্ভট আলোচনা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।

কিন্তু অল্পদিন পরেই নাৎসীরা আরো স্পষ্ট ভাষায় উপনিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করল এবং ১৯৩৪-এর গোড়াতে ফ্যাসিবাদী ঔপনিবেশিক লক্ষ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী নাৎসী সংবাদপত্র নতুন ঔপনিবেশিক প্রচার শুরু করল।

উপনিবেশ সম্বন্ধে বিসমার্কের বক্তব্যের ৫০তম বার্ষিকীর সুযোগ নিয়ে জার্মান ঔপনিবেশিক লীগ ফ্যাসিবাদী ঔপনিবেশিক পরিকল্পনাকে বিস্তারিত-ভাবে প্রচার করল। দেখা গেল, ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ত্যাগ করার নাৎসীদের কোন ইচ্ছা নেই এবং প্রাচ্যমুখী মূল গতি জার্মান সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক পরিকল্পনাকে বাধা দিতে পারল না। ব্যাভারিয়ান স্টাটহল্টার ফ্রানৎস ফন এপ, যিনি রাজনৈতিক প্রচারে ঔপনিবেশিক নীতির প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি স্লোগান তুলেছিলেন, "কোন প্রত্যাখ্যান নয়!"

"পুরনো ঔপনিবেশিক সংগঠনের সংগে" যুক্ত হয়ে নাৎসীদের দ্বারা নতুন শক্তি, নতুন প্রচার উদ্দীপনা এবং নতুন রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতায় জীবন্ত হয়ে যথার্থই প্রচার দ্রুত শুরু হয়ে গেল। ১৯৩৪-এর গ্রীষ্মে কলোগনে এক ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী হল। পুরনো জার্মান সাম্রাজ্যবাদের চিন্তাবিদরা নতুন নাৎসী কর্মীদের সংগে মঞ্চে ফিরে এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীর্ঘবিস্মৃত পল রোরবাখ, যিনি ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময়ে পূর্ব ইউরোপের ভূমি অধিকারকে সমর্থন করেছিলেন এবং বৃটেনের ঔপনিবেশিক ও নৌ-শক্তির ধ্বংসের আহ্বান জানিয়েছিলেন ফ্যাসিবাদী জার্মানীতে রোরবাক নিজের পুরনো ধারণার জন্য উর্বর মাটি পেলেন যে, পূর্ব ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্য-বাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঔপনিবেশিক জগতের পুনর্বিভাগের পরিকল্পনায় বাধা দেয়নি। ফ্যাসীবাদী চিন্তাবিদ ডার কর্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত "রক্ত ও ভূমি" এই

ধ্বনিমূলক সব সরকারী জার্মান প্রচারের এই ছিল মূল বক্তব্য। জার্মান একচেটিয়া পুঁজির মুখপত্র Deutscle Berguerksxeitorng ১৯৩৫-এর ২৫শে মার্চ লিখল: "আমরা 'ভূমি-বিহীন' জাতি এবং সেই জন্য প্রথমে পূর্ব জার্মানীকে উপনিবেশে পরিণত করতে ও পৃথিবীতে অন্যত্র জায়গার জন্য চাপ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

৪

জার্মান ফ্যাসিবাদীরা খুব ভালভাবেই জানে যে, অদূর ভবিষ্যতে তার পুরনো উপনিবেশ ফিরে পাবে না বা নতুন সংগ্রহ করতে পারবে না। অবশ্য, ঔপনিবেশিক জগতে পুনর্বিভাগ তাদের রাজনৈতিক এবং চিন্তাগত পরিকল্পনায় স্পষ্ট উপাদান বলে তারা জানে তাদের দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ তারা পূর্বের জার্মান উপনিবেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী হল, কারণ বহু বছর ধরে জার্মান মূলধন দ্বারা তৈরী পথ ঐ সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জার্মান রপ্তানী প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল ১৯৩২-এর মধ্যে। ১৯৩০-এ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ফরাসী অঞ্চলে সমগ্র আমদানীর মোট ১১ শতাংশ এবং দু বছর পরে তা ৫.৯ শতাংশ নেমে গিয়ে ১৯৩৩-এ সামান্য বেড়ে হল ৬.৪ শতাংশ। ফরাসী কঙ্গোতে জার্মান আমদানী রপ্তানী প্রায় শূন্যের কোঠায় পেঁছিল। ১৯৩৩-এ সেখানে জার্মান বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াল মাত্র ১০,০০০,০০০ ফাঁ-তে, ১৯৩২-এর থেকেও কম। অন্যান্য উপনিবেশেও সরকারীভাবে প্রচণ্ড অবনতির খবর পাওয়া গেল। প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশগুলি থেকে আমদানী ১৯২৯-এর ২০,৩০০,০০০ মার্ক, থেকে কমে ১৯৩২-এ হল ৫,৩০০,০০০ মার্ক, রপ্তানীর ১৯,৪০০,০০০ মার্ক থেকে কমে হল ২,২০০,০০০ মার্ক। অবশ্য, ১৯৩৩-এ সামান্য উন্নতি হয়েছিল (আমদানী ৯,১০০,০০০ মার্ক এবং রপ্তানী ৩,৬০০,০০০ মার্ক)। স্বভাবতঃ, তখন জার্মানি থেকে প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশগুলিতে বিনিয়োগের জন্য মূলধন রপ্তানির কোন প্রশ্ন ছিল না।

প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রভাবের অবনতি আগের দশবছরের চেয়েও যা বেশী, তা বুর্জোয়াদের পীড়িত করল। ব্যাঙ্ক জগৎ ও স্টক মার্কেটের সংগে যুক্ত সংবাদপত্র ঔপনিবেশিক অঞ্চলে জার্মান বাণিজ্য ও বিনিয়োগের "দেশাত্মবোধক" প্রয়োজন ও সুবিধার কথা বিশদভাবে লিখল। এই সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পদ সম্বন্ধে নাৎসী সংবাদপত্র বলল যে, তা বহু খাদ্য ও কাঁচামালে জার্মানীর প্রয়োজন মেটাতে পারে। সংবাদপত্রের নতুন প্রচার শুরু হল। যারা হারানো উপনিবেশগুলিকে শোষণ করতে পারবে তাদের রাজনৈতিক আবেগও বাণিজ্য বৃদ্ধির কাছে নাৎসীরা আবেদন জানাল,

উপরন্তু সবচেয়ে কম বিনিয়োগে কি করে সর্বাধিক মুনাফা করা যায়, বিজ্ঞের মত তার পরামর্শ ছিল।

উপনিবেশে কি কি রপ্তানী করা উচিত, তার বিশদ তালিকা এবং কি করে ওখান থেকে অন্য দেশের উপনিবেশে, বিশেষতঃ পর্তুগীজ অ্যাঙ্গোলায় ঢোকা যায়, তার উপদেশ সংবাদপত্র ছাপছে। কার্যকরী বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বাস্তব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, এই বিজ্ঞাপনের সংগে রয়েছে রাজনৈতিক প্রচার। অর্থনৈতিক অবস্থা রক্ষার সংগেই নাৎসীরা ঔপনিবেশিক জগতের সাধারণ পুনর্বিভাগের জন্য উপনিবেশগুলিতে বিশাল রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে।

ফরাসী উপনিবেশ কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হলেন। প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশে বসবাসকারী জার্মানদের নাৎসীরা সমর্থন করছে এবং নিজেদের ছত্রচ্ছায়ায় গঠিত দেশীয় সংগঠনও নিজেদের জাতিগত তত্ত্ব তৈরী করছে। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান Deutscher Togobund শুধু আফ্রিকানদের নিয়ে গঠিত। ফরাসী সংবাদপত্র খবর দিচ্ছে যে, জার্মান প্রতিনিধিরা সফল প্রভাব বিস্তার করে কয়েকজন উপজাতীয় নেতাকে দিয়ে জাতি সংঘের কাছে দরখাস্ত করেছে যে, তাদের আবার জার্মান শাসনে আনা হোক। যখন দার-এস-সালামে একটি জার্মান দূতাবাস খোলা হল, তখন জার্মান স্বস্তিকাচিহ্নিত কালো-সাদা-লাল পতাকার পাশ দিয়ে একটি আফ্রিকা বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে যায়। অতীত অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে জার্মান সংবাদপত্র খুশী হল। ঔপ-নিবেশিক অঞ্চলের সব স্তরে প্রবেশ করে নাৎসী সংগঠন এক স্থানীয় দল গড়ে তুলতে আগ্রহী হল। স্বাভাবিক কারণে এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কোন উল্লেখ রইল না; শুধু সামান্য, আকস্মিক খবরে বোঝা যায় যে, নাৎসী সংগঠন দূর ঔপনিবেশিক অঞ্চলেও তাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে। আসল ঝোঁকটা আফ্রিকার উপরে। এখানে নাৎসীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা রয়েছে।

স্থানীয় লোকের মধ্যে বেশী রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য নাৎসীরা পুরনো অথচ কার্যকরী মিশনারী সংগঠনকে ব্যবহার করেছে। যেমন, ১৯৩৫-এর গোড়াতে কোলোগনের উৎসবে দুটি বিমান, *পিটার* এবং *পল*, আফ্রিকা ও নিউ গিনিতে জার্মান মিশনারী কাজের জন্য দেওয়া হল।

শেষে, দেখছি যে, জার্মান ফ্যাসিবাদ উপনিবেশের জন্য লড়াই আদৌ ছাড়ে নি। বরং, নাৎসী জার্মানীর অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের পর সে ঐ লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কারণ তিনি একচেটিয়া সংবাদপত্রের সমর্থন পেয়ে ঘোষণা করেছেন, উপনিবেশে জার্মানীর প্রচণ্ড প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শোষণের বৈষম্যকে কাজে লাগাবার কৌশলের উপরে নির্ভর করে জার্মান সরকার তার ঔপনিবেশিক দাবীকে কখনো জোরদার কখনো শিথিল করছে। মোট কথা, প্রত্যেক নাৎসী-

প্রধানের কথার আপাত-অসংলগ্নতার কারণ এই কৌশল। যেমন হিটলার একজন *ডেলি মেল* পত্রিকার সংবাদদাতাকে বললেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক অধিকার হল বিলাসিতা, তার পরেই তাঁর সহকারী রুডলফহেস বললেন, এই বিলাসিতার অর্থ হল, যে সব রাষ্ট্রের অনেক উপনিবেশ আছে তাদের পক্ষে এটা বিলাসিতা, আর জার্মানীর পক্ষে এটা প্রধান প্রয়োজন।

১৯৩৫ এর শুরুতে জার্মানীর ঔপনিবেশিক দাবী আরো উন্মত্ত হয়ে উঠল। 'সার' জনমতের প্রকাশ অধিকার-মূলক মনোভাবে নতুন বিস্ফোরণ ঘটাল এবং ফেব্রুয়ারীতে লণ্ডনে ইংগ-ফরাসী আলোচনার পরে জার্মান ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার তীব্র প্রচার হল আসলে বৃটেনের সংগে পৃথক আলোচনার প্রস্তুতি, যার পিছনে কয়েকটি প্রভাবশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী মহলের সমর্থন আছে।

তৎকালীন বৃটিশ বৈদেশিক সচিব সার জন সাইমনের সংগে বার্লিন আলোচনায় ওয়াকিবহাল ইতালীয় সংবাদপত্র খবর দিল যে, হিটলার বলেছেন, প্রাচ্যের প্রতি "সাহায্যের হাত", অস্ত্রসজ্জা ইত্যাদি ছাড়াও তিনি পূর্ব আফ্রিকায় জার্মানীর প্রাক্তন উপনিবেশগুলি, বিশেষতঃ টাংগানাইকা এবং কংগোর অংশ ফেরত চান। ইতালীয় সংবাদপত্র আরো খবর দিল যে, হিটলার সাইমনকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জাপানকে দিয়ে দেওয়া উপনিবেশগুলি জার্মানী ফেরৎ চায়। নাৎসী সংবাদপত্র অনুযায়ী, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক দাবী এগিয়ে চলেছে।

আপাততঃ, নাৎসীরা জার্মানীর প্রাক্তন উপনিবেশগুলি বৃটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের কাছে ফেরত চাইল। কিন্তু পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির উপরেও ওদের নজর ছিল এবং খুব সম্ভব, অ্যাংগলা বিভাগের জন্য ওরা বৃটেনের সংগে চুক্তির কথাও ভেবেছিল। একদা জার্মান অধিকাবভুক্ত অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের উপনিবেশের কথাও নাৎসী সংবাদপত্র তুলছিল।

তাছাড়া, নাৎসী লেখকরা দেখাল যে, জাপান, "যার প্রধান অধিকারকে নতুন জার্মান ঔপনিবেশিক নীতি অবশ্যই শ্রদ্ধা করে, তাকে একথা মানতেই হবে যে, উপনিবেশের জন্য জার্মান দাবী সমান গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দ্বারা চালিত।" সংক্ষেপে, জার্মান সংবাদপত্র বলেছে যে, যেহেতু বড় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপনিবেশের অসম বণ্টন বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে, অতএব নতুন যুদ্ধ এড়ানোর উপায় হল জার্মান দাবী মেটানো, অর্থাৎ আগে যা তার ছিল না, সেগুলিও তাকে দেওয়া।

স্বাভাবিক কারণে, দাবীগুলি সংযত ভাষায় প্রকাশ করা হল, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং পৃথিবীর পুনর্বিভাগের জন্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছার সংগে সংগতিপূর্ণ।

অন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈষম্য থেকে নাৎসীরা লাভবান হওয়ার আশা করে। ১৯৩৫-এর ২১শে মে-তে জার্মান বৈদেশিক নীতির আপাত

-লক্ষ্যের পর্যালোচনায় হিটলার বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে গভীর রাজনৈতিক বিভেদ ঘটাবার চেষ্টা করলেন—লণ্ডন সম্মেলনে ঐ দুই দেশের মতৈক্য ঘটেছিল এবং স্ট্রেসা-র সম্মেলনে গঠিত কূটনৈতিক ফ্রন্টকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করলেন। কাজেই উনি ঘোষণা করলেন যে, জার্মান নৌবহরের পুনরায় অস্ত্রসজ্জার সংগে জার্মান ঔপনিবেশিক দাবীর কোন সম্পর্ক নেই। হিটলার বৃটিশ শাসকদের আশ্বস্ত করার জন্য বললেন যে, তার দেশ ও বৃটেনের মধ্যে ঔপনিবেশিক চুক্তি সম্ভব। স্বভাবতঃই, সে চুক্তি শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নয়, ফ্রান্সেরও বিরুদ্ধে।

সেল লিখলেন, "জার্মান ঔপনিবেশিক নীতি ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিস্তারে বাধা দেবে। অতএব, সর্বপ্রথম জার্মান নীতি বৃটেনের কাজে লাগছে।" জার্মান কূটনীতিকে বৃটেনের মূল্যবান বন্ধুরূপে উপস্থিত করে নাৎসীরা ইংগিত দিল যে, এই "সেবা"-র জন্য বৃটিশ রাজত্বভুক্ত নতুন উপনিবেশগুলি লাভে বৃটেনের জার্মানীকে সাহায্য করা উচিত।

অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী বৈষম্য থেকেও নাৎসীরা লাভের আশা অবশ্যই করেছিল, যেমন বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা এবং ইটালি ও ফ্রান্সের মধ্যে সংগ্রাম। নিঃসন্দেহে জার্মান ঔপনিবেশিক দাবী শুধু ফ্রান্সেরই নয়, বৃটেনের স্বার্থের বিরুদ্ধেও চালিত হবে। কিন্তু, *ফ্যাসীবাদী জার্মানীর মূল পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংগে জড়িত।* যদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, তাহলে জার্মানী দূর প্রাচ্যে কিছু ক্ষতিপূরণের আশা করে। যাই হোক, এটা স্পষ্ট হল যে, নাৎসীরা এক সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের প্রশ্নে তাদের ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা জড়িয়ে ফেলেছে। ১৯৩৪-এর ১২ই জানুয়ারি Kolnische Zeitung লিখল, "এটা যুক্তিসংগত যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রাক্তন উপ-নিবেশগুলি ফেরত পাব না। ইতিহাসের চাকা কখনো উল্টো দিকে ঘোরে না। সম্ভবতঃ জার্মান জাতি বিশাল রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ঔপনিবেশিক দাবীতে সন্তুষ্ট হবে না।"

এর অর্থ হল যে, জার্মান ফ্যাসিবাদ ঠিক করেছে 'ইতিহাসের চাকা" বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে ঘোরাবে, ঔপনিবেশিক দাবী মেটাবে এবং উপরন্তু, বিশ্বআধি-পত্যের জন্য সাধারণ দাবী তৈরী করবে।

নাৎসীদের প্রধান লক্ষ্য স্থল, পৃথিবী পুনর্বিভাগের জন্য একটা যুদ্ধ। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অবরোধ পৃথিবীর অন্য অংশে ঔপনিবেশিক অবরোধে বাধা দেবে না। বড় নৌবাহিনী, বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং শক্তি-শালী অর্থনৈতিক-সামরিক ক্ষমতা পেলে, ঔপনিবেশিক অধিকার ইউরোপের পূর্বদিকে প্রসারিত হবে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পূর্ব ইউরোপে জয় বড় পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ জোগাচ্ছে

পারে, বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক জয়ে। সেল বললেন, "জার্মান বাণিজ্যিক নীতি, প্রাচ্যে আঞ্চলিক অধিকার এবং জার্মান ঔপনিবেশিক নীতি পরস্পরের পরিপূরক। চতুর ও নিপুণ জার্মান নীতি পূর্ব ইউরোপে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করবে এবং সম্ভবতঃ ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার জন্য বন্ধুও পেতে পারে, যদি না অবশ্য আমাদের 'প্রাচ্য নীতির'-র সংগে যুক্ত বিষয়ে কিছু বাধা দেয়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে জার্মানদের ঐতিহাসিক লক্ষ্যের উপরে ঔপনিবেশিক বিষয় প্রভাব বিস্তার করেছে।"

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিস্তার নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও তার সৃষ্ট নাৎসী দল পৃথিবীকে বদলে ফেলতে বদ্ধপরিকর। এ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক দাবীকে ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক জগৎকে পুনর্বিভাগের প্রশ্ন পরে নিশ্চয়ই তীব্র আকারে প্রকাশ পাবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মানিকে পূর্বদিকে সরিয়ে দেওয়ার আশা করে। কিন্তু হিটলারের জয়ের পরিকল্পনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বঅধিকারের নাৎসী দাবী ক্রমবর্ধমান জার্মান যুদ্ধ ক্ষমতার সংগে তাল মিলিয়ে চলবে। যখন জার্মান ফ্যাসিবাদ সরাসরি ঔপনিবেশিক জগতের পুনর্বিভাগ চাইবে, তখন বৃটেন এক প্রবল আতংকের সম্মুখীন হবে, যে জার্মান নৌবাহিনীর অস্ত্রসজ্জার অনুমতি দিয়েছে। এতে বিশ্বযুদ্ধ নিকটতর হবে যার প্রধান রূপকার জার্মান ফ্যাসিবাদ এত কষ্টে প্রস্তুত হচ্ছে।

১৯৩৫

ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলি স্পেনে দখল চায়

যেদিন ফ্যাসীবাদী বিপ্লব স্পেনের সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ল, সেদিন সারা ইউরোপ তার জনগণ ও সরকারগুলি বুঝল যে, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঐ দেশের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়বে। সাধারণ লোক স্পেনের জনগণকে সহানুভূতি জানাল এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য ফ্যাসিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার মরণপণ সংগ্রামে জড়িত আইনসংগত সাধারণতন্ত্র সরকারকে সহানুভূতি দেখাল। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষতঃ ইউরোপের ফ্যাসীবাদী সরকারগুলি বিদ্রোহ শুরু হওয়ারও আগে স্পেনের বিদ্রোহীদের সাহায্য দিতে শুরু করল।

পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার মাঝে গৃহযুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল একটা অস্থায়ী রেখা। যতই যুদ্ধ চলতে লাগল, ততই তা আরো বন্য হয়ে উঠল, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং ফ্যাসীবাদী জার্মানি, ইটালি ও পর্তুগাল কর্তৃক বিদ্রোহীদের সাহায্য দান আরো প্রকাশ্য ও সক্রিয় হয়ে উঠল, ততই স্পষ্ট হতে লাগল যে, নতুন যুদ্ধের রচয়িতারা কিভাবে তাদের শক্তিকে চালিত করে, তার উপরেই এর ফলাফল নির্ভর করছে।

১৯১৪-১৮-র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধে স্পেন যোগ দেয় নি। তবু, ঐ যুদ্ধের অনেক আগে ত্রিশক্তি মৈত্রী (জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাংগারি এবং ইটালি) ও আঁতাত (বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া) স্পেনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে তাকে নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করেছিল।

স্পেন তখনো সামন্ততান্ত্রিক বোঝায় পীড়িত, তখনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর পেরোয় নি। তাই তার অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অত্যন্ত ধীর, ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুগে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে তার প্রভাব ও সম্মান কমে যাচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্পেনের শাসকবৃন্দ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী

শক্তির তালিকায় জায়গা না পেয়ে পূর্বের শতকে তারা যে ঔপনিবেশিক সম্পদ পেয়েছিল যে কোন মূল্যে তার উপরে অধিকার বজায় রাখতে ঝুঁকে পড়ল। নিজেদের অবস্থাকে সুদৃঢ় করে ও সম্ভব হলে আঞ্চলিক সুবিধা লাভ করে নতুন আন্তর্জাতিক বৈষম্যের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অর্থনীতিতে অনুন্নত এবং রাজনীতিতে দুর্বল, রাজতন্ত্রী স্পেনকে কোন না কোন ভাবে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নীতির কাছে নিজের পরিকল্পনা ও আশা বিসর্জন দিতে হল. ঐ শক্তিগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামরিক লক্ষ্য প্রসারিত করে স্পেনের বৈদেশিক নীতির উপরে বৃহত্তর প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করতে লাগল।

এখানে স্মরণীয় যে, ১৮৭০-এ স্পেনের সিংহাসনের প্রার্থী সংক্রান্ত বিরোধ ছিল ফরাসী প্রুশীয় যুদ্ধের মূল। বিসমার্ক চেয়েছিলেন, হোহেন জোলার্ণ বংশের প্রিন্স লিওপোল্ড বুর্জোয়া-জাংকার প্রুশিয়ার লক্ষ্য অনুযায়ী স্পেনকে শাসন করে ফ্রান্সের পিরেনীয় সীমান্তে আতঙ্ক সৃষ্টি করে শত্রু ফ্রান্সকে দুর্বল করুক। কিছুদিন পরে, পৃথিবীর চূড়ান্ত ভাগের পর্যায়ে জার্মান সাম্রাজ্য স্পেনের উপরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করল, নব গঠিত সামরিক চুক্তি ত্রিশক্তি মৈত্রীর ক্ষেত্রে তাকে টেনে এনে এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ভীত স্পেন ১৮৮৭-তে ঐ গোষ্ঠীতে যোগ দিল।

এই মনোভাবের পিছনে নিঃসন্দেহে বৃটিশ কূটনীতি ছিল। তার অর্থনৈতিক ভূমিকা, ভূমধ্যসাগরে বিশাল নৌবাহিনী এবং প্রথম শ্রেণীর সামরিক অবস্থার গুণে (আইবেরীয়ান পেনিনসুলায় জিব্রাল্টারে তার দৃঢ়তা) গ্রেট বৃটেন স্পেনের বৈদেশিক নীতিতে প্রভাব বিস্তার করল।

কোন বিশেষ তীব্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য তখনো ইংগ-জার্মান সম্বন্ধকে প্রভাবিত না করলেও জারপন্থী রাশিয়া ও ফ্রান্সের সংগে তীব্র বৃটিশ বিরোধিতা ছিল। সুতরাং, জার্মানীর সংগে সম্পর্কের অস্থায়ী উন্নতির জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্পেনকে অনুরূপ পথ গ্রহণে বাধ্য করল. ওদিকে বৃটেনে জার্মানীর দুই মিত্র অস্ট্রিয়া হাংগারী ও ইটালির সংগে বোঝাপড়া করে ভূমধ্যসাগরীয় অবস্থাকে দৃঢ় করল (১৮৮৭-র অর্থনৈতিক ভূমধ্যসাগরীয় আঁতাত করে)।

আফ্রিকার অধিকার লাভে আগ্রহী ফ্রান্সকে স্পেন ঔপনিবেশিক বিষয়ে তার বৃহত্তম প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবল, কারণ, জার্মানি তখনো প্রথম সংকুচিত পদক্ষেপ ঘটাচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও স্পেন কিছু পরিবর্তন সহ বৃটেনকে অনুসরণ করেছিল, কারণ, ইন্দোচীনে প্রভাব বিস্তারের যুদ্ধে এবং ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় বৃটেন ফ্রান্সকে ভয়ংকর প্রতিযোগী মনে করত।

১৯শ শতাব্দীর শেষে, উপনিবেশগুলিতে প্রবল সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষ দেখে স্পেন বুঝল, ত্রিশক্তি চুক্তির উপরে নির্ভর করলে সে কিছুই পাবে না।

সে আরো বুঝল যে, সে নিজেও সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষের লক্ষ্য হয়ে পড়তে পারে।

১৮৮৯-তে যুক্তরাষ্ট্র স্পেন আক্রমণ করল, সে তখন সবে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী জয়ের নীতি গ্রহণ করেছে। সে কিউবা ও ফিলিপ্পাইনস্ হারাল। তাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে বন্ধুত্বের অনেক মূল্য দিতে হল। জার্মানী স্পেন আমেরিকা যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দূর প্রাচ্যে (১৮৯৭-তে কিয়াওচাও অধিকারের পর) সাম্রাজ্য প্রসারে ঝুঁকে পড়ল, ফিলিপ্পাইন দ্বীপপুঞ্জ, দখলের চেষ্টা করল। মার্কিন বাধার ফলে ব্যর্থ হয়ে (১৮৯৮-তে ফিলিপ্পাইনের প্রধান বন্দরের দখল নিয়ে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছিল) সে প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ নিয়েই চুপ করল, ঐ দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের। অবশ্য, এই দখলকে "সংগত" রাজনৈতিক চুক্তি (১৮৯৯) দিয়ে ঢাকা দেওয়া হল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ত্রি-শক্তির নতুন আঁতাত স্বভাবতঃ স্পেনকে প্রভাবিত করল। শক্তিগুলি বিনিয়োগক্ষেত্রে এবং ভূমধ্যসাগরে ও আতলান্তিকে রাজনৈতিক-সামরিক উপাদানরূপে স্পেনের মূল্য সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল। তখনো ভূমধ্যসাগরে ও আফ্রিকায় ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ তীব্র, যদিও আগের তুলনায় কম। দুই শক্তি জার্মান উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতে আগ্রহী, দুজনেই স্পেনের সাহায্য যায়। ১৯০২-তে ফ্রান্স ও স্পেন বোঝাপড়ায় এল : স্পেনকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, তাঞ্জিয়ার নিরপেক্ষ থাকলে উত্তর মরক্কোর দখল তাকে দেওয়া হবে, জার্মানি ফ্রান্সের সংগে সংঘর্ষে এবং অতলান্তিক ও ভূমধ্যসাগরে বিস্তারের সহায়তার জন্য স্পেনকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল, তার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বৃদ্ধি তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসার এবং তার নৌ-পরিকল্পনার দ্রুত উন্নতি বৃটেনকে নিজের নীতি পুনর্বিবেচনায় ও ফ্রান্সের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টায় বাধ্য করল (১৯০৪-এ)। আমরা জানি এই পুনর্যোগাযোগের ভিত্তি ছিল, সমগ্র ইংগ-ফরাসী ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে প্রভাবের স্থানবিভাগ। তাছাড়া, ফ্রান্সকে মরক্কোতে স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু বৃটিশরা জিব্রাল্টারের পাশেই বৃহৎ শক্তি না চেয়ে জোর দিল যে, মরক্কোর উত্তরাংশ স্পেনের হাতে থাক।

এর জবাবে ফরাসী-বৃটিশ চুক্তির শক্তি পরীক্ষা করে উইলহেলম্ তাঞ্জিয়ারে ১৯০৫-এ আতংক দেখাতে লাগল। তাছাড়া, জার্মানি তার প্রভাবের ক্ষেত্রে স্পেনকে টেনে আনতে চাইল। প্রথম যে মরক্কো সংকট ইউরোপে যুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করল, তার পরেই (১৯০৫), জার্মানি বেলেরিক দ্বীপপুঞ্জের জন্য স্পেনের ওপরে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করল। এটা পেলে জিব্রাল্টার দিয়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং সুয়েজ খালের সংগে ভারতের যোগাযোগের পথ এবং

আফ্রিকান সম্পদসহ ফ্রান্সের ওপরে সে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে, যদি মরক্কোতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, তখন জার্মানি একটি পার্শ্ব আক্রমণ প্রকাশ করতে স্পেনের উপরে চাপ সৃষ্টি করবে।

ইটালি ও ত্রিশক্তি মৈত্রীচুক্তির অন্য সদস্যদের মধ্যে শিথিল রাজনৈতিক বন্ধন জার্মানিকে উৎসাহিত করল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং ইউরোপের চূড়ান্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে দখল দৃঢ় করতে।

১৯১১-তে দ্বিতীয় মরক্কো সংকট দেখা দিল, যখন ফ্রান্স ফেজ অঞ্চলে সৈন্য পাঠাল এবং পাল্টা জার্মানি গানবোট প্যান্থারকে আগাদিরে পাঠাল। বার্লিন স্পেনকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাতাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। যে আগাদির সংকট ইউরোপকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেল, তা আপসের পথে গেল।

বলা বাহুল্য, এতে স্পেনে দৃঢ়তর দখল বজায়ের জার্মান চেষ্টা কমে গেল না। কিন্তু প্রত্যক্ষ আলোচনায় ফল বিশেষ না হলেও জার্মানি স্পষ্টতঃ তার ইটালীয় মিত্রকে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিল, যে ইটালী স্পেনের সঙ্গে চুক্তির জন্য আলোচনা চালাচ্ছিল। সম্ভাব্য ইটালীয়-স্পেনীয় চুক্তির ভাষা আঁতাতকে আশংকিত করল।

সবেমাত্র ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদীরা তুর্কিকে হারিয়ে ট্রিপোলিটানিয়া অধিকাব করেছে (১৯১১-১২) এবং নতুন দখলের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভূমধ্যসাগরে "নিজের অবস্থাকে দৃঢ়" করার জন্য তরুণ ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদ দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের সুযোগ নিল। ঐ অঞ্চলে দখল পাওয়ার চেষ্টায় সে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে সমতা নষ্ট করার চেষ্টার দোষে দোষী করল, তাতে ফরাসী শাসকদের ধারণা হল যে, ইটালী ত্রিশক্তি মৈত্রীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বার্লিনের নির্দেশ অন্ধভাবে মেনে চলছে। ইটালীয় কূটনীতির সাহস এবং জার্মানির নেপথ্য চেষ্টায় ত্রিশক্তি মনে করল যে, স্পেনকে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অসুবিধায় ফেলতে হবে।

স্পেনে প্রভাব লাভের জন্য দ্বন্দ্বে আঁতাতের জয় হল। যখন ১৯১৪-য় যুদ্ধ শুরু হল, তখন স্পেন নিরপেক্ষ থেকে পিরেনিজ অঞ্চলে ফরাসী সীমান্ত নিরাপদ করছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশসহ যোগাযোগ পথ দখলের জার্মান পরিকল্পনাও ফেঁসে গেল। এতে ইতালিকে ও তার জার্মান বন্ধুকে কিছটা ছাডতে হল—কারণ ইটালি সমুদ্রেব ধারে এবং ক্ষতিপূরণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর আঁতাতে যোগ দিতে চাইল। ইটালিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশসংক্রান্ত। পশ্চিমাংশ অধিকারের গুরুত্ব আঁতাত ও জার্মান নেতাদের কাছে স্পষ্ট হল। জার্মানি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে বিস্তারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইটালীকে সক্রিয় করার চেষ্টা করল। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী নৌশক্তির স্পষ্ট প্রাধান্যের সামনে এরকম কথা রাখার চেয়ে দেওয়া সোজা।

যদি ফ্রান্সের ব্যাপারে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা স্পেনীয় নিরপেক্ষতাকে কম পক্ষপাতমুক্ত করতো তাহলে ঘটনা অন্যরকম হত। সেটা চেষ্টার অভাব নয়, যাহা হউক বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে ওরা সফল হয়নি। স্পেনে বেশী জার্মান রাজনৈতিক প্রভাব অনেক দিক দিয়ে পশ্চিম ইউরোপে সামরিক পরিস্থিতিকে বদলে দিত।

১৯১৮-তে জার্মানীর পরাজয় সাময়িকভাবে তার স্পেনীয় উদ্যমে বাধা দিল, কিন্তু ধীরে ধীরে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে ওঠার পর তার উদ্যম যুদ্ধোত্তর পরিবেশে নিয়ে গেল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসী অংশের রাজনৈতিক বাহন, জার্মান ফ্যাসিবাদ স্পেনকে যুদ্ধের বীজ-ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য পরিশ্রম করছিল।

২

নাৎসীরা ক্ষমতায় আসার পর স্পেনের ওপরে অধিকার দৃঢ় করার জার্মান প্রচেষ্টা বিশেষতঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে স্পেনের সংগে জার্মানীর অর্থনৈতিক বন্ধন বেশ কম ছিল। স্পেনের বেশী সম্পর্ক ছিল ফ্রান্স এবং বৃটিশ পুঁজির সংগে, হিটলার ক্ষমতায় আসার পর স্পেনে ঢোকার জার্মান পরিকল্পনা পৃথিবী পুনর্বিভাগের জন্য তীব্র যুদ্ধ প্রস্তুতির দ্বারা চালিত রাজনৈতিক সামরিক লক্ষ্যেই প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত হল।

স্বভাবতঃ জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পরিকল্পনাকে ঢেকে রাখছে, এবং স্পেন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ পদ্ধতিকে গোপন করছে। তবু মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের টুকরো থেকে নাৎসী পরিকল্পনার অল্প-বিস্তর সঠিক খবর পাওয়া যায়।

১৯৩৪-এ সংবাদপত্র মরক্কো, স্পেনীয় উপনিবেশ ইফনি এবং সামরিক ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করার নাৎসী প্রচেষ্টা লক্ষ্য করল। যথারীতি, নাৎসীরা অর্থনৈতিক প্রবেশের সব সুযোগকে সামরিক কাজে লাগাচ্ছে। জার্মান প্রতিষ্ঠানগুলি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর, লাস পালমাসে বন্দরের উপকরণ সরবাহের চুক্তি করল, যন্ত্র বসানো তদারক করার জন্য জোর করল এবং জার্মান বিশেষজ্ঞ দিয়ে বন্দর ভরে ফেলার চেষ্টা করল। জার্মানী ফরাসী মরক্কোর দক্ষিণ অংশে ইফনিতে বিমানঘাঁটির অনুমতি আদায়ের চেষ্টাও করছিল। কিন্তু এক দৃঢ় ফরাসী মনোভাব স্পেনকে অসম্মত হতে বাধ্য করল। ফরাসী হস্তক্ষেপে বাধা পেয়ে জার্মান বিমান প্রতিষ্ঠান লুফৎহান্সা তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন স্পেনীয় বিমান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার পথে প্রভাব বজায় রাখতে পারল।

ক্ষমতায় আসার অল্প পরেই নাৎসীরা স্থানীয় উপ-জাতীয় সর্দারদের সংগে

যোগাযোগ রেখে তাদের অস্ত্র দিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মান যুদ্ধকে অন্য পথে চালিত করার প্রস্তুতির জন্য উত্তর আফ্রিকায় ও সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জে, বিশেষতঃ ক্যানারিতে গোপন প্রতিনিধি পাঠাল। স্থানীয় সর্দারদের সহায়তায়, ফ্যাসিবাদীরা ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, মানবিক ও বাস্তব উপাদানের বিশাল সঞ্চয় আফ্রিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ককে অন্ততঃ ভাঙ্গার আশা রাখে। যে জার্মান মিশনারীরা সুন্দর সংগঠন গড়ে তুলছে, তারাও একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে। স্পেন ও মরক্কোতে নাৎসী হস্তক্ষেপের ব্রিটিশ সংবাদের দ্বারা এটা সমর্থিত হয়।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় উধৃত গোপন ফ্যাসিবাদী কাগজপত্রে দেখা গেল সিউটা, তেতুয়ান ও অন্যত্র জালের মত ছড়িয়ে আছে নাৎসী কেন্দ্র (Stutzpunkte) ও শাখা (Ortsgruppen)। স্পেনের মত মরক্কোতেও ফ্যাসিবাদী প্রতিনিধিদের এক তথাকথিত বন্দর প্রতিষ্ঠান রয়েছে, গেস্টাপো প্রতিনিধির চিহ্নস্বরূপ। তার কাজ হ'ল, নাৎসী প্রচার চালানো, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খবরদারি করা এবং সামরিক গুপ্তচর বৃত্তি। উত্তর আফ্রিকায় রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের জমি তৈরী করতে নাৎসীরা মুক্তির স্লোগান তুলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী ও ফরাসী বিরোধী মনোভাবে উস্কানি দেয়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র কর্তৃক প্রকাশিত গোপন নাৎসী কাগজপত্রে দেখা যায় যে, হিটলারের লক্ষ্য আরব প্রাচ্যে অনুপ্রবেশ করা। বিদেশের গোপন নাৎসী প্রতিনিধি এবং সরকারী জার্মান কূটনীতিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ দিল *ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান*। মরক্কোতে বিভিন্ন প্রকাশ্য ও গোপন প্রতিনিধিরা বিশেষতঃ সক্রিয়, কারণ ব্রিটিশ সংবাদপত্রের মতে, ফ্যাসিবাদী মনোযোগ ঐ দেশে নিবদ্ধ। ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধ থেকে, ব্রিটিশ সংবাদপত্রে উধৃত এক গোপন নাৎসী দলিল বলে যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ও পশ্চিমে জার্মানির পথ আটকে রেখেছে, কিন্তু মরক্কোতে জার্মানি উত্তর আফ্রিকা ও প্রাচ্যের মুসলিম জগতে নতুন পথ খুলতে পারবে।

সত্যি হয়তো জার্মান ফ্যাসিবাদ মরক্কোকে আফ্রিকার "দরজা" মনে করে, সেখানে সে ঔপনিবেশিক জগতের পুনর্বিভাগের পূর্বে ভাল জায়গা চায়। স্পেনের কথা সম্পূর্ণ আলাদা: নাৎসীদের কাছে এটা হ'ল ইউরোপে যুদ্ধের পক্ষে সুবিধাজনক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী বিপ্লবের অনেক আগে স্পেনে নাৎসী হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে।

সরকারী কূটনীতি এবং বেসরকারী নাৎসী প্রতিনিধি বিপ্লবের কথা আগেই জানত, কারণ তারাই এর প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে। স্পেনে জার্মান প্রতিনিধিরা ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে কূটনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত করল। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রচয়িতা নেতৃস্থানীয় স্পেনীয় ফ্যাসিবাদী জেনারেল সানজুর্জো কিছুদিন বার্লিনে থেকে সর্বোচ্চ

নাৎসী ব্যক্তিদের সংগে অনবরত যোগাযোগ রাখলেন। নাৎসী দল তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করল, বার্লিনে স্পেনীয় সামরিক অ্যাটাশে জার্মান কর্তৃপক্ষ ও স্পেনীয় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মধ্যস্থরূপে কাজ করলেন। অভ্যুত্থানের অল্প আগে, চোরাকারবার করে বিশাল সম্পদের অধিকারী বিশিষ্ট মাদ্রিদ ব্যাংক ব্যবসায়ী জুয়ান মার্চ অর্ডিনাস হামবুর্গে গেলেন, সেখানে তিনি গোপনে নাৎসী নেতাদের সংগে আলোচনা করলেন। সম্ভাব্য বিদ্রোহের সংগঠনগত দিক ও নাৎসীদের খরচের বিষয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হ'ল। লিসবন বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল সানজুর্জো মারা যাওয়ার পর জেনারেল ফ্রাংকো দায়িত্ব নিয়ে হামবুর্গের এক ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জোগাড় করলেন। আরও জানা গেল যে, তখনও মরক্কোয় অবস্থানরত জেনারেল ফ্রাংকোর সংগে আলোচনায় ছিলেন প্যারির ব্রাউন হাউসের অধ্যক্ষ শ্লীহার এবং এক পরিচিত ফ্যাসিবাদী প্রতিনিধি।

স্পেনে যখন বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন জার্মানদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্পেনীয় জলপথে জার্মান সরকার দুটি নৌস্কোয়াড্রন পাঠাল : একটা স্পেনের উত্তর তীর পাহারা দিতে, অন্যটা রইল বার্সিলোনা ও মরক্কো বন্দরের মধ্যে। জার্মান হস্তক্ষেপ চাপা দিতে "মস্কোর হাত"-এর কুখ্যাত চীৎকার তুলল নাৎসী সংবাদপত্র। হস্তক্ষেপ দৃঢ় করতে নাৎসীরা সাধারণতন্ত্রী সরকারকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ স্পেন সরকার বলল যে ফ্যালাঞ্জিস্টদের দ্বারা অনধিকৃত অঞ্চলের বিদেশীদের জীবন ও সম্পত্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে নেবে। এই প্রতিশ্রুতিকে উপেক্ষা করে জার্মান সরকার আরও যুদ্ধ জাহাজ পাঠাল।

নৌ-শক্তি শুধু চুপ করে রইল না। সে গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে লাগল। বহু আকারে তার সাহায্য এল। সাধারণতন্ত্রের অনুগত স্পেনীয় নৌ-বাহিনীর বোমাবর্ষণ থেকে বিদ্রোহীদের আড়াল করে রাখল জার্মান জাহাজগুলি এবং ফ্যাসিবাদী বিপ্লবের প্রধান ঘাঁটি মরক্কো থেকে প্রেরিত বিদ্রোহীদের রক্ষা করল। উপরন্তু সাধারণতন্ত্রের জাহাজে গোলাবর্ষণকারী বিদ্রোহীদের বন্দুককে জার্মান জাহাজগুলি চিনিয়ে দিল, সাধারণতন্ত্রী নৌ-চলাচলের খবর রাখল এবং ফ্যাসিবাদী জেনারেলদের প্রয়োজনীয় বহু খবর সরবরাহ করল। জার্মান নৌ-সাহায্য ছাড়া মরক্কো থেকে স্পেনে শক্তি ছড়ানোয় বিদ্রোহীরা কখনও সফল হত না, কারণ স্পেনীয় নৌ-বাহিনী ছিল প্রধানতঃ সরকারের অনুগত।

৩

স্পষ্টতঃ বিস্কে উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরে জার্মান নৌশক্তির আবির্ভাবে ইউরোপীয় শান্তির ওপরে আকস্মিক আঘাত, তার সংগে অস্ত্র, গোলাগুলি,

বিমান ও প্রশিক্ষক দিয়ে বিদ্রোহীদের প্রকাশ্য সাহায্যের পেছনে ছিল রাজনৈতিক সামরিক লক্ষ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপরে প্রচণ্ড ফ্যাসিবাদী প্রচার-আক্রমণ এর আরও একটি প্রমাণ। ১৯৩৬-এ নাৎসী দলের ন্যুরেমবুর্গ সম্মেলন স্পেনীয় পরিস্থিতি আলোচনায় অনেক সময় ব্যয় করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ হ'ল ১৫শ শতাব্দীতে রাজত্বকারী রাজা ফার্দিনান্দ ও রাণী ইসাবেলার নীতির বিরুদ্ধে ইহুদীদের প্রতিশোধ, নাৎসীদের এই দাবী শুধু মূর্খ এবং ন্যুরেমবুর্গ সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের উপযুক্ত। জার্মান ফ্যাসিবাদীরা যা কিছু গোপনে বিপ্লবের আগে ও বিপ্লবের অল্প পরেই করেছে, তাতে দেখা যায় যে, নাৎসীরা গৃহযুদ্ধকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর।

নাৎসীরা ইউরোপে একটা নতুন যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। যদি ১৯১১-তে কাইজার উইলহেলমের *প্যান্থার* তৎকালীন কিছু জার্মান রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকে, তাহলে ২৫ বছর পরে এখন স্পেনের তীরে ও মরক্কোতে ফ্যাসিবাদী *লেপার্ড* ও অন্যান্য জার্মান জাহাজের লাফ হল ঔপনিবেশিক দুনিয়ার পুনর্বিভাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সামরিক পরিস্থিতি দখলের নাৎসী বাসনার স্মারক চিহ্ন। আর একটি উদ্দেশ্য হল, নতুন জার্মান অস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা।

জার্মান সশস্ত্র শক্তি ইউরোপের একেবারে দক্ষিণ পশ্চিমে ঝাঁপিয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে অতলান্তিক ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান নৌ-শক্তি, বিশেষতঃ ড্রেডনটসের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটি তার প্রধান শক্তি উত্তর সমুদ্রে জড়ো করতে এবং ফ্রান্সের সংগে ভূমধ্যসাগরীয় জলপথ রক্ষায় ফ্রান্সকে পাঠাতে বাধ্য হ'ল। ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের ফল এবং স্ক্যাপা ফ্লো-তে জার্মান নৌ-বাহিনীর জল ডুবির ফলে ব্রিটিশরা তাদের প্রায় অর্ধেক নৌ-শক্তি ভূমধ্যসাগরে আবার জড়ো করতে পারল। যুদ্ধের প্রথম কয়েক বছর পরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল শুধু ইউরোপে নয়, উপরন্তু ভূমধ্যসাগরবিধৌত অন্যান্য মহাদেশেও চলছিল। ফ্রান্সের সংগে এই সংঘর্ষে ব্রিটেন কিছুটা ইটালীয় সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার পর ইতালির স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি ঐ অঞ্চলের শক্তির ভারসাম্যকে বদলে দিল। ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ইতালীর ফ্যাসিবাদীরা ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। ফ্রান্সের সংগে চুক্তির (১৯৩৫, ৭ই জানুয়ারী) দ্বারা সংরক্ষিত ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে পূর্ব আফ্রিকার এক অংশে ঢুকতে শুরু করল, যে অংশকে কয়েক দশক ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশর থেকে ভারতের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খুব দরকারী মনে করে

এসেছে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে নৌ-বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রকাশিত স্পষ্ট ব্রিটিশ হুমকিতে সাম্রাজ্যবাদী যুগে এই প্রথম কোন প্রত্যক্ষ ফল ফলল না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অনৈক্যকে যারা কাজে লাগাচ্ছিল- সেই ইতালীয় ফ্যাসিবাদীরা নিজেদের যথেষ্ট দৃঢ় মনে করল। অন্য পক্ষে, অনেক কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হুমকি কার্যকরী করতে সাহস করল না।

একটা কারণ হ'ল, ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গভীরভাবে জড়িত একটি শক্তিশালী ইতালীয় বিমানবাহিনীর সেখানে উপস্থিতির ফলে ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চলে রাজনৈতিক-সামরিক ভারসাম্যের আমূল পরিবর্তন। উপরন্তু, ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মতে, এতে ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর বিপদ দেখা দিয়েছে।

ইটালীয় বিমানবহর গঠনের ফলে একটি প্রধান ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটি মাল্টা তার মূল গুরুত্ব হারাল। ভূমধ্যসাগরের মাঝে অবস্থিত মাল্টা পূর্ব ও পশ্চিমে অন্যান্য ব্রিটিশ ঘাঁটি থেকে দূরে এবং ইতালীয় বিমান ঘাঁটিগুলির খুব কাছে। তবু ব্রিটিশ ভূ-মধ্যসাগরে হোরের পরিদর্শন মূল্যবান এবং পরিদর্শনের পর তিনি যা বলেছেন তাতে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টির এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘাঁটি ছাড়ার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না, যদিও তা ইতালীয় বোমাবর্ষণ বাহিনীর এত কাছাকাছি। ব্রিটেন এখন মাল্টার এ্যাণ্টি এয়ারক্র্যাফ্ট অস্ত্রগুলি জড়ো করছে এবং তার অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় ঘাঁটিকে জোরদার করছে। গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া ও অন্যান্য দেশের সংগে বোঝাপড়া করেও সে তার অঞ্চলে নিজের অবস্থা দৃঢ় করছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে, যেখানে ইতালীয় আধিপত্যের ভয় সবচেয়ে বেশী, সেখানে সামরিক ঘাঁটিগুলি মজবুত করে ব্রিটেন ভূমধ্যসাগরের মুখে জিব্রাল্টারে প্রথম শ্রেণীর দুর্গ ও নৌ-ঘাঁটি রাখল—এ ঘাঁটির ভাগ্য ভূমধ্যসাগরীয় শক্তি সাম্যের ওপরে নির্ভর করছে।

অতএব, ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ ঘটলে স্পেনীয় জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে ইতালীয় ও জার্মান ফ্যাসীবাদের হস্তক্ষেপের গুরুতর রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। বিশের দশকে ইটালীয় ফ্যাসীবাদ যখন বিস্তার নীতির সূচনায়, তখন মুসোলিনী ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও পশ্চিমে ঢোকার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে তিনি অনেকবার স্পেনীয় একনায়ক প্রাইমো দ্য রিভেরাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কোন সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়-বিশেষতঃ বেলারিক দ্বীপপুঞ্জে ইটালীকে একটা নৌঘাঁটি দেওয়ার জন্য। তখন ইতালীয় পরিকল্পনা ছিল একেবারে ফরাসী বিরোধী। যদি ফ্যাসিবাদীরা বেলরিক দ্বীপপুঞ্জ, কার্টাজেনা ও সিউটা দিয়ে তৈরী সামরিক ত্রিভুজে দখল পেত, সেটাই ওদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল—তাহলে ফ্রান্স মুস্কিলে পড়ত, কারণ, তাহলে, যুদ্ধের সময়ে তো বটেই, শান্তির সময়েও তার আফ্রিকান সম্পদের সংগে যোগাযোগ

ইটালীর নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। স্বভাবতঃই ফ্রান্স চেষ্টা করল, যাতে ইটালীর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। দৃঢ় ফরাসী কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে, ১৯২৬-এর আগস্টে প্রাইমো দ্য রিভেরা শুধু মধ্যস্থতার বিষয়ে ইতালীর সংগে এক চুক্তি করলেন।

এই ইতালীয় স্পেনীয় চুক্তি তাঞ্জিয়ার সংক্রান্ত ইটালীয় প্রচেষ্টার সূচনা, যাতে দেখা যায় যে, ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়লেও পশ্চিমদিক সম্বন্ধেও সমান আগ্রহী। ১৯২৩-এ ইটালী তাঞ্জিয়ারের অবস্থা নবীকরণের জন্য বৃটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের সভায় আমন্ত্রিত হয়নি—তার যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে ইটালীয় ফ্যাসিবাদীরা তাদের নৌ ক্ষমতা দেখিয়ে ঐ বিষয়ে বৃটিশ সমর্থন যুক্ত প্যারি আলোচনায় চাপ দিতে সক্ষম হল: আন্তর্জাতিক অঞ্চল শাসনে ইটালীর একটা ভাগ রইল এবং তাঞ্জিয়ার সংক্রান্ত আরো অনেক বিষয়ে বলতে দেওয়া হল।

প্রাইমো দ্য রিভেরার পতনের পরে স্পেনীয় বৈদেশিক নীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটল। স্পেন ইটালী থেকে সরে গিয়ে ফ্রান্সের সংগে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করল। ইটালী সরকার নজর রাখল। ইথিওপিয়ার যুদ্ধের সময়ে, বিশেষতঃ পরে তাঞ্জিয়ারে তার আবার আগ্রহ দেখা দিল। ফ্যাসিবাদী ঔপনিবেশিক মন্ত্রীসভার মুখপত্র *এজিয়োন কলোনিয়েল* আবার ঐ আন্তর্জাতিক অঞ্চলের ভবিষ্যৎ আলোচনা করল। তাঞ্জিয়ারে ইটালীয় কূটনৈতিক মিশনের প্রধান এবং সেই সংগে আন্তর্জাতিক শাসনের যদস্য রোসি স্পেনীয় বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে সাহায্য করলেন। স্পেন সরকারের প্রতি অনুগত স্পেনীয় পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে সেখানে ইটালীয় ফ্যাসিবাদীদের বসালেন, যারা বহুভাবে জেনারেল ফ্রাংকোর প্রতিনিধিদের সাহায্য করছে। খুব সম্ভবতঃ তাঞ্জিয়ার থেকে স্পেনীয় সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ জাহাজগুলি সরানোর জন্য ফ্রাংকোর চূড়ান্ত "দাবী"র পেছনে রোসিই ছিলেন প্রধান, তাঞ্জিয়ারে জাহাজগুলি মরক্কো ও স্পেনের যোগাযোগকে বিপদে ফেলত এবং এইভাবে বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষদের সেনাচলাচলে বাধা দিত। তবুও তিনি তাঞ্জিয়ারকে বিদ্রোহীদের পাঠানো ইটালীয় অস্ত্রের মধ্যবর্তী শিবিরে পরিণত করলেন। *নিউজ ক্রনিকল* খবর দিল যে, স্পেনীয় মরক্কোতে ঢোকার জন্য ইটালীর খুব ইচ্ছে। তেতুয়ান ইটালীয় বিমান ঘাঁটি হয়েছে। ঐ ঘাঁটি চালাচ্ছেন ইটালীয় অফিসাররা। বিনা বাধায় ইটালী যেখানে চায় সেখানেই গেছে।

স্পেনীয় জলপথে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে ইটালীয় সাম্রাজ্যবাদ তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রকাশ করল। পালের্মোতে একটা বড় ইটালীয় বাহিনী জড়ো হল। সিসিলি এবং উত্তর আফ্রিকার মাঝামাঝি প্যান্টেলেরিয়ার সুরক্ষিত দ্বীপ হল একটি বড় সামরিক নৌঘাঁটি। ইটালীয় ফ্যাসীবাদীদের দ্বারা স্পেনীয় বিপ্লবীদের বিমান, সমরোপকরণ দিয়ে সাহায্য করায় বোঝা যায় যে, ইতালী পশ্চিম ভূমধ্য-

সাগরে তার উদ্দেশ্য সফল করতে চায় এবং স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সুযোগের ওপরে খুব নির্ভর করছে। কার্যতঃ, বেলারিক দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ, এখন ইতালীয় সামরিক বাহিনী দ্বারা শাসিত মাজোর্কা এখন ইটালী অধিকার করে নিয়েছে। অনেকদিন আগে ইউরোপীয় সংবাদপত্র বলেছিল যে, স্পেনের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার মূল্য স্বরূপ ইটালী বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ চায়। এটা প্রধান বৃটিশ ঘাঁটি জিব্রাল্টারের পক্ষে ভয়ের কথা। সাম্প্রতিক পরিবর্ধিত রাজনৈতিক সামরিক আবহাওয়ায় বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ দখলের (যে ভাবেই হোক) সুদূর প্রসারী ফল দেখা দিতে পারে এবং স্বভাবতঃ ফরাসী রাজনৈতিক গোষ্ঠী উদ্বিগ্ন হল।

৪

প্রথম থেকে জার্মান নাৎসীদের সংগে ইতালীয় ফ্যাসিবাদীরা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। *টাইমস* বলল, নিশ্চয়ই ইটালীয় ও জার্মানদের একটা যৌথ কাজের এক বাহিক চুক্তি রয়েছে। জার্মান ও ইটালীয় যুদ্ধ জাহাজগুলি প্রায় এক সংগে স্পেনীয় জলপথে ঢুকতে লাগল। একই সংগে জার্মান ও ইটালী স্পেন সরকারের ওপরে দাবী প্রতিবাদ এবং প্রকাশ্য হুমকির চাপ সৃষ্টি করতে লাগল, বিনা কারণে। আইনসঙ্গত স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে জার্মান ও ইটালীর সংবাদপত্রের প্রচারও একত্রে চলতে লাগল। বার্গোসে বিদ্রোহী সরকারের অনুকূলে একই সংগে জার্মানী ও ইটালীতে প্রতিধ্বনি শোনা গেল। শেষে, সোভিয়েত বিরোধী প্রচার নাৎসীদের দ্বারা শুরু হলেও শীঘ্রই ইটালীয় সংবাদপত্র তাতে যোগ দিল। স্পেনের বিদ্রোহীদের হয়ে ইটালী ও জার্মান ফ্যাসিবাদীদের এই মিলন গড়ে উঠেছিল ইটালীর প্রচারমন্ত্রী কাউণ্ট আলফিয়েরির বার্লিনে থাকাকালীন।

ইটালী ও জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অনুসৃত হস্তক্ষেপ পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে স্বভাবতঃ নিয়ন্ত্রিত করল ঐ ইটালী জার্মান রাজনৈতিক সহযোগিতা। হস্তক্ষেপকারী ও স্পেনীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে আলোচনার খবর বিদেশী সংবাদপত্রের কাছে ফাঁস হয়ে গেল। খবর পাওয়া গেল যে, ইটালীয় ফ্যাসীবাদীরা বেলারিক দ্বীপপুঞ্জের দখল চায়, আর হিটলার চান ক্যানারিজ দ্বীপপুঞ্জ, সেখানে জার্মান প্রতিনিধিরা খুব সক্রিয়। এটা অনুমান করা যায় যে, পরবর্তী ঘটনা স্রোতের উপরে নির্ভর করে হস্তক্ষেপকারীরা দর বাড়াবে। যে ফ্যাসীবাদীরা পৃথিবীকে নতুন করে ভাগ করার জন্য যুদ্ধ চায় তারা স্পেনের যুদ্ধের সুযোগ নিতে চায়, আফ্রিকায় বৃটেনও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসহ তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রধান জায়গাগুলি দখলের জন্য তারা এই যুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। দুটি ফ্যাসিবাদী শক্তিই স্পষ্টতঃ

পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অধিকার স্থাপন করতে চায়, ইউরোপে যুদ্ধ ঘটলে যা তাদের খুবই সহায়তা করবে।

স্পেনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার আন্তর্জাতিক চুক্তি যাহাতঃ মেনে নিতে বাধ্য হয়েও নাৎসীরা বা ইটালীরা কেউই নিজেদের রাজনৈতিক পথ ত্যাগ করল না। তারা পর্তুগালকে তাদের সদর দপ্তর এবং স্পেনীয় বিদ্রোহীদের নির্ভর যোগ্য আশ্রয় রূপে ঠিক করল। ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মত হল যে, সালাজারের ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র সর্বাগ্রে চায় স্পেনে গণতন্ত্র ধ্বংস হোক, কারণ, তার আশা যে বিদ্রোহীদের জয়ের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব সুদৃঢ় হবে।

কিন্তু ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা আরো এগিয়ে গেল। স্পেনে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব ঘটলে স্বভাবতঃ ইটালী ও জার্মানি আইবেরিয়ান পেনিনসুলায় অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে বৃটিশ যোগাযোগের পথও গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটির পক্ষে নতুন বিপদ তো সৃষ্টি করতই, উপরন্তু ফ্রান্সের পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে দেখা দিত। ফ্রান্স ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী বিপদে পড়ত। ফ্যাসিবাদী স্পেনের অর্থ ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদী যে প্রতিক্রিয়ায় এখন চাপা পড়েছে তা মাথা তুলে ফরাসী জনগণের গণতান্ত্রিক লাভ ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে। হিটলার ও তাঁর পরিকল্পনার আশা ছিল, চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা ফ্রান্সে ক্ষমতাশালী হয়ে জাতীয় স্বার্থকে নষ্ট করে নাৎসী জার্মানির সহায়ক হবে।

স্পেনে সশস্ত্র ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার সময়ে নাৎসীরা স্পষ্ট আশা করছিল যে, দেশটা প্রথমে জার্মান ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার, তারপরে রাজনৈতিক এবং পরে দরকার হলে ভাবী যুদ্ধের সামরিক রঙ্গমঞ্চের প্রস্তুতি ক্ষেত্র হবে। যদি স্পেনে ব্যবহৃত রাজনৈতিক পদ্ধতি নাৎসীরা ফ্রান্সে ছড়াতে পারে, তাহলে ইউরোপে তাদের পরিকল্পিত সামরিক আক্রমণ কার্যকরী করা আরো সহজ হবে। ফ্রান্সে যুক্ত ফ্রন্টকে ভাঙ্গার চেষ্টার সংগে জড়িত এই পরিকল্পনা নাৎসীরা গোপন করল না।

জার্মান ও ইটালীর ফ্যাসিবাদীদের সহায়তায় স্পেনে যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিল, সাধারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা দিল। ফ্যালাঞ্জিস্টদের জয় হলে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসীরা একটা বড় যুদ্ধের দিকে আরো এক পা এগিয়ে যাবে।

স্পেনে ফ্যাসিবাদী হস্তক্ষেপ হল নতুন যুদ্ধের রচয়িতাদের আগ্রাসী পরিকল্পনার অংশ, অংশত এই হস্তক্ষেপ ইউরোপের শান্তিতে নতুন রাজনৈতিক ও সামরিক আতংক সৃষ্টির চেষ্টা। ফ্রাংকো বিদ্রোহীরা কখনো নাৎসী ও ইটালীয় সাহায্য ছাড়া এগোত না, কারণ তাহলে ওরা নিশ্চিত ব্যর্থ হত। জার্মানি ও ইতালীর সাহায্য না থাকলে কয়েকটি সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল ও আর্থিক সংখ্যালঘুর সরকারের উত্থানকে গণতান্ত্রিক স্পেনের আইনসংগত

সরকার, যার পেছনে জনগণের সমর্থন রয়েছে, অনেক আগেই দমন করত। সরকারী সশস্ত্র বাহিনী, বিমান ও নৌবহরের প্রযুক্তিগত ক্ষমতার সমান যে বিদ্রোহীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সে শুধু জার্মান ও ইটালীয় সাহায্যের কারণের আধুনিক বিমান, ট্যাংক ভারী বন্দুক ইত্যাদি।

ফ্যাসিবাদী হস্তক্ষেপ এবং স্পেন মরক্কোকে বিদ্রোহীদের রসদ ঘাঁটিতে পরিণত করাটা আন্তর্জাতিক চুক্তিকে একেবারে অমান্য করা। তবু ১৯৩৬-এর আগস্টের হস্তক্ষেপ বিরোধী চুক্তি সত্ত্বেও, হস্তক্ষেপ ঘটতে লাগল এবং আগ্রাসীরা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিতে কতটা অবিশ্বাসী তার নতুন প্রমাণ দিল।

যেসব পুঁজিবাদী দেশের অন্তত: বর্তমানে যুদ্ধে কোন বিপদ নেই, তাদের আপস যে কোথায় পেঁছিতে পারে, ইটালী জার্মান হস্তক্ষেপ তারই স্পষ্ট প্রমাণ। হস্তক্ষেপ-বিরোধী চুক্তি হ'ল ফরাসী সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল বৈদেশিক নীতির ফল অবশ্য হস্তক্ষেপ-বিরোধী কমিটির পরিকল্পনা দিয়েছিলেন বৃটিশ কূটনীতিকরা। ফরাসী সরকারের প্রধান লিয় ব্লাম বুদ্ধিটা নিয়েছিলেন। ঠিক হল যে রক্ষণশীল দলের নেতা, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বল্ডউইনের চেয়ে উনি সমাজতান্ত্রিক নেতা, হস্তক্ষেপ বিরোধিতার সমর্থনের বেশী উপযুক্ত। বৃটিশ নীতির দুটি উদ্দেশ্য ছিল: প্রথম স্পেনের বিশেষত: যুক্ত ফ্রন্টের গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা আর দ্বিতীয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী পূর্বমুখী জার্মান বিস্তারের জন্য হিটলার জার্মানির লক্ষ্য সহ "বড় শিকার"—এর জটিলতা বাড়াতে অনিচ্ছা।

ফরাসী সরকারের মনোভাবে ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীলরা গর্বিত হল। স্পেনে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হয়ে তারা স্বদেশে গৃহযুদ্ধের স্বপ্ন দেখতে লাগল। ফ্রান্সের ফ্যাসিবাদীরা নিজেদের "জাতীয়তাবাদী" বললেও তারা পিরেনিজের ওপারে ফ্রান্সের পিছন দরজায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মান আগ্রাসনের নতুন ঘাঁটি তৈরীতে খুব ইচ্ছুক। পর্তুগালের উপরে নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ বৃটিশ বুর্জোয়াদের আশীর্বাদ ছিল, না হলে সে স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বড় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপের পথ হয়ে উঠতে সাহস করত না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী হস্তক্ষেপকারীদের নিন্দা করল এবং যারা ভেবেছিল হস্তক্ষেপ বিরোধিতার আড়ালে বিদ্রোহীদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে, তাদের মুখোশ খুলে দিল। সে হস্তক্ষেপ বিরোধিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, যদিও আইনসংগত স্পেন সরকারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতাকে ভুল মনে করে। স্বাক্ষর সে করল শান্তির স্বার্থে ফরাসী সরকারের অনুরোধে, এই আশায় যে, এই চুক্তির মাধ্যমে স্পেনে ইতালী-জার্মান হস্তক্ষেপের মাত্রাকে থামানো বা সংযত করতে পারবে। স্পষ্টত:, ফ্র্যাংকের ফ্যাসিবাদী

বিপ্লব দ্রুত অবদমিত হত, যদি সামরিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যেত। অবশ্য যখন দেখা গেল যে, এই চুক্তি শুধু বিদ্রোহীদের ফ্যাসিবাদী সাহায্য দেওয়ার ছল মাত্র, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে দাবী করল যে, এ চুক্তি বাতিল করা হোক।

ফ্রাঙ্কোবিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত স্পেনীয়রা শুধু গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিজেদের স্বাধীনতাকেই সমর্থন করছে না, উপরন্তু যারা পৃথিবী পুনর্বিভাগের জন্য নতন যুদ্ধ তৈরী করছে, তাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের শান্তিকেও রক্ষা করছে। বিদ্রোহী ও জার্মানি, ইটালির ফ্যাসিবাদী শক্তির যোথ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝরানো রক্ত দিয়ে বীর স্পেনীয়রা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জনতার যুদ্ধের এক সুন্দর অধ্যায় লিখছে।

১৯৩৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক পূর্ব ইতিহাস

মানুষের ইতিহাসের কয়েকটি রক্তাক্ষর দিন নিয়ে মানুষ সংগতভাবেই গর্ব করতে পারে। সেই দিনগুলি মানুষের মনে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে, প্রগতির পথ আলোকিত করে, মানুষের উচ্চমূল্য গুলিকে সুনিশ্চিত করে উন্নততর ভবিষ্যতের পথ দেখায়। কিন্তু অনেক ঘটনা গভীর বিপদের স্মারক হয়ে থাকে, যেমন, বিস্তার নীতিতে আগ্রহী আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইউরোপ ও পৃথিবীকে যখন যুদ্ধ মৃত্যু ও ধ্বংসের কবলে এনে ফেলল, তখন যে বিপদ লোকের সামনে দেখা দিয়েছিল।

যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করল, তখন সে তার শত্রুর শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। হিটলারের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ শুরু করে তিনি কয়েকটি বিদ্যুৎগতি আঘাতে দ্রুত এক এক করে শত্রু বিধ্বস্ত করে ইউরোপ ও পৃথিবীর উপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

কমিউনিজম বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিয়ে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাবার ইচ্ছাকে গোপন করলেন না এবং তার জন্য তৈরী হলেন। কিন্তু তার উন্মত্ত কমিউনিজম বিরোধিতার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল: তার আশা ছিল, "বলশেভিকবাদের বাহন" পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে একথা বিশ্বাস করানোয় তার সহায়ক হবে যে, "লাল বন্যার বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানি শেষ অবলম্বন।" তিনি বলেছিলেন, "বিপদ পার হওয়া ভার্সাই চুক্তি ও পুনরস্ত্রীকরণ চুক্তি থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র পথ" হল ওদের এটা বিশ্বাস করানো।

সত্যিই, দুটি যুদ্ধের মাঝে পশ্চিম বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ একচেটিয়া কারবারীরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ওসমরবাদ জাগিয়ে তোলার অনেক চেষ্টা করে-ছিল এটা তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর ইচ্ছে ছিল। সে জাগরণ এত দ্রুত হল যে, ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে জার্মান একচেটিয়া পুঁজি বহুদিকে বিস্তার লাভ করতে পারত। তার শাখা ছড়িয়ে পড়ল মধ্য, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে, মধ্য প্রাচ্যে

(তুরস্ক, ইরান ইরাক, মিশর এবং প্যালেস্টাইনে), দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশে, বিশেষতঃ জার্মানী যে সব অঞ্চলে একদা শাসন করত। শীঘ্রই ল্যাতিন আমেরিকায় জার্মান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষিত হল, যে অঞ্চলকে, প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অঞ্চল বলে মনে করত।

ইউরোপের ভিতরে ও বাইরে হিটলারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক দাবী জার্মান সমরবাদের আশ্চর্য বৃদ্ধি তার জাতিবাদের বল্গাহীন প্রচার, আক্রমণ এবং বার্লিন রোম টোকিও অঞ্চলে নাৎসীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ থেকে বোঝা যায় যে, জার্মানী আবার বিশ্ব শান্তির পক্ষে আতংক হয়ে দেখা দিয়েছে।

দূর প্রাচ্যে জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন, সেখানে জাপানী সমরবাদীরা চীনের উপরে লাফিয়ে পড়েছে এবং নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী সামরিক নীতির ফলে ইউরোপে আরেকটি যুদ্ধের সম্ভাবনা সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় জাতিগুলি তখনো আশা করছিল যে, একটা নতুন বিস্ফোরণ বন্ধ করা যাবে। ১৯১৪-১৮-র যে যুদ্ধ বলকান অঞ্চলে শুরু হয়েছিল, তার অভিজ্ঞতা এবং যে সমরবাদী শক্তিগুলি পৃথিবীকে আবার ভাগ করতে চাইছিল, তাদের আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে শান্তি সর্বত্র বিস্তারী, ইউরোপের এক অংশের আগ্রাসী যুদ্ধ নিশ্চয়ই সারা মহাদেশে ছড়াবে এবং সে যুদ্ধ নিশ্চয়ই গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। ইতিহাসের শিক্ষা হল যে, ছোট বা স্থানীয় যুদ্ধের ফ্যাসিবাদী ধারণার উদ্দেশ্য হ'ল শত্রুর ঐক্য নষ্ট করে তাদের একে একে ধ্বংস করার ইচ্ছা গোপন করা।

অতীত অভিজ্ঞতানুযায়ী পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝতে পারল যে, তার ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সংগে পারস্পরিক চুক্তি যথেষ্ট নয়। সে প্রাণপণে যৌথ নিরাপত্তার চেষ্টা করতে লাগল, যাতে হিটলারকে বাধা দিয়ে যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তিকে দৃঢ় করা যায়। ক্ষুদ্র বৃহৎ, ইউরোপীয় অ-ইউরোপীয় সব জনগণের তাতে উপকার হবে।

এ জন্য হিটলার তার কূটনীতি চালনা করলেন, প্রথম, আগ্রাসী শক্তি গোষ্ঠীকে দৃঢ় করা এবং দ্বিতীয় যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেওয়া। প্রথম উদ্দেশ্য সাধিত হল ১৯৩৬-এর ২৫শে নভেম্বরে সম্পাদিত প্রকাশ্য সোভিয়েত বিরোধী কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তির দ্বারা এর লক্ষ্য ছিল বৃটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রও। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হল, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার জন্য কূটনৈতিক কৌশলের দ্বারা। দুটি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত কারণ নিজেদের কমিউনিজম বিরোধিতার সমর্থক বলে ঘোষণা করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিমী শক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে লাভবান হওয়া, তাদের কাছে সুবিধা আদায় করা এবং তারপর

ইইরোপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্রুততম সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার আশা করেছিল।

ইতিমধ্যে পশ্চিমী শক্তিগুলির আশা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই ফ্রণ্টে হিটলার-জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে—তার অবস্থাকে কঠিন করে তোলা। তাদের ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, তারা যেন জার্মান পরিকল্পনাকে ন্যায্য মনে করল। প্রকৃতই ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীয় আক্রমণ, চীনের বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রমণ এবং সাধারণতন্ত্রী স্পেনের বিরুদ্ধে ইতালী-জার্মান হস্তক্ষেপের চেষ্টায় দেখা গেল যে, পশ্চিমী শক্তিরা আক্রমণে বাধা দেওয়ার চেয়ে বরং সেদিকে ঝুঁকেই পড়ল। উপরন্তু, হিটলার অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করতে চান, জানতে পেরে বৃটিশ বৈদেশিক সচিব লর্ড হ্যালিফাক্স ওকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য জার্মানির ভূমিকা সম্বন্ধে "সম্পূর্ণ সচেতন" এবং জার্মানিকে "বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে যথার্থই পশ্চিমের অবরোধ বলে মনে করা" যায়। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাবের কথা জেনে হ্যালিফাক্স স্বীকার করলেন যে, "পৃথিবী অচল নয়" এবং সম্ভাব্য" শক্তিকে সাধারণ একটি লক্ষ্যে চালিত করার" পরামর্শ দিলেন।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কোন "সাধারণ লক্ষ্য?" যখন হিটলার তার উপনিবেবেশসংক্রান্ত দাবী জানালেন, তখন হ্যালিফাক্স তাকে উপদেশ দিলেন, জার্মান প্রসারণ সম্পূর্ণ অন্যপথে চালাতে : মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, বিশেষতঃ অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ডানজিগ।

১৯৩৮-এর মার্চের শুরুতে বার্লিনে বৃটিশ দূত স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন হিটলারকে আশ্বাস দিলেন যে, ফুয়েরারের সবচেয়ে ভাল সহযোগী হবেন লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন, তিনি, "কিছুই গোপন করলেন না, যৌথ নিরাপত্তাজাতীয় সব কথাই ব্যাখ্যা করলেন," উপরন্তু বুঝিয়ে দিলেন যে, হিটলার জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকারে তার সরকারের আপত্তি ছিল না।

হিটলার উত্তর দিলেন, যে, তার উদ্দেশ্য "রাশিয়াবিহীন ইউরোপের ঐক্য," ওদিকে নাৎসী দূতরাও ফ্রান্সের শাসকদের সংগে একই রকম কথাবার্তা চালাতে লাগল।

১৯৩৮-এর ১১ই মার্চ জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়াতে হানা দিল। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স আক্রমণ স্বীকার করল। একা সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ় ভাষায় এর নিন্দা করে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এর ফল সম্বন্ধে পৃথিবীকে সাবধান করে দিল। সতর্কবাণীতে বলা হল, "আগামীকাল অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখন খুব দেরী হবে না যদি সব রাষ্ট্র, বিশেষতঃ বৃহৎ শক্তিবর্গ শান্তির যৌথ নিরাপত্তা সমস্যা সম্বন্ধে দৃঢ় ও একমুখী মনোভাব গ্রহণ করে।"

(তুরস্ক, ইরান ইরাক, মিশর এবং প্যালেস্টাইনে), দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশে, বিশেষতঃ জার্মানী যে সব অঞ্চলে একদা শাসন করত। শীঘ্রই ল্যাতিন আমেরিকায় জার্মান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষিত হল, যে অঞ্চলকে, প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অঞ্চল বলে মনে করত।

ইউরোপের ভিতরে ও বাইরে হিটলারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক দাবী জার্মান সমরবাদের আশ্চর্য বৃদ্ধি তার জাতিবাদের বল্গাহীন প্রচার, আক্রমণ এবং বার্লিন রোম টোকিও অঞ্চলে নাৎসীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ থেকে বোঝা যায় যে, জার্মানী আবার বিশ্ব শান্তির পক্ষে আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

দূর প্রাচ্যে জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন, সেখানে জাপানী সমরবাদীরা চীনের উপরে লাফিয়ে পড়েছে এবং নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী সামরিক নীতির ফলে ইউরোপে আরেকটি যুদ্ধের সম্ভাবনা সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় জাতিগুলি তখনো আশা করছিল যে, একটা নতুন বিস্ফোরণ বন্ধ করা যাবে। ১৯১৪-১৮-র যে যুদ্ধ বলকান অঞ্চলে শুরু হয়েছিল, তার অভিজ্ঞতা এবং যে সমরবাদী শক্তিগুলি পৃথিবীকে আবার ভাগ করতে চাইছিল, তাদের আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে শান্তি সর্বত্র বিস্তারী, ইউরোপের এক অংশের আগ্রাসী যুদ্ধ নিশ্চয়ই সারা মহাদেশে ছড়াবে এবং সে যুদ্ধ নিশ্চয়ই গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। ইতিহাসের শিক্ষা হল যে, ছোট বা স্থানীয় যুদ্ধের ফ্যাসিবাদী ধারণার উদ্দেশ্য হ'ল শত্রুর ঐক্য নষ্ট করে তাদের একে একে ধ্বংস করার ইচ্ছা গোপন করা।

অতীত অভিজ্ঞতানুযায়ী পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝতে পারল যে, তার ফ্রান্স ও চেকোশ্লভাকিয়ার সংগে পারস্পরিক চুক্তি যথেষ্ট নয়। সে প্রাণপণে যৌথ নিরাপত্তার চেষ্টা করতে লাগল, যাতে হিটলারকে বাধা দিয়ে যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তিকে দৃঢ় করা যায়। ক্ষুদ্র বৃহৎ, ইউরোপীয় অ-ইউরোপীয় সব জনগণের তাতে উপকার হবে।

এ জন্য হিটলার তার কূটনীতি চালনা করলেন, প্রথম, আগ্রাসী শক্তি গোষ্ঠীকে দৃঢ় করা এবং দ্বিতীয় যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেওয়া। প্রথম উদ্দেশ্য সাধিত হল ১৯৩৬-এর ২৫শে নভেম্বরে সম্পাদিত প্রকাশ্য সোভিয়েত বিরোধী কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তির দ্বারা এর লক্ষ্য ছিল বৃটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রও। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হল, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করার জন্য কূটনৈতিক কৌশলের দ্বারা! দুটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কারণ নিজেদের কমিউনিজম বিরোধিতার সমর্থক বলে ঘোষণা করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিমী শক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে লাভবান হওয়া, তাদের কাছে সুবিধা আদায় করা এবং তারপর

ইইরোপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্রুততম সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার আশা করেছিল।

ইতিমধ্যে পশ্চিমী শক্তিগুলির আশা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই ফ্রণ্টে হিটলার-জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে—তার অবস্থাকে কঠিন করে তোলা। তাদের ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, তারা যেন জার্মান পরিকল্পনাকে ন্যায্য মনে করল। প্রকৃতই ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীয় আক্রমণ, চীনের বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রমণ এবং সাধারণতন্ত্রী স্পেনের বিরুদ্ধে ইতালী-জার্মান হস্তক্ষেপের চেষ্টায় দেখা গেল যে, পশ্চিমী শক্তিরা আক্রমণে বাধা দেওয়ার চেয়ে বরং সেদিকে ঝুঁকেই পড়ল। উপরন্তু, হিটলার অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করতে চান, জানতে পেরে বৃটিশ বৈদেশিক সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ওকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য জার্মানির ভূমিকা সম্বন্ধে "সম্পূর্ণ সচেতন" এবং জার্মানিকে "বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে যথার্থই পশ্চিমের অবরোধ বলে মনে করা" যায়। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাবের কথা জেনে হ্যালিফ্যাক্স স্বীকার করলেন যে, "পৃথিবী অচল নয়" এবং সম্ভাব্য" শক্তিকে সাধারণ একটি লক্ষ্যে চালিত করার" পরামর্শ দিলেন।

আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কোন "সাধারণ লক্ষ্য?" যখন হিটলার তার উপনিবেশসংক্রান্ত দাবী জানালেন, তখন হ্যালিফ্যাক্স তাকে উপদেশ দিলেন, জার্মান প্রসারণ সম্পূর্ণ অন্যপথে চালাতে: মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, বিশেষতঃ অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ডানজিগ।

১৯৩৮-এর মার্চের শুরুতে বার্লিনে বৃটিশ দূত স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন হিটলারকে আশ্বাস দিলেন যে, ফুয়েরারের সবচেয়ে ভাল সহযোগী হবেন লণ্ডনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন, তিনি, "কিছুই গোপন করলেন না, যৌথ নিরাপত্তাজাতীয় সব কথাই ব্যাখ্যা করলেন," উপরন্তু বুঝিয়ে দিলেন যে, হিটলার জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া অধিকারে তার সরকারের আপত্তি ছিল না।

হিটলার উত্তর দিলেন, যে তার উদ্দেশ্য "রাশিয়াবিহীন ইউরোপের ঐক্য," ওদিকে নাৎসী দূতরাও ফ্রান্সের শাসকদের সংগে একই রকম কথাবার্তা চালাতে লাগল।

১৯৩৮-এর ১১ই মার্চ জার্মান বাহিনী অস্ট্রিয়াতে হানা দিল। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স আক্রমণ স্বীকার করল। একা সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ় ভাষায় এর নিন্দা করে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে এর ফল সম্বন্ধে পৃথিবীকে সাবধান করে দিল। সতর্কবাণীতে বলা হল, "আগামীকাল অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখন খুব দেরী হবে না যদি সব রাষ্ট্র, বিশেষতঃ বৃহৎ শক্তিবর্গ শান্তির যৌথ নিরাপত্তা সমস্যা সম্বন্ধে দৃঢ় ও একমুখী মনোভাব গ্রহণ করে।"

ইতিমধ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ হিটলারকে চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের জন্য উস্কাতে লাগল, যার সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি ছিল।

কিভাবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে "শান্ত" করার নামে পশ্চিমী চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানির দয়ার উপরে ছেড়ে দিল, সে করুণ কাহিনী অতি পরিচিত। যখন ১৯৩৮-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর রাতে মিউনিখের অধিবেশনকক্ষে—যেখানে চার শক্তি, জার্মানি, ইতালী, বৃটেন ও ফ্রান্সের অধিবেশন বসেছিল, সেখানে চেকোশ্লোভাকিয়া প্রতিনিধিদের ডাকা হল, তখন এক সাক্ষীর ভাষায়, "আবহাওয়া ছিল থমথমে ; যেন দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হচ্ছে।"

সে দণ্ড রচিত হল রুদ্ধকক্ষে। যখন হিটলার বললেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভাগ করার সময় হয়েছে এবং মুসোলিনী তা সমর্থন করলেন, তখন চেম্বারলেন উত্তর দিলেন যে, তার মনে হয়, অপেক্ষা করার আর দরকার নেই। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দলাজিয়র বললেন : "অনেকদিন ধরেই আমার এই মত, যদিও ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি রয়েছে।"

এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কারবারীদেরও হাত ছিল। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে হিটলারের দূত ডিকহফ বার্লিনে খবর পাঠালেন যে, প্রাচ্যে জার্মান প্রসারণ ওয়াশিংটন থেকে কোন বাধা পাবে না, কারণ, ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি গ্রহণকারী গোষ্ঠী এরকম প্রসারের পক্ষে। বৃটেনে মার্কিন দূত জোসেফ কেনেডি, মর্গান, বারুচ ও হার্স্টের সংগে এই মত প্রকাশ করলেন যে, জার্মানির অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে স্বাধীনতা দিতে হবে।

নিজেদের ধারণা অভ্রান্ত এই বিশ্বাস নিয়ে কমিউনিজম-বিরোধিতায় উৎসাহিত হয়ে বৃটেন ফ্রান্সের শাসকরা মার্কিন একচেটিয়া কারবারীদের সমর্থনসহ নাৎসীদের সংগে এক চুক্তি করলেন। ইতিমধ্যে, মিউনিখের ফলাফলের জন্য পাশ্চাত্য প্রচার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে দোষ চাপাল, যদিও দলিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সব গোষ্ঠীকে যৌথ প্রতিরোধের অনুরোধ জানিয়েছিল এবং কূটনৈতিক ও সামরিক পথে আশ্বাস দিয়েছিল যে, সে তার নিয়মকে সম্মান জানাবে। ১৯৩৮-এর মে-র মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্ট এডয়ার্ড বেনেসকে জানাল যে, যদি ফ্রান্স তার প্রতিশ্রুতি ফিরিয়েও নেয় তবুও সে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি সে আত্মরক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে এইরকম সাহায্যের অনুরোধ জানায়। কিন্তু বেনেস এবং চেকোশ্লোভাকিয়াক সরকার প্রথম যেন প্রতিরোধ ও আত্মসমর্পণের মধ্যে পথ বেছে নেওয়ার ভাব দেখিয়ে প্রকাশ্যে দ্বিতীয় পথ বেছে নিলেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা গর্বিত হলেন। মিউনিখ থেকে ফিরে আত্মমুগ্ধ নেভিল চেম্বারলেন জানালেন যে, "একটি প্রজন্মের জন্য" শান্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এর

দ্বারা তিনি প্রাচ্যে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের মূল্যে পশ্চিমের শান্তির কথা বোঝালেন। বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিক, উইলিয়াম বুলিট বললেন: "রাশিয়াকে তার ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নিজেদের দেশ থেকে জার্মানির আতংককে অন্যত্র চালিত করবে।"

ঘটনায় দেখা দেখা গেল যে, মিউনিখ চুক্তি শুধু পশ্চিমী ভ্রান্তি নয়, অপরাধমূলক বিনিময়।

অবশ্য, কিছুদিন পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিশ্চিত ছিল যে, "প্রাচ্যমুখী প্রসারণ কোন না কোন সময়ে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের সব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই। অবশ্য ১৯৩৯-এর এপ্রিলে হিটলার পরিকল্পনা বদলালেন। মিউনিখের পর থেকে বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি হয়েছে দেখে, তিনি ঠিক করলেন যে, প্রথম আঘাত সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গের ওপরে হানা বেশী লাভ জনক হবে। তার সংগে "প্রাথমিক" হিসাবে পোল্যাণ্ডকে আঘাত করা হবে।

চেকোস্লোভাকিয়াকে গ্রাস করে জার্মানি তখনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের জন্য ব্যস্ত না হয়ে পশ্চিমে আঘাত হানার জন্য সামরিক ও আদর্শগত প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। সক্রিয় বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আলোচনা শুরু করল (১৯৩৯, ১৫ই এপ্রিল), কিন্তু সার্বিক সাহায্যের নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি আদাই করাই ছিল তাদের প্রস্তাব এবং বিনিময়ে কোন প্রতিশ্রুতি তারা এড়িয়ে চলছিল। যদি হিটলার জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে, তাহলে তাঁকে নিজেই নিজেকে বাঁচাতে হবে। বৃটিশ ও ফরাসী উদ্দেশ্য আরো সন্দেহজনক, কারণ ঐ দুই শক্তি বাল্টিক সাধারণতন্ত্রকে প্রতিশ্রুতি দানের সোভিয়েত প্রস্তাব একগুঁয়ের মত খারিজ করে দিল। এর অর্থ, তারা হিটলারকে ইংগিত করছে যে, তাঁর আক্রমণ পূর্বমুখী হওয়া উচিত, আক্রমণ ও যুদ্ধ থামাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তি কবার চেয়ে তারা মস্কো আলোচনা জার্মানিকে প্রভাবিত করা ও নাৎসীদের সংগে চুক্তির জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। এটা আরো স্পষ্ট হল, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক মিশন ১৯৩৯-এর ১২ই আগস্ট মস্কোর সংগে আলোচনা শুরু করল।[১]

এই আলোচনার উদ্যোক্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তির প্রস্তাব আনল, তখন কি করে সামরিক প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটানো যায় বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক মিশন তার আলোচনা এড়িয়ে গেল এবং তার বদলে সামরিক সহযোগিতার "সাধারণ লক্ষ্য" এবং "সাধারণ নীতি" রূপায়নের প্রস্তাব

১। ইন্টার ন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, নং ২, ৩, মস্কো, ১৯৫৯।

করল। উপরন্তু, আলোচনার সময়ে দেখা গেল যে, গুরুত্বহীন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক মিশনের যৌথ কার্যক্রমের কোন প্রাথমিক সামরিক পরিকল্পনা নেই এবং বৃটিশ মিশনের সামরিক চুক্তি সম্পাদনের অধিকার পর্যন্ত নেই।

মার্শাল ক্লিমেণ্ট ভোরোশিলভ প্রশ্ন করলেন: "যদি ফ্রান্স ও বৃটেনকে, পোল্যাণ্ড বা রুমানিয়াকে কিংবা পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে বা তুরস্ককে একত্রে আক্রমণ করে, তা হলে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর অংশগ্রহণকে ফ্রান্স ও বৃটেনের মিশন বা সৈন্যবাহিনী কি ভাবে নেবে? সংক্ষেপে, আগ্রাসীর বা আগ্রাসীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ কার্যকলাপকে বৃটিশ ও ফরাসী মিশন কি ভাবে নেবে, যদি এইমাত্র উল্লিখিত দেশগুলি বা আলোচনায় যোগদানকারী দলের কারোর বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেয়?"

ফ্রান্সের জেনারেল দুমাঁক উত্তর দিলেন:

"আপনার উল্লিখিত দেশগুলি সম্বন্ধে মনে হয়, তাদের অঞ্চলরক্ষা তাদের কাজ। কিন্তু সাহায্যের দরকার হলে আমরা তাদের সাহায্য করব।"

মার্শাল ভোরোশিলভ: "যদি ওরা খুব দেরীতে সাহায্য চায়; তা'হলে ওরা আত্মসমর্পণ করবে।"

জেনারেল দুমাঁকের অক্ষম অজুহাত: "সেটা খুব অপ্রীতিকর হবে।"

পশ্চিমী শক্তিবর্গের অন্য কোন প্রস্তাব ছিল না। বার বার তারা পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের মনোভাবের কথা বলছিল, ঐ সব সরকার ওদের অনুরোধে দেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সোভিয়েত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল। আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দিল। সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের প্রধান ২১শে অগাস্ট দেখলেন যে "সামরিক আলোচনা শুরু করা ও তাতে বাধা দেওয়ার দায়িত্ব স্বভাবতঃ বর্তায় ফরাসী ও বৃটিশ পক্ষের ওপরে।"

সোভিয়েত অনুমান ঠিক ছিল। দলিলে দেখা যায় যে, হিটলার জার্মানীর সংগে গোপন আলোচনা জনগণের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখা এবং জার্মানিকে চাপ দিয়ে আরো নমনীয় করার জন্য তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আলোচনা করেছিল।

প্রথমে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তির সম্ভাবনায় হিটলার খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু লণ্ডনে জার্মান দূত ডার্কসেন বৃটিশ সরকারী গোষ্ঠীর আশ্বাস পেয়ে তাঁর ভয় কমালেন। তিনি ১৯৩৯-এর ১লা আগস্টে বার্লিনে তারবার্তা পাঠালেন, "সামরিক মিশনের উদ্দেশ্য হল, যুদ্ধের ব্যবস্থা করার চেয়ে বরং সোভিয়েত বাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা নিরূপণ।"[২] তিনি

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত দলিল এবং বস্তু, খণ্ড ২, পৃ. ১০৩।

আশ্বাস দিলেন যে, বৃটিশ সামরিক মিশন পর্যবেক্ষণের জন্য মস্কোতে এসেছে। অর্থাৎ, ওটা একটা আবরণ মাত্র, আর কিছু নয়।

প্রকাশিত দলিলে দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গ হিটলারের সংগে চুক্তির চেষ্টা করছে। বার্লিনের চেষ্টায় জার্মানির সংগে তাদের আলোচনা আবার শুরু হল ৭ই জুন এবং হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের দিন পর্যন্ত বহুপথে চলতে লাগল সুইডিশ মধ্যস্থ, শিল্পপতি ওয়েনার, গ্রেনেক্স এবং ডালেরাসের মাধ্যমে হিটলার শর্ত বাড়াতে লাগলেন: কোনোদিন চান আফ্রিকায় উপনিবেশ, পরের দিন হয়ত মধ্য প্রাচ্যে তৈল-অঞ্চল। স্বভাবত: বৃটেন এসব নাৎসী দাবী মেটাতে ইচ্ছুক ছিল না। পরিবর্তে সে প্রস্তাব দিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনকে দিয়ে জার্মানি তার খিদে মেটাক, কারণ বৃটিশ ও জার্মান প্রভাবের ক্ষেত্র একেবারে নির্দিষ্ট; প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন গোষ্ঠী অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করল (যেমন, আর্থার ভ্যাণ্ডেনবার্গ, হ্যামিল্টন ফিস ও অন্যান্য)।

গোয়েরিং-এর প্রতিনিধি হোরেস উইলসন উলটাটকে বললেন যে জার্মানির সংগে চুক্তি হলে বৃটেন পোল্যাণ্ডের সংগে চুক্তি থেকে রেহাই পাবে, অর্থাৎ যদি নাৎসীরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বমুখী আক্রমণ চালায় তাহলে পোল্যাণ্ড ওদের হাতে থাক। ২৯শে জুলাই শ্রমিক দলের এক মুখপাত্র চার্লস্ রোডেন বাক্সটন জার্মান দূতালয়ের উপদেষ্টা কোর্টের সংগে দেখা করলেন এবং নিম্নলিখিত ভাষায় এক বিশদ ইংগ-মার্কিন চুক্তির কথা বললেন:

১। জার্মানি বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

২। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে জার্মান প্রভাবের ক্ষেত্রকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে গ্রেটবৃটেন। এর ফলে জার্মান প্রভাবাধীন কয়েকটি রাষ্ট্রকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি গ্রেটবৃটেন ত্যাগ করছে। সে আরো কথা দিচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বন্ধন ছিন্ন করা ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের সংগে যোগাযোগ ভাঙ্গার জন্য সে ফ্রান্সকে প্রভাবিত করবে।

৩। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তির জন্য বর্তমান আলোচনা ভেঙে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রেটব্রিটেন দিচ্ছে।"

এই সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা উইলসন ও চেম্বারলেন কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে আলোচনা সরকারী ধারায় চলতে লাগল। কয়েক দিন পরে ৩রা আগস্ট ১৯৩৯-এ উইলসন ডার্কসেনকে বোঝালেন যে সম্ভাব্য ইংগ-জার্মান চুক্তি "বৃটিশ সরকারকে পোল্যাণ্ড, তুরস্ক ইত্যাদিকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে।"

উইলসন দাবী করলেন যে, ইংগ-জার্মান আলোচনা গোপন থাকবে। ডার্কসেন বৈদেশিক সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সংগে দেখা করলে তিনি

আশ্বাস দিলেন যে, "জার্মানির সংগে বোঝাপড়ার জন্য বৃটিশপক্ষ অনেক দূর এগোবে।

ডার্কসেন বার্লিনে গেলেন। বৃটিশ সরকারের আশা হল যে, তিনি হিটলারের সম্মতি নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু হিটলার দাবী ত্যাগ করার কথা ভাবতেই পারেন নি। তাঁর কাছে বৃটিশ প্রস্তাব হল দুর্বলতার নতুন প্রমাণ এবং এতে বোঝা যায় যে, "জার্মান-পোলিশ যুদ্ধ ঘটলে ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের পক্ষে যোগ দেবে না।"

আমরা দেখছি, পশ্চিমী শাসকদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তি করার কোন ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা হিটলার জার্মানির সংগে এক ব্যাপক রাজনৈতিক সামরিক চুক্তি চাইছিলেন, যাতে নাৎসী আক্রমণ পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে চালিত হয়।

১৯৩৯-এর মে মাসে আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে, জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু মঙ্গোলীয় গণ-সাধারণতন্ত্র আক্রমণ করল বৈকাল হ্রদের রুশ সীমানা দিয়ে ঢোকার উদ্দেশে। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন, "প্রাচ্য মিউনিখ"-এর কথা ভাবছিল, তখন চীনের অবস্থা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত এবং জাপানী আক্রমণ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মতলবের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। তার পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিমে এক যৌথ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিল। সে যৌথ নিরাপত্তার চেষ্টা চালাতে লাগল যাতে যুদ্ধ এড়ানো যায় বা অন্ততঃ যুদ্ধটা বিলম্বিত হয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এরকম কোন ব্যবস্থা নিতে চায় না দেখে মস্কো ফ্যাসীবাদী আক্রমণের যৌথ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী চুক্তির চেষ্টা করতে লাগল। হিটলার জার্মানি সোভিয়েত মনোভাব বোঝার জন্য ১৯৩৯-এর মে-তে চেষ্টা করার পর সে যৌথ নিরাপত্তা খুঁজতে লাগল। শীঘ্র স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, পশ্চিমীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তি চায় নি, সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলার জার্মানির সংগে চুক্তি করতে চেয়েছে।

পরে হিটলার জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দিল। নাৎসীরা শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিপদ জানত এবং তাদের আশা ছিল যে শক্তিশালী শত্রুকে সামলাবার আগে তারা পশ্চিমী শক্তিবর্গকে পরাস্ত করবে, আর ভয় ছিল যে, প্রবল শত্রুর সংগে যুদ্ধে তাদের সম্পদ ক্ষয় হলে তারা পশ্চিমে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

১৯৩৯-এর সেই উত্তেজনাময় ও সংকটজনক আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হল: হয় পশ্চিমী শক্তিগুলির সংগে অকারণ আলোচনা চালিয়ে হিটলারের সংগে তাদের গোপন চুক্তি সম্পাদনে অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য

করা, নতুবা জার্মান প্রস্তাব মেনে নেওয়া। প্রথম ক্ষেত্রে, তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সম্মুখীন হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে জার্মানী ও জাপানের সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে তাকে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে লড়তে হবে। তাছাড়া, জার্মানীর সংগে অনাক্রমণ চুক্তির অর্থ হল, ভবিষ্যতের যে কোন হিটলার আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত আত্মরক্ষার সময় পাওয়া। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পাতা ফাঁদ এড়াতে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্তই নিল।

ইতিমধ্যে নাৎসীরা মার্চে পোল্যাণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগল। হিটলার ও তাঁর সহযোগীরা নিশ্চিত ছিলেন যে, প্যারী ও লণ্ডন পোল্যাণ্ডকে ত্যাগ করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে পোল্যাণ্ডের শাসকরা সোভিয়েত উক্রাইনে পুরস্কার স্বরূপ জায়গা পাবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সংগে সংগে হিটলার ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করার জন্য তাকে আক্রমণ করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শ্রেণী বিদ্বেষে অন্ধ জোসেফ বেক এবং ইগন্যাসি মচিকি হিটলারের সাহায্য চাইলেন। ওয়ার্সতে প্রাক্তন ফরাসী দূত লিয়ঁ নোয়েল লিখলেন যে, বেক নাৎসীদের মূল্যবান কাজ করেছেন। পোল্যাণ্ড জাতিসংঘ, যৌথ নিরাপত্তা এবং বহুমুখী পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মান কৌশলকে সমর্থনের কোন সুযোগ ছাড়ল না। বার বার সোভিয়েত সরকার পোল্যাণ্ডকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিল। কিন্তু সব বৃথা।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অনেক দিন চেষ্টা করার পর ইতিহাসের চরম সংকট মুহূর্তে বেক দেখলেন পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক সাধারণ জ্ঞানের অভাবে এই মূল্য তাঁর দেশকে দিতে হল, শাসকরা বোঝেনি যে, কমিউনিজম বিরোধিতাই পোল্যাণ্ডের জাতীয় দুর্যোগের কারণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের দশদিন আগে হিটলার ১৩ই আগষ্ট মুসোলিনীকে জানালেন যে, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবেন। তবু ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত পোলিশ সরকার লণ্ডনকে বললে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে কোন চুক্তি করবে না। ২৫শে আগষ্টে নাৎসীরা পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিরোধ না বাধানো পর্যন্ত বৃটেন ওয়ারসের সংগে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করল না। বৃটেনের পক্ষে এ হল এক নতুন "মিউনিখ"-এর হাতিয়ার, এবারে পোল্যাণ্ডকে শোষণ করে। হিটলারকে সন্তুষ্ট করার আলোচনা চলতে লাগল, যতদিন না নাৎসীরা আক্রমণ শুরু করে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সামরিক শত্রু করে তুলল, যেটা পশ্চিমের কাছে সবচেয়ে অবাঞ্ছিত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কূটনৈতিক পূর্ব ইতিহাসে দেখা যায় যে বৃটেন ও

ফ্রান্স হিটলারকে পূর্বদিকে চালিত করে একের পর এক সুযোগ দিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে ওরা আশা করল যে, ওদের বিরুদ্ধে নাৎসী আক্রমণ থেমে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শুরু হবে। এই জন্য তারা যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনা ত্যাগ করল, তখন ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে নিরস্ত করে নাৎসী ও তাদের অনুচররা পৃথিবীকে যে বিপদে ঠেলে দিয়েছে তার থেকে জগৎকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ উপায়। যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেখে, হিটলার প্রথমে পশ্চিমের সেই শক্তিগুলিকে আক্রমণ করলেন, যারা যৌথ নিরাপত্তাকে নষ্ট করার সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছে—তারপরে প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে এবং তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে গ্রাস করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলেন। সেদিন যুদ্ধের স্রোত বদলে গিয়ে হিটলারের বাহিনী ও তৃতীয় রাইখের ধ্বংস ঘনিয়ে এল।

১৯৫৯

যুদ্ধকালীন দিনলিপির পাতা থেকে

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

যে যুদ্ধ চলেছে তা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এবং সেইসংগে পৃথিবীর ভবিষ্যতও স্থির করবে। আমাদের দেশের বাইরে কেউ আশা করে নি যে, জার্মান বাহিনী এরকম অভূতপূর্ব প্রতিরোধে পড়বে, বিশেষতঃ জার্মান কমাণ্ড মোটেই আশা করে নি। আগস্টের প্রথমে নাৎসীরা প্রচার করল যে, ভলগা অঞ্চলের কয়েক দিনের মধ্যেই পতন হবে। আগস্টের শেষে সে জয়ের সম্বন্ধে এমন আস্থা গড়ে তুলল যে, জার্মান জনতা বার্লিনের রাস্তার লাউড স্পিকারের নীচে জড়ো হয়ে স্তালিনগ্রাদ অধিকারের এবং লাল ফৌজের চূড়ান্ত পরাজয়ের খবরের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বিগত কয়েক দিনে নাৎসী প্রচারের ঢং বদলাল। জার্মানদের "রুশ উন্মত্ততা" এবং "intransigence"-র কথা বলা হল। একবারে ভলগার যুদ্ধ শেষ করায় জার্মানদের ব্যর্থতার কারণ খোঁজা হতে লাগল।

ইতিমধ্যে, এ্যাংলো-স্যাক্সন সংবাদপত্র স্তালিনগ্রাদ আর ভাঁদ্যুঁ মধ্যে তুলনা করেছে। আমার মনে হয়, ওটা কৃত্রিম এবং ভুল। ভাঁদ্যুঁতে ফরাসী সহিষ্ণুতা ও সাহস প্রশ্নের যোগ্য নয়। কিন্তু শুধু যুদ্ধের গুণটাই আমাদের বিবেচ্য নয়, উদ্দেশ্যমূলক পরিস্থিতিও বিবেচনা করতে হবে। ভাদ্যুঁতে ফরাসীরা একটি প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় দুর্গ রক্ষা করছিল। তারা জানত যে, পূর্ব ফ্রন্টে রুশবাহিনী পশ্চিম-ফ্রণ্ট ও ভাদ্যুঁ থেকে জার্মান বাহিনীর বেশ, বড় অংশকে টেনে নিচ্ছে। এখন পরিস্থিতি অন্য রকম। একটি সীমান্তে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জার্মান কমাণ্ড পশ্চিম রঙ্গমঞ্চ, এমনকি উত্তর আফ্রিকা থেকেও সৈন্য ও বিমান বাহিনী নিয়ে স্তালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, যা আসলে দুর্গই নয়। তবুও ভলগা শহরের রক্ষাকারীরা দৃঢ় হয়ে আছে। আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু প্রতি সেণ্টিমিটার জমির জন্য লড়াই করে আমরা নাৎসী বাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছি। জার্মান প্রচার আর মজবুত নেই। আগস্টের প্রথমে বার্লিন সংবাদপত্র বলেছিল যে, সেভাস্তো-

পোল জয়ের পর বাকী যুদ্ধটা ছেলে খেলার মত সহজ। ১১ই সেপ্টেম্বরে জার্মান বেতার স্বীকার করল যে, সেভাস্তোপোল জয়ের চেয়ে স্তালিনগ্রাদ জয় অনেক বেশী কঠিন।

এখনো নাৎসী বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও আহতের সংখ্যা প্রচুর। আমি জার্মান জনগণের মনোভাবের কথা ভাবছি। গোয়েবলস স্বীকার করেছেন যে বহু জার্মান প্রশ্ন করে: "জয়ের আর কত দেরী?" *ডস রাইখের* সম্পাদক মুন্ডলার জবাবটা এড়িয়ে যান। তিনি লিখছেন, "পূর্বের জার্মান সৈন্যরা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকায় না।" গোয়েবলসের উত্তর আরো প্রত্যক্ষ। তিনি বললেন, "বিলম্বিত যুদ্ধ, জীবন ও উত্তেজনা দিয়ে মূল্য আদায় করবে।"

যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষের প্রাক্কালে, রাশিয়ায় দ্বিতীয় শীতকালীন প্রচারের পূর্বে নাৎসী মিথ্যা কারখানার প্রধান জার্মানদের আরো রক্ত, ক্ষতি ও পরিশ্রমের বেশী কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না।

দেখা যাচ্ছে, হিটলার আরো সৈন্য খুঁজছেন। সারা ইউরোপে তিনি যা পারছেন, সংগ্রহ করছেন। তিনি পোল, ফরাসী ও ওলন্দাজদের জোর করে সৈন্যবাহিনীতে নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। যখন কলমের খোঁচায় তিনি আলসেস-লোরেনকে তৃতীয় রাইখের অন্তর্ভুক্ত করলেন, তখন দুঃখিত জনগণ চুপ করে রইল। লণ্ডন বলেছে, কয়েকদিন আগে জার্মান কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক ভাবে নাম লেখানোর কথা ঘোষণা করে আশা করেছিলেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত জার্মান বাহিনীর জন্য সৈন্য জোগাড় হবে। অনেক লোক পালাবে বলে ঠিক করল। অনেকে পারল, বাকীরা ধরা পড়ে গুলিতে মারা গেল। জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

লাক্সেমবুর্গের লোকজনকে জার্মান বলে ঘোষণা করে হিটলার তাদের জার্মান বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য এক বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সোভিয়েত প্রতিরোধে অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণ প্রতিবাদ জানাল। সাধারণ ধর্মঘট দেখা দিল—নাৎসী অধিকৃত একটি ইউরোপীয় দেশে প্রথম যুদ্ধকালীন সাধারণ ধর্মঘট। ক্ষিপ্ত নাৎসীরা অবরোধ ঘোষণা করল। গেস্টাপোরা ধ্বংস লীলা চালাতে লাগল। কিন্তু আসল কথা হল ইউরোপীয় জনগণ নাৎসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে জার্মান বাহিনীকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যখন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলছে। সে ক্ষেত্রে ছোট লাক্সেমবুর্গে সাধারণ ধর্মঘট গুরুপূর্ণ এবং ফ্রান্সের ঘটনার সংগে যুক্ত।

বিদেশী সংবাদপত্র ও বেতার থেকে লোকের ধারণা হচ্ছে যে, ফরাসী জাতি উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছে। সেই সুন্দর অসুখী দেশ ফ্রান্স তার নেতাদেরও অক্ষমতার জন্য চরম মূল্য দিচ্ছে। কিন্তু ফরাসীদের ভুল ভাঙছে।

আক্রমণকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণা নিয়ে তারা নিজেদের ভুল থেকে মুক্ত করছে। তারা বিষণ্ণ এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। *স্টক হোলমস টিডনিনজেন* পত্রিকার সংবাদদাতা সদ্য ভিচি-প্রত্যাগত Bjork লিখেছেন, "অনেকে মনে করে যে, ফ্রান্সে গভীর আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভের সময় এগিয়ে আসছে। প্যারি লিয়, মার্সেই ও অন্যান্য শহরে বিশৃংখলার গুজব শোনা যাচ্ছে। যদি যুদ্ধের অবস্থা বদলে যায় এবং অধিকারীদের দখল শিথিল হয়, তাহলে একটা বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।"

হিটলার যে দখল রাজত্ব ও নতুন চাপ ইউরোপীয়দের উপরে কায়েম করছেন, তা প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে। জাতিগুলি লাল ফৌজের উদাহরণে উৎসাহিত হচ্ছে। তারা চ্যানেলের উপর থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪২

রোমেলের বাহিনী মিশরে পরাজিত হয়েছে। যথাযথ রূপে সংগঠিত ইংগ-মার্কিন বাহিনীর উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের ফলে ভূমধ্যসাগরের পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে। কিন্তু ভলগার তীরে স্তালিনগ্রাদের বিশাল যুদ্ধ এখন নির্ধারণমূলক উপাদান হয়ে রয়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৪২-এ ফ্যাসিবাদী কোয়ালিশনের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। সময় আমাদের অনুকূলে। বর্তমান পরিস্থিতির অন্যতম অপ্রত্যক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল যে, বহু ইঙ্গিত অনুযায়ী দেখা যায়, নিরপেক্ষ দেশ-গুলিতে ইতালীয় জার্মান কোয়ালিশনের মর্যাদা কমতে শুরু করেছে।

জার্মান বাহিনী অল্প কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের নিরপেক্ষতাকে উপেক্ষা করেছে। একসময়ে হিটলার তাদের নিরপেক্ষতা পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন। এইভাবে তাদের আগ্রাসন বিরোধী যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, ফলে তাদের এক এক করে গ্রাস করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সর্বত্র তিনি প্রতিনিধি বসিয়েছিলেন। কয়েকটি দেশে নিজের আক্রমণের সমর্থক "পঞ্চম বাহিনী", ফ্যাসিবাদী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। অন্যত্র একই উদ্দেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মোটের ওপর, ঐ পদ্ধতিগুলিকে মিলিতভাবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করেছিল। সর্বত্র হিটলার "বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের" জিগিরকে প্রাধান্য দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য পাচ্ছিলেন। তিনি কয়েকটি দেশকে "মিত্ররূপে" ব্যবহার করতে ও বাকীগুলি দখল করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, বাকী যে সব দেশ এতদিন যুদ্ধের আগুন এড়িয়ে বেঁচে আছে তাদের আজ অথবা কাল পতন হবে।

নভেম্বরের প্রথমে নিরপেক্ষ দেশগুলির ওপরে নাৎসীদের চাপ খুব বেড়ে গেল। কয়েকদিন আগে Volkischer Beobachter আবার দাবী করছে যে, নিরপেক্ষরা "আত্মবিসর্জন" দিক। এস. এস.-দের মুখপত্র Das Schwarze Korps আরো প্রত্যক্ষ। সুইডিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নিরপেক্ষদের ধমক দিয়ে সে বলল, "তোমরা চাও অথবা না চাও, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা তোমাদের দেশে আরোপিত হবে।"

নাৎসী শাসকরা অসন্তুষ্ট হল যে, নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদপত্র সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করছে, জার্মান প্রচারের দাবীগুলি, বিশেষতঃ লাল ফৌজের "প্রচণ্ড পরাজয়ে"র কথা জানাচ্ছে না। নভেম্বরের প্রথমে নাৎসী সংবাদপত্রের প্রধান, ডিয়েট্রির নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদপত্রকে আক্রমণ করে দাবী করলেন যে, তারা জার্মান আদেশ পালন করুক। তিনি এটাকে বললেন, "ভাবগত নিরপেক্ষতা।" কিন্তু তার আক্রমণ প্রতিহত হয়ে উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। সুইডিস Dagens Nyheter পত্রিকা লিখল, 'ডিয়েট্রিচ মনে করেন যে, নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদপত্রগুলি এক নতুন ইউরোপের ধর্মপ্রচারে বাধ্য এবং সেটা না পারলে, অন্তত: জার্মানদের "নতুন ব্যবস্থা"র বিরুদ্ধে যেন কিছু না বলে। কিন্তু ভাবগত নিরপেক্ষতার জার্মান দাবীকে নিরপেক্ষ দেশগুলি প্রত্যাখ্যান করল।"

দৃঢ় নাৎসী খবরদারি সত্ত্বেও, অধিকৃত দেশে হিটলারের নীতির বিষয়ে, পোল্যাণ্ডে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে বর্বর শাসন সম্বন্ধে বিদেশী সংবাদপত্রে খবর ফাঁস হয়ে গেল। ইউরোপে "নতুন ব্যবস্থা"-র নামের আড়ালে কি বলেছে, আমাদের সংবাদপত্র তার আবরণ উন্মোচন করে খবর ছাপছে।

নিরপেক্ষ দেশগুলিতে আরো কার্যকরী প্রচারের জন্য হিটলার জার্মানি প্রচুর টাকা খরচ করছে। যেমন, নাৎসী জার্মানিতে এবং আক্রান্ত দেশগুলিতে জনকল্যাণ বোঝাবার জন্য সুইডেনে নাৎসী প্রতিনিধিরা হ্যাণ্ডবিল, ছবি এবং বই বিলি করছে। কিন্তু মিষ্টি কথার আড়ালে রয়েছে বর্বরতা। বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সুইডিশ জনগণের সহানুভূতি নরওয়েবাসীদের প্রতি, তারা "নতুন ব্যবস্থা"-র কুক্ষিগত, কিন্তু হিটলারের দূত টার্বোভেন এবং তাঁর ক্রীড়নক কুইসলিং-এর কাছে নতিস্বীকার করবে না। জনসভায় স্বাধীনতা-সংগ্রামী নরওয়ের একক গলা শোনা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় জনসংগঠনই শুধু নরওয়ের জন্য সাহায্য তহবিলে একমাত্র দাতা নয়; কিছু স্টক কোম্পানি, সেভিংস ব্যাংক ইত্যাদিও ছিল।

এই তথ্যগুলি থেকেও হিটলারের সম্মানের অবনতি বোঝা যায়। সুইডিশ পত্রিকা Goteborgs Handels-och Sjofarts-Tidning লিখছে, "আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাবার কোন কারণ নেই, কারণ যুদ্ধের গতিপরিবর্তনের ফলে

জার্মানদের আতঙ্ক আমরা বুঝতে পেরেছি। জার্মানদের বৃহৎ জয়ের সময় চলে গেছে।"

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সংগে তাদের সম্পর্কে জার্মান ইতালীয় ফ্যাসী-বাদী রাষ্ট্রগুলি অসুবিধায় পড়ছে। একদা সেখানে তাদের শুধু দখলের প্রয়োজন ছিল, এখন সেখানে তাদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্রমবর্ধমান দৃঢ় মনোবলের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৩

কয়েকদিন আগে নাৎসী প্রচার স্তালিনগ্রাদে জার্মান পরাজয় সম্পর্কে নীরব ছিল। স্বভাবতঃ বৃটেন ও তার বন্ধুরা আশা করেছিল যে, বিপদ ঠেকানো যাবে, কাজেই মৌন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সারা পৃথিবী যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে, সেটা কতদিন চেপে রাখা যায়? নাৎসী বেড়া ডিঙিয়ে পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ায় হিটলারের সে কথা বলা ছাড়া উপায় রইল না। স্পষ্টতঃ বার্লিন এবং রোম দুঃখিত হল।

Srenska Dagbladet-এর বার্লিন সংবাদদাতার মতে, "লোকে বার্লিনে প্রকাশ্যে বলছে যে, এতদিন পর্যন্ত জার্মানীর অভিজ্ঞতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এর বর্তমান শীতের প্রচারেই সবচেয়ে কঠিন ও দুর্ভাগ্যজনক। অবিরাম বলা হচ্ছে যে, পূর্বের বিশাল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সর্বাধিক প্রচেষ্টা ও আত্ম-ত্যাগের প্রয়োজন হচ্ছে।"

সম্প্রতি, জার্মান সংবাদপত্র ও হিটলার কথা দিয়েছে যে, ১৯৪২-এ লাল ফৌজ ধ্বংস হবে। এখন, নাৎসী মুখপত্র Volkischer Beobachter লিখছে:

"জার্মান বাহিনীকে বিধ্বস্ত করতে আগ্রহী এক অতি ভয়ানক শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ব সীমান্তে দ্বিতীয় শীতকালীন প্রচারের বিরুদ্ধে জার্মান বাহিনীকে লড়তে হচ্ছে।"

যে ফ্যাসিবাদী পত্রিকা সম্প্রতি সোভিয়েত পরাজয়ের হতাশ ছবি এঁকে-ছিল, সে এখন বলছে, "পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধে যে কোন মূল্যে জিততেই হবে, কারণ তা না হ'লে, তৃতীয় রাইখ চিরকালের মত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।"

নতুন সুর!

রোমে উন্মত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। খুব স্বাভাবিক। ইতালীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেংগে পড়েছে। ডনের তৃণভূমিতে সৈন্যবাহিনী ঠাণ্ডা মাটিতে চির-বিশ্রাম নিয়েছে। তবু রোম যেন জার্মান পরাজয়ের কথা বলতে বেশী ইচ্ছুক। ইতালীয় ভাষ্যকার এ্যাম্পেলিয়াস বলেছেন: "আমরা স্তালিন-গ্রাদে রুশ সাফল্য স্বীকার করছি। ঐ অঞ্চলে যুদ্ধরত জার্মান বাহিনীর প্রচণ্ড ধ্বংসের কথা স্বীকার করছি। স্বীকার করছি, ওদের পরিস্থিতি নাটকীয়। রুশরা অসাধারণ প্রচণ্ডতা ও শক্তি নিয়ে লড়ছে।"

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

এ্যাম্পলিয়াস বলছেন, "রুশ সীমান্তের পরিস্থিতি ভয়ংকর। কারণ, রুশেরা যে শুধু যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য আনছে তাই নয়, উপরন্তু শীতকালীন প্রচারে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী সৈন্য অক্ষশক্তি ব্যবহার করতে পারছে না। রুশ চাপ যথার্থই ভীতিপ্রদ।"

সরকারী প্রতিবেদনে জার্মান কমাণ্ড মুখ বজায় রাখার চেষ্টা করছে। একটা বড় জায়গা বরাবর লাল ফৌজ নাৎসী প্রতিরোধ ভেংগে ৪০০ কিলোমিটারের মত এগিয়ে গেছে। তবু জার্মান কমাণ্ড বলছে যে, বরাবর তারা যা ভেবেছে, তাই ঘটছে। সে "স্থিতি স্থাপক প্রতিরক্ষা"-র কথা বলছে।

লাল ফৌজ শত্রুর বিরাট বাহিনী বিধ্বস্ত করল, ২০০,০০০ লক্ষ বন্দী করল, ১৩,০০০ বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র দখল করল। এটাও কি নাৎসী পরিকল্পনার অংগ?

১২-১৪ই মে, ১৯৪৩

কিছু গোপন কূটনৈতিক চাল সম্বন্ধে বিদেশী সংবাদপত্রে খবর ফাঁস হয়ে গেল। নাৎসী জাহাজ এখনও ডোবে নি, কিন্তু তার কিছু অংশ প্রাণ বাঁচাবার কথা ভাবছে। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি Giornaled'Italia-তে এক প্রবন্ধে ডিউসের সাহিত্য-সহায়ক গায়দা বললেন যে, ইতালী লড়তে চায়, কিন্তু নীতিগতভাবে সে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সংগে শান্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না।

আরও আগে, জানুয়ারীর শেষে ব্রিটিশ রক্ষণশীল পত্রিকা *ডেলি মেল* সতর্কভাবে দেখিয়ে দিল যে, অদূর ভবিষ্যতে জার্মানী নতুন, আরও দৃঢ় শান্তি আক্রমণ শুরু করবে। কি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রিকা। অথবা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা পত্রিকা। কাসাব্লাংকায় রুজভেল্ট, চার্চিল আলোচনার সময়ে জার্মান শান্তি সম্বন্ধে গুজব বিস্তারিতভাবে বিদেশী সংবাদপত্রে আলোচিত হতে লাগল।

জানুয়ারীতে *নিউজউইক* বলল, সে ভেবেছিল যে, বার্লিনে প্রভাবশালী গোষ্ঠী হয় এখনি মিত্র শক্তির কথা ভাবছে বা তাদের সংগে বন্ধুত্বের চেষ্টা করছে। *নিউজউইক* লিখল যে, জার্মান কমাণ্ডের কয়েকজন সদস্য বুঝতে পেরেছেন যে, হিটলারের ভাগ্য শেষ হয়ে গেছে। অতএব পত্রিকাটি বলল যে, ওরা বার্লিন এবং যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে "শান্তি"-র প্রস্তাব এনে মিত্র জাতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথমে, যখন সোভিয়েত জার্মান সীমান্তে নাৎসী পরাজয়, বিশেষতঃ স্তালিনগ্রাদে ৬ষ্ঠ বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জার্মান সংবাদপত্র "পুরো সৈন্য চালনা"-র ঢাক বাজাচ্ছে, তখন গোয়েবলস্ *ডস রাইখে* একটা প্রবন্ধ লিখলেন

যাকে বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীরা শান্তির পথ বলে বর্ণনা করল। এ বিষয়ে লা ক্রাঁস লিখল :

"নিঃসন্দেহে নাৎসীরা বহুভাবে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবে। তারা স্টকহোলম, বার্ণ, মাদ্রিদ, লিসবন, রোম বা হেলসিংকি যাকেই ব্যবহার করুক, মধ্যস্থের অভাব হবে না।"

এপ্রিলের শেষের দিকে বিদেশী সংবাদপত্র স্পেনের বৈদেশিক মন্ত্রী জেনারেল জোর্ডানার বক্তৃতার খবর ছাপল, তিনি জার্মানী এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি আলোচনার জন্য স্পেনের "সৎ কাজ"-এর প্রস্তাব দিলেন। হাল এবং ইডেন প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইতালী-জার্মান কোয়ালিশন এবং তার সহায়কদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জোর্ডানার ঘোষণার কথা আগে কিছুই জানা ছিল না, এই ঘোষণা ছাড়া নাৎসীদের উপায় রইল না। একমাস আগে ফ্যাসিবাদী নিয়ন্ত্রিত সুইডিশ Dagposten পত্রিকা ইঙ্গিত দিল যে, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তির স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

নাৎসী "শান্তি" কামনাকারীদের উদ্দেশ্য এর চেয়ে স্পষ্ট হতে পারে না। দেখা গেল, হিটলার জার্মানীর কয়েকটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী আশা করে যে, এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যাতে আগের মত, এবারো ওরা একে একে শত্রুর সংগে বোঝাপড়া করে নেবে। এমন কি আপস শান্তির ফলে নাৎসীরা যথেষ্ট সুবিধা পাবে। তখন তারা তাদের অন্যায়ের দায়িত্ব এড়াতে পারবে। ইউরোপে লুণ্ঠিত ধন তারা রাখতে পারবে। তারা নতুন আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতির সুযোগ পাবে। সুতরাং তাদের আশা যে, যে সব শত্রু নাৎসীদের সংগে সংগ্রামের সাধারণ স্বার্থে মিলিত হয়েছে, তাদের একজন অন্যদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

আমার মনে পড়ছে, ১৯৪১-এর ১১ই নভেম্বর (১৯১৮-তে কম্পিয়েন-তে জার্মানদের আত্মসমর্পণের ২৩ তম বার্ষিকীতে) যখন নাৎসী বাহিনী মস্কোর মুখে পেঁৗছেছে, তখন স্কিমিড, জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক সরকারী বিবৃতিতে জানালেন : "একদিন যখন যুদ্ধের ইতিহাস লেখা হবে, তখন এ কথা তাতে থাকবে না : জার্মানী শান্তির বার্তা পাঠিয়েছিল। সে ইতিহাস শুধু জার্মানীর জয়ের কথা বলবে।"

না, যুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যভাবে লেখা হবে। এই প্রথম অবস্থাতেও স্পষ্ট বোঝা যায়, যে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মত এ যুদ্ধ সম্বন্ধেও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের "শান্তি" প্রচেষ্টার কথা অনেক পাতা জুড়ে থাকবে। বোঝা যাচ্ছে, নাৎসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং হিটলার জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া ইউরোপের দীর্ঘকাল জর্জরিত মানুষের শান্তি আসবে না।

আজ, আমাদের রেডিওস্টার একটি প্রকৃতই অসাধারণ সংবাদপত্র Freies Deutschland-এর প্রথম সংখ্যা (১৯শে জুলাই, ১৯৪৩) পেল। যারা বাদামী, (যা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, হলদে) সেই বিরক্তিকর নাৎসী সংবাদপত্র পড়েছে, তাদের কাছে এই পত্রিকা টাটকা একঝলক হাওয়ার মত : শেষে একজন জার্মানদের সম্বন্ধে জার্মানীর দ্বারা লিখিত সত্য জার্মান ভাষায় পড়তে পারছে। যুদ্ধের আগে আমি গোপন পত্রিকা Rote Fahne-এর কয়েকটি সংখ্যা দেখেছিলাম। পাতলা ছোট কাগজের ঘেঁষাঘেঁষি অথচ স্পষ্টাক্ষরে ছাপা জার্মান কমিউনিস্টদের দলীয় পত্রিকাটি উত্তেজক, কারণ জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লোকদের বক্তব্য নিয়ে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের ধাঁচে যোদ্ধাদের আহ্বান শোনা গেল।

Freies Deutschland অন্যরকম পত্রিকা। জার্মানদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ হল নতুন, কি এর পরিণতি কেউ বলতে পারে না। আমাদের তথ্য অনুসরণ করতে হবে : জার্মান বন্দী শিবিরের অফিসার ও কর্মচারীরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী জননেতা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এ বসবাসকারী রাইখস্ট্যাগ ডেপুটিদের সংগে যৌথভাবে ১২-১৩ জুলাই এক সম্মেলন করল। বন্দী শিবিরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল। দুদিন বিতর্কের পর সম্মেলন মুক্ত জার্মানি জাতীয় কমিটি গঠন করল কবি এরিখ উইনার্টকে প্রেসিডেণ্ট এবং মেজর কার্ল হেজ ও লেফটেন্যাণ্ট হাইনরিখ ফন আইনসিডেলকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট করে।

Freies Deutschland পত্রিকার প্রথম পাতায় রয়েছে জার্মান বাহিনী এবং জার্মান জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত ন্যাশনাল কমিটির বাণী। তার রূপরেখা, যা ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে স্থানলাভ করবে, তা হল এই :

"তথ্য থেকে দেখা যায়, যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে। প্রচণ্ড মৃত্যু ও ক্ষতির মূল্যে জার্মানি আরো কিছুদিন যুদ্ধ চালাতে পারে।

"যথার্থ জাতীয় জার্মান সরকার গঠন কঠিন কাজ। শুধু এই সরকারই জার্মান জনগণ ও তাদের প্রাক্তন শত্রুর বিশ্বাস অর্জন করবে। সে শান্তি আনতে পারবে……সমগ্র জার্মান জনগণের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এই সরকার গঠিত হতে পারে। এই সরকার হিটলারের পরাজয়ের জন্য সব সংগ্রামী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাকরবে।

"আমাদের লক্ষ্য হল স্বাধীন জার্মানি।

"অর্থাৎ : এক দৃঢ় গণতান্ত্রিক সরকার ;

"জাতীয় বা জাতিগত বিদ্বেষভিত্তিক সব আইনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ;

"জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক লাভের প্রসার ;

"অর্থনীতি, বাণিজ্য ও কারিগরির স্বাধীনতা ;

"নাৎসী আতঙ্কের শিকারদের অবিলম্বে মুক্তিদান এবং তাদের বাস্তব ক্ষতিপূরণ ;

"যারা যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেইসব যুদ্ধাপরাধীদের ন্যায্য ও নির্দয় বিচার।

"জার্মানরা এগিয়ে চল, স্বাধীন জার্মানীর জন্য লড়াই কর।"

এই হল মুক্ত জার্মানীর পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে দেখা যাবে, এটা কত সমর্থন পাবে। আজ, এই ধারণার নীচে ৩৩টি স্বাক্ষর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই পরিকল্পনা বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও বিশ্বাসের, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোককে একত্র করেছে। এদের মধ্যে আছেন জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির পণ্ডিত নেতারা, আর্নেস্ট থালমানের রাজনৈতিক বন্ধুরা, উইলহেলম্ পিয়েক, ওয়াল্টার আলব্রিখ্ট এবং উইলহেলম ফ্লোরিনের মত জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অসাধারণ ব্যক্তিরা এবং রাইখস্ট্যাগের ডেপুটিরা। হিটলার জোর করে এঁদের আসন কেড়ে নিয়েছেন, কিন্তু জার্মান জনগণ প্রদত্ত ক্ষমতা যে এঁদের রয়েছে, সেকথা কে অস্বীকার করবে। এরিখ উইনার্ট ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট কবি ও লেখকরা জাতীয় কমিটিতে ঢুকে অবাধ বক্তৃতা ও সৃষ্টিশীল চিন্তাকে সমর্থন করতে লাগলেন : যেমন, উইলি ব্রেডেল এবং ফ্রেডরিখ উল্ফ্ (সেই অপূর্ব ফ্যাসিবাদ বিরোধী চিত্রের "প্রোফেসর মামলক"-এর লেখকদ্বয়)।

যা চোখে পড়ে তা হল যে, এই বিবৃতিতে জার্মান বাহিনীর পেশাদার অফিসার ও সৈনিকদের স্বাক্ষর রয়েছে : মেজর হাইনরিখ হোমান (১০০ তম জেগার বাহিনীর ভূতপূর্ব মেজর)। প্রাক্তন বার্লিন শ্রমিক এবং পরে ৩৬৮ তম পদাতিক বাহিনীর সৈন্য এরিখ কুন এবং আরো অনেকে।

Freies Dertschland পত্রিকা ও নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কমিটি জার্মান ফ্যাসিবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন গর্বের সূচনা হতে পারে। লক্ষ্যে পৌঁছতে এখনো দেরী। এই স্বাধীন জার্মানী কেমন হবে ?

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

আজ প্রাভদা-য় জার্মান, জেনারেল, অফিসার, জনগণ ও বাহিনীর প্রতি আবেদন এই নামে ১১ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর মস্কোর কাছে অনুষ্ঠিত লীগ অফ জার্মান অফিসার্স-এর সভায় গৃহীত এক নতুন, গুরুত্বপূর্ণ দলিল বেরিয়েছে। পাঁচজন অফিসারের বন্দী শিবির হইতে ১০০-র বেশী প্রতিনিধি এবং মুক্ত জার্মানীর জাতীয় কমিটির সদস্যরা সভায় যোগ দিয়েছিল। আবেদনে, স্তালিনগ্রাদে ৬ষ্ঠ বাহিনীর পরাজয়ের পর জীবিত অফিসার ও জেনারেলরা বলছেন যে, "জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শান্তির পথ গ্রহণ করতে পারছে না।" তাঁরা "ঐ ধ্বংসাত্মক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার" অনুরোধ

করেছেন। আবেদন এইভাবে শেষ হয়েছে: "হিটলার ও তাঁর সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবী করুন। স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ, মুক্ত এবং জার্মানি দীর্ঘজীবী হোক।" এর নীচে আর্টিলারি জেনারেল ফন সিডলিটজ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এডলার ফন ফ্যানিয়েলস, মেজর-জেনারেল কোর্ডস্ ও অন্যান্যদের সহ ৯৫টি স্বাক্ষর রয়েছে।

এরা কাদের সমর্থনের আশা করছে? নিজেদের সম্বন্ধে এরা লিখছে: "জার্মানীতে আমাদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা বেঁচে আছি।"

হিটলারের যুদ্ধ যন্ত্রে কি এমন লোক আছে যাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা আছে এবং যারা সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে? এটাই বড় প্রশ্ন। আর এরা কি ভাবতে পারে যে, কাজের একমাত্র পথ হল সব সক্রিয় গণতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে ব্যাপকক্ষেত্রে মিলিত হয়ে কাজ করা? এখন জরুরী বিষয় হল যে, লীগ অফ জার্মান অফিসাব মুক্ত জার্মানি আন্দোলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৬-১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৩

সোভিয়েত আক্রমণের ঢেউ ইউরোপে গিয়ে প্রতিরোধের উদ্যম জাগাল। যে সব জায়গা জনশক্তি ঘুমোচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল, সেখানেও লোক ঐক্যবদ্ধ হল। ডেনমার্কের খবর ধরুন। যখন ১৯৪০-এর এপ্রিলে হিটলার ঐ দেশ আক্রমণ করলেন, তখন ড্যানিস সরকার নাৎসী বাহিনীকে বিনাবাধায় ঢুকতে দেওয়ার আদেশ জারী করে ভাবলেন ওদের বিশ্বাস অর্জন করবেন।

প্রথমে, হিটলার দয়ার ভাব দেখালেন। দেখা গেল, উনি প্রথমে ড্যানিশ নাৎসীদের নেতৃপদে রাখতে চান না, তার একটা কারণ হল ওখানকার নাৎসীদের এতটুকুও প্রভাব নেই। (১৯৪২-এর মার্চে সংসদ নির্বাচনে শতকরা ৯০টি ভোট ওদের বিরুদ্ধে পড়েছিল)। সুতরাং, হিটলার ড্যানিশ "স্বাধীনতা"-র ভান বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে কয়েকটি সুবিধে হল: তাঁকে দেশ শাসনের জন্য, সামরিক সরকারের জন্য লোক এবং টাকা ব্যবহার করতে হল না। তাছাড়া, প্রচারের উদ্দেশ্যেও, "ইউরোপীয় দুর্গ"-এর অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য আরো অনিচ্ছুক জাতির কাছে ডেনমার্ক আত্মসমর্পণের আদর্শ হতে পারবে।

এই গ্রীষ্মে যখন জার্মানীর সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, বিশেষতঃ কুর্স্কের যুদ্ধের পর, তখন জার্মান কমাণ্ড চাপ বাড়াল। সে ডেনমার্কের কাছে আরো খাদ্য চাইল এবং জানিয়ে দিল যে, ড্যানিশ বাহিনীর অফিসাররা জার্মান যুদ্ধ যন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ডেনমার্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে "হাত না দেবার" ভান ঘুচিয়ে জার্মান দূত বেস্ট দাবী করলেন যে, জার্মান কাজে ড্যানিশ অফিসারদের যোগ দেওয়ার জন্য কোপেন হেগেন তার

চাকরি সংক্রান্ত আইন পরিবর্তিত করুক। বেস্টের সহায়ক ড্যানিশ প্রধানমন্ত্রী স্ক্যাভেনিয়াসকে অনেক চেষ্টায় কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য তাঁর সরকারকে রাজী করাতে হল। কিন্তু এর ফল বার্লিন শাসক ও ড্যানিশ শাসকদের বিস্মিত করল: মাত্র পাঁচজন ড্যানিশ অফিসার জার্মান বাহিনী ভুক্ত হলেন। ফলতঃ, বহু ড্যানিশ অফিসারকে জাহাজে করে জার্মান বন্দী শিবিরে পাঠানো হল।

এ তো সবে শুরু। আগে, ডেনরা আক্রমণকারীদের উপেক্ষা করে আক্রমণের জবাব দিত। এখন বিশ্বাস করা যায় যে, এই শান্তিপ্রিয় লোকগুলি আরও সক্রিয় প্রতিরোধের পথ নিয়েছে। তারা জার্মান জাহাজ উড়িয়ে দেওয়া, সামরিক ট্রেন লাইনচ্যুত করা, জার্মান সৈনাদের ব্যারাকে আগুন লাগানো এবং নাৎসীদের খুন করা শুরু করল। সাম্প্রতিক মাস গুলিতে প্রতিরোধ বিশেষ করে চোখে পড়ল, জার্মানীর সামরিক সম্মান কমে যাওয়ার পর। ইংরাজী ইভনিং স্টাণ্ডার্ড পত্রিকার এক সুইডিশ সংবাদদাতা তোগার্নি সেগারস্টেট ডেনমার্কের রাজনৈতিক মনোভাবের এই বর্ণনা দিয়েছেন: ডেনরা বাস্তববাদী এবং দক্ষিণের প্রতিবেশীদের বিষয়ে তাদের কোন মোহ নেই। তারা জানে যে, যদি তাদের কারখানায় জার্মানদের জন্য কাজ হয়, তাহ'লে মিত্রশক্তি তাদের বোমা মেরে ধ্বংস করতে পারে। আর যদি ডেনরা বোমা মারে, তাহ'লে তাদের সান্ত্বনা থাকবে যে, মিত্রশক্তি যা করত, তারা তাই করেছে। উপরন্তু নিজেদের জন্য কিছু না করা তাদের পক্ষে জাতীয় অপমান। তারা একদল খুনীর অনুগত সেবক হ'তে চায় না।

২৮শে আগস্টে বার্লিন থেকে ফিরে বেস্ট বললেন, স্ক্যাভেনিয়াস সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করুক, জার্মান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ড্যানিশ দেশ-প্রেমিকদের জার্মান সামরিক বিচারালয়ের হাতে তুলে দিক। তিনি যা চাইলেন, আসলে তা হ'ল রক্ত কলঙ্কিত হিটলার শাসনকে ডেনমার্কে পুরো-পুরি কায়েম করা। স্ক্যাভেনিয়াসের সরকার এসব দাবী প্রত্যাখ্যান করল। তার অন্য উপায় ছিল না, কারণ তা না হ'লে জনতা বিদ্রোহ করত। ডেনমার্কে জার্মান বাহিনীর প্রধান, জেনারেল হ্যানেকেন তখুনি অবরোধ ঘোষণা করলেন। বেস্ট দুঃখ করলেন: "আমার আপস নীতি ব্যর্থ হল।" তিনি স্ক্যাভেনিয়াস সরকারকে অসহযোগিতার মনোভাবের জন্য দোষী করলেন। কিন্তু সেই প্রহসনে সব অভিনেতাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল। বার্লিন আগেই জানত সে কি করবে: সে ট্যাংক ও কামানসহ অন্ততঃ ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী পাঠাল।

হ্যানেকেন সন্ত্রাসের রাজত্ব চালু করলেন। প্রথমে তিনি ড্যানিশ বাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নিলেন, তারপর নৌ-বাহিনী দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'লেন। জাহাজের কমাণ্ডরা ড্যানিশ অ্যাডমিরাল্টির কাছ থেকে এক গোপন আদেশ

"৩নং নির্দেশ" পেলেন এবং কেউ জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন, কেউ সুইডিশ বন্দরের দিকে রওনা হলেন। নতুন আঘাত চলতে লাগল। জার্মান কম্যাণ্ড যথারীতি বর্বর উপায়ে ড্যানিশ প্রতিরোধ ভাঙ্গতে শুরু করলেন।

যখন ১৯৪০-এর বসন্তে নাৎসীরা ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করল, তখন ওরা ভেবেছিল যে, জার্মানীর উত্তর দিক ওরা সুরক্ষিত করেছে। সম্প্রতি Kriegsmarine পত্রিকায় জার্মান ভাইস-অ্যাডমিরাল ব্রন উল্লেখ করলেন যে, ঐ দুটি দেশ জয় করে জার্মানী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় রাজনৈতিক আধিপত্য সুনিশ্চিত করেছে, উপরন্তু প্রচুর সামরিক সুযোগ পেয়েছে। তিনি বললেন, ডেনমার্ক ও নরওয়েতে আধিপত্যের ফলে জার্মানী ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলে অনবরত চাপ দিতে পেরেছে এবং ব্রিটেন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত সমুদ্র পথকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে। কিন্তু সেটা এখন বদলে গেছে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে জার্মান আক্রমণকারীরা ডেনমার্কের উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে এবং যারা বিরোধিতা করতে পারে, তাদের সরিয়ে দিতে চাইছে।

কয়েকদিন আগে জার্মান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে যে, তারা ডেনমার্কের অবরোধ তুলে নেবে। তারা পৃথিবীকে বলতে চাইছে যে, ড্যানিশ রাজত্বে সব ঠিক আছে। কিন্তু এখনও তারা সরকার গঠনে ইচ্ছুক জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে নি। খবর এসেছে যে, একটি গোপন মুক্তি কমিটি তৈরী হয়েছে। নাৎসী সন্ত্রাস রাজত্ব চলেছে, অর্থাৎ "ইউরোপীয় দুর্গ"-এর উত্তরে দাহ্য আবেগ প্রচুর সঞ্চিত হয়েছে, ইউরোপে মিত্র বাহিনী দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুললেই তা ফেটে পড়বে। কিন্তু সেটা কখন ঘটবে ?

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩

খবর এসেছে যে, ইংগ মার্কিন বাহিনী ভল্টার্নো পেরিয়ে ভিংকিয়াটুরো এবং ক্যাম্পোবাসো দখল করে মধ্য ইটালীর দিকে আসছে। অবশ্য এখনও দেশের দুই তৃতীয়াংশ জার্মান বাহিনীর হাতে।

এগিয়ে আসা মিত্র বাহিনীর সংগে যুদ্ধরত জার্মান কমাণ্ড পেছনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হচ্ছে, সেখানেও জনগণ বাধা দিচ্ছে, বিশেষতঃ উত্তর ইটালীর বড় শিল্প-কেন্দ্র গুলিতে। মিলানে ফ্যাসিনেতা রিক্কির হত্যাকাণ্ডই প্রমাণ করে যে, জার্মান আক্রমণকারীরা পরিস্থিতি অনুযায়ী চলছে না এবং ক্রীড়নকদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারছে না। প্রাপ্ত প্রমাণ অনুযায়ী, রোমেও জার্মান শাসকরা অনিশ্চিত ও উদ্বিগ্ন। ওদের ব্যবহার দেখে মনে হয়, যে সাতটা পাহাড়ের ওপরে রোম তৈরী, তার প্রত্যেকটাই যেন লাভা-উদ্গীরণকারী ভিসুভিয়স। মুসোলিনীর পরাজয়ের এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে বাদোগলিও সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার পর নাৎসী অধিকৃত প্রদেশগুলিতে ইটালীয়দের প্রতিরোধ দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এখন জার্মান কমাণ্ড তার "মিত্র"-কে বজায় রাখার জন্য এক বর্বর শাসন কায়েম করেছে। জার্মান বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—না, পূর্ব সীমান্তে নয় অবশ্যই—অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে। উত্তর ইটালীতে ফিল্ড মার্শাল রোমেল এবং মধ্য ইটালীতে কেসেলরিং সামরিক একনায়ক হয়েছেন। অস্ট্রিয়ার নাৎসী শাসনের সময়ে বর্বরতার জন্য পরিচিত গলাইটায়ের হোফার তিনটি উত্তরের প্রদেশে সামরিক শাসক নিযুক্ত হয়েছেন। জার্মান বাহিনী ইটালীয় বাহিনীকে নিরস্ত্রীকরণ করা শুরু করল, কিন্তু সর্বদা সফল হ'ল না: বহু ইটালীয় অফিসার ও সৈন্যরা পাহাড়ে যেতে চায় না, ওখানে ওদের গেরিলা বাহিনী রয়েছে।

উত্তর অভিমুখী জার্মান বাহিনী রক্তের রেখা রেখে যায়। বিদেশী যুদ্ধ-সংবাদদাতারা সংবাদ দিচ্ছে যে, নেপ্‌ল্‌সে নাৎসীরা ইস্পাত কারখানা এবং রাসায়নিক কারখানা উড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে ৪,০০০-এর মত শ্রমিক কাজ করত। জেনারেল পোস্ট অফিসের বাড়ীতে লুকোনো একটা নাৎসী টাইম বোমায় অনেক মারা গেল। বিধ্বংসী বাহিনী পশ্চাদপসারণের পথ ধরে প্রচণ্ড-ভাবে সব ধ্বংস করতে লাগল। নেপ্‌ল্‌স থেকে রয়টার সংবাদদাতা খবর দিলেন যে, এই বাহিনী সমুদ্রের তীরবর্তী রাস্তায় বাড়ীতে আগুন লাগিছে।

যেখানেই ইটালীয় দেশপ্রেমিকরা দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেখানেই বিশেষ করে জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ হিংস্র হয়ে উঠেছে। শহরে ও গ্রামে নাৎসী আদেশ জারী হল: প্রতিটি নিহত জার্মানের জন্য আমরা ১০০জন ইটালীয়কে গুলি করব।"

এ শুধু ফাঁকা হুমকি নয়। নেপলসে ৩০,০০০ ইটালীয়কে শ্রমে বাধ্য করার জার্মান আদেশের বিরুদ্ধে জনগণ বাধা দিল। ১৫০ জনের বেশী লোক না পেয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষ প্রতিশোধ নিল। বেপরোয়াভাবে লোককে গুলি করা হতে লাগল এবং তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল। নেপ্‌ল্‌সের জনগণ বন্দুক আর ছুরি নিয়ে জার্মান বাহিনীকে আক্রমণ করল। নাৎসী বাহিনী আতঙ্ক সৃষ্টি করল। আমার কাছে এক সরকারী জার্মান যুদ্ধ-প্রতিবেদন আছে। তাতে নেপ্‌ল্‌সে নাৎসী পাল্টা ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই রকম বর্ণনা আছে: "জার্মানবাহিনী নির্দয়ভাবে অভ্যুত্থানকে পিষ্ট করল। আমাদের ট্যাংক রাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়ে একের পর এক প্রতিরোধ ধ্বংস করল। বন্দরের সুযোগ নষ্ট করে দেওয়া হল। নেপ্‌ল্‌স তার অবাধ্যতার অতিরিক্ত মূল্য দিল।"

এই হল জার্মান বক্তব্য; কিন্তু খবর এল যে, ক্রুদ্ধ নেপ্‌ল্‌সবাসীরা শহর থেকে নাৎসী আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিল।

এবারে জার্মান কমাণ্ড রোমে তাণ্ডব শুরু করেছে। সে রাজধানীর খাদ্য-

সরবরাহ অধিকার করেছে। জনগণ অনাহারে রয়েছে। জার্মান প্রহরীরা যুদ্ধে যাওয়ার মত বয়সী ইটালীয়দের জাহাজে করে উত্তর ইটালীতে পাঠাবার জন্য ধরে রেখেছে, সেখানে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হবে। রোমের উপকণ্ঠে জার্মান কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি বন্দীশিবির স্থাপন করেছে, সেখানে লক্ষ লক্ষ ইটালীয় সৈনা বন্দী। বিদেশী প্রতিবেদনের মতে, জার্মান কর্তৃপক্ষ জোর করে জনতাকে সমুদ্রের তীর ধরে ওস্টিয়া থেকে নেত্তুনোতে এবং দেশের ভেতরে ভ্যালেত্রি-তে নিয়ে গেছে। তারা এদের শ্রমিকের কাজে জাহাজে করে পাঠাল, দুর্গ তৈরীর কাজে। এই বাধ্যতামূলকভাবে চালিত ইটালীয় সৈনা-দলগুলি জার্মান অফিসারদের অধীনে রাখা হল এবং নামকরণ হল, "নব ইটালীয় শ্রমিক শ্রেণী বাহিনী।" ডিউসকে পুতুল সরকারের প্রধান করে হিটলার তাঁকে নতুন ইটালীয় বাহিনী তৈরীর আদেশ দিলেন। কিন্তু মুসোলিনী ক্ষমতাহীন এমন কি নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলেও তাই সৈন্যচালনার আদেশ স্থগিত রাখতে হল। রোমেলের সাম্প্রতিকতম নির্দেশ হল :

"প্রত্যেক ইটালীয় বেছে নিতে পারে : হয় সে প্রথম সারির জার্মান বাহিনীতে যোগ দিক নয় তো সহায়ক বাহিনীতে থাকুক।"

কিন্তু লোক দুটোই এড়াতে চায়। বিদেশী সংবাদপত্রগুলো বলছে যে, উত্তরে জার্মান কর্তৃপক্ষ জনগণের কাছে গোপন করছে যে, বাদোগলিও সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ওরা ভয় পাচ্ছে যে, এটা জানলে নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে ইতালীয়দের বিরোধিতা আরো বেড়ে যাবে।

কত তাড়াতাড়ি ঘটনা ঘটবে, তা বলা এখনো কঠিন। এটা নির্ভর করবে প্রধানতঃ মিত্রপক্ষের সামরিক কার্যকলাপেব ওপরে।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩

অত্যন্ত জরুরী খবর : বৃহৎ তিন শক্তির সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের নেতৃবর্গ, হিটলারবিরোধী কোয়ালিশনের প্রধান সদস্যারা ইরাণের রাজধানীতে এক সম্মেলন করলেন। ১লা ডিসেম্বরে যৌথ ইস্তাহারে সই করে তাঁরা বললেন : "আমরা জার্মান বাহিনীকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছি···পৃথিবীর কোন শক্তি স্থলে জার্মান বাহিনী, সমুদ্রে তাদের ইউ-বোট এবং শূন্যে তাদের যুদ্ধ উপকরণ ধ্বংসের কাজে আমাদের বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আক্রমণ হবে নির্বিচার ও ক্রমবর্ধমান।"

আমাদের দেশের সামনে যে পরীক্ষা দেখা দিল, যাতে জার্মানির বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও নাৎসী অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের দ্বারা শক্তিশালী নাৎসী যুদ্ধ যন্ত্রের বিরুদ্ধে আঠারো মাস ধরে একা যুদ্ধ করতে হয়েছে, তার পর এ যেন ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদের মৃত্যুদণ্ডের মত। এই ঘোষণায় রয়েছে আশা, ভলগা ও কুর্স্কের যুদ্ধের পর তা আরো জোরদার হয়েছে। এখন

নাৎসী অত্যাচারে জর্জরিত দেশগুলিকে একই মনোভাব দেখা দেবে। মিত্রপক্ষের দ্বারা এটা সক্রিয় সামরিক কার্যকলাপে রূপায়িত হবে, এটাই আশা করা যাক।

আমার ঐতিহাসিকের স্মৃতিতে কোয়ালিশন যুদ্ধের অনেক স্মৃতি রয়েছে। অনেক ঘটনায় মনে পড়ে যে, শত্রুকে হারানোর সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই যুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক মতভেদ দেখা দিয়ে মিলিত প্রচেষ্টাকে ভেঙে দেয় বা কোয়ালিশনকে পর্যন্ত ভেঙে দেয়। অন্যান্য ঘটনায় দেখা যায়, কোয়ালিশনের সদস্যদের পক্ষে সামরিক পরিকল্পনাকে একত্রে কাজে রূপায়িত করা কত কঠিন। কয়েকটি ক্ষেত্রে, কোয়ালিশন সদস্যরা শুধু অল্প বিস্তর সীমাবদ্ধ প্রকৃতির সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। ঘোষণায় বলা হয়েছে, তেহেরাণে বড় তিন নেতা "পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের কাজের সীমা ও সময় সম্বন্ধে একমত হয়েছেন। বিশাল পরিমাণ সামরিক বিষয়ের এই ব্যাপকচুক্তি কোয়ালিশন যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। যদি যথাযথ পালিত হয়, তাহলে সাধারণ শত্রু হিটলার জার্মানির বিরুদ্ধে বৃহৎ সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এক নতুন ঘটনা ঘটবে।

খুব অল্প লোক ঘটনাবলীর দ্রুত, সঠিক ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন করতে পারে। সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা নির্দেশ দিতে পারে না। তবু, বর্তমান পরিস্থিতিতে তেহেরাণের সামরিক চুক্তির গুরুত্ব প্রচুর। এ সত্ত্বেও বা হয় তো, এই কারণেই, তেহেরাণ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস না করার কথা যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে শোনা গিয়েছিল। সংক্ষেপে, এটা হিটলারের পক্ষে স্বস্তিকর, তিনি যুদ্ধের সময় ধরে নাৎসীবিরোধী কোয়ালিশনের সদস্যদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা, তাদের যৌথ সামরিক প্রচেষ্টায় অবিশ্বাস, বিদ্বেষ আনা এবং একেবারে নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

জার্মান ফ্যাসীবাদী প্রচার তেহেরাণ সম্মেলনের সামরিক প্রভাবকে তুচ্ছ করা, এমনকি অস্বীকার করার অসংগত চেষ্টা করছে। গোয়েবলসের অন্যতম সহকারী সেমলার ৬ই ডিসেম্বর বললেন যে, এ ঘটনায় বার্লিন কোন গুরুত্বই দেয় না এবং "পূর্বে জার্মান ফ্রন্ট দৃঢ় আছে ও থাকবে।" গোয়েবলসের আরেক জন সহকারী অটো ক্রিক, ঘোষণা করলেন যে, "তেহেরাণ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি মিথ্যে।" জেনারেল স্টাফের Berliner Borsenzeitung পত্রিকা লিখছে: "আমাদের শত্রুদের সামরিক নীতির প্রচণ্ড ব্যর্থতার ইঙ্গিত হল তেহেরাণে সম্মেলন, কোথায় আক্রমণ করতে হবে, তারা জানে না।" আজ বার্লিন রেডিও বলল: "ত্রিশক্তি ঘোষণার বিষয়বস্তু এখানে বার্লিনে হাসির উদ্রেক করেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্টের আলোচনায় আমাদের জনগণ মজা পেয়েছে।" এই বক্তব্যে আরো কি ছিল অস্পষ্ট আত্মসমর্পণ না উন্মত্ত ভয়, বলা কঠিন।

৭ই জুন, ১৯৪৪

এখন ইউরোপে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট বাস্তব ঘটনা। গতকাল ভোরে বৃটিশ, মার্কিন ও কানাডার সেনাবাহিনী সুন্দরভাবে নেমেছে, দ্রুত জার্মান প্রতিরোধ ভেঙ্গে চুকেছে। গতরাতে, মস্কোর এক ছোট রাস্তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃটিশ সামরিক মিশনের বাড়ীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোভিয়েত সাংবাদিকরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সম্মেলন ডেকেছিলেন বৃটিশ মিশনের প্রধান লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ব্রোকাস বারোস এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশনের প্রধান, মেজর জেনারেল জন ডীন।

লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল বারোস একটা মানচিত্রে ইংগ-মার্কিন কমাণ্ডের মনোভাব প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, কাজ সাধারণ পরিকল্পনা মত সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে এবং অভিযানে প্রযুক্ত সব কাজের নির্দিষ্ট নিয়ম বজায় রয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত, সংহত বক্তব্যে জেনারেল সামরিক দিক এবং অবতরণ দিনের পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন। তিনি সংযতভাবে মন্তব্য করেছেন যে, প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নর্ম্যাণ্ডি অভিযানের ঘটনা সম্ভব হয়েছে। মনে হয়, তিনি ভেবেছেন যে, যেহেতু লণ্ডনে ১৯৪২-এর জুনে ইংগ সোভিয়েত আলোচনা এবং ওয়াশিংটনে ১৯৪২-এ সোভিয়েত মার্কিন আলোচনায় ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার বিষয়ে চুক্তি হয়েছে, সেইজন্য অভিযান কেন আরো আগে হয় নি, সে বিষয়ে এই বক্তব্যই যথেষ্ট।

আমরা যেন কেউই প্রশ্নটা প্রত্যক্ষভাবে করতে চাই না। গত দু বছরে যারা বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্র পড়েছে, তাদের চোখে পড়বেই যে, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার সমস্যা শুধু সামরিক নয়, রাজনৈতিকও বটে। দু বছর ধরে সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন সংঘর্ষ চলেছে। কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সেই জটিল সংঘর্ষের বহু স্তরের কাহিনী বর্ণনা করবেন। সে এক আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক কাহিনী হবে।

যাই হোক, ইউরোপের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় ফ্রণ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইউরোপে কোন সামরিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন অনুসরণ করবে তার ওপরে এখনো অনেক কিছু নির্ভর করছে। বার্লিন সেটা জানে। প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে, সামরিক না রাজনৈতিক?

২৬শে জুন, ১৯৪৪

ইউরোপে মিত্রশক্তি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার পর থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। একথা এখন খুব স্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিত্র শক্তির মধ্যে পার্থক্যের ওপরেই প্রধানতঃ হিটলার নির্ভর করছেন। "ইউরোপীয় দুর্গ"-এর নাৎসী গুজব হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পরে, লোকে আশা করবে যে, জার্মান

রাজনৈতিক কুশলীরা সামগ্রিক সামরিক পরাজয় এড়ানোর জন্য কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। কিন্তু, বিদেশে জার্মান প্রচারের ধরন থেকে বোঝা যায়, নর্মাণ্ডিতে অবতরণের পর বার্লিন নতুন কিছু প্রচার করে নি। আগের চেয়েও মরিয়া হয়ে তারা নাৎসীবিরোধী কোয়ালিশনের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ ও অবিশ্বাস খুঁচিয়ে তোলার পুরনো পদ্ধতি আকড়ে ধরছে, বিশেষতঃ এ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলিও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে। অবতরণের তিন দিন পরে, ৯ই জুন গোয়েবলসের এক কর্মচারী হেলমুট জ্যাক্স ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলেন:

"পূর্বে যখন সব শান্ত, তখন মিত্রবাহিনী যদি পশ্চিমে এগোতে চায়, তাহ'লে তেহেরাণে ঘোষিত-সমন্বয় কোথায় থাকে ?"

কয়েকদিন পরে লাল ফৌজ এর উত্তর দিল। উত্তর সিদ্ধান্তমূলক, নির্দিষ্ট ও বিধ্বংসী। গোয়েবলস্‌রা মিথ্যে বললেন যে প্রথমে কারখানাগুলি এর গুরুত্ব বোঝে নি। চারদিন আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপরে নাৎসী আক্রমণের তৃতীয় বার্ষিকীতে এবং ভিটেবস্কে শক্তিশালী সোভিয়েত আঘাতের প্রাক্কালে Bremer Nachrichten তখনো অভ্যাসবশতঃ বলে চলেছে যে, "রাশিয়াতে বিশাল অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে জার্মানি সামরিক কাজের ধারা থেকে ঠাণ্ডা মাথায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মত কাজ করেছে।" ফ্যাসিবাদী প্রচার এখনো তার "স্থিতিস্থাপক প্রতিরক্ষা"-র পুরনো গল্প প্রচার ক'রে চলেছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে গল্প থেমে গেল। এখন একটা নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হ'ল: "পরিকল্পনা মত সীমান্তকে প্রসারিত করা।" চেরবুর্গের মুক্তির পরেই পূর্বে ভিটেবস্ক, ওর্শা এবং মোগিলেভের মুক্তি ঘটল। ২৩শে জুন শুরু হওয়া সোভিয়েত আক্রমণের মাত্রা ও গতি কয়েক দিনের মধ্যেই ইউরোপের সামরিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিল। এর সম্ভাব্য ফল কি হবে, তা বলার সময় এখনো আসে নি। একটা ব্যাপার স্পষ্ট: প্রথম শ্রেণীর জার্মান প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলে, এক বিশাল জার্মান বাহিনীকে ঘিরে ধরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে, আক্রমণ তীব্র ক'রে এবং দ্রুত পশ্চিম দিকে এগিয়ে লাল ফৌজ ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মে নাৎসী পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। ইউরোপের উভয় রঙ্গমঞ্চে জুনের ঘটনাবলী, শেষে জার্মান কমাণ্ডকে দিয়ে স্বীকার করাল যা সে প্রথমে অস্বীকার করেছিল: যে হিটলার বিরোধী কোয়ালিশনের সশস্ত্র বাহিনী বেশী শক্তিশালী।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪

গত বছর কুর্স্কে হিটলার বরাবরের মত ব্যর্থ হয়েছেন। এখন নির্ভয়ে বলা যায় যে, লাল ফৌজ এবং ইংগ-মার্কিন কার্যাবলী দ্রুত জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয়কে ত্বরান্বিত করছে। গোয়েবল্‌স্ সামগ্রিক সৈন্য চালনার প্রচার

চালাচ্ছেন। লোকবল কমে যাওয়ায় নাৎসী সমরবিদদের এখন দুটি উপাদানের ওপরে ভরসা—সুযোগ ও সময়।

অর্থাৎ, ওরা *যতদিন* সম্ভব এবং জার্মানির প্রধান কেন্দ্রগুলি থেকে যত দূরে সম্ভব বাধা দিয়ে যেতে চায়। বার্লিন থেকে Dagens Nyheter-পত্রিকার এক সংবাদদাতা বলছেন যে, "২৯শে জুন জার্মান সামরিক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, আপাততঃ জার্মানি পশ্চিম ও পূর্ব-দূর জায়গাতেই আত্মরক্ষা করবে···বার্লিন বলছে, জার্মানির আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পক্ষে ফ্রান্স যথেষ্ট বড় এবং তাতে গুরুত্বপূর্ণ জার্মান অঞ্চলগুলি বিপদে পড়বে না।"

২৯শে জুন জাপানী *ইয়োমিউরি শিম্বুন* পত্রিকার বার্লিন সংবাদদাতা খবর পাঠাল যে :

"গত পাঁচ দিনে লাল ফৌজ যে ভাবে এগোচ্ছে, তাতে সামরিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে······একজন জার্মান সমর বিশেষজ্ঞ বলছেন, ফিল্ড মার্শাল মডেল পোল্যাণ্ডে পিছিয়ে গেলেও তাঁর পেছনে আরো ২০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা থাকবে·· অবশ্য জার্মান সামরিক গোষ্ঠী দেখিয়ে দিয়েছে, গ্রীষ্মে অবস্থা আরো উত্তেজনাকর হবে।"

জার্মান "সামরিক গোষ্ঠী"-র জানা উচিত, কারণ সোভিয়েত-জার্মান নাট্যশালার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল। লাল ফৌজ পোলোট্স্ককে মুক্ত করেছে এবং সোভিয়েত লিথুয়ানিয়াকে মুক্ত করতে চলেছে। তার পশ্চিমমুখী প্রবল আঘাত নাৎসীদের স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে, ওদের এখন ঠিক করতে হবে, কিভাবে ওরা পূর্ব প্রাশিয়ার পথে এগোবে।

২৮শে জুলাই, ১৯৪৪

আটদিন আগে হিটলারের প্রাণহানির জন্য কর্নেল স্টফেনবার্গের ব্যর্থ চেষ্টা এবং জেনারেলের ষড়যন্ত্র যেন "শক্তি সংকটে" বিদ্যুৎ চমকের মত। বিদেশী সংবাদপত্রের সত্য মিথ্যা খবর অনুযায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা এই বিশ্বাসে এগিয়েছিল যে, যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছে। ১৯১৮-তে লুডেনডর্ফের মত তারা যা পারে করবে ভেবেছিল : সৈনাদের সম্পূর্ণ পরাজয় থেকে বাঁচাবে এবং জার্মানিকে আক্রান্ত হওয়ায় বাধা দেবে। লুডেনডর্ফ যেমন শেষ মুহূর্তে বুঝেছিলেন যে, কাইজার উইলহেলমকে ত্যাগ করতে হবে, এরাও তেমনি বুঝল হিটলার ও তাঁর চক্রান্তকে ত্যাগ করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আগে তারা যা করেছে, তার জন্য জেনারেলের অপরাধ মুছে ফেলার চেষ্টা দেখা গেল।

সরকারী নাৎসী বক্তব্য অনুযায়ী, ষড়যন্ত্রকারীরা অধিকাংশ সক্রিয় কাজ থেকে বরখাস্ত হওয়া জেনারেল। অথচ সাম্প্রতিক জার্মান পরাজয়ের জন্য

তাদের দোষ দেওয়া হচ্ছে। একটি নাৎসী ভাষ্যকার লিখছেন, "পূর্ব সীমান্তের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি হয়েছে প্রধানতঃ ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা।" জেনারেলদের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে হিটলার বলছেন যে, জয়ের পথে শেষ বাধা তিনি অপসারণ করছেন। তবুও জেনারেলরা ষড়যন্ত্র করছেন, কারণ তাঁদের মতে, পরাজয়ের জন্য হিটলার দায়ী।

হিমলারের হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য হ'ল, বিধ্বংসী যুদ্ধে নাৎসীদের সাহায্য করা। হিটলার বিপর্যয় রোধের প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। অন্ততঃ হিটলারের সাম্প্রতিক সৈন্য চালনার এইটিই অর্থ, যাকে ডিটমার নামে এক ভাষ্যকার "পরিবর্তন" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, এটা কার্যকরী হবে কি না, সে বিষয়ে তিনিও নিশ্চিত নন, কিন্তু জানেন যে, এ অবস্থায় হিটলারের "সহজাত বুদ্ধির" আর কিছু করার নেই। ডুবন্ত লোক খড়ও আঁকড়ে ধরে। নতুন সৈন্য নিয়োগের প্রধান হলেন গোয়েবলস এবং অন্যান্য বিভাগের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হ'ল হিমলার কে।

পূর্ব রণাঙ্গন অধিনায়কদের এক সম্মলনে হিটলার পোল্যাণ্ড ও পূর্ব প্রুশিয়ায় আসন্ন বিপদের কথা বললেন। ডিটমার লিখলেন, আমাদের সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ পূবে" যেখানে, "জার্মানীর প্রবেশপথে এক বিরাট বিপদ দেখা গিয়েছে।"

ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, প্রথমতঃ হিটলার তড়িৎ গতিতে যুদ্ধের প্রস্তাবক বিধ্বংসী যুদ্ধের সমর্থক হয়ে উঠেছেন এবং দ্বিতীয় জার্মানী জেনারেল ও হয়ত অন্যান্য উচ্চক্ষেত্রে একটা সংকট ঘনিয়ে উঠছে। সবকিছু সত্ত্বেও এ হল প্রবল নাৎসী পরাজয় এবং সামরিক ও রাজনৈতিক ভুলের ফল।

৮ই আগস্ট, ১৯৪৪

নাৎসী আবরণের মধ্য দিয়ে কয়েকটি ইঙ্গিত, বিশেষতঃ জার্মান সংবাদপত্র ও বেতারের সাহায্যে আমি দেখছি, ১৯১৮তে পরাজিত জেনারেলদের দ্বারা "পশ্চাতে ছুরিকাঘাত"-এর সামরিক প্রবাদ এই পরিস্থিতির মানানসই হয়ে ফিরে এসেছে। সম্প্রতি, হিটলার বলেছেন যে, জার্মান জয় নিশ্চিত। কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এবারে জার্মান বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হবে না। তবু ৪ঠা আগস্টে তিনি স্বীকার করলেন যে, ফলাফল সম্বন্ধে তিনি পুরো নিশ্চিত নন, কারণ তিনি "জানেন না, পেছনে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা, গভীর বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে কি না।" পরাজয়ের জন্য তিনি ২০শে জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রকারীদের দোষ দিচ্ছেন।

কয়েকদিন আগে হিটলার ও তার পরিষদবর্গ পৃথিবীকে বলেছেন যে, ষড়যন্ত্রের ফল যত সাংঘাতিক হোক না কেন, তার গভীর মূল নেই। এখন, গোয়েবলসের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিদের অন্যতম ফ্রিটশেও স্বীকার করছেন যে,

"প্রথমে আবিষ্কৃত তিনজন ষড়যন্ত্রকারী পরিকল্পনা রচনায় বাইরের সাহায্য পেয়েছিল। যা ভাবা হয়েছিল, দেখা গেল দলটা তার চেয়ে বড়।"

বেক ছাড়া, অন্যান্য বিশিষ্ট জেনারেল ও অফিসাররা অংশ নিয়েছিলেন, তারা তাদের সরকারী পদের সাহায্যে প্রকৃত সামরিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলেন। এদের একজন ছিলেন প্রযুক্তিগত যোগাযোগের প্রধান জেনারেল ফেলজিবেল, তিনি যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চের সব গোপন খবর নাড়াচাড়া করতেন। সর্বোচ্চ অধিনায়কের বিভাগীয় প্রধান কর্ণেল হ্যানসেন আর্টিলারী জেনারেল ওয়াগনার এবং মেজর জেনারেল স্টিফ সর্বোচ্চ অধিনায়কের সাহায্যে জনবল ও বাস্তব সম্পদের খবর পেতেন। আরেকটি বিভাগের প্রধান, কর্নেল ফন ফ্রেটাগ-লোরিং হোভেন আবিষ্কৃত অঞ্চলে সক্রিয় প্রতিরোধের মাত্রা এবং জোর করে জার্মানীতে প্রেরিত বাধাদানকারী লক্ষ লক্ষ বিদেশী শ্রমিকদের দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। হিটলারের নতুন "আদালত"-এর শাসনাধীন বাদীদের তালিকায় বহু নাম লেখা ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রে জড়িত অফিসারের সংখ্যা তালিকার চেয়ে অনেক বেশী। নাগরিক শাসনব্যস্থাতেও ষড়যন্ত্রকারী এবং কিছু শিল্পপতি ছিল যারা একদা হিটলার ও তার গোষ্ঠীকে অর্থসাহায্য করেছে। এদের অন্যতম হলেন গোয়েডের্লার, আস্থির অর্থনৈতিক সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

ষড়যন্ত্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি ছিল? জার্মানীর ও বিদেশের এই সব ঘটনার পরিণতি কোথায়?

এ সব প্রশ্নের উত্তর পরিস্থিতিকে আরো স্পষ্ট করবে, অন্ততঃ সাধারণভাবে, কিংবা যুদ্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে।

হিটলার ও তাঁর গোষ্ঠী কিসের উপরে নির্ভর করছে? এক সম্মেলনে Reichsleiters ও Gauleiters-দের জরুরী ডাক দেওয়ায় মনে, পরাজয়কে বিলম্বিত করার জন্য হিটলার এদের উপরেই নির্ভর করছেন। অস্ত্রমন্ত্রী স্পিয়ার বললেন, তিনি জার্মান বাহিনীকে আবার অস্ত্রসজ্জিত করেছেন। তিনি বললেন, জার্মানীতে তৈরী "গোপন অস্ত্র" (V-1, নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র) এমন এক "সামরিক উপাদান" যা নিশ্চয়ই পশ্চিম ইউরোপে মিত্রশক্তিকে দুর্বল করবে। তিনি বললেন, এটা না পাওয়া পর্যন্ত দেশকে "অপেক্ষা করতে" হবে। গোয়েবলস বলেছিলেন, তিনি যে সাম্প্রতিকতম সৈন্যচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, তার থেকে মুক্তি আসবে। হিমলার যথারীতি হিংস্রভাবে "সংশোধন" চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নাৎসী ভাষায় এ হল "যুদ্ধ যন্ত্র থেকে বাকী বালির কণা বার করে দেওয়া।" Hackenkreuzbanner পত্রিকা বলছে, এর অর্থ "আমরা সময় নিতে দৃঢ় পরিকর।" জরুরী সম্মেলনের এই ছিল মূল কথা, সেখানে হিটলার বলেছিলেন যে, তিনি "বিশ্বাস-

ঘাতকতা" ছাড়া আর কিছুকেই ভয় পান না। তাঁর প্রকৃত ভয় হল নতুন পরাজয়ে এবং জার্মান বাহিনীর আসন্ন পতনে।

৩০শে আগস্ট, ১৯৪৪

দশদিন আগে নাৎসী পত্রিকা Flensburger Nachrichten লিখেছিল : "যুদ্ধ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে। পূর্বে, সোভিয়েত বাহিনী ভিস্টুলায় পৌঁছে জার্মানীর কিছু উত্তর থেকে হুমকি দিচ্ছে।"

ইতিমধ্যে, জার্মানীর সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। নাৎসীরা যখন সোভিয়েত-জার্মান সীমান্তের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে জড় হচ্ছে, তখন লাল ফৌজ দক্ষিণে আঘাত হেনেছে।

সোভিয়েত বাহিনী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া থামিয়ে দিয়ে দানিয়ুবের তীরে এগিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন রুমানিয়ার যে সংকট চলছিল, তার বিস্ফোরণ অ্যান্টোনেশকু একনায়কত্বের পতন ঘটিয়েছে। নবগঠিত স্যানাটেশু সরকার হিটলার জার্মানীর সংগে সম্বন্ধ ছিন্ন করে মিত্রশক্তির হয়ে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নাৎসী নিউজ এজেন্সি ট্রান্সওশান দুঃখের সংগে মন্তব্য করেছে যে, এ "সত্য গৌণ", অবশ্য ইংগিতে বুঝিয়েছে যে, বার্লিন ও হিটলার জার্মানীর বিশৃংখলা তার অনুচরদের পতন আর ঠেকাতে পারছে না।

রুমানিয়ায় জার্মান বাহিনীর ভাগ্য বিপর্যস্ত। লাল ফৌজ তাদের পিষ্ট করছে।

রয়টার সংবাদদাতা ডেনিস মার্টিন খবর দিচ্ছেন যে, যুগোশ্লাভিয়ার নাৎসীবাহিনী টিটোর মুক্তিবাহিনীর সম্মুখীন হওয়ায় খুব চাপের মধ্যে পড়েছে।

প্যারিস মুক্ত। এই কয়েকটি কথার গভীর অর্থ। মিত্রবাহিনী মার্ন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সের অবতীর্ণ বাহিনী পূর্বদিকে এগোচ্ছে। শীঘ্র তারা উত্তর ইটালীতে পেঁৗছে কেসেলরিং-এর বাহিনীর পক্ষে নতুন বিপদ সৃষ্টি করবে। উত্তর মুখী অন্যান্য মিত্র বাহিনী যে কোনদিন জার্মানীর দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে পেঁৗছবে।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৪

৯ই অক্টোবরের মস্কোর ইংগ-সোভিয়েত আলোচনার ফল ১৮ই তারিখের মাধ্যমে সব আন্তর্জাতিক ঘটনাকে তুচ্ছ করে দিল। পশ্চিম ইউরোপীয় রণ-মঞ্চ সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত চার্চিল ও রুজভেল্টের কুইবেক আলোচনায় গৃহীত হয়েছিল, তার পরে অনুষ্ঠিত মস্কো আলোচনা *টাইমস* পত্রিকার মতে "সামরিক

ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিত্র নীতির অধিকতর প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

ওয়াশিংটন যে এ্যাভারেল হ্যারিম্যান নামে মস্কোতে মার্কিন দূত নিয়োগ করল, এটাই মস্কো আলোচনায় তিন বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ কালীন বন্ধুত্বের নতুন প্রমাণ। ইংগ-সোভিয়েত ইস্তাহারে বলা হল, "সাধারণ স্বার্থ ঘটিত বহু রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে" "স্বাধীন ও ঘনিষ্ঠ মতবিনিময়" ঘটল। কিন্তু এটাই সব নয়: আলোচনার ফলে দেখা দিল যৌথ সমর কৌশলে, যার চরম লক্ষ্য হল সাধারণ শত্রু হিটলার জার্মানীর দ্রুততম পরাজয়। দীর্ঘ, কষ্টকর মস্কো সম্মেলনের মনোভাব ছিল তেহেরাণের মত, যার সিদ্ধান্ত সময় কালে ভাল ফল দিয়েছে।

মস্কো আলোচনা যে কত সফল হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, নাৎসীদের নতুন ভয়। জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র ২১শে অক্টোবর গম্ভীরভাবে স্বীকার করলেন যে, "মস্কো আলোচনার সাদামাটা পদ্ধতির মধ্যে লুকিয়ে আছে জার্মানীকে ধ্বংস করার জন্য মিত্র শক্তির এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা।"

লাল ফৌজ নতুন জয় করল: মার্শাল টিটোর বাহিনীর সংগে একযোগে সে বেলগ্রেডকে মুক্ত করল; বুদাপেস্তে আক্রমণ চালাল; কার্পেথিয়ান অঞ্চলে ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ শত্রু দুর্গ ভাঙল, বাল্টিক অঞ্চলে শত্রুমুক্ত করে পূর্ব প্রাশিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনী আচেন অধিকার করেছে। হিটলার জার্মানীর কেন্দ্রস্থলের বিরুদ্ধেযৌথ আক্রমণের সামরিক পরিস্থিতি দেখে জার্মান কমাণ্ড ভীত হয়ে পড়ছে।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৪

এমনকি এই কঠিন সময়েও কতটা কাজ হয়েছে, তা পেছন ফিরে দেখা দরকার। তেহেরাণে বৃহৎ তিন শক্তির নেতাদের সম্মেলনের ঘোষণার পর আগামীকাল এক বছর পূর্ণ হবে। এই বারোমাসে, লাল ফৌজ প্রথম শ্রেণীর জয়লাভ করেছে। সে দেশকে নেপ্রোপেত্রোভস্ক থেকে বেলগ্রেড, ওয়ারস ও টিলজিট পর্যন্ত মুক্ত করেছে। মিত্রবাহিনী দক্ষিণ থেকে উত্তরে আপেনাইন পেনিনসুলা পেরিয়েছে, পশ্চিম ইউরোপে তাদের অবতরণ (এটা আর দেরীতে করা যেত না) এবং চ্যানেল থেকে রাইনের ওপর দিক পর্যন্ত অগ্রগতি এক নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে।

আমাদের বাহিনী শুধু সোভিয়েত অঞ্চল থেকে নয়; রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরির অধিকাংশ, পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার এক অংশ এবং নরওয়ে থেকে শত্রুদের বহিষ্কৃত করেছে। সে পূর্ব প্রাশিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায় আঘাত

করতে চলেছে। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইটালীর অধিকাংশ, ফ্রান্সের এবং বেলজিয়ামের প্রায় সব, নেদারল্যাণ্ডসের একটা বড় অংশ মুক্ত করেছে। তারা পশ্চিম জার্মানীতে ঢুকে রাইনল্যাণ্ড ও রুর-অঞ্চলে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

লাল ফৌজ ও মিত্রবাহিনীর পক্ষে পথ যতই দীর্ঘ হোক, তা শুধু কিলোমিটার দিয়ে মাপা উচিত নয়। স্রোতের পরিবর্তন স্পষ্ট এবং এ কথা এখন বোঝা যাচ্ছে যে, হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয় আর দূরে নেই। হাঙ্গেরী ছাড়া, হিটলার তাঁর ইউরোপীয় মিত্রদের হারিয়েছেন। সমাধানের অতীত সমস্যাবলী, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, সৈন্য ঘাটতি, সম্ভাব্য শক্তি সংকটে পীড়িত হিটলার গণতান্ত্রিক শক্তির এক ক্ষমতাপন্ন কোয়ালিশনের মুখোমুখি হলেন, যার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। দুই ফ্রন্টের সাঁড়াশির মাঝে হিটলার জার্মানী এখনো বেপরোয়াভাবে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু এ যেন মুমূর্ষু ব্যক্তির মরিয়াভাব।

১৯৪৪, ২৫শে অক্টোবর তারিখের Volkischer Beobachter বললেন, "পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গুরুতর, খুব গুরুতর···পূর্ব প্রাশিয়া ও জার্মানীর বিপদ আগের মতই গুরুতর।"

জার্মান সংবাদপত্রে হতাশার সুর শোনা গেল। সাম্প্রতিক আবেদনে, হিটলার স্বীকার করলেন যে, লাল ফৌজের প্রবল আঘাত "ফ্রন্টগুলিকে বিচ্ছিন্ন করেছে" এবং ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ জার্মানীর পক্ষে পরিস্থিতিকে আরো প্রতিকূল করেছে। হিটলার জার্মানী এখন তেহেরাণে গৃহীত সামরিক সিদ্ধান্তের ফল ও তাৎপর্য বুঝতে পারছে।

২রা জানুয়ারি, ১৯৪৫

জার্মানদের প্রতি হিটলারের নববর্ষের আবেদনের দুটি নকল আমার কাছে আছে একটি ১৯৪৪-এ প্রদত্ত এবং অন্যটি কয়েকদিন পূর্বের। গতবছর উনি বলেছিলেন যে, পূর্বদিকে যথেষ্ট এগিয়ে যাওয়া এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হল জার্মান বাহিনী এবং *পিতৃভূমিকে* ঐ অঞ্চলে কেউই বিপন্ন করতে পারবে না। তিনি আরো বলেছিলেন যে, রোমের দক্ষিণাঞ্চলের জার্মান বাহিনী ইতালীর ওপরে দখল ছাড়বে না। শেষে ঘোষণা করলেন যে, বলকান অঞ্চল জার্মান বাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, পশ্চিমে "ইউরোপীয় দুর্গ" আক্রমণের যে কোন প্রচেষ্টাতে সে বাধা দেবে।

তাঁর দাবী চূর্ণ হয়ে গেল। ১৯৪৪-এর সালতামামি দিতে গিয়ে হিটলার গতকাল স্বীকার করেছেন যে, "প্রকৃতপক্ষে একটার পর একটা বিপদ চলেছে।" সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ মুখপাত্রও একই কথা বলেছেন। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল গুডেরিয়ান বলেছেন, "গত বছরে আমাদের শত্রুরা

জার্মানীর সীমান্তে পৌঁছতে পেরেছিল।" এ্যাডমিরাল ডোনিৎজ, যিনি একবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, নির্দয় সাবমেরিন যুদ্ধের দ্বারা মিত্রশক্তিকে পর্যুদস্ত করবেন, তিনি ঘোষণা করলেন : "আমাদের পেছনে রয়েছে এক কঠিন ও সর্বনাশা বছর। জার্মানীর পক্ষে ঐ বছর হল বড় বড় পরাজয়ের বছর।
"গোয়েরিং, যিনি একবার বলেছিলেন যে, বিমান বাহিনী দিয়ে সব শত্রুকে চূর্ণ করে জার্মানীর মাটীতে কোন শত্রুর বোমা ফেলতে দেবেন না, তিনি অতীতের বিষয়ে কিছু বললেন না, কারণ জার্মানীতে সংঘটিত ধ্বংসলীলাই মিত্র পক্ষের বিমান শক্তির প্রবলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি শুধু ফুয়েরারের প্রতি আনুগত্য জানালেন : কারণ, হান্স ব্রিটশের মতে, তিনি বোধহয় "দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বহু জার্মানদের অন্যতম, যারা জানে যে, সামনে গহ্বর রয়েছে।"

*ফুয়েরার*ও একথা জানতেন। "প্রচণ্ড পরাজয়ের" কথা স্বীকার করে তিনি রুমানিয়া, বুলগেরিয়ার প্রাক্তন শাসকদের, অন্যান্য অনুচরদের দোষী করলেন এবং দায়ী করলেন সেই সব জেনারেলদের যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে। তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক নেতাদের বিশ্বাস করতে," তাঁকে, তাঁর নীতি ও "সহজাত সমরকুশলতা"কে বিশ্বাস করতে জার্মানদের অনুরোধ জানালেন। তিনি ওদের বললেন, "শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই করতে।" কিন্তু তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, "সংকট" জার্মানদের আর আশাবাদী করতে পারছে না হিটলার তাদের কোন কথা দিতে পারছেন না, কাজেই ওদের হুমকি দিচ্ছেন : নিশ্চিত ভাষায় ওদের বলছেন যে, যে যুদ্ধ "এড়াবার চেষ্টা করবে তার শিরচ্ছেদ" করবেন। বলছেন, উনি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারেন এবং গোয়েবলস্ ওঁকে যাদুকর বলে ঘোষণা করলেন। প্রসংগত, নাৎসী প্রচারে দাবী করা হল যে, পশ্চিমে রুণ্ডস্টেটের আক্রমণ ঠিক এরকম "জার্মান অলৌকিকতা।"

৯ই জানুয়ারি ১৯৪৫

এখন এ কথা স্পষ্ট যে, বেলজিয়াম ও আলসেসে রুণ্ডস্টেট আক্রমণের লক্ষ্য শুধু সামরিক নয়, বড় রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে। যখন আক্রমণ সাফল্যের সংগে এগিয়ে চলেছে তখন Volkischer Beobachter লক্ষ্য করল যে, "এই যুদ্ধে আসল বিবাদ শহর বা নদী নিয়ে নয়, বাহিনীর ভবিষ্যৎ নিয়েও নয়, বিবাদ হল আগামী দিনে পশ্চিম ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে কে আইন রচনা করবে তাই নিয়ে। পত্রিকাটি বলল যে, স্তালিনগ্রাদে পরাজয়ের পর "আইন রচনার" ক্ষমতা হারিয়ে নাৎসীবাহিনী তা পুনরুদ্ধারে তিনদিকে পরিবেষ্টিত "জার্মান দুর্গ"-এর ধ্বংস এড়াতে বদ্ধ পরিকর।

প্রথমতঃ, জার্মানরা ভেবেছিল, প্রথম উদ্যম তারা মিত্র পক্ষের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে যথেষ্ট *রাজনৈতিক* প্রতিক্রিয়া ঘটবে। আক্রমণের জন্য নির্বাচিত রংগমঞ্চ হল রাজনৈতিক লক্ষ্যের স্পষ্ট প্রমাণ: মার্কিন প্রথম বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকে নাৎসীরা বেলজিয়ামে বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে ঢোকার আশা করেছিল। সামরিক দিক দিয়ে, আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লিজ; আর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আরও সুদূর প্রসারী। গত কয়েক দিনে, রুণ্ডস্টেট স্ট্রাসবুর্গে ঢোকার চেষ্টা করছেন এই আশায় যে, এই প্রচেষ্টা তাঁকে প্যারিতে পৌঁছে দেবে।

হিটলার আশা করছেন, আক্রমণের ফলে মিত্র শিবিরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই তাঁর শেষ আশা। রুজভেল্ট কংগ্রেসকে পাঠানো সাম্প্রতিক বাণীতে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জার্মানরা পশ্চিম ইউরোপে যে আঘাত করেছিল, যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেকবেশী বিপজ্জনক হল, যে বিভেদ তারা অনবরত আমাদের ও মিত্রপক্ষের মধ্যে ঘটাবার চেষ্টা করছে। মিত্রপক্ষের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে রটানো যে কোন গুজব আমাদের প্রকৃত শত্রু সে আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অন্তর্ঘাত ঘটাতে চেষ্টা করছে।

সময়োচিত সতর্কবাণী।

গোয়েবলসের মিথ্যা কারখানার প্রচারোৎপাদন এবং রিবেনট্রপ কূটনীতিকদের গোপন "শান্তি" আলোচনায় জার্মানির ছাপ অতিস্পষ্ট। কিন্তু মাঝে মাঝে অনুরূপ বস্তু প্রকাশিত হয়ে পড়ে যেখানে হিটলারের কোন জোর নেই। যেমন ধরুন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত প্রভাবশালী *আর্মি এ্যাণ্ড নেভি জার্নাল*। তার সাম্প্রতিক সংখ্যায় বলা হয়েছে, লাল ফৌজের নিষ্ক্রিয়তার জন্য বেলজিয়ামে জার্মান আক্রমণ সম্ভব হয়েছে। পত্রিকাটি এরকম ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যে, সোভিয়েত জার্মান সীমান্ত থেকে ছড়িয়ে পড়া বাহিনীর দ্বারাই রুণ্ডস্টেটের আক্রমণ ঘটছে। বিপরীত পক্ষে, বুদাপেস্ত দখলের জন্য নাৎসীবাহিনী পশ্চিম থেকে, বিশেষতঃ হল্যাণ্ড থেকে সৈন্যদের হাংগারীতে সরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনা বিলাসী সমরবিদরা এ সত্য দেখতে পান না। তাঁরা লিখছেন; "যদি বুদাপস্ত দখলের জন্য কিছুই না করা হয়, তাহলে হিটলার রুণ্ডস্টেটে সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের জার্মান আক্রমণকে বিলম্বিত করতে পারেন।" যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গোষ্ঠী স্পষ্টতঃ মিত্র শিবিরে লাল ফৌজ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগানোর চেষ্টা করছে।

সত্যানুসন্ধানী মানুষ এসব সহ্য করবে না। এক বৃটিশ পর্যবেক্ষক প্যাট্রিক লেসি *আর্মি এ্যাণ্ড নেভি জার্নালের* সংগে তর্ক জুড়েছেন। তিনি বলছেন, ঐ পত্রিকার প্রকৃত ঘটনার সংগে যোগ নেই এবং সে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ও হাংগারিতে সোভিয়েত কার্যকলাপকে উপেক্ষা করেছে, ঐ দুই

জায়গায় লাল ফৌজ পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় কার্যকলাপের চেয়ে বড় না হোক, অন্ততঃ সমান বড় শীতকালীন আক্রমণ চালাচ্ছে। লাল ফৌজ ইউরোপে প্রধান জার্মান দুর্গগুলির অন্যতম বুদাপেস্ত শহরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যুদ্ধের সময়ে রুশ ফ্রন্ট সর্বাধিক জার্মান শক্তিকে বিপথে চালিত করেছে এবং এখন যুদ্ধ চলার সাড়ে তিন বছর পরেও সোভিয়েত বাহিনী জার্মান বাহিনীর অর্ধেকের অনেক বেশী অংশকে দমিত করে রাখছে।

এসব সত্য মার্কিন পত্রিকার কানে গেল না। সে বলল, হাঙ্গেরীতে লাল ফৌজের আক্রমণের এক "বিশেষ উদ্দেশ্য" আছে। লাল ফৌজের সাফল্যে তার অসন্তোষ গোপন করা কঠিন। নাৎসীরাও ওদের সম্বন্ধে ভীত। সুতরাং প্যাট্রিক লোস প্রশ্ন করলেন: "রুশদের সমালোচনা করছে, এই লোকগুলি কারা?" এটা কল্পনা নয়। বিশেষতঃ যদি আমরা মনে করি, কোন শক্তি যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগাবার চেষ্টা করেছিল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

কয়েকদিন আগে এক নতুন মিত্রপক্ষীয় সম্মেলনের দলিল প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিশক্তির সাক্ষাতের গুজব প্রথম গত বছর শরৎকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের পুনর্নির্বাচনের পরে ওরা আরও উৎসাহী হয়ে উঠল। সম্ভাব্য স্থান সম্বন্ধে বিদেশী সংবাদপত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল। কেউ বলল লণ্ডন বা প্যারি, অন্যরা আলাস্কায় ফেয়ার ব্যাংকস বা তেহেরাণের কথা বলল। আবার অন্য অনেকে ভূমধ্যসাগরের কোন জায়গা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করল। রাষ্ট্রীয় বিভাগের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের বললেন, তিনি জায়গার নাম বলবেন না, কারণ সেটা হয়তো কাজে লাগানো হতে পারে। দেখা গেল, ফেব্রুয়ারীর ৪-১১ তারিখে সম্মেলন হল আমাদের ক্রিমিয়ায়।

আমরা সবাই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে সম্মেলনের দিকে তাকিয়েছিলাম, শত্রুরাও অপেক্ষা করছিল, তবে ভীত মনে। তেহেরাণ সম্মেলনের আগে হিটলার তখনো ভেবেছিলেন যে, যুদ্ধে জয় না হলেও অন্ততঃ পরাজয়টা এড়াতে পারবেন।

ক্রিমিয়া সম্মেলনের কয়েক মাস আগে নাৎসীরা আর দম্ভ প্রকাশ করতে পারল না। প্রচণ্ড আশংকায় তারা সব খবর পড়তে লাগল। এবারে নিঃসন্দেহে ওরা একটা সম্মেলনের সম্ভাবনার কথা বলল। রিবেনট্রপ মন্ত্রী সভার এক মুখপাত্র বললেন, তাঁর মতে সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য "সামরিক নয়, রাজনৈতিক: ইঙ্গ মার্কিন-সোভিয়েত কোয়ালিশনকে বাতিল করা।" তিনি বললেন, কোন পক্ষের আর এই কোয়ালিশনে আস্থা নেই। এ চিন্তা কল্পনা বিলাস, এতে নাৎসীদের এই আশা প্রকাশ পেল যে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মত পার্থক্য থেকে

গভীর বিভেদ দেখা দিল নাৎসীরা তার সাহায্যে নিজেদের বাঁচাতে অথবা চরম মুহূর্ত'টিকে বিলম্বিত করতে পারে।

ক্রিমিয়া সম্মেলনের কয়েকমাস আগে মিত্রপক্ষীয় সংবাদপত্রের কয়েকটি গোষ্ঠী সত্যিই বিভিন্ন বিষয়ে, প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বিবাদ শুরু করেছিল। তারা তেল সমস্যা, নৌ-যোগাযোগ এবং যুদ্ধোত্তর নাগরিক ভ্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল। প্রাক্তন নাৎসী অঞ্চল পোল্যাণ্ড এবং জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল মতভেদ দেখা দিল। নাৎসী প্রচার দপ্তর একে মীমাংসার অতীত বলে মনে করল। জাপানী সংবাদপত্রেরও এক মত। যেমন, *সাইনিচি শিম্বুন* ১৯৪৫-এর ২৩শে জানুয়ারী বলল যে, কয়েকটি বিষয়ে সমাধানের অভাবে আগের ত্রিশক্তি সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ক্রিমিয়া সম্মেলনের অল্প আগে, গোয়েবল্‌স *ডস রাইখ* পত্রিকায় লিখলেন যে, মিত্রপক্ষের মধ্যে চুক্তি, বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলির মধ্যে চুক্তি অসম্ভব। "বলশেভিক আতঙ্ক"-এর বিরুদ্ধে নতুন প্রচার শুরু হল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যত্র তার সমর্থক ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াশীল বই-পত্র আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলল, যুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ শান্তির মূল সমস্যাবলীর সমাধানে সফল আলোচনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করল।

অতএব যারা আশা করেছিল, মিত্র শক্তি কোন বোঝাপড়ায় পেঁছিতে পারবে না, ইয়াল্টার সিদ্ধান্তকে তাদের পরাজয় বলে দেখতে হবে।

প্রকাশিত দলিল থেকে বিচার করলে, সামরিক দিক দিয়ে জার্মানীকে ধ্বংস করার সমস্যা প্রধান হয়ে উঠল। খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। সে সব রয়েছে লাল ফৌজের যুদ্ধ পরিকল্পনা ও ইংগ-মার্কিন পরিকল্পনার মধ্যে। অবশ্য আমরা জানি, যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার জন্য পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ থেকে জোরালো আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা রয়েছে।

জার্মানী পরাজিত হবে। এখন তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করার সময়। এ শুধু জার্মানীর পক্ষেই নয়, ভবিষ্যৎ শান্তির পক্ষেও জরুরী। হিটলারের নিঃশর্ত সমর্পণ কি করে ঘটানো যায়, ক্রিমিয়া সম্মেলন তার একটা পরিকল্পনা রচনা করল। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র কিছু লোক আপত্তি করল। ভ্যাটিকান "আপস"-এর আহ্বান জানাল। ব্রিটেনের ক্যাথলিক সংবাদপত্র এবং আর কয়েকটি গোষ্ঠীও অনুরূপ মত প্রকাশ করল। *নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি এ্যাণ্ড আফটার* পত্রিকার মতে, সামরিক জার্মানী সোভিয়েত বিরোধী নীতির প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হতে পারে। বিশিষ্ট মার্কিন বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিশেষতঃ সেনেটর হুইলারও তাই মনে করেন। সুপরিচিত সাংবাদিক ডরোথি থম্পসন আবেদন জানিয়েছেন যে, নাৎসীদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নীতি বাতিল করতে হবে

এবং জার্মানীর সংগে আলোচনার পর যুদ্ধ বিরতি হওয়া উচিত। কিন্তু ক্রিমিয়া সম্মেলন হিটলারের সমর্থকদের উপেক্ষা করল। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই যুদ্ধের চরম লক্ষ্য হয়ে রইল।

জার্মানীর সশস্ত্র প্রতিরোধ একেবারে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে শর্ত জানানো হবে। আত্মসমর্পণের সময়ে সামরিক পরিস্থিতির উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। যদি জার্মান বাহিনী শেষ পর্যন্ত বাধা দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন সৈন্য দেখা যাবে। নাৎসী ভাষ্যকার জেনারেল ডিটমার সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় দুর্বল প্রতিরোধ বোঝাতে একটা পরিভাষা বার করেছেন, "চলমান কেটলি।" এই ভবঘুরে "কেটলিরা" বোধহয় বেশী সময় বাধা দিতে পারবে না, ফলে জার্মান সামরিক যন্ত্রে বিশৃংখলা দেখা দেবে।

প্রধান যুদ্ধাপরাধীরা হয় তো নিরপেক্ষ দেশ বা অন্যত্র পালাবার চে টা করবে। মস্কোর বিদেশী মন্ত্রী-সম্মেলনে মিত্রশক্তি ঠিক কবেছে, তারা যেখানেই পালাবার চেষ্টা করুক, "পৃথিবীর শেষে গেলেও" তাদের ধরা হবে।

গোয়েবল্‌স বলেছিলেন "আত্মসমর্পণের চেয়ে বরং আমরা মরব।" একবারের জন্য প্রায় ঠিক বলেছেন। হিটলার ও তার দলবল আত্মসমপ ণ বা মৃত্যু কোনটা থেকেই রেহাই পাবে না। ইয়াল্টা সম্মেলন বলেছে, সর্বোচ্চ সমর নেতাদেরও দ্রুত ও ন্যায্য উপায়ে ধরা হবে। বৃহৎ ত্রিশক্তি একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে: নাৎসীদের শেষ সৈন্যটি পর্যন্ত নিরস্ত্র হবে, জার্মান সশস্ত্র বাহিনী ভেঙে দেওয়া হবে। জার্মান অস্ত্র ধ্বংস, জার্মান অস্ত্র শিল্প বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে। এতে প্রুশো-জার্মান সমরবাদের অবসান হবে।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা একদিন ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য যেসব পথ ব্যবহার করতে পারে, সেগুলো বন্ধ করাই ছিল ইয়াল্টা সম্মেলনেব উদ্দেশ্য। জার্মানীকে দখল করা হবে—কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত আংশিক নয়। তিনটি বড অধিকৃত অঞ্চল থাকবে। রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন যে, পূর্বাঞ্চল লাল ফৌজের হাতে, উত্তর-পশ্চিম বৃটিশ বাহিনীর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও ব্রেমেনে যাওয়ার একটি ফালি জায়গা থাকবে মার্কিন বাহিনীর হাতে। ফ্রান্স চাইলে তারা একটা জায়গা থাকতে পারে।

জার্মান রাজধানী বার্লিনের প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত রইল। এই বিষয়েরও মীমাংসা হবে যে বাহিনীই ঐ শহরে প্রথম ঢুকুক। স্পষ্টতঃ, হিটলারবিরোধী কোয়ালিশনের প্রধান শক্তিগুলির কমাণ্ডার-ইন-চীফ-দের নিয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ পরিষদের রাষ্ট্রগুলির বাহিনী এ জায়গা দখল করবে।

আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কে ইয়াল্টার প্রকাশিত সিদ্ধান্তে কিছু বলা হয় নি। তবুও বিদেশী সংবাদপত্র উৎসাহে এই নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছে। দুটো বিষয় স্পষ্ট: অস্ট্রিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং পোল্যাণ্ডকে "উত্তরে ও পশ্চিমে যথেষ্ট জায়গা দিতে" হবে।

মুক্ত ইউরোপের প্রকাশিত ঘোষণা গভীর প্রভাব বিস্তার করল। তার পরিকল্পিত পথে "মুক্ত জনগণ নাৎসীবাদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলে নিজেদের পছন্দমত গণতান্ত্রিক সংগঠন সৃষ্টি করতে পারবে।"

হিটলারি রাষ্ট্রের দ্বারা রূপায়িত জার্মান সমরবাদের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত পরাজয়ের পথ কঠিন, শ্রমসাধ্য। ভলগার তীর থেকে ওডার পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনীর পথ ক্রিমিয়া সম্মেলনের ওপরে নিঃসন্দেহে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছে। হিটলারের কূটনীতি এবং বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান সত্ত্বেও হিটলারবিরোধী উপাদান ভেঙে যায় নি। যুদ্ধ চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছচ্ছে। যে শুরু করেছিল, সে ধ্বংস হবে।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

প্রায় সমগ্র পূর্ব প্রাশিয়া এবং সাইলেশিয়ার প্রধান যুদ্ধশিল্পকেন্দ্রগুলি দখল করে লাল ফৌজ জার্মানির কেন্দ্রে আঘাত করছে। পশ্চিমে মার্কিন ও কানাডীয় বাহিনী সিগফ্রিড লাইন ভেদ করে রাইন-ওয়েস্টফ্যালিয় অঞ্চল দখলের মুখে। যদি অসম্ভব কিছু না ঘটে, তাহলে নাৎসী বাহিনী ও হিটলার রাষ্ট্র পরাজয়ের সম্মুখীন। নাৎসী গোষ্ঠী তা জানে। তার প্রচার সত্যকে আর চাপা দিতে পারছে না।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে জেনারেল ডিটমার কেনিগসবার্গ, ব্রেসল, পোজনান ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্ন জার্মান বাহিনীকে খুব প্রশংসা করেছিলেন। এক সপ্তাহ পরে, ২৪শে ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ শহর সম্বন্ধে Gauleiters-এর কাছে প্রেরিত বাণীতে পোজনান-এর নাম বাদ দিলেন, কারণ ওটা মুক্ত হয়ে গেছে। একই কারণে তিনি Sehneide-muhl-এ বেষ্টিত বাহিনীর কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি Gauleiters-এ ব্রেসেল ও কোনিগসবার্গ সাহায্যদান সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না, তিনি "ভবিষ্যতে বিশ্বাস" রেখে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধের অনুরোধ জানালেন।

বুদাপেস্ত, পোজনান ও অন্যান্য শহরে জার্মান বাহিনীর যা ঘটল, তাতে বোঝা যায় বেপরোয়া, বিবেচনাহীন প্রতিরোধের ফল কি হবে। হিটলার জার্মানির ভবিষ্যৎ শেষ। ইয়ালটায় পরিকল্পিত, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ থেকে তাদের দেশের ওপরে আসা আঘাতের পরিণাম কি, তা হিটলার, জার্মান বাহিনী ও অন্যান্য নাৎসী প্রধানরা জানেন না, এ সম্ভব নয়। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, গোয়েবলসের অন্যতম সহকারী রুডলফ সেমলারের ভাষায় "পূর্ব ও পশ্চিম থেকে যুগপৎ সাধারণ আক্রমণ।" দুদিকেই আক্রমণ শুরু হয়েছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি সাম্প্রতিক যুদ্ধ প্রতিবেদনে "পূর্ব ও পশ্চিমে যুদ্ধ"-তে ডিটমার জার্মানদের আরো পরাজয়ের জন্য তৈরী হতে বলেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে

জানা গেছে, পূর্ব ও পশ্চিমের যুদ্ধ সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে-বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্র সংলগ্ন অঞ্চলে এবং কয়েকটি মাত্র জার্মান প্রদেশ এখন যুদ্ধক্ষেত্রের কিছু দূরে রয়েছে। সুইডিস Aftonbladet পত্রিকার মতে স্যাক্সনির জনগণ বিশৃংখল হয়ে পড়েছে কারণ Volkssturm বাহিনী ভেঙে যাচ্ছে। মেয়েরা কটবাস-এ বিক্ষোভ দেখাল, তারা নাকি বলেছে: "বুড়ো লোকদের দিয়ে কি হবে? যদি ফ্যুয়েরার লড়তে চায়, লড়ুক।" বিদেশী সংবাদপত্র বলছে, সবাই পালাচ্ছে, বিশেষতঃ Volkssturm থেকে।

তবু এক নতুন আবেদনে হিটলার বললেন, "চরম উন্মাদনা ও প্রচণ্ড ধৈর্যসহকারে" লড়াই চালাতে হবে। সাধারণ বুদ্ধিকে তুচ্ছ করে তিনি নিজে যা বিশ্বাস করেন না, তাই জাতিকে বিশ্বাস করাতে চান: "বছর শেষ হওয়ার আগেই এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখা দেবে।" জার্মানী জিতবে কি না, এ প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। একটি ইংরাজী পত্রিকার ভাষায় তাঁর প্রতিশ্রুতির মূল্য একটা পচা আলুরও সমান নয়। শেষ মুহূর্তকে বিলম্বিত না করতে পারার উন্মত্ততা নিয়ে হিটলার জার্মানী বাধা দিয়ে যাচ্ছে।

বার্লিন কি আশা করেছে? স্বেন হেডিন, সুইডিশ নাৎসী, এখন খুব স্থাবর, একবার বলেছিলেন, জার্মানী যদ্ধে না হারলে জিতবে। আজ, জার্মানীর ধ্বংসের মুখে, এ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তথ্য। ইয়াল্টার পরে হিটলারের বোঝা উচিত ছিল, জয় তো নয়ই, "আপস মীমাংসা"-রও আশা নেই। নাৎসী গোষ্ঠী আশা ছেড়েও ছাড়ছে না, এ কথা মনে করার কারণ আছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী হিটলার Reichsleiters, Gauleiterds ও অন্যান্য নাৎসী প্রধানদের সংগে আলোচনায় মিলিত হলেন যে, "নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধ"-এর সরকারী ঘোষণা কি হবে। মনে হয় ওরা গোপন নাৎসী বাহিনীর পরিকল্পনা করছে পুরনো ও নতুন বন্ধুদের সাহায্য এবং মিত্রপক্ষীয় ও নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রভাবশালী সাহায্যের উপরে নির্ভর করে। এক নাৎসী ভাষ্যকার, উইলফ্রেড, ফন্‌ওফেন ২৩শে ফেব্রুয়ারী বেতারে বললেন, "আমাদের বাধা দেওয়া দরকার", কারণ, মিত্রপক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে।

১৩ই মার্চ, ১৯৪৫

সাম্প্রতিক ঘটনায় দেখা যায় যে, ক্রিমিয়া সম্মেলনে গৃহীত যে সব সামরিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একমাস আগে প্রকাশিত হয়েছে, তা এখন কার্যকরী হচ্ছে। সোভিয়েত বাহিনী ডানজিন ও স্টেটিনের মুখে পৌঁছেছে। তারা কুস্ত্রিন অধিকার করে বার্লিনের আরো কাছে এসেছে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী অনেক জায়গায় রাইন অতিক্রম করে পূর্বতীর দখল করেছে। পশ্চিম-

মুখী লাল ফৌজ ও পূর্বমুখী মিত্রবাহিনীর মধ্যে ৫০০ কিলোমিটার ব্যবধান। হিটলার জার্মানী বাহিনীর প্রতি সাম্প্রতিক আবেদনে বলেছেন, "আমার ধারণা ভাগ্য আমাদের বিপক্ষে গেছে।"

বহুভাবে এই সাম্প্রতিক আবেদন আগের আবেদনের চেয়ে পৃথক। *ইয়র্কশায়ার পোস্ট* বলেছে, এটা অপরাধী মনস্তত্ত্বের প্রমাণ। হিটলার কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। তিনি দাবী করেছেন: "বাধা দিয়ে যাও যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়।" তবু জার্মান বাহিনী বুঝেছে, পিছিয়ে যাওয়া দূরে থাক, মিত্রপক্ষের আক্রমণ আরো প্রচণ্ড হচ্ছে। জার্মান অধিনায়করা শেষ সৈন্যদল ব্যবহার করছে, ওদিকে Volkssturm-এ নতুন প্রচার থেকে বোঝা যায় যে, জনবল কমে যাচ্ছে। হিটলারের আবেদন এমন কি প্রচার নয়। পরাজয়কে বিলম্বিত করা, আত্মসমর্পণ স্থগিত রাখার জন্য এ এক উন্মত্ত আবেদন। এতে প্রকাশ পায় যে, হিটলারের মনে ভয় দেখা দিয়েছে, যখন উনি বুঝেছেন যে, লাল ফৌজ ও মিত্রপক্ষ শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে।

৭ শে মার্চ, ১৯৪৫

ঘটনা দ্রুত ঘটছে। লোকে ভাবছে, বার্লিন গোষ্ঠী ও তার জেনারেলরা কিসের ওপরে নির্ভর করছে? ইয়াল্টা সম্মেলনের পরে তাদের আর ভুল ধারণা থাকতে পারে না। তাদের প্রচার মন্ত্রকে যৌথ আক্রমণ সহ্য করার জন্য জাতিকে তৈরী করতে হয়েছে। ইয়াল্টাতে রচিত সামরিক পরিকল্পনা ওরা ভেস্তে দিতে, অন্ততঃ বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। এইজন্য তারা লেক বালাটনে ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়ে ছিল তৃতীয় রাইখের সেইসব প্রদেশ বরাবর, অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়া যেখানে জার্মান যুদ্ধ শিল্প রয়েছে। উত্তর সাইলেশিয়া হারানো এবং রুর-এ মিত্রপক্ষীয় আতংক দেখা দেওয়ার পর, হিটলারের পক্ষে ঐ অঞ্চলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্য, নাৎসী আক্রমণ ভেঙে পড়েছে। জেনারেল ডিটমার ২৩শে মার্চ বললেন: "ঐ অঞ্চলের গুরুত্ব কম, এটা ভাবা মূর্খতা। দানিয়ুবের তীর বরাবর পথ বুদাপেস্ত থেকে ব্রাতিস্লাভা ও ভিয়েনায় চলে গেছে। নিঃসন্দেহে, লাল ফৌজ আজ অথবা কাল ওখানে বড় আক্রমণ চালাবে।"

নাৎসীদের অনুমানের থেকেও আগে লাল ফৌজ আঘাত করল। উপরন্তু, সে বুদাপেস্ত আক্রমণের সংগে ওপ্পেলনে এক বৃহৎ শত্রু বাহিনীকে ঘিরে ধ্বংস করল। নাৎসীরা স্তম্ভিত হয়ে "মুক্তির" কথায় বলল না যে, লাল ফৌজের দ্বারা বেষ্টিত বাহিনী অন্যত্র জার্মানিকে বাঁচাচ্ছে। এই ঘেরাও হওয়া বাহিনী হিটলার জার্মানির প্রতি নতুন আঘাত থামাতে পারল না: ধ্বংসও এড়াতে পারল না। পূর্ব প্রাশীয় বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নাৎসী বাহিনীর মনোভাবের প্রতিফলক ডিটমার অজ্ঞের মত ভাবছেন, কি হবে। ভবিষ্যতে

তাকিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "লাল ফৌজের আক্রমণ অনেকগুলি স্তরে এগিয়ে চলেছে।"

পূর্বে প্রধান নাৎসী বাহিনীকে অবরুদ্ধ ক'রে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী রাইন পেরিয়েছে। নাৎসীরা শুধু ক্ষমতাশালী জলবাধাই হারাল না, যা এত ঐতিহ্য ও আশায় পূর্ণ, উপরন্তু জার্মান যুদ্ধ ক্ষমতার কেন্দ্র বহু বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রও হারাল। রুর-এর অচলতা আসন্ন। হিটলার কয়েকদিন আগে বলেছেন, "স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এখানকার পরিস্থিতিতে জরুরী মৌলিক সমাধানের দরকার।" কিন্তু হিটলার কি সমাধান করতে পারেন? রুণ্ড-স্টেটের বদলে কেসেলরিং এসে কিছু বদলাতে পারেন নি। মার্শাল মণ্ট-গোমারির পাল্টা কেসেলরিং-এর ১৫ ডিভিসন সৈন্য ছাড়া আর কিছু নেই। নাৎসী নিউজ এজেন্সি *ট্রান্সওশান* বলছে যে, গত কয়েকদিনে ইঙ্গ-মার্কিন ডিভিশন অনুকূল পরিস্থিতিতে ছিল, বিশেষতঃ যখন থেকে যুগপৎ তারা সোভিয়েতের সংগে আক্রমণ চালাচ্ছে।'

ইয়াল্টার যৌথ পরিকল্পনাভিত্তিক এই যুগপৎ আক্রমণ জার্মানিতে গভীর আতঙ্ক জাগাচ্ছে। সরকারী নাৎসী প্রচার মাধ্যম তা লুকোতে পারছে না। মার্কিন ভাষ্যকার ল ইস ভাবছেন, কতদিন হিটলার জার্মানদের এক থেকে আরেক পরাজয়ে নিয়ে যাবেন।

নাৎসী গোষ্ঠী—হিটলার, হিমলার, বোমান, গোয়েবলস এবং গোয়েরিং—কিসের ওপরে নির্ভর করছেন? বোধ হয় "রাজনৈতিক সংকট"-এর ওপরে। ক্রিমিয়া সম্মেলনের পর তাঁদের আরো বোঝা উচিত। তবু ওঁরা এই বৃথা আশা আঁকড়ে আছেন। ওঁদের গোপন কূটনীতির নতুন, দুঃসাহসী কাজের এই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। যেমন, স্টকহোলমে হেসের "শান্তি" মিশন—মিত্রশক্তির মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি, রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করা এবং মিত্রপক্ষীয় সামরিক পরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা।

তবু এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। গোয়েবলস সেদিন ওঁদের উদ্দেশ্য আবার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা আবার সব শুরু করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।"

তাই সোভিয়েত ইউনিয়নও হিটলার জার্মানিকে চূর্ণ করে পৃথিবী থেকে ফ্যাসিবাদ দূর করতে বদ্ধপরিকর।

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫

লাল ফৌজ কোনিগসবার্গ অধিকার করেছে। সে ভিয়েনার পথে লড়াই করছে। সোভিয়েত ও বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এটা মুখ্য সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ!

বাল্টিকে নাৎসী প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কোনিগসবার্গের জন্য পূর্ব প্রুশীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে চরমে নিয়ে গেল। *নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের* এলিয়টও লক্ষ্য করেছেন যে, বালাটন হ্রদ থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত লাল ফৌজের অগ্রগতি যুদ্ধের বৃহত্তম সামরিক সাফল্যের অন্যতম। ভিয়েনার পতন হলে লাল ফৌজ আভ্যন্তরীণ জার্মান দুর্গে ঢুকবে। *এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের* ভাষ্যকার ম্যাকেঞ্জিও লক্ষ্য করেছেন যে, আর কোন সাম্প্রতিক ঘটনা ভিয়েনার যুদ্ধকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না, কারণ এতে আল্পস্ অঞ্চলে হিটলারের শেষ অবলম্বন ধরে রাখার ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রভাবও বিরাট। প্রুশীয়-জার্মান প্রতিক্রিয়া এবং আগ্রাসী প্রাচ্য নীতির ঐতিহাসিক আশ্রয় পূর্ব প্রুশিয়া চিরকালের মত জার্মান সমরবাদ হারাল। ভিয়েনায় যুদ্ধরত সোভিয়েত বাহিনী মধ্য ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বের প্রতি এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। লাল ফৌজ কর্তৃক মুক্ত ষষ্ঠ ইউরোপীয় রাজধানী হল ভিয়েনা। খবর অনুযায়ী, অস্ট্রিয়রা জার্মান বাহিনীর সংগে পালাচ্ছে না। উপরন্তু, তারা ধীরে কাজ করে নাৎসীদের বাধা দিচ্ছে, কারখানা বাইরে পাঠাবার নাৎসী প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছে এবং Volkssturm-এ যোগ দিতে চাইছে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন "জার্মান নাৎসী দখলদার বাহিনীর রাজত্ব বিলোপে সাহায্য করবে এবং অস্ট্রিয়ায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ফিরিয়ে আনবে" এই সরকারী সোভিয়েত বিবৃতির অস্ট্রিয়ায় ও অন্যত্র অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল। এতে বোঝা গেল যে লাল ফৌজের অস্ট্রিয় অঞ্চল অধিকার বা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন ইচ্ছে নেই। অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা উপলক্ষে মিত্রপক্ষের ঘোষণার বক্তব্য ও মনোভাবের উপরে সোভিয়েত নীতি গঠিত।

হিটলার জার্মানি মিথ্যা গুজব ছড়াল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ ঘোষণা মানবে না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি পশ্চিমী গোষ্ঠী তা বিশ্বাস করল, যদিও এর উদ্দেশ্য ছিল মিত্রপক্ষে অবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

এটাও অনুরূপ তথ্যে দেখা যায় যে, নাৎসীরা যে সামরিক ক্ষমতা হারিয়েছে তার বদলে রাজনৈতিক উপায় খুঁজছে। হিটলার প্রতিটি জনবল কাজে লাগিয়েছেন। জার্মান লোকবল শেষ হয়ে গেছে। এখন নাৎসীরা পূর্ব সীমান্তে তাদের "বিশেষ বাহিনী" Walkure এবং Gneisenau বাহিনী ছড়িয়ে দিচ্ছে। *ট্রান্সওশান* বলছে, ওরা "আকস্মিক বিপদ দূরীকরণের" দমকল। এই "দমকল"-ই প্রমাণ যে Volkssturm-এর সম্বন্ধে আশা চূর্ণ হয়ে গেছে। Volkssturm, Walkure Gneisenau বাহিনী বা পশ্চিম থেকে পূর্বফ্রন্টে স্থানান্তরিত নিয়মিত জার্মান বাহিনীর ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ, এই পৃথিবীর কোন কিছুই লাল ফৌজের প্রচণ্ড আঘাত ঠেকাতে বা জার্মানির দ্রুত আসন্ন ধ্বংস এড়াতে পারবে না।

পশ্চিম ফ্রণ্টের ঘটনাবলীতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও সোভিয়েত জার্মান সীমান্তে যা ঘটেছে তার থেকে অবশ্য এটা স্পষ্টতঃ পৃথক। ৭ই এপ্রিল লণ্ডনের *টাইমস* "পূর্বে বিশিষ্ট সহযোগিতা" লক্ষ্য করেছেন, "যেখানে জার্মানদের সংগঠিত সেনাবাহিনী এখনো পশ্চিমে জয়ের জন্য লড়ছে।"

তাদের শাসকরা পূর্বে প্রচণ্ড পরাজয়ের এবং পশ্চিমে পতনোন্মুখ প্রতিরোধের কথা জার্মান জনগণের কাছে গোপন করার চেষ্টা করছে। তারা এই মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করছে যে—পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, সব সীমান্ত জার্মান বাহিনী এখনো বাধা দিতে সমর্থ। ৭ই এপ্রিল নাৎসী তথ্য সংস্থা দাবী করেছে যে, জার্মান রাইখের আত্মরক্ষার সংগে সর্বত্র রয়েছে প্রবল প্রতিরোধ। পরের দিন *ট্রান্সওশান* স্বীকার করল যে, "পশ্চিম সীমান্ত প্রতি ঘণ্টায় মিনিটে বদলাচ্ছে," আর পশ্চিম সীমান্তে জার্মান বাহিনীর মুখপাত্র বলেছেন যে, এই অবস্থা চলবে "যতদিন না সীমান্ত ফিরে পাওয়া যায়।" অর্থাৎ উনি স্বীকার করলেন যে, পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে জার্মানদের আর অবিচ্ছিন্ন সীমান্ত নেই, আরো বললেন: "মিত্রশক্তি এখনো বৃহৎ জার্মান বাহিনীকে ধ্বংস করে নি।"

যার অস্তিত্ব নেই তাকে ধ্বংস করা অসম্ভব, পশ্চিমে যেমন বৃহৎ জার্মান বাহিনী। নাৎসীদের ওখানে ব্যবহারের মত সৈন্যবলও নেই। *ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান* খবর দিচ্ছে যে, সামরিক প্রশিক্ষণবিহীন লোক দিয়ে বাহিনী তাড়াতাড়ি গঠন করা হচ্ছে। যে সব জায়গায় কোন বাহিনী আছে, সেখানেই এই নিকৃষ্ট বাহিনী পাঠানো হয়। অবশ্য কিছুই প্রায় নেই, চেষ্টা করলে নাৎসী বাহিনী তা তৈরীও করতে পারবে না, শুধু এই কারণে যে, তার প্রয়োজনীয় সৈন্য নেই। মার্কিনদের হাতে বন্দী জার্মান বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের এক বিশিষ্ট অফিসার বলেছেন যে, "পশ্চিমের চেয়ে পূর্ব থেকে ভয় বেশী এবং অধিকাংশ বাহিনী ওখানে লাগানো হয়েছে।"

এক জার্মান মুখপাত্র বলেছেন যে, "পশ্চিমে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা নেই।" চার্চিলের ভাষায়, এখন জার্মান দৈত্যের সাহস লাল ফৌজ নষ্ট করে দেওয়ার পর, এটা শুনে মনে হচ্ছে, মৃত্যুদণ্ডের আসামীর অদ্ভুত পরিহাস। তবু, এটা রসিকতার বিষয় নয়।

জার্মানরা জানে, শেষ মুহূর্ত সমাগত, খুব কাছে। হান্স ফ্রিটশে বললেন, "পূর্বে এক নতুন আক্রমণ চলেছে, কাজেই এখন কথা বলার সময় নয়।" তিনি জার্মানদের ওয়ারউলফ গোষ্ঠী তৈরী করে গোপনে লড়াই করার অনুরোধ জানালেন। জার্মান ব্যাক ও শিল্পপতিরা গোপনে ও প্রকাশ্যে পুঁজি, কাগজ, মূল্যবান বস্তু, পেটেণ্ট ইত্যাদি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মার্কিন রাষ্ট্রসচিব হোমস বললেন, পরা জয়ের পর জার্মান সাম্রাজ্যবাদের শিল্প ও সামরিক

শক্তি রক্ষার পরিকল্পনা অনেকদিন জার্মানীতে রয়েছে। ১৯৪৩-এ ফন প্যাপেনের উপরে এর দায়িত্বছিল। ১৯৪৪-এর শরতে জার্মান শিল্পপতিরা নিরাপদ জায়গায় পুঁজি ও শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের পাঠাতে শুরু করল। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে একজন আই.জি ফার্বেনের মুখপাত্র কয়েকজন বিদেশী শিল্পপতিকে বললেন যে, জার্মানী ও বিদেশে যুদ্ধের পর পূর্বাবস্থা বজায় রাখাই তাঁর চেষ্টা।

রয়টারের মতে, ওয়াকিবহাল লণ্ডন গোষ্ঠী শুনেছে যে, যদি তৃতীয় রাইখের পতন হয়, তাহলে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় যুদ্ধের সময়ে জার্মান অর্থপতি ও শিল্পপতিরা ব্যস্ত ছিল। এই হল পরিকল্পনার কয়েকটি উপাদান: বিভিন্ন দেশের বিচারালয়ে অভিযোগ করা যে মিত্রপক্ষ "অন্যায়ভাবে" জার্মান সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে; অন্যান্য দেশে পেটেন্টের উপরে বে-নামে জার্মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির শিল্পে গুপ্তচরের জাল ছড়াতে বিদেশী সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ নেওয়া, মিত্রপক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির জন্য প্রচার ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৫

আমরা করেছি। লাল ফৌজ বার্লিনে পৌঁছে রাস্তায় এবং চত্বরে লড়ছে। পৃথিবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখছে। এখনও নাৎসী বাহিনী মরিয়া হয়ে বাধা দিচ্ছে। নাৎসী বাহিনী সব শক্তিকে যুদ্ধে লাগাচ্ছে। বহু উপ-নগরী, ব্যারাক বাড়ী, সোজা রাস্তা, বড় চত্বর আর অজস্র খালে ভরা এই শহর একটা দুর্গ হয়ে উঠেছে। গোয়েবল্‌স্ শহরের অধিবাসীদের বলছেন যে, "গত সপ্তাহগুলিতে রাজধানীতে ভয়ংকর আত্মরক্ষা গড়ে উঠেছে। শহরের উপকণ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত দুর্গ ছড়িয়ে আছে। বার্লিনের চারদিকে কয়েক হাজার ট্যাংক, ব্যারিকেড, মাটির দেয়াল গড়া হয়েছে। রাজধানী নিজেকে বাঁচাতে প্রস্তুত।"

গোয়েবল্‌স একথা বলেছিলেন ২২শে এপ্রিল অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য বার্লিনে হিটলারের ঘোষণার ঠিক তিন বছর দশ মাস পরে। ন্যায়ের জয় হল। হিটলারের তৃতীয় রাইখ ভেঙ্গে যাচ্ছে। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে বাধা হল যন্ত্রণা, এক মুমূর্ষু রাক্ষসের যন্ত্রণা যার মৃত্যু এখনও হয়নি।

২৩শে এপ্রিলের ***নিউ ইয়র্ক টাইমস*** লিখেছে, "বার্লিনে যে আলো জ্বলেছিল, তা আবার সেই শহরে ফিরে এসেছে। যে বিরাট বিশৃংখলা ইউরোপের দু' হাজার মাইলের বেশী এবং শেষে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তা যে রাজধানী থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা এখন রাজধানী দিয়ে বয়ে চলেছে। আর যে গর্বিত সেনাবাহিনী এক সময়ে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন করার জন্য বহু

দেশে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল, তার অবশিষ্টাংশ এখন নিজেদের বিধ্বস্ত রাজধানীর ভাঙ্গা দেয়ালের নীচে কবরস্থ হয়েছে।"

বার্লিন বাহিনীর পিছিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই। সোভিয়েত বাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, তারা নিরুপায় হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন আগে জার্মান বেতার ঘোষণা করল যে, জার্মানরা দক্ষিণ ব্যাভারিয়া ও নরওয়েতে প্রবল বাধাদানে প্রস্তুত। কিন্তু তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। এখন নাৎসীরা বলছে যে, বার্লিন শেষ পর্যন্ত বাধা দেবে। সেই অবস্থায় তারা বার্লিনকে শেষ করতে চায়। তার নীচে বিশ্ব শক্তির জার্মান সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা চাপা পড়বে। জার্মান সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা বজায় রাখার চেষ্টা আর কখনও অনুমোদন করতে দেওয়া হবে না।

বার্লিন, ৩রা মে, ১৯৪৫

নাৎসী জার্মানীর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সব শহর ও গ্রাম যুদ্ধের ক্ষতি এড়িয়ে কোনমতে বেঁচেছিল, তারা একা, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে, জীবনের কোন চিহ্ন নেই। টাউন হলগুলিতে আত্মসমর্পণ সূচক বড় সাদা কাগজ ঝুলছে। কিন্তু বার্লিনের Autobandn ও সংলগ্ন সব রাস্তা ভীড়ে ভরা।

ত্রিশদশকের মাঝামাঝি, নাৎসীরা ক্ষমতা দখলের পরেই টড সংস্থা আসন্ন আক্রমণের সযত্ন রচিত মানচিত্রে সামরিক মোটরপথ তৈরীর জন্য বেকারত্ব সমাধানের অজুহাত দেখিয়েছিল। যেসব ব্যক্তি হিটলারকে ইচ্ছে করে উত্তেজিত করেছিল এবং যারা তাঁকে অন্ধের মত পূজো করত, তারা ভাবতেও পারে নি যে, যুদ্ধের প্রথমে যে সোভিয়েত বাহিনীকে তারা মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও ভলগাতে পশ্চাদপসারণে বাধ্য করেছিল, এখন প্রচণ্ড গতিতে বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসা সেই সোভিয়েত বাহিনীর অসুবিধা করার জন্য তাদের ঐ সব পথের উপরের ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে।

এই অসংখ্য শহরগুলির লোকজন কোথায়? তারা কি ভাবছে, কি তাদের আশা? অজস্র বড় ও গ্রামের পথের একটিতে চলুন, দেখবেন, লক্ষ লক্ষ জার্মান —পুরুষ, নারী, শিশুর স্রোত জিনিসপত্র নিয়ে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, নাৎসী কর্তৃপক্ষ প্রথমে ভেবেছিল, পূর্বের প্রদেশগুলির লোকেদের পশ্চিমে পাঠাবে। কিন্তু অবিরাম যুদ্ধের মধ্যে ৩ কোটি লোককে সরানো অসম্ভব হয়ে উঠল। নাৎসীদের আরেকটি ভুল, আরেকটি অপরাধ—এবারে নিজের জনগণের বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ নাৎসীরা শুধু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বড় অফিসার, ধনী পরিবার এবং ওয়্যারম্যাচেৎ এর পরিবার এবং অন্যান্য অফিসারের পরিবারদের স্থানান্তরে যাওয়ায় সাহায্য করছিল। ফলে, "বলশেভিক বর্বরতা" সম্বন্ধে গোয়েবলসের গল্প শুনে ভয় পেয়ে, দীর্ঘ আচরিত শৃঙ্খলাবোধ এবং প্রধানতঃ

সোভিয়েত মাটিতে নাৎসী অপরাধের প্রতিশোধের ভয়ে অধিকাংশ লোক অন্ধের মত পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তরদিকে চলেছে। আনুগতো অভ্যস্ত, কিন্তু এখন পরিত্যক্ত হয়ে তারা নিজেদের কাজের উপরে এবং বুদ্ধির উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। ভয় ও বিশৃংখলায় ওরা পালাচ্ছে। অত্যন্ত উন্মত্ত, বুদ্ধিহীন নাৎসী অফিসাররা একবার ওদের বলছে প্রতিটি গ্রামের চারদিকে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে প্রতিটি বাড়ীকে বাঁচানোর জন্য লড়তে আবার কখনো বলছে পালাতে। ভয় সংক্রামক। অনেকে নাৎসীবাহিনীর সংগে চলে গেল, অনেকে পেছনে পড়ে রইল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে ট্যাংক ও কামান চলছে, সেখানে গেল। তাদের নির্বোধ মৃত্যু অন্যদের মনে ভয় জাগাল। কিন্তু জার্মান বাহিনী এসব দেখছে না। আত্মসমর্পণ প্রত্যাখ্যান করে, একগুঁয়ের মত অকারণ বাধা দিয়ে তারা বহুবার প্রবঞ্চিত সৈন্য এবং নাগরিকদের মেরে ফেলছে।

এই প্রথম, জার্মানরা স্বদেশে যদ্ধের কষ্ট বুঝতে পারল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর থেকে কখনো জার্মানির মাটিতে যুদ্ধ হয় নি। গত ৮০ বছরে প্রুশিয়া ও জার্মানির অনেক যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কখনো জার্মানিতে নয়। এই হিটলার চালিত যুদ্ধেও তাদের ধারণা হয়েছিল যে, প্রচুর "বাসস্থান" দখল করার ফলে জার্মান বাহিনী জার্মানির সীমান্ত থেকে দূরে যুদ্ধ করে লক্ষ্যে পৌঁছবে। তবু যুদ্ধ প্রচণ্ড পরাজয়ে শেষ হচ্ছে, তৃতীয় রাইখের হাজার বছর ব্যাপী আয়ুসম্পন্ন জয়ে নয়। এতদিনে জনগণ জেনেছে যে, বার্লিন চূর্ণ হয়ে গেছে। গতকাল জার্মান রাজধানী নির্বোধ প্রতিরোধের পর সোভিয়েত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

বিশাল জনতা শংকান্বিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ আশ্রয়ের খোঁজে, অন্যরা দ্রুত পরিত্যক্ত বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে। তাঁদের দৃষ্টি শূন্য। "জাতীয় সমাজতন্ত্র" নামে পরিচিত জাতীয়তাবাদ, সমরবাদ, সেমেটিক বিরোধিতার মিশ্রণ এক তত্ত্বের বিষাক্ত প্রচারে এতদিন অস্থির এই জনতার কি মনে হচ্ছে, কেউ বলতে পারে না। যে কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন বাদীরা অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছে, তারা শুধু জানে কি করতে হবে। গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনায় তারা সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে চায়।

আমি দেখেছি, জার্মান "উদ্বাস্তু"-র ভীড়ের সংগে পথে পোল, ফরাসী, ইটালীয়দের দেখা হয়েছে, তারা বন্দী শিবির থেকে মুক্ত বা যুদ্ধ কারখানায় কিংবা জাংকার অঞ্চলে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, যে পূর্ব থেকে মুক্তি এসেছে সেদিকে যাওয়ার সময়ে তারা জাতীয় পতাকা নিয়ে যাচ্ছে। জার্মানরা চোখ নিচু করে দেখতে না পাওয়ার ভাণ করে তাদের নীরবে যেতে দিয়েছে। এই জনতা নানাদিকে চলেছে, এই অসংখ্য লোকের কয়েকজন মাত্র গতকাল সচেতন হয়েছে "প্রভুজাতি"-র বিষয়ে, আর বাকীরা দাসত্ব গ্রহণ করেছে—

নাৎসী ধাঁচের সমাজের ভাঙ্গনের এবং নাৎসী রাষ্ট্র অবসানের এই প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ।

ফ্যাসীবাদের ফলে জার্মানির কতটা বিপর্যয় হয়েছে তা বার্লিনকে দেখলে বোঝা যায়।

জার্মান রাজধানী ধ্বংসের মধ্যে পড়ে আছে। রাতে সম্পূর্ণ অন্ধকারে মগ্ন বার্লিন যেন একটা বড় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, যাকে লাভা অতি অদ্ভুত আকৃতি দিয়েছে। শহরটা মরে গেছে। এখানে সেখানে, এখনো আগুন জ্বলছে। সবচেয়ে বড় আগুন রাইখস্ট্যাগের কাছাকাছি, সেটা আমাদের চিহ্ন। শুধু আগুনের শিখা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, এটা শহর দুঃস্বপ্ন নয়। দিনের আলোতে বার্লিনকে চেনা যায় না আরো কুৎসিত লাগে। তার সোজা রাস্তা ও চত্বর অগম্য: গোলার গর্ত, বোমার গর্ত, বাড়ীর ভাঙ্গাচোরা টুকরোতে সব যানবাহন বন্ধ। ধ্বংসের উপরে একটা হলদে ধুলোর আবরণ হাওয়াকে দূষিত করছে। অ্যাডলফ হিটলারের বিধ্বস্ত বাড়ী, ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলরিতে বিশ্রী নির্জনতা। রিবেনট্রপ মন্ত্রীসভা ও অন্যান্য সরকারী বাড়ী, জেনারেল স্টাফের বাড়ী যে রাস্তায়, সেই উইলহেলমস্টাসেরও এক অবস্থা।

রাইখস্ চ্যান্সেলার, জার্মান জনগণের ফুয়েরার এবং জার্মান রাইখের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিটলার কোথায়? তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর দেহ নাকি দাহ করা হয়েছে: তাঁর নকল কয়েকজনকেও পাওয়া গেছে।

গোয়েবলস কোথায় বার্লিনের Verteidigungskommissar? তিনিও আত্মহত্যা করেছেন।

গোয়েরিং, বোরমান, হিমলার, জোল আর কাইটেল-রা নির্লজ্জের মত পালিয়েছে।

শতাব্দীর বৃহত্তম অপরাধের উপরে যবনিকাপাত হচ্ছে।

বার্লিন, ৫ই মে, ১৯৪৫

আজ দুপুরে, পূর্বে আত্মসমর্পিত ও নিরস্ত্র নাৎসী সৈন্যদের রাইখস্ট্যাগের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বারো বছর আগে ঐ সব ঘরে নাৎসীরা যে আগুন জেলেছিল, তাদের মনে হয়েছিল, সেটা বুঝি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জার্মান জাতির গণতান্ত্রিক শক্তি ও ঐতিহ্যের বিরোধিতাকে দমিত করার পথ।

যারা তখন বলেছিল যে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নাৎসীদের যুদ্ধে রাইখস্ট্যাগের আগুন একটি ব্যর্থ ঘটনা মাত্র, তাদের দৃষ্টি কত ক্ষীণ। না,

ইউরোপে, সারা পৃথিবীতে, আগুন লাগানোর স্বপ্ন যারা দেখেছিল, রাইখ স্ট্যাগের আগুন তার ভূমিকা মাত্র। গেস্টাপোদের হাতে বন্দী জর্জি দিমিত্রোভের মত অভিযোগকারীদের প্রকাশ্যে দোষী করতে গেলে ইতিহাসের গভীর জ্ঞান, উপরন্তু, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দায়িত্ব বোধ থাকা চাই। হিটলার জার্মানির নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পথ ছিল আগুন লাগানো, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করা।

তিনদিন আগে জার্মান রাজধানী আত্মসমর্পণ করেছে। বাকী যুদ্ধাপরাধীরা প্রাণ বাঁচাতে মাটির নীচে লুকিয়েছে। নাৎসী একনায়কত্বের অধীন রাইখস্ট্যাগের কোন বাস্তব ভূমিকা ছিল না এবং আগুন লাগার পর তার বড় বাড়ীটাও নষ্ট হয়েছিল। তবু, আগুনের জন্য বাড়ীটা ফ্যাসিবাদী নীতির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং, তার মাথায় স্থাপিত সোভিয়েত পতাকা প্রতিক্রিয়া, ফ্যাসিবাদ এবং আগ্রাসী যুদ্ধের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বার্লিনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। শুধু জার্মান সেনানায়ক ও অফিসাররাই নয়, সৈন্যরাও শেষ পর্যন্ত প্রবল লড়াই করেছে, যদিও তারা নিশ্চয়ই জানত যে, যুদ্ধ অর্থহীন। তাদের কি আশা ছিল? তারা কি দেয়ালে সাঁটা গোয়েবলসের শ্লোগান পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল? না কি তারা ভেবেছিল, পশ্চিম সীমান্তে প্রতিশ্রুত সৈন্য সত্যিই পৌঁছবে? তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না যে, Volkssturm কার্যকরী হবে, কারণ তাতে তাড়াহুড়ো ক'রে ১৪ বছরের বার্লিনের ছেলেদের ইঁদুর রঙা চলচলে পোশাক পরিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল। মোটের ওপর, স্বীকার করতে হবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রচলিত নিরংকুশ আনুগত্যের মনোভাব এবং প্রুশো-জার্মান সামরিক শৃংখলা প্রতিশোধের আতঙ্ক সহযোগে নাৎসী বাহিনীর সব স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাৎসী শাসক ও জার্মান বাহিনী কিসের ওপরে নির্ভর করছিল? বার্লিন প্রতিরক্ষাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দ্রুত সোভিয়েত অগ্রগতি, জার্মানি পেরিয়ে মিত্র বাহিনীর অগ্রগতিতে নিশ্চয়ই ওরা বুঝেছিল যে, ওরা হেরে গেছে এবং ইউরোপের জনগণ ও স্বদেশবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের পর ওদের এই পরাজয় সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত। তবু ভীরুর মত মরিয়া ভাবে লড়াই ক'রে ওরা বাঁচতে চাইল। জার্মান জেনারেলরা বলেন, যখন সোভিয়েত বাহিনী হিটলারের মাটির নীচের ঘরের কাছাকাছি এসেছে সেই ৩০শে এপ্রিল বিকেলের আগে পর্যন্ত হিটলার নিজের দেহে গুলি করেন নি, তাঁর শেষ আশা কি ছিল? তাঁর উত্তরাধিকারী গ্রস্যাডমিরাল ডোনিৎজ-এর শেষ আশা কি ছিল, যে জন্য, তিনদিন আগে বার্লিনের আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও তিনি শ্লেজউইগের কোন এক জায়গায় অস্ত্র-সমর্পণ করেন নি?

জার্মানির পরাজয়ের এই বসন্তের দিনে নাৎসী শাসকদের মধ্যে কি

ঘটেছিল, একদিন পৃথিবী তা জানবে এবং ঐতিহাসিকরা তা চিন্তা করবে। আজও বেতার অনুষ্ঠানে এবং চিঠিপত্রে নাৎসীদের রাজনৈতিক-সামরিক আশার আবরণ কিছুটা উন্মোচিত হয়, হয়তো ডোনিৎজের বিষয়েও। এটা স্পষ্ট যে, জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের গৃহীত প্রশ্নটি নিয়ে দীর্ঘদিন মিত্রপক্ষীয় সংবাদপত্রে ও বেতারে অনেকটা রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে। ভবিষ্যৎ শান্তির স্বার্থে ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্ট ক্যাইবেক সম্মেলনে ১৯৪৩-এ এই যুদ্ধ লক্ষ্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন। তেহেরাণ ও ইয়াল্টাতে ত্রিশক্তি সম্মেলন ইহা গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের জাগিয়ে তুলেছে। নতুন বৈদেশিক নীতির দাবী জানিয়ে, বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে, এই গোষ্ঠী হিটলার ও তাঁর দলকে আশান্বিত করেছিল যে, নাৎসী-বিরোধী কোয়ালিশন ভেঙে যাবে। নাৎসী সংবাদপত্র ও বেতার থেকে মনে হয়, এই আশা থেকে বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল যে, ভাঙন অবশ্যম্ভাবী।

সত্যিই পরিস্থিতি অদ্ভুত। যতই লাল ফৌজ এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মুহূর্তকে ত্বরান্বিত করেছে, ততই যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের কয়েকটি গোষ্ঠী এবং নিরপেক্ষ দেশগুলি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক যুক্তি দিয়ে প্রবল চাপ দিচ্ছে। মোটামুটি, ওদের যুক্তি হল : নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ফলে জার্মান জনগণ ও জার্মান বাহিনী সব দিকে বঞ্চিত হবে, তিক্ততা দেখা দেওয়ার ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলবে এবং অকারণ ক্ষতি হবে। যদি পশ্চিমী শাসকরা দাবী তুলে নেয়, তাহ'লে জার্মান শাসকরা আলোচনা করতে পারে। অতএব মানবতার স্বার্থে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত নীতি।

কিন্তু বক্তব্য ও অনুসিদ্ধান্তটি সম-পরিমাণে ভুল। সত্য বটে, হিটলার এবং তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক চক্র জার্মানদের বিশ্বাস করিয়েছে যে, তাদের ভাগ্য নাৎসী বাহিনী এবং রাষ্ট্রের ভাগ্যের সংগে জড়িত। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, অসংযত জাতীয়তাবাদী প্রচার এবং অতিরিক্ত সন্ত্রাসের দ্বারা নাৎসীরা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে, কিন্তু ঠিক এই জন্যই অন্যান্য তথ্য দারুণ জরুরী। যাহাই হউক, স্তালিনগ্রাদে ৬ষ্ঠ বাহিনী, বুদাপেস্ত ও অন্যত্র বাহিনীগুলি, বার্লিনে জার্মান বাহিনী লোভনীয় ভবিষ্যতের জন্য আত্মসমর্পণ করেনি। বরং, তারা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে, 'কারণ এ ছাড়া তাদের আর কোন পথ ছিল না। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবীর পেছনে কোন প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল না। এর পেছনে, হিটলার জার্মানীকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার বাসনা ছিল, যেখানে, চাকুরিয়া বা অসামরিক প্রত্যেক জার্মান স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে, জার্মান সহ জনগণের স্বার্থে নাৎসীবাদ ও সমরবাদকে ধ্বংস করতে হবে। এতেই শুধু

জার্মান জাতি এক নতুন ঐতিহাসিক পটভূমিকা লাভ করবে। ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে সেই হবে একমাত্র সংগত ও প্রকৃত মানবিক নীতি।

কিন্তু বাইরে জার্মান শাসকরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেও রঙ্গমঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার আগে এখনো এটা এড়ানোর আশা রাখে। এদের কয়েকজন হয়তো আশা করে যে, জার্মানীর ভবিষ্যতের প্রশ্ন নিয়ে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনে মতভেদ দেখা দেবে আর অন্যদের হয়তো ধারণা যে, যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলে তা হলে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সংগে পৃথক শান্তি সম্ভব।

লজ্জার কথা, ওদের আশাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলা যায় না। এপ্রিলের শেষাশেষি, বোধ হয় ২৬শে, সানফ্রান্সিস্কোর *ডেলি মিরর*-এর সংবাদদাতা খুব আনন্দের সংগে খবর দিলেন যে, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধা দেওয়ার জন্য জোরালো যুদ্ধোত্তর জার্মানী সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এটাই এ জাতীয় একমাত্র প্রতিবেদন নয়। এপ্রিলের শেষদিকের প্রতিবেদন বলছে, যে, সুইডিশ রেডক্রসের সভাপতি কাউন্ট বার্নাডোট কয়েকটি নাৎসীগোষ্ঠী এবং বৃটিশ ও মার্কিন শাসক চক্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে কাজ করেছেন।

হিটলার আর নেই, কিন্তু তাঁর জেনারেলরা রয়েছেন। হয়তো সাধারণভাবে আত্মসমর্পণে দেরীর কারণ ওঁরা অন্য পথে চেষ্টা করছেন। কিছুই বলা যায় না।

বার্লিন, ৯ই মে, ১৯৪৫

পৃথিবী এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছে। আজ সেই দিন এসেছে— জয়ের দিন, আশার দিন। যে নাৎসী জেনারেল ও অ্যাডমিরালরা পশ্চিমী গোষ্ঠীদের সংগে গোপন আঁতাতের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তাদের কূটনৈতিক দলাদলির চেয়ে আমাদের জনগণের এবং হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের জনগণের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিশালী

গতকাল, মিত্র পক্ষীয় পতাকায় সজ্জিত পথে বার্লিনের জনতা বেরিয়ে এসেছিল, তারা অস্পষ্টভাবে বুঝেছিল যে বিধ্বস্ত নাৎসীবাহিনীর প্রায় বিধ্বস্ত রাজনীতিতে কিছু ঘটতে চলেছে। দুপুর নাগাদ টেম্পেলহফ বিমান বন্দরে পৌঁছলেন ইউরোপে সর্বোচ্চ মিত্র পক্ষীয় অধিনায়ক এয়ার মার্শাল সার আর্থার ডব্লিউ টেডার, জেনারেল ডিউইট ডি. আইসেনহাওয়ার এবং ইউরোপে মার্কিন বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল কার্ল স্পার্টজ। সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের সংগে দেখা করলেন জেনারেল ভি. ডি. সোকোলোভস্কি, এন. ই. বার্জারিন, এস. আই. রুডেংকো, এফ. ই. বোকোভ এবং অন্যান্যরা। কোন কারণে, ফরাসী বাহিনীর কোন প্রতিনিধি আসেন নি।

শীঘ্র আর একটি বিমান এল, তার থেকে বেরোলেন ফিল্ডমার্শাল কাইটেল, অ্যাডমিরাল ফ্রেডবুর্গ এবং বিমান কর্নেল জেনারেল স্টামফ, সংগে তাঁদের সহকারীরা। মার্শালের ব্যাটন হাতে নিয়ে কাইটেল দলের আগে চললেন, তাঁর চোখ অজ্ঞাতসারে ডানদিকে চলে গেল, সেখানে মিত্র শক্তির অধিনায়কদের সংগে সামরিক ব্যক্তিদের সংগে আলাপ করানো হচ্ছে। কাইটেলের সংগীদের ভাবী আত্মহত্যাকারীদের মত দেখাচ্ছিল।

বিকেলে, বিশেষ বিমানে পেঁছিলেন ফরাসী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ডেলাতার দ্য তাসিনি। সন্ধ্যের পরে, মাঝরাতের কাছাকাছি, ক্লান্তিকর অথচ আনন্দিত প্রতীক্ষার পরে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হল যুদ্ধ প্রযুক্তিবিদদের কার্লশর্টের প্রাক্তন বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে।

ইউরোপ ও বিশ্ব জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে হিটলার একবার বলেছিলেন: "আমরা জিততে না পারলেও অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংস করব। আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করব না।"

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী রাজনীতিক ও তত্ত্ববিদদের জার্মান সাম্রাজ্যবাদ এবং সমরবাদের আশানুরূপ হয় নি। প্রকৃতই অর্ধেক পৃথিবীকে ধ্বংস করে আগ্রাসী জার্মান সমরবাদ জার্মানীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, কিন্তু আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এড়াতে পারল না। শুধু একটা বিষয়ে হিটলার ঠিক বলেছিলেন: ১৯৪৫, ১৯১৮-র পুনরাবৃত্তি নয়। আত্মসমর্পণ চুক্তির এই ঐতিহাসিক স্বাক্ষর যে জার্মানীর বাইরে কম্পিয়েন বা অন্যত্র হয় নি, হয়েছে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে, এতেই বোঝা যায় জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদ, ফ্যাসীবাদী অত্যাচারী ও তাদের যুদ্ধ এবং আক্রমণের তত্ত্বের ক্ষেত্রে কতটা বিপর্যয় হয়েছে। ১৯১৮-তে কাইজার জার্মানির আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হয়নি জেনারেল লুডেনডর্ফের দ্বারা, হয়েছিল শুধু পশ্চিমী শক্তির সংগে রাইখস্ট্যাগ ডেপুটি আর্জবার্গারের। এবারে বার্লিনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর করলেন ফিল্ডমার্শাল কাইটেল এবং জার্মান সমরবাদের অন্যান্য প্রতিনিধি। জয়ের ক্ষেত্রে নিশ্চিত অবদান সোভিয়েত ইউনিয়নের আর এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। জাতীয় স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের সমর্থকদের জয়ে অংশ রয়েছে।

যখন চেয়ারে বসা সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জি. কে. জুকভ জার্মান প্রতিনিধিদলকে ডাকতে বললেন, তখন ঘরে নিঃস্তব্ধতা নেমে এল। ঘরে ঢুকে কাইটেল ব্যাটনটা তুলে বোধহয় বুঝলেন, নাৎসী সমরবাদের এই শেষ ভঙ্গী কত ভুল, ঐ নাৎসীবাদ যুদ্ধে বিধ্বস্ত, ইতিহাস কর্তৃক নিন্দিত এবং সম্পূর্ণ বিলোপের মুখে।

কাইটেল খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন (তাঁর চশমা অনেকবার খুলে যাচ্ছিল)। তবুও নিজের মুখ বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন। স্বাক্ষরের আগে তিনি

কথা বলতে চাইলেন। মানুষের উপরে ফ্যাশিবাদ যে রক্তাক্ত অত্যাচার চাপিয়ে দিয়েছে, তার উপরে ইতিহাস যখন যবনিকাপাত করছে, তখন এই যুদ্ধাপরাধী কি বলতে পারেন? তিনি কি "জার্মানী অবরোধ"-এর প্রাচীন সামরিক প্রবাদের নাৎসী সংস্করণ এবং "নিরোধক যুদ্ধ"-এর প্রয়োজন ফিরিয়ে এনে জার্মান সমরবাদের শয়তানি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? না কি, জার্মান বাহিনী কর্তৃক গৃহীত "বিশ্বাসঘাতকতা"র পুরানো প্রবাদ ফিরিয়ে আনতে চান? কিংবা আত্মসমর্পণের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি কি প্রতিশোধের আহ্বান জানাতে চেয়েছিলেন, যাতে কোন অনুকূল সময়ে জার্মানরা আবার সামরিক পতাকা তুলে নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারে?

বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল না, কারণ ইতিহাস তার রায় জানিয়ে দিয়েছে। দলিলপত্র উপস্থিত করে কাইটেল, ফ্রেডবুর্গ এবং স্টামফ্ একে একে টেবিলের কাছে এসে স্বাক্ষর করলেন।

চুক্তিটি হল, "আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা জার্মান হাইকমাণ্ডের আদেশে এখানে নিঃশর্তভাবে মিত্রপক্ষীয় অভিযান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের কাছে এই তারিখে জার্মান অধীনে স্থল, জল ও শূন্যের সব শক্তিকে সমর্পণ করছি।"

শেষে বলা হল, যদি জার্মান পক্ষ সব কিছু পালন না করে, তাহলে "দণ্ডার্হ বা অন্যান্য ব্যবস্থা যা তারা যথাযথ মনে করে" প্রয়োগ করা হবে।

"দণ্ডার্হ ব্যবস্থা।" এই কথাগুলির নীচে স্বাক্ষর করার সময়ে জার্মান সমর নেতারা প্রায় স্বীকারই করলেন যে, ওদের ব্যবহার অপরাধীর মত হয়েছে।

প্রথম থেকেই ওরা অপরাধ করেছে। সোভিয়েত বাহিনীর সৈন্য, অফিসার ও জেনারেলরা তার সাক্ষী, কারণ তাঁরা নাৎসী যুদ্ধ যন্ত্রের আঘাত বহন করছেন, সহ্য করছেন এবং ওঁদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। ভি. আই চুইকোভ এখানে, এই ঘরে রয়েছেন; তাঁর বাহিনী ভলগা থেকে স্প্রি পর্যন্ত গিয়েছিল। যারা হিটলার জার্মানীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল, তারা অন্ততঃ মনে মনেও সবাই এখানে উপস্থিত আছে। সোভিয়েত জনগণ এবং অন্য ছোট, বড, সব জনতা, যারা নাৎসী শয়তানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সকলের প্রবল বীরত্বব্যঞ্জক এবং কষ্টকর প্রচেষ্টাকে এই সাধারণ ঘরটি যেন ধরে রেখেছে। এখানে সব সৈন্য, সব অংশীদাররা রয়েছে, যারা এখনও জীবিত আর যারা মারা গেছে; কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট, বিশাল প্রতিরোধবাহিনী, বিচিত্র বহুভাষী যারা ফ্যাসিবাদকে হারানোর ইচ্ছায় একত্র হয়েছিল। এখানে লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে—পুরুষ, স্ত্রী, জীবিত, আহত, নিহত, সারা ইউরোপের সব বন্দী শিবির থেকে আগত; গ্যাসচেম্বারে শ্বাসরুদ্ধ, মাজডানেক আর অশউইট্জের আগুনে দগ্ধ, নাৎসী অধিকৃত শহরে ও গ্রামে নিহত শিশুরাও আছে। যারা লড়েছে, যারা জাতিগুলির ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রাণ দিয়েছে,

সবাই তাদের মূল্যবান দায়িত্ব পালন করেছে যাতে নাৎসী বাহিনী এই ঘরে এসে পরাজয় স্বীকার করে বেরোতে বাধ্য হয়। শেষে, এত বছর পরে নাৎসী-বাদের দুর্গন্ধ থেকে হাওয়া মুক্ত হতে শুরু করেছে।

এখন থেকে জার্মান সমরবাদ ও ফ্যাসীবাদকে দূর করা একটা রাজনৈতিক এবং নৈতিক দায়িত্ব। প্রত্যেকে এটা চায়—যারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছিল, জার্মান জাতির যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি বহু বছর দুর্বল হয়ে থেকে নাৎসী শিবিরে ধ্বংস হয়ে গেছে বা মাটির নীচে কিংবা বিদেশে হিটলারের সংগে প্রাণপণ লড়াই করেছে। জার্মান জনগণ এবং অনেকটা ইউরোপীয়দেরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, এই কাজ কত ভালভাবে হয় তার উপরে।

আজ আমরা জয়ে আনন্দ করছি, কিন্তু কাল আমাদের যুদ্ধোত্তর শান্তির রূপদানের কথা ভাবতে হবে। মতভেদ হতে পারে, কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত জার্মান সমরবাদে শান্তিপূর্ণ ইউরোপে কোন স্থান নেই।

চতুর্থ খণ্ড

পুনরায় সামরিকবাদ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বা পারমাণবিক বিপর্যয়

প্রুশিয়ান রাষ্ট্রগুলির অবলুপ্তি সামরিক ঐতিহ্য

ইতিহাস অনেক আপাতদৃশ্য জটিলতা ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছে যেগুলির প্রভাব যা ভাগ গিয়েছিল, তার থেকে অনেক ক্ষীণ হয়েছে। এটার জন্য ঐতিহাসিক ত্রুটি বা সমসাময়িকদের ভ্রান্তি দায়ী নয়—যদি অবশ্য ঘটনার সাধারণ মূল্যায়ণ এবং তার মৌলিক দ্বন্দ্বমূলক প্রবণতার মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য না থাকে। ঐ প্রবণতাগুলির কিছু ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে এবং কিছু কিছু পুরাতন শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক মানুষ সকলেই রাষ্ট্রের অবলুপ্তিকে এক সামরিক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখবেন এবং নিশ্চয়ই একমত হবেন যে এটা একটা বৃহৎ ঘটনা যা ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করবে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে প্রুশ রাষ্ট্র ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে সামরিক ঐতিহ্যর এক প্রতীক হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং কেউ বলতে পারে না যুদ্ধবাজদের ভবিষ্যৎকে সে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করবে পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হিটলার বিরোধী বৃহৎ চতুঃশক্তি (সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স) পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণের পরিষদ, ১৯৪৭ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ১৯৪৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী যুগ্ম নিয়ন্ত্রণ পরিষদ প্রুশ রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার যে আইন প্রণয়ন করেছিল তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। আমরা জানি, এই আইনের আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী রাষ্ট্র পরাজিত হয়েছিল এবং জার্মানি, যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রুশিয়া, নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল। ঐ আইনে বলা হয়েছিল, যে প্রুশ রাষ্ট্র, দীর্ঘদিন যুদ্ধবাদী ও প্রতিক্রিয়াকে বহন করেছে। তার অবলুপ্তি ঘটল। হিটলার বিরোধী শক্তির এই আইন প্রণয়নের দ্বারা এই রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটল ও রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে গেল।

আধুনিক ইতিহাসের উপর এর কি প্রভাব হতে পারে? এটা কি কোনো সামরিক পরিবর্তনের প্রতীক না এটা জার্মানির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল? বিগত দুটো বিশ্বযুদ্ধে এটা প্রমাণিত যে জার্মানির ভাগ্যের

সংগে ইউরোপের ভাগ্য বেশ জড়িত। রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভাগ্য অনুযায়ী প্রশ্ন হচ্ছে প্রুশ রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সংগে সংগে কি আজকের দিনে প্রুশিয়ান ঐতিহ্যর সমাপ্তি ঘটছে কি না?

তার ৭০০ বছরের জীবনে প্রুশ রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় যুদ্ধবাজ ছিল। এর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সব সময় সামরিক স্বার্থ কেন্দ্রীক ছিল। যেহেতু এই সদা গত শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ ধরে যে ছিল জার্মান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড, অনেকের মনে হতে পারে যে এর অবলুপ্তি প্রভাব যুদ্ধোত্তর জার্মানীর রাজনৈতিক পুনগঠনে অনুভূত হবে। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে বেশী সচেতন কেউ নয়। তারাই প্রথম এই ধারণার অবতারণা ঘটায় যে প্রুশিয়া ও জার্মানীর ঐক্যের জন্য যুদ্ধ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তারা প্রাণপণ পরিশ্রম করে এই ধারণা প্রচার করার চেষ্টা করেছে যে জংগী যুদ্ধবৃত্তি বা সমরসজ্জা জার্মান জাতির একতাকে সুরক্ষিত করতে পারে। বিসমার্ক এই ধারণার জনক এবং হিটলার তা নতুন ভাবে সাজান প্রুশিয়ান যুদ্ধ বা ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে তিনি তার দানবিক সাম্রাজ্যবাদী অনুষ্ঠান সূচীকে দাঁড় করান।

যদিও যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে, বিসমার্কের এই ধারণার প্রভাব এত দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর যে জার্মান প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক মতলব যা সাধিত করার জন্য এই ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে। শোচনীয় পরাজয়ে পর্যুদস্ত হয়ে তারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শিবিরে সমর্থক খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এই সমর্থন পাবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিছু কিছু বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্র বলেছিল যে প্রুশিয়ান রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কোন গুরুত্ব নেই। কিছু কিছু সংবাদপত্র এই অবলুপ্তি নিয়ে বিলাপ করেছিল। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকা প্রুশিয়ান চরিত্রের কিছু কিছু গুণাবলী যথা শ্রমশীলতা, সঞ্চয়শীলতা, ধর্মপরায়ণতা আইন শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতির ওপর আলোকপাত করেছিল, তাদের এই প্রচেষ্টা থেকে এই ধারণা হতে পারে যে কিছু কিছু মহল চায় যে প্রুশিয়ান চরিত্র সম্বন্ধে লোকের এই রকম ধারণা গড়ে উঠুক এবং তাদের আসল ব্যর্থতা লোকে ভুলে যাক।

১

প্রুশিয়ার অস্তিত্ব মধ্যযুগ থেকে যখন ব্রাণ্ডেনবুর্গ মার্ক বা জার্মান সাম্রাজ্যর পূর্বাঞ্চলের (ফ্রেনাকের শ্লাভভূমি নামে পরিচিত) ঘাঁটি হিসাবে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্রাণ্ডেনবুর্গ বা উত্তর মার্ক প্রথমে ছিল এ সবের এক মাঝারি আকারের সামরিক ঘাঁটি যেখান থেকে প্রতিবেশী শ্লাভ উপজাতির ওপর আক্রমণ

চালানো হত। কিছুদিনের মধ্যে শ্লাভদের হয় শেষ করে দেওয়া হয়েছিল অথবা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ মার্ক-নতুন কলেবর প্রাপ্ত হয়েছিল। তার আয়তন ওডার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং তা ছাড়িয়ে আরও পূর্বে বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রথমে ডিউকরা আক্রমণকে পরিচালনা করত। ১২শ শতাব্দীতে তাদের উপাধি ছিল ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের মার্ক গ্রাফেন। তারা ছিল অ্যানহল্টের হাউস, তারপরে এসেছিল ব্যাভেরিয়ান হাউস থেকে, তারপর সুক্সেমবুর্গ হাউস থেকে, তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হেহ্বেন জোলার্ন হাউসের প্রায় যুক্ত স্বোয়াচিয়ান বংশের এক শাখা যে বংশের রাজত্ব পত্তন করে তা প্রথমে ব্র্যাণ্ডেন বুর্গ, তারপর প্রুশিয়া এবং অবশেষে জার্মানী ১৯১৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে।

যখন হেহ্বেন হোলানর্রা ব্র্যাডেনবুর্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল তখন রাষ্ট্রের পূর্বে ব্রা ঠিকমত ব্র্যাণ্ডেন বুর্গের ধরন ও চরিত্রের মত এক প্রুশিয়া রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল—তা ছিল টিউটনিক নাইটদের এক রাষ্ট্র। তারা সিরিয়ার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে পরাজিত হয়ে অস্ট্রিয়ার বুগেনল্যাণ্ড, প্রদেশ জয় করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আবার পরাজিত হয়ে ইউরোপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বাল্টিক উপকূলে এসে পৌঁছেছিল। সেখানে বোরুসিদের (এক প্রকার লিথুবানিয় উপজাতি) সংগে অনেক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পর শস্য শ্যামল মাটিকে মরুভূমিতে পরিণত করে, স্থানীয় অধিবাসীদের ধ্বংস করে বা ক্রীতদাসে পরিণত করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। কার্ল-মার্কস শ্লাভাঞ্চলের বলপূর্বক জার্মানীকরণ গভীরভাবে গবেষণা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "বিদেশী আক্রমণকারীরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল, বন কেটে ফেলেছিল, জলাভূমি শুকিয়ে দিয়েছিল, স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরেছিল এবং জার্মান ধাঁচে দুর্গ, শহর, আশ্রম ও যাজকালয় স্থাপন করেছিল, যাদের হত্যা করা হয় নি, তাদের ক্রীতদাস করা হয়েছিল।" এইভাবে প্রুশিয়ার জন্ম হয়েছিল এবং এইভাবে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল—এর জন্ম ও বৃদ্ধি হিংসার দ্বারা এবং ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ মার্কের মত এর অস্তিত্বের উপায় ও উদ্দেশ্য হিসাবে হিংসার মনোভাব দেখিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের অ্যালব্রেখটকে টিউটনিক শাসন ব্যবস্থার গ্র্যাণ্ড মাস্টার হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। লুথারের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ঐ ভূখণ্ড হচ্ছে হেহেবনজোলানর্দের বংশানুক্রমিকভাবে এক্তিয়ারভুক্ত। টিউটনিক নাইটরা বিশাল ভূখণ্ডের মালিক হয়ে উঠল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন অ্যালব্রেখটের আর কোন পুরুষ বংশধর রইল না

তখন ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের ইলেক্টর প্রুশিয়ার উপর তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করলেন এবং ১৭০১ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়াকে এক রাজ্যের সম্মানে ভূষিত করলেন এবং নিজেকে প্রুশিয়ার রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

এই ভাবে শ্লাভ ও লিথুয়ানীয় জাতির ভূমিতে গ্রথিত ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ ও টিউটনদের প্রুশিয়া থেকে প্রুশ রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রুশিয়া এক পোল্যাণ্ডের একখণ্ড জমির দ্বারা বিভক্ত ছিল।

প্রুশিয়া ঔপনিবেশিকতাবাদীদের এক সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং এর শাসক দস্যু ব্যারণেরা বিজিত জনসাধারণের ধনসম্পদ ও জমি দখল করেছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পোল্যাণ্ডের যে অংশ প্রুশিয়াকে বিভক্ত করেছে, তা দখল করে নিয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্যাক্সনির এক বৃহদাংশ এবং রাইন নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চল দখল করেছিল। এই ভাবে প্রুশিয়া মধ্য ইউরোপের শক্তিশালী দেশে অন্যতম হয়ে উঠেছিল।

এই সময় প্রুশিয়ার চরিত্র গড়ে উঠেছিল এবং তা তার পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিবেশীদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠে ছিল। এই আগ্রাসী প্রুশ চরিত্রের মূল বাহন হয়ে উঠেছিল জাঙ্কাররা তারা ছিল বিশাল সম্পত্তির মালিক। এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল লোভী, সাম্রাজ্য লিপ্সু ও স্থূলবুদ্ধি এবং তারা তাদের সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা আঁকড়ে ধরেছিল। তাদের পুরাপুরি কিউটনিক নাইকদের কাছ থেকে তারা যে ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল তা হচ্ছে পশুশক্তি অধিকারের উৎস এবং ক্ষমতা সুদৃঢ় ও বিস্তার করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। এই ভাবে তারা এক স্থূল ও উদ্ধত সামরিক শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের ধারণা দেশের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

সময়ের গতির সংগে সংগে ইতিহাস সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু প্রুশিয়া তার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখেছিল। যদি সম্ভব হত, জাঙ্করা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রকে চিরদিনের মত জীইয়ে রাখত।

মিবাবু একবার বলেছিলেন যে প্রুশিয়ার স্থায়ী শিল্প হচ্ছে যুদ্ধ। দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের সামরিক তথ্য সংগ্রহকারী বেরেনহেবার্স্ট ভেবেছিলেন যে, প্রুশিয়া সাধারণ অর্থে একটা রাষ্ট্র ছিল না। তিনি বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে এক সৈন্য শিবির। ইতালীর ট্র্যাজেডী লেখক ভিত্তোরিয়ো অলেফিবেরারি, যিনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন, লিখেছিলেন যে প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিন হচ্ছে "এক সৈন্য শিবির সমূহের এক বিরক্তিকর সমষ্টি এবং প্রুশিয়া তার হাজার পেশাদার সৈন্য নিয়ে এক যুদ্ধবন্দীদের এক বিশাল হাজত।" এক অগ্রবর্তী ও পরবর্তীকাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

জার্মান যুদ্ধবাজদের আদর্শ দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ছিলেন, "প্রুশবাদের" দ্বারা এবং আলোকিত স্বৈরতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক। তিনি তার পূর্বসূরীদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে পেশাদার সৈন্যদের এক বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই বাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল সেনাপতিদের অন্যতম জেরহার্ড ফন স্কানহোর্স্টের মতে তা গঠিত হয়েছিল জোর করে ধরে আনা দাসদের নিয়ে এবং এই বাহিনীর অধিকাংশ ছিল "ভবঘুরে, মাতাল, চোর, হত্যাকারী ও দেশের অন্যান্য সামাজিক অপাঙক্তেয়দের নিয়ে।" এই বাহিনী এত বিশাল ছিল যে এর খাদ্য সরবরাহ করার জন্য বিদেশী রাজ্যে ক্রমাগত হানা দিতে হত। দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ এই সামরিক নীতির অবতারণা করেন যে, "একজন সৈন্য তার অফিসারকে শত্রুর থেকেও বেশী ভয় করবে।" তিনিই ব্যুরোক্রাটিক পুলিশ বাহিনী তৈরী করেছিলেন। লেসির লিখেছিলেন যে, এই বাহিনী প্রুশিয়াকে ক্রীতদাসের দেশে পরিণত করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে প্রুশিয়ার আভিজাত্য "এতগুণে সমৃদ্ধ যে তাকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে। তিনি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি, এমন কি জার্মান রাষ্ট্রগুলির ভূখণ্ড দখল করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করেন নি।

দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ কৌশল অবলম্বনের জন্য কোন রকম অস্থিরমতির পরিচয় দেন নি। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তার প্রিয় রাজনৈতিক অস্ত্র। তিনি বিপন্নকে ঠকিয়ে আনন্দ পেতেন। এক প্রতিবেদনের পাশে তিনি লিখেছিলেন : "বৃটিশরা হচ্ছে বোকা, ওলন্দাজরা নির্বোধ। এই সুযোগ গ্রহণ করে ওদের বোকা বানানো যাক। "রোক্র আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে তিনি যারা তাঁকে বাধা দিতে পারে, তাদের মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন। তিনি তার পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখেছিলেন : "পৃথিবীর নিপুণতম ভণ্ড হোন। তাহলে আমি সৌভাগ্যের সব থেকে সুখী সৈনিক হবো এবং আমাদের নাম কখনো বিস্মৃত হবে না।" বাস্তবিকই প্রুশিয়ার যুদ্ধবাজরা এবং জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে ভুলে যায় নি, তারা বুড়ো ফ্রিটনকে পুজো করত। পুরোনো প্রুশ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির কিছু পরিমার্জন হয়েছিল কিন্তু দূরবর্তী প্রুশ-জার্মান যুদ্ধবাজদের উপর এর প্রভাব ১৯৪৫ সালের শোচনীয় আঘাতের আগে পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে টিউটনিক নাইট ও প্রুশিয়ান যুদ্ধবাজরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহান বুর্জোয়া বিপ্লবের ঝড় ফ্রান্স থেকে সামন্ততন্ত্রকে উপড়ে দিয়েছিল। তখন জার্মানী রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ছিল। তখন তার অস্তিত্ব ছিল রাজনৈতিক অপেক্ষা ভৌগোলিক। এর ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল ৩০০-র বেশী সামন্ততান্ত্রিক অঞ্চল এবং হাইনরিখ হাইনের মতে এর মধ্যে কিছু কিছু এত ছোট ছিল যে সেগুলো একজনের জুতোর সোলে বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জেনায়

প্রুশিয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর জার্মান মানসিকতায় বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদী সম্পর্কের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ধারণার অংকুরোদগম হয়। কিন্তু তখন জনতা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও বংশভিত্তিক ব্যবস্থার দূর করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি এবং জার্মান রাজ্যগুলির মধ্যে শক্তিশালী প্রুশিয়া তখন জাংকারডম ও বংশানুক্রমিক স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত ছিল।

ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ জনতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভীতত্রস্ত তৃতীয় ফ্রেডরিখ-উইলহেলম্ জনতার জন্য এক সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল স্তোকবাক্য মাত্র। তিনি কোনোমতেই প্রুশ জাংকারদের আধিপত্য খর্ব করতে পারেন নি এবং সেরকম কোন চেষ্টাও করেন নি। পরবর্তীকালে এংগেলস্ লিখেছিলেন যে, যে সমস্ত নির্বোধ সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন সার্জেণ্ট মেজর হবার জন্য এবং সৈন্যদের বোতাম ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। তিনি ছিলেন একজন ঠাণ্ডা মাথার নীতিহীন ব্যক্তি অথচ তিনি নৈতিকতা প্রচার করতেন এবং তিনি নিজের ছেলেকে দিয়ে আদেশ জারী করার ব্যাপারে উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন। তার মাত্র দুটো অনুভূতি ছিল—ভয় এবং একজন সার্জেণ্ট-মেজরের ঔদ্ধত্য।"

তিনি নেপোলিয়নকে ভয় পেতেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পর রুশ জারকে যিনি প্রতিক্রিয়াশীল পবিত্র গোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করতেন, ভয় পেতেন। তবে সংখ্যালঘু জার্মান রাষ্ট্র ও প্রজাদেব ক্ষেত্রে তাঁর সার্জেণ্ট মেজরের ঔদ্ধত্যর কোন সীমা ছিল না।

১৮১৫ সালের ভিয়েনা বৈঠকের পর জার্মান রাষ্ট্রগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। মাত্র ৩৯টা অবশিষ্ট ছিল এবং এদের মধ্যে বৃহত্তম প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সংগে, মধ্য ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার মূল ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। ১৮০৭ খৃস্টাব্দে প্রুশিয়ার সরকার দাসপ্রথা রদ করার জন্য যে আদেশ জারী করেছিলেন তারপর আরও অনেক আইন, আদেশ ও সরকারী অনুশাসনের প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং তার ফলে জাংকারদম আবার পুনর্বাসিত হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা বহাল ছিল, তাদের মধ্যে ছিল কর্ভি এবং আরও কিছু শুল্ক। ফাটকা, মুনাফা এবং পুরোনো সমাজতান্ত্রিক করের দ্বারা ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে জাংকাররা শোষণের পুঁজিবাদী কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং কৃষকদের অসহায়তা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে প্রুশিয়ার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও কৃষিবিভাগে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এইভাবে প্রুশিয়ার কৃষিব্যবস্থার দীর্ঘ পুঁজিবাদী অধ্যায় শুরু হয়েছিল এর প্রায় একশ বছরের উপর। এর প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক ছাড়া রাজনৈতিক ইতিহাসেও পড়েছিল।

জাংকাররা প্রুশিয়ার প্রধানশক্তি হিসাবে বিরাজ করেছিল এবং রাজনীতির

মোড়ল হয়ে উঠেছিল তাদের সৃষ্ট সামরিক শ্রেণী। এমনকি যখন বুর্জোয়ারা জন্মগ্রহণ করেছিল তখনও প্রুশিয়ান রাজ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি।

রুশ সাহিত্যিক আলেকজান্দার হার্জেন ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের অল্প কিছুদিন আগে প্রুশিয়া ভ্রমণ করেন এবং তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছিলেন: সার্জেন্ট-মেজরের চাবুক ও অর্থনীতি সম্বন্ধে এক হীন ধারণার সাহায্যে প্রুশিয়ার মানবতাবাদ রোপণ করা হচ্ছে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জার্মানীর ঐক্য সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি জার্মানীর ঐক্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিসঞ্চয় করতে পারে নি। অবশ্য তারা বেশ জোরালো ছিল এবং জার্মান বুর্জোয়ারা বিপ্লবের ভয়ে স্বৈরতন্ত্রী প্রতি বিপ্লবে যোগদান করেছিল।

২

এই সময় বিসমার্ক রাজনৈতিক দিগন্তে আবির্ভূত হলেন। তার বিশ্বাস ও চলনবলন এমন ছিল যে অচিরেই তাঁর প্রতিবেশী জমির মালিকরা তাকে "বুনো জাংকার" নামে ডাকতে লাগল। বার্লিনের বিপ্লবের খবর পেয়েই প্রুশিয়ার রাজা পূর্ণ ক্ষমতা (ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ যতক্ষণ পর্যন্ত তা জাংকার-দের ইচ্ছার সংগে তাল রেখে চলছে) ফিরিয়ে আনার জন্য তার কৃষকদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে এক বাহিনী গঠন করেছিলেন।

এমনকি রাজা বিসমার্কের আবার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় বিস্মিত হয়েছিলেন. কিন্তু বিসমার্ক ছিলেন দ্বিধাহীন। বিপ্লবকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। জনতার গভীর থেকে ঐক্যের যে আদর্শ নির্গত হয়েছিল তা কেবল একটা স্বপ্ন রয়ে গেল। কিন্তু বিসমার্ক খুব শীঘ্র মুখ খুললেন। যখন ১৮৬২ খৃস্টাব্দে তাঁকে প্রুশিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন:

"জার্মানীর চক্ষু প্রুশিয়ার স্বাধীনতার উপর নয়, তার শক্তির উপর নিবদ্ধ। বড বড ব্যাপার বক্তৃতা এবং সংসদের গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, পোড়ামাটি নীতির দ্বারা ঠিক করা হয়," আর এক জায়গায় তিনি ঘোষণা করে-ছিলেন "জার্মানের সমস্যার সমাধান কোন সংসদ করবে না, তা করবে কূটনীতি এবং তরবারি।"

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে তিনি তার পরিকল্পনা রূপায়িত করার সময় বলেছিলেন, "অবশেষে রাষ্ট্রের আইনগুলি বেয়নেট দিয়ে ঠিক করা হয়।"

সমগ্র জার্মানীতে প্রুশিয়ার শাসন বিস্তৃত করার জন্য বিসমার্ক ঐক্যের আদর্শের উপর ছোঁ মারলেন। ঐক্যর আদর্শ নিয়ে বুর্জোয়ারা এতদিন করে খাচ্ছিল। যখন সময় এল তিনি এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ প্রুশ পদ্ধতিতে অর্থাৎ যুদ্ধ দিয়ে তিনি সমস্যার মোকাবিলা করলেন। প্রুশিয়ার কূটনীতিবিদরা

ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং তারা সব থেকে সহজ নীতির ভিত্তিতে কাজ করেছিল—শত্রুকে একের পর এক পরাস্ত করা সহজ। প্রথমে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হল। তারপর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। খুব অল্প লোকই বিসমার্কের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। অনেক জাংকার যারা ওঁর পদ্ধতিকে সমর্থন জানিয়েছিল, তার পরিকল্পনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হল। জার্মান বুর্জোয়ারা তাঁর পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে উৎসুক ছিল। জাংকার প্রুশিয়ার নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার উদারনৈতিক তলানি ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দূরদর্শী সমসাময়িকেরা বিসমার্কের নীতির ভিতর বুঝতে পেরেছিলেন। আলেকজান্দার হারজেন লিখেছিলেন "বিসমার্ক নগ্ন হয়ে পড়েছেন। তার উদ্দেশ্য জার্মানীকে প্রুশিয়ার সাম্রাজ্যে পরিণত করা। ছিঁড়ে ফেলা সংবিধানের টুকরোগুলিকে মণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হবে।"

তিনি বিদ্রূপ করে জার্মানদের বলেছিলেন: "নিজেদের জাঁকজমকে ডুবে থাকুন এবং প্রুশদের ভবিষ্যৎ সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করুন কিন্তু মনে রাখবেন যে হাত রাজাগুলিকে চুরমার করেছে সেই হাত আপনাদের অকৃতজ্ঞ প্রচেষ্টাকে কঠোর ও নির্দয়ভাবে চুরমার করবে।" হারজেন জানতেন যে, জার্মানীতে প্রুশিয়ার আধিপত্যের অর্থ প্রতিক্রিয়া এবং প্রুশিয়ান সমরতন্ত্রের বৃদ্ধি ইউরোপে যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসা। প্রুশ সৈন্যের সূচাগ্র রাইফেলের উল্লেখ করে তিনি বলেন: "প্রত্যেকে জানে যে প্রুশিয়ার ছুঁচ দিয়ে ইউরোপকে সেলাই করা হলে সেলাই খুব ভালো হবে না এবং তা খুলে যাবে।"

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর প্রুশিয়ার সমরবাদীদের পথ অনুযায়ী জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। প্রুশিয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করে। প্রুশিয়া প্রাচীন ফরাসী প্রদেশ আলজে ও লোঁরে নিজ ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে। সে অনেক ক্ষতিপূরণ লাভ করে এবং তার অধিকাংশই অস্ত্র সজ্জায় ব্যয় করা হয়। এর ফলে জার্মান রাষ্ট্রগুলি বিজয়ও সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকগণ প্রুশিয়ার রাজাকে জার্মানের রাজমুকুট নিবেদন করেন।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক জয় এবং জার্মান রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জয় প্রুশিয়ার সমরতন্ত্রে বাড়তি ঔদ্ধত্য এনে দিয়েছিল। সাফল্যে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। প্রুশিয়াকে এক জাতীয়তাবাদী গ্রাস করে এবং তা সমগ্র জার্মানীতে সংক্রামিত হয়। রুশ লেখক সালতিকোভ শেচদ্রিন সেই সময়ের প্রুশিয়ার রাজধানী পরিদর্শন করেছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে জার্মানীকে প্রুশিয়ার প্রভাবাধীন করার জন্য বিসমার্কের নীতি অনেক জার্মানের কাছে বিস্বাদ ঠেকেছিল। তিনি লিখেছিলেন, "অন্তত: অর্ধেক জার্মানীর পক্ষে বার্লিন শুধু আকর্ষণহীন নয়, রীতিমত ঘৃণা। যে প্রত্যেকের কাছ থেকে নিয়েছে কিন্তু কাউকে কিছু দেয় নি। তাছাড়া:যে সর্বত্র বার্লিনের সৈন্য এবং সমসংখ্যক অফিসার মোতায়েন করেছে।"

প্রুশিয়ার সামরিক শ্রেণীর অযৌক্তিক ভয় ছাড়া বিরক্তির উদ্রেক করেছিল। সাল্তিকোভ শ্চেদ্রিন তাঁর বিরক্তি চেপে রাখতে পারেন নি। তিনি লিখেছিলেন, "যখনই আমি একজন বার্লিনের অফিসারের পাশ দিয়ে গেছি তখনই অবাক হয়েছি, তার হাবভাব এবং চালচলন, ফোলানো বুক ও চকচকে কামান চিবুক নিয়ে সে যেন বলছে: "আমি একজন মহাবীর। আমার আরও গর্বিত হওয়া উচিত।" আমি অবাক হতাম না যদি সে বলতো, "আমি একজন দস্যু। আমি তোমার চামড়া ছাড়িয়ে নেব।"

সাল্তিকোভ শ্চেদ্রিন জানতেন যে, ঐক্যের ধুয়োর আড়ালে প্রুশিয়ার সমরতন্ত্রীরা তাদের আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যগুলি সাধন করার জন্য সমগ্র জার্মানীর উপর তাদের প্রভাব সুদৃঢ় করছে। তিনি জানতেন যে, বার্লিন হচ্ছে প্রুশিয়ার সমরতন্ত্রে মূল কেন্দ্র এবং সেখান থেকে শান্তিকে বিপন্ন করার জন্য মৎলব আঁটা হচ্ছে।

তিনি লিখছিলেন: "বর্তমান বার্লিনের সারাংশ এবং বিশ্বজনীন গুরুত্ব হচ্ছে এক চূড়ান্ত মূলকেন্দ্র গড়ে তোলা।"

এটা ঠিক। প্রুশিয়ার সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষমণ্ডলী অন্যান্য দেশের তুলনায় আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সালতিকোভ শ্চেদ্রিন একটা ভীতি নিয়ে প্রুশিয়া ও বর্তমানে সমগ্র জার্মানীর রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন।

অন্যান্য সমসাময়িকরাও শ্চেদ্রিন অভ্রান্তভাবে যা অংকন করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন। আর একজন বিশিষ্ট রুশ লেখক গ্লেব উপসেনস্কি জার্মানী ভ্রমণ করে লিখেছিলেন: "যে মুহূর্তে তুমি সীমান্ত পেরুবে তুমি বার্লিনে পৌছে গেলে যেখানে এক সমাজতন্ত্রর অধিষ্ঠান যা আমাদের স্বদেশবাসীর ধারণার অতীত·········তলোয়ার ঘোড়ার খুর, শিরস্ত্রাণ, গোঁফ এবং দুটো আঙ্গুল সেলামের ভঙ্গীতে মুখের উপর ন্যস্ত। এরকম লোকের সম্মুখীন প্রতিমুহূর্তে হতে হয়। প্রহরীদল ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা সব থেকে খারাপ তা হচ্ছে যে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে সে যা করছে তা ঠিক।

৩

প্রুশিয়ানিজম এবং রাষ্ট্র হিসাবে প্রুশিয়া জার্মানী এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। প্রুশিয়ার সমরতন্ত্রী প্রতিক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট জার্মান রাষ্ট্র ছিল বৃহত্তর প্রুশিয়া বা এঙ্গেলস কথিত "প্রুশ জাতির জার্মান সাম্রাজ্য।" প্রুশিয়ার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল। প্রুশিয়ার রাজা হয়ে উঠলেন জার্মানীর কাইজার। প্রুশিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি হয়ে উঠলেন রাইখ চ্যান্সেলর এবং বৈদেশিক বিষয়ের মন্ত্রী। জার্মানীর ভূখণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ দখল করে

তার জার্মানীর জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ তার বলে দাবী করে, কর্ষিত জমির দুই তৃতীয়াংশ ভোগ করে এবং শিল্পে এক বিরাট অংশ ভোগ করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ কব্জা করে প্রুশিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের সব-থেকে প্রভাবশালী রাজ্য হয়ে উঠেছিল। সে সাম্রাজ্যের রাজ্যগুলির প্রতিনিধি-স্থল "বুণ্ডেরস্টাটের" ৬১ ভোটের মধ্যে ১৭টি ভোট নিয়ন্ত্রণ করত এবং স্বভাবতঃ সব থেকে প্রভাবশালী ছিল। যখন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ছোটখাট ব্যাপারে যে ভোটে হেরে গেছিল, তখন মন্ত্রী রাইখ রাষ্ট্রপতি এবং চ্যান্সেলর "বিরোধীদের" প্রুশিয়ার ইচ্ছার কাছে, নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেন এবং এ রকম ভোট আর ভবিষ্যতে দেওয়া হবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করান।

প্রুশিয়া সারা জার্মানীকে নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং জাঙ্কার ও বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী প্রুশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। তার কারণ তারা শুধু দেশের শিল্প ও কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তা নয়, তারা যুগ যুগ ধরে সনাতনী প্রুশ নির্বাচন পদ্ধতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সামগ্রিক জার্মানীর পদ্ধতি ছিল শুধুমাত্র পুরুষভোটভিত্তিক প্রুশিয়ার *লাণ্ডটাগের* নির্বাচনের ভোট-দাতারা তিনরকম ব্যালট দিতে পারত এবং তাদের শ্রেণী নির্ভর করত তারা কত কর দিত তার উপর। দেশকে এক সনাতনী নির্বাচনী কেন্দ্রজালে জড়ানো হয়েছিল এবং এটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ, পুলিশের সাহায্যে ভোটদাতাদের এক তৃতীয়াংশকে ভোট দিতে নিয়ে আসত। এর ফলে রক্ষণশীল দল শতকরা ১৭ ভাগ ভোট পেয়ে অর্ধেকের বেশী কেন্দ্রে জয়ী হত কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দল যারা শতকরা ২৪ ভাগ ভোট পেলেও *লাণ্ডটাগের* মাত্র ৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত মার্কস প্রুশিয়ার প্রভাবাধীন জার্মানীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে ছিল এক পুলিশ-রক্ষিত সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং তা ছিল সংসদের দ্বারা খচিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা সুদৃঢ় এবং বুর্জোয়া ও বুরোক্র্যাটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"[১]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রুশিয়ার দ্বারা পুষ্ট জার্মান সাম্রাজ্যবাদ যারা ইউরোপের ভীতি হয়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে প্রুশিয়ার সামরিক যুদ্ধবাজ ঐতিহ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জেনারেল লুডেনড্রফ "সার্বিক যুদ্ধের" পরি-কল্পনা করেছিলেন। হবাইমার সাধারণতন্ত্রে *রাইখওয়ার* এই ঐতিহ্য রক্ষা করেছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারল ফন সিকট বলেন: "সেনাবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্র।" জার্মান ফ্যাসিবাদের জন্ম খানিকটা প্রুশিয়ার মাটিতে।

কিন্তু জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্রুত বিস্তার এবং তাদের জন্ম সম্প্রসারণবাদ প্রুশিয়ার কুক্ষীগত জার্মানীকে এক নতুন দ্যোতনা এনে দিয়ে-

---

১। মার্কস, নির্বাচিত রচনা, দুই খণ্ডে; খণ্ড ২, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৩।

ছিল। পুঁজিবাদী প্রেস জার্মানীকে এক "বিশ্ব শক্তি" বলে অভিহিত করেছিল। কাইজার এক "বিশ্বনীতি" তৈরী করেছিলেন। জার্মান ব্যাংকগুলি এক "বিশ্ব ভূমিকা" পালন করতে চেয়েছিল এবং জার্মান ব্যবসায়ীরা এক "বিশ্ব-বিদ্যার" জন্য চেঁচামেচি শুরু করেছিল পুরনো প্রুশ ধারণাকে নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ব্যবহার করা হয়েছিল। যুদ্ধতত্ত্ব এবং তার সংগে পশুশক্তি ও নিষ্ঠুর ইচ্ছাশক্তি তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল।

এইভাবে ইউরোপে যখন যুদ্ধের আবহাওয়া ঘনিয়ে আসছিল, জার্মান সেনাবাহিনী উপনিবেশগুলিতে যুদ্ধ করেছিল। এক ঔপনিবেশিক যুদ্ধে তারা আফ্রিকার বিশ্বস্ত ও শান্তিপ্রিয় উপজাতি "হিরিওদের" সমূলে বিনাশ করেছিল এবং তাদের মাত্র একজন জীবিত ছিল।

দূরদর্শী সমসাময়িকেরা প্রুশ জার্মানীর প্রারম্ভিক রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির মধ্যে যুদ্ধবাহী সমরতন্ত্রবাদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিশিষ্ট রুশ প্রচারবিদ এন. মিখাইলোভস্কি ১৮৭১ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন: "ইউরোপ শীঘ্রই রক্ত দেখবে এবং গোলাগুলি ও আর্তনাদ শুনতে পাবে। প্রুশ প্রগতিবাদীরা তাদের সাফল্যে এবং অভিভূত যে তারা স্লাভদের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সংগে এক আঁতাতের কথা ভাবছে। এক বৃটিশ সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে যে মোল্টকে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করার এক মতলব ভেঁজেছে, ভবিষ্যতে কি হবে? এটা অবধারিত যে আগামী দশকে "প্রুশ সভ্যতা" পৃথিবীর উপর নিজেদের জোর করে চাপাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এক সভ্যতার পতন সময়-সাপেক্ষ। প্রশ্ন হচ্ছে কখন এবং কিভাবে বিশমার্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে। বোধ হয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি একত্রিত হলে এর ধ্বংস হবে।"

১৯১৮ সালের শেষে বিসমার্কের আশা বিধ্বস্ত হয়েছিল। ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয় দেশগুলি একত্রিত হয়ে প্রুশ জার্মানীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। এক বিপ্লবের আগুনে জার্মান রাজবংশ পুড়ে গিয়েছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম জার্মানী সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি প্রুশিয়ার রাজা হিসাবে টিঁকে থাকবেন কিন্তু খুব শীঘ্র তাকে হল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে হয়।

৪

প্রুশ রাজবংশ অপসারিত হয়েছিল কিন্তু সেনাপতিরা থেকে গিয়েছিল। তারা ছিল প্রুশ এবং অন্যান্য সমস্ত জার্মান প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তারা প্রথমে নেপথ্যে প্রস্থান করেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তারা বেশী সক্রিয় হয়ে

উঠেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতা দখল করা এবং জনতাকে দমিয়ে রাখা। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের ফলে কিন্তু তারা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে চ্যুত হয় নি। একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা যেমন শিল্পের সর্বেসর্বা ছিল, জাংকাররা তেমন তাদের বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিল এবং এইহেতু জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনের উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তারা তাদের শক্তি দিয়ে জার্মানীর গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথ রুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তারা কিছু সুযোগ সুবিধা ছেড়ে দিয়েছিল।

যখন রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে, তখন নতুন সংবিধানের মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে ছিল জার্মান রাষ্ট্র প্রুশিয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় উদারনৈতিক প্রগেসিভ পার্টির অন্যতম এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিউগো প্রাউস ভবিষ্যৎ "সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্র" সম্বন্ধে এক খসড়া তৈরী করেন। সামন্ততন্ত্রের শত্রু প্রিউস একথা জোর দিয়ে বলেন যে, "অবিসম্বাদিতভাবে নতুন জার্মান সাধারণতন্ত্রকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

তিনি আরও বলেছিলেন যে, "যে রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের কোনটাই জার্মান জাতির রাজনৈতিক জীবনে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়।" তার যুক্তি ছিল "যে জার্মান জনগণের এক ঐতিহাসিক সূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক সত্ত্বা" ছিল আরও সঠিক সংজ্ঞা।

প্রিউস লিখেছিলেন, প্রুশিয়া বা ব্যাভেরিয়ার আলাদা জাতি হিসাবে অস্তিত্ব নেই। জার্মান জাতির অস্তিত্ব আছে। তার রাজনৈতিক জীবনের প্রকাশ ঘটাতে হবে গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে।

প্রিউস ভেবেছিলেন, প্রুশিয়ার অস্তিত্ব ও অধ্যক্ষতার সংগে তাঁর ঐক্যবদ্ধ জনতার রাষ্ট্রের কোন মিল নেই। তিনি ভূখণ্ড সম্বন্ধে এক নতুন ব্যবস্থার খসড়াও করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জার্মানীতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে যদি প্রুশিয়াকে অন্যান্য জার্মান *লাণ্ডারের মধ্যে* বিভক্ত করা যায়। এর দ্বারা প্রুশ রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত না করা গেলেও তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। কিন্তু প্রুশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, যার থেকে তার উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি লোপ করার প্রশ্নটি তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর পরিকল্পনাটিকে সমস্ত মহল থেকে সমালোচনা করা হয়, প্রুশ প্রতিক্রিয়াশীলরা দক্ষিণ জার্মান সংকীর্ণবাদীরা এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যাঁরা শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল এবং জার্মান সাম্রাজ্য রাজনৈতিক ভগ্নাবশেষগুলির উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিল, প্রিউসের এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য হাত মিলিয়েছিল এবং তারা সফল হয়েছিল। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে প্রিউস ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর পরিকল্পনা অবাস্তব। ২১শে ফেব্রুয়ারী

সংবিধানকে পুরো সংশোধন করে আইনসভায় পেশ করা হয়েছিল। জার্মান রাষ্ট্রকে কি নাম দেওয়া হবে এই নিয়ে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ বলেছিল জার্মানীর নাম হোক জার্মান যুক্তরাষ্ট্র, কেউ চেয়েছিল নাম হোক শুধু যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু প্রিউসের যুক্তি ছিল এই দুটো নামই সংকীর্ণ-বাদী এবং জার্মানীর ইতিহাসের পক্ষে পশ্চাদগমন। জাতীয় পরিষদ জার্মান সাধারণতন্ত্রের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল এবং রাইখ (সাম্রাজ্য) এই নাম গ্রহণ করেছিল এবং তার কারণ হিসাবে বলেছিল যে এই নাম জার্মান জনগণের, যাঁরা সর্বদা জাতীয় ঐক্য কামনা করে এসেছেন, দীর্ঘ ঐতিহ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে একটা জয় ছিল তার কারণ তারা মধ্য যুগ থেকে "সাম্রাজ্য" কথাটার ওপর জোর দিয়েছিল।

রাইখ এবং *লাণ্ডারের* সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে আরও জোরালো বিবাদের উদ্ভব হয়েছিল আবার প্রিউস প্রুশিয়ার আধিপত্য খারিজ করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সংবিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক জার্মান জার্মানী সৃষ্টি করা যার সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপরে এক জার্মান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বিস্তৃত থাকবে।"

বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল, ক্যাথলিক সেণ্টার পার্টির একজন নেতা স্পাহন প্রুশ নেতৃত্বের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে তা হচ্ছে উন্নততর সামরিক শক্তি, প্রুশ ব্যুরোক্রাসির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন যে হোহেনজোর্নদের পতনের ফলে প্রুশ আধিপত্য খর্ব হয়েছে। অবশ্য তিনি এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন নি যে প্রুশিয়াকে রাষ্ট্র হিসাবে অবলুপ্ত করা উচিত: তিনি চেয়েছিলেন অন্যান্য *লাণ্ডারদের* বৃহত্তর ভূমিকা। তিনি সংকীর্ণবাদী আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাড়িত হয়ে বলতে চেয়েছিলেন যে জার্মানীর প্রুশিয়ার পতনের সুযোগ নেওয়া উচিত এবং নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠিত করা উচিত। কৃষি ও শিল্পের একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা প্রাণপণে প্রুশ রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিল। পিপলস্ পার্টির একজন বিশিষ্ট সদস্য ভেলবুইকের যুক্তি ছিল যে এক শক্তিশালী প্রুশিয়া ছাড়া জার্মানী টিকে থাকতে পারে না। হাইনজে, তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে প্রুশ রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি প্রুশদের হাতে সামরিক শক্তির সংহতি থামিয়ে দিয়েছে এবং সমস্ত জার্মানীতে প্রুশ সামরিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, তিনি সাধারণতন্ত্র ঘৃণা করেন এবং প্রুশিয়াকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন "আমরা প্রুশিয়াকে ভগ্ন করতে পারি না তার কারণ তাহলে আমাদের রাইখে একমাত্র স্তম্ভকে ধ্বংস করবে। আমরা প্রুশিয়াকে দ্বিখণ্ডিত করার বিরোধী।"

জার্মান একচেটিয়া বুর্জোয়াদের এক রাজনৈতিক নেতা স্ট্রেসেমানও একই কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য বলেছিলেন যে এটা প্রুশিয়া আর জার্মান প্রতিক্রিয়ার দুর্গ নেই।

কাইজার সংবিধান প্রুশিয়াকে জার্মান সাম্রাজ্যের এক রাষ্ট্র হিসাবে সংরক্ষিত করেছিল। কিন্তু এর আসল ব্যর্থতা ছিল যে, এর কিছু ধারা গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল, বিশেষ ৪৮ ধারা যা রাষ্ট্রপতিকে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছিল এবং তা থেকে হিটলারের একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

তবুও জার্মান ইতিহাসে কাইজার সংবিধান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে একটা পদক্ষেপ ছিল। এর ফলে প্রুশিয়া ছাড়া জার্মানীর অন্যান্য অংশের জনগণের কিছু অধিকার দৃঢ় করে। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠনের স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার অধিকার এবং প্রেস ও আইনসভার স্বাধীনতা প্রভৃতি সাধিত হয়। লাণ্ডারকে কিছু পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অনুমতি দেওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হয়।

Weimer যুগে প্রুশিয়ার রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। জার্মানির সংগে একই রাজছত্রের তলায় প্রুশিয়া ছিল, প্রুশিয়া তার তা রইল না। তার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি সংগে সংগে রাইখ চ্যান্সেলর হত না এবং জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে প্রুশির মন্ত্রীসভার সদস্য হতে হত না। সমগ্র জার্মানীর মন্ত্রীপরিষদের থেকে প্রুশির মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক চেহারা একটু আলাদা ছিল। প্রুশির মন্ত্রীসভা তথাকথিত যুক্ত Weimer পার্টিগুলি (সোশাল ডেমোক্রাট, ডেমোক্রাটিক পার্টি, ক্যাথলিক সেন্টার) নিয়ে গঠিত ছিল এবং সমগ্র জার্মানীর মন্ত্রিসভাগুলি ছিল বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রতিভূ পিপলস পার্টির প্রতিনিধি এবং প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও জাংকার সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতিভূ জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে।

কিছু কিছু জার্মান দাবী করে থাকে যে সেই সময় থেকে প্রুশিয়ার ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছিল, তাদের যুক্তি যা ছিল জাংকার প্রতিক্রিয়ার দুর্গ, তা হয়ে উঠেছিল গণতন্ত্রের দুর্গ, তা প্রমাণ করার জন্য বলে যে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যাভেরিয়ায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং ব্যাভেরিয়ার সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট সংগঠন গজিয়ে উঠেছিল এবং হিটলার তাঁর বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

অবশ্যই প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র হিসাবে এবং সামন্ততান্ত্রিক ও সংকীর্ণবাদীর উৎস হিসাবে ব্যাভেরিয়া প্রুশিয়ার সমতুল্য, লিও ফিউখটজাংকার তার "সাকসেস"-এ কিভাবে ব্যাভেরিয়া তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত অনুন্নতির জন্য জার্মান প্রতিক্রিয়ার দুর্গ হয়ে উঠেছিল তার এক যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। খোলাখুলিভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কায়েম হবার

পর জেনারেল লুডেনফ সহ অনেক জার্মান সমাজতন্ত্রী ব্যাভেরিয়ায় গিয়েছিল। শীঘ্র তারা হিটলারের আন্দোলনের পিছনে মদত যুগিয়েছিল এবং নেতৃত্ব, চাঁদা ও তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করেছিল। এটা সত্যি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রুশিয়া, বিশেষ করে তার শিল্পাঞ্চলগুলির অর্থাৎ বার্লিন ও Rhine Westphelie অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পিছনে কোন অনুকূল উপাদান ছিল না। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রুশিয়ার পুলিশ ব্যাভেরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের থেকে এমন কিছু বেশী অনুতাপের সংগে শ্রমিকদের মিছিলের উপর গুলি চালায় নি। প্রুশিয়ার সরকার শিল্প ও অর্থনীতিতে জাংকারদের শক্তি খর্ব করার জন্য কোন চেষ্টা করে নি। তাদের অর্থনৈতিক শক্তির জোরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেনাবাহিনীতে রাজনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রুশিয়ার মতাদর্শ প্রচার করেছিল। তারা নতুন অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং অশ্রুতপূর্ব বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিয়েছিল।

তার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় অসওয়াল্ড তার বই "Preussentum Sozialismus" প্রকাশ করেছিলেন এবং হিটলার তার পার্টির নাম রেখেছিলেন, 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক'।

সমগ্র জার্মানীর প্রতিক্রিয়া সুদৃঢ় করার জন্য এবং কিছু লাণ্ডারের কাছ থেকে প্রতিরোধের আশংকা করে রাজতান্ত্রিক সরকার স্বাধীনতার যে খণ্ডাংশগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলো "সমূলে বিনাশ" করতে শুরু করল। দুই কেন্দ্রীয় সরকারের "প্রুশ ও রাজতান্ত্রিক—" মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকল, সাম্রাজ ও প্রতিক্রিয়ার সংস্কার করার প্রবক্তারা দুমুখো সরকারী কার্যকলাপ এবং জার্মান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রুশিয়ার মত বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য উদ্ভূত বিভিন্ন অসুবিধা নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

সম্পর্ক পুনর্গঠিত করার জন্য ১৯২৮ সালে "বুা Bund zur Erneuerung" প্রতিষ্ঠিত হল, এর প্রধান হলেন বৃহৎ ব্যবসায়ীদের এক উৎসাহী মুখপাত্র হানস লুথার। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট আর্নল্ড রাইখের অধীনে এক বিশেষ পরিষদ গঠন করা হবে হল এবং সেই পরিষদ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা তৈরী করেছিল :

১) রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রুশিয়ার সরকারের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

২) রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রুশিয়ার সরকারের আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩) প্রুশিয়াকে এক লাণ্ড ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে বিলোপ করা।

৪) তার বদলে ১৩টি নতুন আঞ্চলিক ইউনিট তৈরী করা এবং বার্লিন সহ-১৩টি-প্রুশীয় প্রদেশকে নিয়ে এক নতুন *লাণ্ডার* তৈরী করা।

এই প্রস্তাব করা হয়েছিল প্রুশিয়াকে ব্যাভেরিয়া স্যাক্সনি, প্রভৃতি অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রের মত, কতকগুলি *লাণ্ডারে* বিভক্ত করার জন্য, কিন্তু বিশেষ করে ব্যাভেরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। প্রুশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও ব্যাভেরিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা প্রুশিয়াকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল। প্রথমতঃ তারা ভয় পেয়েছিল যে এর পর কোপ পড়বে ব্যাভেরিয়ার ওপর, দ্বিতীয়তঃ তাদের বিবেচনায় প্রুশিয়ার অস্তিত্ব ছিল তাদের সংকীর্ণবাদী অভিপ্রায়ের পক্ষে সহায়ক। সর্বোপরি তাদের ভয় ছিল যে, প্রুশিয়ার পুনর্গঠন দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলতে পারে।

এর মধ্যে সমধর্ম স্বার্থ সত্ত্বেও শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল, এসবের পূর্বদিকের জাংকাররা নতুন সুযোগ সুবিধা দাবী করেছিল এবং প্রুশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পপতিরাও নতুন সুযোগ-সুবিধা দাবী করেছিল, কিন্তু দুদলেই সমগ্র জার্মানীতে, বিশেষ করে প্রুশিয়ার শিল্পাঞ্চলে, ক্রমশঃ দানাবাধা শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছিল, প্রুশিয়াকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনা অবশেষে রাইখস্টাগে পেঁাছেছিল। কিন্তু শাসক শ্রেণী মোটেও ভীত হয় নি। তারা জানত যে রাজতান্ত্রিক সরকার প্রুশ সরকারের মতই, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের উৎসের ওপর কোন আঘাত হানতে সাহস করবে না। *রাইখ চ্যান্সেলার* ব্রইনিং ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের রাস্তা পরিস্কার করতে ব্যস্ত ছিলেন, আর তিনি এ পরিকল্পনার কোন আলোচনা সংসদে হতে দেবেন না বলে স্থির করেন। তিনি সংবিধানকে ব্যঙ্গ করার জন্য Weimer সংবিধানের কুখ্যাত ৪৮ ধারা প্রয়োগ করে *রাইখ স্টাগ* ভেঙ্গে দিলেন, তার উত্তরসুরী ফ্রানজ্ ফন্ পাপেন প্রুশিয়ার সংশোধনের পরিকল্পনাকে এক অদ্ভুত মোচড় দিলেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী ফিল্ড মার্শাল যান হিণ্ডেনবর্গ-এ সমাপ্ত প্রুশ মন্ত্রীদের অবসর গ্রহণের জন্য এক নির্দেশ জারী করলেন। তাদের সমস্ত ক্ষমতা *রাইখ চ্যান্সেলার* ও তার প্রতিভূদের হাতে ন্যস্ত করা হল।

প্রুশিয়া এইভাবে এক একগুঁয়ে, প্রুশ সমরতন্ত্রী দ্বারা তার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। প্রবল তর্কবিতর্কের পর সুপ্রিম কোর্টের কাছে ঐ বিবাদ পেশ করা হল এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রুশ সরকারকে পুনর্বহাল করল।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট অটো ব্রাউনের নেতৃত্বে প্রুশ মন্ত্রীসভা তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রচুর সংগ্রাম করতে লাগল কিন্তু তার অস্তিত্ব ন্যায্য বা বৃহৎ কোনটা না হওয়ায় এই যুদ্ধে তাদের হারতে হল। সোশ্যাল

ডেমোক্র্যাটরা প্রায় ফ্যাসিস্ট-রাজতান্ত্রিক সরকার অপেক্ষা শ্রমিক শ্রেণীকে বেশী ভয় করত যদিও শ্রমিক শ্রেণী তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করত। এর মধ্যে প্রুশপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্ত্রিক সরকারের দিকে ঝুঁকল। হিটলার কালক্ষেপ না করে প্রুশ প্রুশিয়ার প্রুশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করলেন। নাৎসী প্রতিক্রিয়ার সংগে দাংগা করার জন্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা প্রুশিয়ার সমর্থন পাবার জন্য যে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছিল।

পুরোনো প্রুশ সামরিক ঐতিহ্যের ধারকদের দলে টানবার জন্য হিটলার প্রুশ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কোন চেষ্টা করেন নি। তিনি পোটসডামে এক আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছিলেন এবং প্রুশিয়াকে জার্মানীর অন্যান্য অংশের মত ফ্যাসিবাদী করে তুললেন। এ তিনি হেরমান গোয়েরিংকে প্রুশ মন্ত্রীসভার প্রধান রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রুশ সরকারের সংগে রাজতান্ত্রিক সরকারের তফাৎ এই ছিল যে হিটলার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী এই মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন না। হিটলার তৃতীয় নাৎসী সাম্রাজ্যে প্রুশ রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনি বিকেন্দ্রীকরণের প্রবর্তন করেন। তার কারণ বৃহৎ পুঁজিবাদের জংগী অংশ এক সর্বাত্মক যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করেছিল।

৫

হিটলারের জার্মানী যে পরাজয় বরণ করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া ভার। প্রুশ-জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও জংগী বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতীক নাৎসী সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা হয়েছে। যুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিত্রয় জার্মানীকে নিয়ে কি করা যায় এবং কিভাবে তার অর্থনৈতিক জীবনকে নতুন গণতান্ত্রিক পথে পুনর্গঠিত করা যায়, তা স্থির করার জন্য পটাসডামের সিসিলিয়েনহফ প্রাসাদে একত্রিত হয়েছিল।

পটাসডামের বৈঠকে জার্মানীকে নিরস্ত্রিকরণ করতে হবে বলে স্থির করা হয়েছিল। তার অর্থনীতিকে বিকেন্দ্রীভূত করা হবে এবং বিভিন্ন পুঁজিবাদী সংগঠন যুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাদের অবলুপ্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আরও স্থির করা হয়েছিল যে, যে সমস্ত জার্মানী শিল্প সামরিক উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে তা ভেংগে দেওয়া হবে বা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হবে।

নাৎসীবাদের অবশিষ্টাংশ এবং সমস্ত নাৎসী সংগঠনে সমূলে বিনাশ করা হবে বলে স্থির করা হল। যে সমস্ত নাৎসী হিটলারের দলের সক্রিয় সদস্য ছিল এবং যারা মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যের বিরোধী তাদের সরকারী অফিস থেকে এবং

বেসরকারী উদ্যোগের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল।

পোটসডামের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল প্রুশ জার্মান সমরতন্ত্র এবং তার অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিকভিত্তিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত। জার্মানীর সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সমস্ত ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান যারা কয়েক দশক ধরে সামরিক ঐতিহ্যকে বহন করেছিল, গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছিল। প্রুশ-জার্মান সমরতন্ত্রের মূল মস্তিষ্ক ও রাজনৈতিক জীবনে সর্বদা প্রভাবশালী জার্মান জেনারেল স্টাফকে ভেঙে দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছিল, পোটসডামে যে অর্থনৈতিক রীতিগুলি গৃহীত হয়েছিল তা নির্দেশ করেছিল যে জার্মানীর সামরিক শক্তি বিনষ্ট করা হবে এবং তার অর্থনীতিকে নতুন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাজানো হবে।

অর্থনৈতিক নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনাটি সমগ্র দেশে প্রযুক্ত করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল যা একটি মাত্র অর্থনৈতিক সত্ত্বা বলে গণ্য হবে।

পোটাসডাম সম্মেলনের পর মাত্র দুবছর কেটেছে কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এই সিদ্ধান্তগুলি একমাত্র পূর্ব জার্মানী ছাড়া অন্য কোথায় কার্যকরী করা হচ্ছে না। সেখানে জাতির গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সক্রিয় সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের স্বাদ পেয়ে সোশালিস্ট ইউনিটি পার্টির চারপাশে জমা হয়েছে এবং পোটাসডাম সম্মেলন অনুযায়ী সংশোধনী ব্যবস্থা কার্যকরী করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। হিটলার বিরোধী জোটের বৃহৎ শক্তিবর্গের সার্বিক সম্মতিতে গৃহীত এই নীতিগুলি সমরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মুখে অসহায় জার্মানীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্বার্থ অনুযায়ী গৃহীত হয়েছিল।

এই সমস্ত শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করা জাতীয় কর্তব্য। পূর্বজার্মানীতে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাংকাবরা একদা যে জমি ভোগ করত তা জাংকারদের হাতে হস্তান্তরিত করা জার্মানীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। যেখানে জাংকার শ্রেণী এবং রাজাজয়, দস্যুতা ও অত্যাচারের এক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছিল, তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও বৃহৎ শিল্পপতিরা যারা নাৎসী একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছিল, ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনকে গণতান্ত্রিক করে তোলার জন্য অর্থপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোদ্দা কথা প্রুশিয়া ও জার্মানীর এক বৃহদাংশ পুরোনো সমরতন্ত্রী ঐতিহ্য আর অনুসরণ করবে না, পোটসডামের সংগে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে তার নতুন গণতান্ত্রিক উন্নতির ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছে।

সমরবাদী ঐতিহ্যের মূল দুর্গ প্রুশ রাষ্ট্রের বিলোপ জার্মানীকে নতুন

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। প্রুশ ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটানোর ফলে সমগ্র জার্মানীতে সমরতন্ত্রী ঐতিহ্যের অবসান ঘটতে পারে এবং এর ফলে সে আক্রমণাত্মক ও প্রতিশোধ পরায়ণ মতলবগুলি ত্যাগ করে এক শান্তিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

তা হলে জার্মানী ও ইউরোপের ইতিহাস এক নতুন পথে বাঁক নেবে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে ঘটনার গতিপ্রকৃতি অন্যদিকে সমরতন্ত্রী প্রভাবের অবলুপ্তি নয় কিন্তু তার পুনরুজ্জীবন ও সংগঠন নাৎসীবাদ বিলোপ করা নয় বরঞ্চ পুরোনো নাৎসী কর্মীদের জীইয়ে রাখার ব্যবস্থা. গণতন্ত্রীকরণ নয়. এক নতুন শাসকশ্রেণীর আড়ালে প্রতিক্রিয়ার অভ্যুত্থান।

সুতরাং এরকম ধারণা করা ভুল যে প্রুশ রাষ্ট্রের বিলোপের ফলে সামরিক ঐতিহ্যের অবসান ঘটবে। আক্রমণের উৎস এতকাল ছিল প্রুশ রাষ্ট্র কিন্তু এখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও পশ্চিম জার্মানীর সমরতন্ত্রের মধ্যে সংহত হয়েছে.. সমরতন্ত্র ইতিহাস থেকে বিদায় নিতে অনিচ্ছুক। সে পশ্চিম জার্মানীতে পুনাবির্ভূত হয়েছে।

এই অবস্থায় প্রুশ রাষ্ট্রের বিলোপ, জার্মান সমস্যাকে এক যুদ্ধ বিরোধী উপায়ে সমাধান করার এবং জার্মান জাতির গণতান্ত্রিক প্রকাশের ঐতিহাসিক সুযোগের এক প্রতীক মাত্র। কিন্তু প্রতীক মানেই সমাধান নয়, সুযোগ মানেই কার্যসিদ্ধি নয়। প্রুশ রাষ্ট্রের বিলোপ কখনোই ইতিহাসে অনুভূত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না জার্মান গণতন্ত্রের শত্রু, ও যে কোনো রূপ আগ্রাসন ও প্রতিশোধের অস্ত্র, জার্মান সমরতন্ত্রকে পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী থেকে সমূলে উৎপাটিত করা হচ্ছে।

১৯৪৭

নতুন সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার ষড়যন্ত্র

১

বুর্জোয়া ইতিহাস রচনা কৌশলের গর্ব করার দিন চলে গেছে। বুর্জোয়ারা তাদের আধিপত্য বিস্তার করার পর যখন বিপ্লবী শ্রেণী পুঁজিবাদী অত্যাচার থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল : তখন প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস রচনা কৌশলের দক্ষ এক দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। "সেই সময় থেকে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কোন ফরমুলাটা ঠিক-এইটা না সেটা?" মার্কস লিখেছিলেন "কিন্তু এটা পুঁজির পক্ষে লাভ না লোকসান, সুবিধাজনক না অসুবিধাজনক রাজনৈতিক-ভাবে বিপজ্জনক ছিল না। স্বার্থহীন অনুসন্ধানকারীর বদলে দেখা গিয়েছিল ভাড়া-করা পুরস্কারান্বেষীদের, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বদলে দেখা গিয়েছিল অসৎ বিবেক এবং ক্ষমা প্রার্থনার অন্তরালে অশুভ উদ্দেশ্য।"[১]

১৮৭০-র দশকের গোড়ায় যখন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের স্তরে এসে পৌঁছাচ্ছিল, তখন এডওয়ার্ড এ. ফ্রিম্যান নামে বৃটিশ উদারনৈতিক ইতিহাস রচনার একজন যথার্থ প্রবক্তা লিখেছিলেন, "ইতিহাস হচ্ছে অতীতের রাজনীতি এবং......রাজনীতি হচ্ছে বর্তমান ইতিহাস।" এই ধারণা অস্বীকার করে যে, ইতিহাস হচ্ছে সমাজকে যে সব নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তার বিজ্ঞান এবং একে একে রাজনৈতিক অস্ত্রে পর্যবসিত করা হচ্ছে সমসাময়িক প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস রচনা কৌশলের মূল বৈশিষ্ট্য।

সাম্রাজ্যবাদী যুগের ঐতিহাসিকরা শাসক শ্রেণীর নীতিগুলি সমর্থন করে থাকে। জার্মানীতে এক আস্তঃ জার্মান ধারণার অস্তিত্ব ছিল যা জার্মানীকে মনে করত "ইউরোপের হৃদয় এবং জার্মান জাতিকে ইউরোপ ও পৃথিবীর শাসক বলে মনে করত, এই ধারণা সমরতন্ত্র, প্রতিক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও যুদ্ধকে সমর্থন করত এবং হিটলার যুগের নাৎসী ঐতিহাসিকরা এই ধারণাকে এক বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

১। মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, ১৯৬৫, পৃঃ ১৫।

ব্রিটেনে জন শিলি তার *"ইংলণ্ডের বিস্তার"* নামক বইয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাম্রাজ্যবাদী ধারণাগুলি একত্রিত করেছিলেন এবং এই বই এখনও ব্রিটিশ উপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদের বাইবেল। তাঁর একটি বই "ব্রিটিশ নীতির বৃদ্ধি" আন্তর্জাতিক শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ব্রিটেনের আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী কোশলের এক কৈফিয়ৎ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিক এ. মাহান তাঁর *"ইতিহাসে সমুদ্র শক্তির প্রভাব"* গ্রন্থে যে ধারণাগুলি প্রচার করেছিলেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ভূমিকার—যা ছিল জলাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করা—মূল্যায়ন হিসাবে কিছু মার্কিন মহলে এখনও জনপ্রিয়।

শিলি ও মাহানের ধারণার মধ্যে কিছু তফাৎ ছিল। প্রথমব্যক্তি ব্রিটেনকে অ্যাংলো স্যাকসন মহলের প্রধান শক্তি হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং মহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঐ পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। একই প্রবণতা পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ইতিহাস রচনা কৌশলে লক্ষিত হয়।

ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চারণকবি শিলি ও মাহান বর্ণবৈষম্যবাদ ও বিশ্বশক্তির ধারণা ছাড়া এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার অবতারণা করেন যে ঐতিহাসিক আবশ্যিকতার জন্য ও রাজনৈতিক উপযোগিতার দোষ দিয়ে জনতাকে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া উচিত নয় এটা হচ্ছে গোপন কূটনীতির অজুহাত এবং গোপন কূটনীতি সম্প্রসারণবাদও আগ্রাসনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে যোসেফ চেম্বারলেন ও শিশিল রোডস জন শিলি প্রবর্তিত "অ্যাংলো-স্যাকসন" বর্ণবৈষম্যবাদ ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের যুক্তিগুলি সমর্থন করেছিলেন এবং একজন প্রকৃত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী থিয়োডর রুজভেল্ট নিজেকে মাহনের শিষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তার বিশ্বশক্তি অর্জনের জন্য যুদ্ধে নৌবাহিনীর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন ইতিহাস রচনায় চার্লস অস্টিন রেয়ার্ড- সিড্নি ব্র্যাডশ ফে, জর্জ পিবডি গুচ, হ্যারল্ড টেম্পারলে প্রভৃতি পেশাদারী ঐতিহাসিকেরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করেছিলেন এবং কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় বা পররাষ্ট্রীয় কোন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তা শেষ হয়ে যাবার পর তাঁরা নেপথ্যে প্রস্থান করেছিলেন। স্বয়ং একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা এবং তাদের রাজনৈতিক সমর্থকরা ইঙ্গ-মার্কিন ইতিহাস রচনায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বিজনেস হিস্টরিক্যাল সোসাইটির বুলেটিনে এই অভূতপূর্ব পরিণতিকে স্বীকার করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল "এটা চিন্তা করলে উত্তেজিত হতে হয় যে,

আমাদের চোখের সামনে পণ্ডিত ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে এবং তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।”[১]

মার্কিন ইতিহাস রচনা ও পেণ্টাগণের মধ্যে যুদ্ধোত্তর সহযোগিতা বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রচারবিদরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক নেতা ও পণ্ডিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে “স্পষ্ট ও গভীর” বলে বর্ণনা করেছি। *বিজনেস হিস্টরিক্যাল সোসাইটি বুলেটিন* এই মত পোষণ করে যে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিস্তারের যে কোন সত্যনিষ্ঠ বর্ণনার ফলে সরকারী বিভাগগুলির প্রচেষ্টার যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। যেহেতু সম্প্রতি সরকারী বিভাগ ও পেণ্টাগণ- জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও প্রাক্তন নাৎসী জেনারেলদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিশোধকামী সেনাবাহিনীদের পুনর্জীবিত করার কাজে ব্যস্ত, মার্কিন ঐতিহাসিকেরা জার্মান সমরতন্ত্রকে ঢাকা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং সংগে সংগে তাদের আদর্শ অন্যান্য দেশে ছড়াবার চেষ্টা করছে। তাদের সবথেকে অনুগ্রহ আদায় করতে সমর্থ হয়েছে পশ্চিম জার্মানী তার কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একে তার ঘনিষ্ঠতম সহযোগী হিসাবে দেখছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ এবং পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিকরাও তাদের সংগে গলা মিলিয়ে আধুনিক ও সমসাময়িক জার্মানীর ইতিহাসের ব্যাখ্যা করছে।

২

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রেমী দেশগুলি হিটলারের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখন মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা কিভাবে তারা বিশ্বশক্তি অর্জন করবে তার ফন্দী আটতে ব্যস্ত ছিল।

ওয়াল স্ট্রীটে জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদকে এক বিপদজনক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা হয়েছিল এবং তারা জার্মানীর অর্থনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে, পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার থেকে জার্মানীকে তাড়িয়ে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের শরৎকালে রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী এবং ওয়াল স্ট্রীটের একজন গণ্যমান্য সদস্য জুনিয়ার হেনরি মর্গ্যানথু রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের পরিকল্পনা জার্মান শিল্পকে ধ্বংস করে জার্মানীকে এক কৃষিপ্রধান উপনিবেশে পরিণত করার এক খসড়া তৈরী করেছিল। যুদ্ধের শেষে মর্গ্যানথু *আমাদের সমস্যা জার্মানী* নামে এক বই লিখেছিলেন এবং এ বইয়ে তিনি তার পরিকল্পনার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

১। বিজনেস্ হিস্টরিক্যাল সোসাইটি বুলেটিন, বস্টন্, ৫, ২২, নং ১, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮।

তার অভিপ্রায় ছিল সমস্ত জার্মানীকে ধ্বংস করা—শুধু হিটলারের রাষ্ট্র বা যুদ্ধশিল্পকে নয় সমগ্র জার্মান রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা তার ছিল। মর্গ্যানথু লিখেছিলেন "জার্মান আক্রমণের ভয়কে ধ্বংস করার জন্য আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, সোজা কথায়, জার্মানীতে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে না দেওয়া। তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা ফুটিয়ে তোলার জন্য মর্গ্যানথু তার মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব ভুল ধারণা বহুল প্রচারিত, সেগুলিকে প্রথমে যেগুলির অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি কৌতুকাচ্ছলে এই মন্তব্য করেন যে, মার্কিন ইতিহাস রচনা উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানীকে এক "রূপকথার রাজ্য" হিসাবে একেছেন যেখানে রাজপুত্র অ্যালবার্ট ও রাজপুত্র আর্নেস্ট বলে ঘুরে ঘুরে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতেন এবং অপরিচ্ছন্ন দুর্গে পিয়ানো বাজাতেন, যেখানে কৃষক ছিমছাম খামারে তার বড়দিনের হাঁসকে মোটা করত। যেখানে ইউরোপের অধিকাংশ রাজা ও রাজপুত্রেরা তাদের সরল বৌদের খুঁজে পেতেন।"

মর্গ্যানথু এই সমস্ত আবেগপূর্ণ গল্পকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে এই বিষয়ের এক সম্পূর্ণ নতুন দিকে আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, "অনেক শতক ধরে ইউরোপ তার ভাড়া করা সৈন্যদের এই ছবির মত সুন্দর গ্রামগুলি থেকে সংগ্রহ করেছে।" তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যেহেতু জার্মান রাষ্ট্রগুলি থেকে ভাড়া করা সৈন্যদের আমদানী হয়েছিল, তারা ছিল মূলতঃ আগ্রাসী এবং তিনি দাবী করেছেন যে, এই বৈশিষ্ট্য শারীরিক ও ঐতিহাসিক কারণে জার্মান জাতীর মজ্জাগত। তিনি ধারণা পোষণ করেছেন করেছেন যে জার্মানী বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দুই বিশ্বযুদ্ধ সহ যে সব যুদ্ধ করেছে তার পেছনে রয়েছে জার্মানীর জনগণ। মর্গ্যানথু জাংকারডমের যুদ্ধলিপ্সুতার কথা বলেছেন কিন্তু এক বিশেষ সামাজিক শক্তি হিসাবে দেখেন নি। তাছাড়া তিনি অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী, জার্মানীর পুঁজিবাদী শ্রেণী, যারা সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠিত করেছিল, তাদের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে নি। তিনি যুদ্ধের জন্য সোজাসুজিভাবে জার্মান জনগণকে, বিশেষভাবে জার্মান প্রলেতারিয়েতদের দায়ী করেছেন। তার মতে, যেহেতু জার্মান শিল্প যুদ্ধের প্রয়োজন মেটানোর কাজে ব্যস্ত ছিল, জার্মান শ্রমিকেরা ছিল জার্মানীর আগ্রাসনের অন্যতম উৎসশক্তি।

ইতিহাসের এই বিকৃতির দুমুখো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ "যুদ্ধ-লিপ্সুতা" এবং "গণতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা" জার্মানীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য এই যুক্তি দেখিয়ে মর্গ্যানথু জার্মানীর সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ছোট করে দেখাতে চেয়েছেন বা এমন কি তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি জার্মানীর পুঁজিবাদকে, যা অজস্র গ্রন্থিতে মার্কিন পুঁজিবাদের সংগে যুক্ত, চুণকাম করতে চেয়েছেন।

এটা স্পষ্ট যে রাজস্ব বিভাগের সচিব মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মধ্যাঞ্চল-জার্মান কৃষিকরণ এবং জার্মান প্রলেতারিয়েতদের বলপূর্বক দাসে পরিণত করার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু এটাই সব নয়। তিনি জার্মানীর দ্বিখণ্ডীকরণ সমর্থন করেছিলেন। জার্মান রাষ্ট্র ও জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে তার বিবরণ সত্যের অপলাপ এবং এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এই যে ঐক্য ছিল জার্মান আক্রমণের পরিচালিকা শক্তি।

তিনি লিখেছেন: "একটা জার্মানী থেকে দুটো জার্মানীর মোকাবিলা করা ভাল তার কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রের অঙ্ক অনুযায়ী এটা সত্যি নয় যে দুই অর্ধাংশ সমান এক একক।"

যখন বন্দুক গর্জন করেছিল তখন তিনি জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করার রাজনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করতে ব্যস্ত ছিলেন।

যুদ্ধের সময় লর্ড ভানসিটার্ট একটি প্রবন্ধের প্রস্তাব করেছিলেন। যুদ্ধের আগে পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী এবং তারপর পররাষ্ট্র বিভাগের সচিবের প্রধান কূটনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন এবং এক সময় বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁর অনেকগুলো বই ও প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। ভ্যানসিটার্ট তার জার্মানীকে ধ্বংস করার প্রতিক্রিয়াশীল ও অবাস্তব ধারণাগুলোকে কিছু সন্দেহজনক ও পাণ্ডিত্যবিরোধী সত্যের আড়ালে ঢাকা দিয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "বস্তুতঃ ইতিহাসের এমন কোন স্তর থাকতে পারে না যখন একটা জাতি আর টিকতে পারবে না। কিন্তু জার্মানীর ইতিহাসে এমন একটা স্তর আসার কারণ জার্মান জাতি সত্যি সত্যি অধঃপতিত।"

তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন যে জার্মানীর ইতিহাসে সমরতন্ত্রের এক অত্যধিক প্রভাবশালী ভূমিকা ছিল? তাই যদি হয় তাহলে এই সমরতন্ত্রের পেছনের সামাজিক শক্তিগুলো সম্বন্ধে কিছু বলেন নি কেন? এই সমস্ত শক্তিকে সমর্থন ও একত্রিত করলে কার লাভ হয়? সর্বোপরি কিসের ওপর ভিত্তি করে জার্মান সমরতন্ত্র এত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

এখানে ভানিসর্টাট এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে পুঁজিবাদ অনেক অনিষ্টের অন্যান্য কারণ হতে পারে কিন্তু এর কারণ নয় যেখানে সমাজতন্ত্র অন্যান্য অনিষ্টকে সহায়তা করতে পারে কিন্তু তা অনিষ্টের পক্ষে সহায়ক নয়: এই অনিষ্টের জন্য দায়ী একটি বিশেষ কারণ—জাতি।

ভানসিটার্টের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর শাসকশ্রেণী। জুঙ্কার ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও সমরতন্ত্রের বাহকদের দোষস্খালন করা এবং সকলের প্রগতি ও শান্তির অমোঘ পন্থা সমাজতন্ত্রকে হেয় করা। তৃতীয়তঃ তাঁর ইচ্ছা জার্মান জাতিকে দোষারোপ করা যেন অন্যান্য জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত

করার জন্য যুদ্ধগুলোর জন্য এক একটা গোটা জাতিই দায়ী। তাঁর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলো কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত নয়, তাঁর মতে ইহার কারণ জার্মান অত্যাচারী মনোবৃত্তির মধ্যে নিহিত। তিনি আরও বলেছিলেন যে জার্মনীর সমাজতন্ত্রী আন্দোলন গোড়া থেকেই সমরতন্ত্রী ছিল। তাঁর ভয়ংকর অভিযোগগুলো শিডেমান বা নোস্কেকে জাতীয় দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয় নি। তিনি দুজন মহান জার্মান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ও অগাস্ট বেবেলকে বোঝাতে চেয়েছিলেন এটা সহজেই বোঝা যায় যে তাঁর আবিষ্কারকে তথ্যবহুল করার জন্য তাঁকে ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে কিঞ্চিৎ খেলাধূলা করতে হয়েছিল।

ভ্যানসিটার্ট এই ভয় করেছিলেন যে জার্মানী যুদ্ধ যন্ত্রের পরাজয় হলে জার্মানরা জাতীয় গণতান্ত্রিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করবে এবং এইজন্য তিনি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অবলুপ্তির বদলে জার্মান রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চেয়েছিলেন এবং তাঁর মতে ইহা সম্ভব যদি ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী দীর্ঘকাল জার্মানী দখল করে থাকে। যখন পশ্চিমে জার্মান যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতন্ত্র এবং পূর্বে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ধারণার রাজনৈতিক সূচনা টানেন এই বলে "আমাদের একমাত্র আশা আডেনআর।"

৩

যুদ্ধের পর যখন খুব শীঘ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটেছিল, তখন পুরানো যুক্তিগুলোকে আবার নতুন করে সাজানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ জার্মানীর শিল্প ধ্বংস করে তাকে কৃষিভিত্তিক দেশে পরিণত করার পুরোনো পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিল। এই সোভিয়েত জয়ের ফলে উদ্ভূত ইউরোপের নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর উদ্ভবের ফলে এবং জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসারের ফলে— পশ্চিমী শক্তিগুলি জার্মানীকে ভাগ করেছিল এবং সমরতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়া প্রচার করতে শুরু করেছিল। ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক জার্মানী তৈরী করার জন্য পোস্টসডামে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা তারা পদদলিত করেছিল। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি পুনর্গঠন করতে শুরু করে দিয়েছিল। জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের আগেকার ধারণাগুলোকে এই নতুন রাজনৈতিক কর্তব্য অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হয়েছিল এবং এতে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও পুঁজিবাদীরা যোগ দিয়েছিলেন। মার্কিন বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের প্রধান ও প্রতিনিধিরা ইউরোপ, বিশেষতঃ পশ্চিম জার্মানী পরিদর্শন

করতে এবং তারা মার্কিন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা, তাঁদের পরিদর্শনের ফলাফল এবং যে সব দেশ বিশেষভাবে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তা সম্বন্ধে তাদের ধারণা প্রকাশ করেছিল। জনস-ম্যানভিল কর্পোরেশনের পর্ষদের চেয়ারম্যান লুই. এইচ. ব্রাউন *জার্মানীর সম্বন্ধে এক বিবরণী* প্রকাশ করেছিলেন এবং ঐ বিবরণ ওয়াল স্ট্রীট, পেণ্টাগন প্রভৃতি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেছিল। ব্রাউন তাঁর বই শুরু করেছিলেন "বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব" এক বিশ্লেষণ দিয়ে এবং ইতিহাসের ঝোপঝাড় ঘেঁটে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তার দৃষ্টিভংগী একজন ঐতিহাসিকের নয়, একজন ব্যবসায়ীর।

তিনি লিখেছিলেন, "এই সমস্যার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী একটা দেউলিয়া কোম্পানীর প্রতি একজন শিল্পপতির, যে চেষ্টা যথাশীঘ্র লাভজনক উপায়ে উৎপাদন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাড় করার চেষ্টা করছে।"

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ব্রাউন জার্মানীর উন্নতি সম্পর্কে এক বিশেষ অধ্যায়ে 'কোম্পানীর' দেউলিয়া হওয়ার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রুগীর চিকিৎসা করার আগে ডাক্তারকে তার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিটলারের যুদ্ধ যন্ত্রের পতনের পরে যারা জার্মানী পরিদর্শনে গেছে সেই রকম অনেকে আগেও গিয়েছিল। তিনি তিরিশ বছরের যুদ্ধের (১৬১৮-১৬৪৮) উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ঐ যুদ্ধের পর জার্মানদের সমরতন্ত্র গ্রাস করে এবং তখন থেকে জার্মানী" এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী পোষণ করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে ইচ্ছুক ছিল।

নিজেকে ঐতিহাসিকের আসনে বসিয়ে এই মার্কিন শিল্পপতি পুনরায় এই ধারণা চালু করেছিলেন যে সমরতন্ত্র হচ্ছে জার্মান জনগণের এক বৈশিষ্ট্য। ব্রাউন প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, জার্মানীর শাসকশ্রেণী অর্থাৎ জাঙ্কারডম বা একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী নয়। তাহলে যুদ্ধ শুরু করার জন্য দায়ী কে? ব্রাউন বলেন যে, তা ছিল ভয়; যে ভয় গত শতকের শেষে যখন জার্মানীতে এক বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠছিল তখন ফরাসীরা জার্মানীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সম্বন্ধে ভয় পেয়েছিল। এই ভীতির তাড়নায় ফরাসীরা তাড়াতাড়ি রাশিয়ার সংগে এক চুক্তি করেছিল। ব্রাউনের মতে "এর ফলে জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইটালীর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আঁতাত গড়ে উঠে।"

স্কুলের যে কোন বুদ্ধিমান বালক ব্রাউনকে বলবে যে ১৮৯১-৯৩ সালের সম্পাদিত রুশ ফরাসী চুক্তির জন্য ১৮৮২ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয় নি বরঞ্চ প্রথমোক্ত চুক্তি দ্বিতীয় চুক্তিরই পরিণতি। এটা অবশ্যই ব্রাউনের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা নয়। এর দ্বারা অজ্ঞতা ও বোকামী সূচিত হয় কিন্তু

যখন ব্রাউন বলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আসল কারণ বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংঘাত নয়, এর কারণ রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সংঘর্ষ যার ফলে "পশ্চিমী অবধারিত ভাবে জড়িয়ে পড়বে"। তখন কিন্তু সেটা এক জঘন্য মিথ্যে। ব্রাউন এজন্য অনুতপ্ত যদি জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকত এবং নিজেদের মধ্যে নিরলস কশাইগিরি চালিয়ে আরও রক্তপাত ঘটাত।

এই রকম মোচড় দিয়ে ব্রাউন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জার্মান সমরতন্ত্রীদের ঢাকার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেছেন যে হিটলার জাংকার, সমরতন্ত্রী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের সমর্থন স্বল্প সময়ের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দাবী করেছেন যে, তারা "নিজেদের একটা মইয়ের মত ব্যবহার করতে দিয়েছিল এই আশায় যে তারা হিটলারকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে দেবে" কিন্তু "একবার ক্ষমতা পেয়ে হিটলার সেই মই লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলেন।"

এর অন্তর্নিহিত অর্থ খুব সহজ: "সামন্ততান্ত্রিক সূত্রে সৃষ্ট সনাতনী সমরপন্থী এবং সম্প্রতি উদ্ভূত শিল্পপতিরা, যাদের সংগে কাইজারের দীর্ঘকালীন আঁতাত ছিল," দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় "হিটলারের হাতের" নিষ্পাপ মেষশাবক হয়ে উঠেছিল।

তারপর ব্রাউন তাঁর জার্মানি সতীর্থদের "দক্ষ ও বুদ্ধিমান" বলে প্রশংসা করেছেন এবং তার মতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক সম্পদের অন্যতম" হিসাবে জার্মানীর তাঁদের ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন যথেষ্ট ন্যায্য। তারপর আবার ইতিহাস বিকৃতকারী ব্রাউন বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য নাৎসী জার্মানি পরাজিত হয়েছে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং ইউরোপীয় জনগণকে নাৎসী বর্বরতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁদের সংগ্রাম সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটর চালিত সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের চাপে বার্লিনের পতন হয়েছিল।"

ব্রাউন এই আশা প্রকাশ করেছেন যে ইতিহাসের শিক্ষা হারিয়ে যাবে না এবং তিরিশ বছরের যুদ্ধের সময়, যখন তার মতে জার্মানী সমরতন্ত্রর গাড্ডায় পড়েছিল, কখনো মানুষ ভুলে যাবে না। ব্রাউন অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, জার্মানী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোন নতুন আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মত হচ্ছে জার্মান জনগণের এই সমস্ত অনুভূতির জন্ম এক ব্যর্থতা বোধ থেকে এরা একজন ব্যস্ত লোক হিসেবে এক "লাভজনক পরিস্থিতি" ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি শান্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিদান

হিসাবে এক অদ্ভুত ওষুধ দাওয়াই বাৎলেছেন। তিনি বলেছেন "রুগীর প্রকৃতির এক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের পর ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে—একটা দরজা খোলা থাকবে এবং সংগে সংগে তাকে চালানোর জন্য তার পিছনে একটা লাথি মারতে হবে।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ব্রাউন প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যতক্ষণ না মার্কিন-পুষ্ট জার্মান শিল্পপতিরা ক্ষমতায় না আসছে ততদিন জার্মান জনগণের ইতিহাসের অগ্রগমন অচিন্তণীয়। তিনি স্বীকার করেছেন যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আর কোন কৌশল নেই যা দিয়ে যে "বিভিন্ন জাতির আত্মা" দখল করতে পারে; এই কারণে ইতিহাসের পুরনো শিক্ষার দোহাই দিয়ে ব্রাউন এই মত পোষন করেছেন যে সে জার্মানদের "আদেশ গ্রহণ করাতে এবং তা পছন্দ করাতে বাধ্য করা যায় যদি সরকারের এর পেছনে হাত থাকে।" সম্প্রসারণের উপযোগিতা ও জার্মানীতে বৃহদায়তন মার্কিন নীতির সমর্থন করে ব্রাউন বলেছেন যে মার্কিন জীবন পদ্ধতির শত্রুরা তাঁর সংগে একমত হবেন তিনি তা আশা করেন না। বোধহয় ব্রাউনের গোটা বইয়ের একমাত্র যুক্তি যা অস্বীকার করা যায় না।

৬

বর্তমান বৃটিশ ও মার্কিন ইতিহাস রচনা কৌশল জার্মান সেনাপতি ও জেনারেল স্টাফকে ঢেকে রাখার জন্য একটু তাড়াতাড়ি করছে। একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে, এটা এমন কি ঐতিহাসিক দিক থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ***ইউ. এস. নিউজ য়্যাণ্ড ওয়ার্লড রিপোর্ট*** স্বীকার করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মান জেনারেল স্টাফের উদ্দেশ্য যাচাই করতে আগ্রহী। কিন্তু কোনরকম সত্যতা যাচাই করার আগেই এটা স্পষ্ট যে এই "ধারণা" জার্মান সমরতন্ত্রের মত, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী জার্মানীরা অপরাজেয়, এই ধারণার অবসান ঘটিয়েছিল এবং জার্মান জেনারেল স্টাফ যে সুনাম গড়ে তুলেছিল তা চূর্ণ করেছিল। নুরেমবুর্গ বিচার পরিষদের সোভিয়েত সদস্যর বিশেষ বিবৃতিতে এর নৈতিক মূল্যায়ন বিধৃত রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে জেনারেল স্টাফ হচ্ছে প্রুশ-জার্মান সমরতন্ত্রের সব থেকে বিপজ্জনক মূর্তরূপ। তিনি তথ্যের দ্বারা এটা দেখিয়েছিলেন যে, এটা একটা অপরাধী সংগঠন এবং তাকে ধ্বংস করা উচিত।

কিন্তু বিচার পরিষদের পশ্চিমী সদস্যরা জার্মান সমরতন্ত্রকে পুনর্বাসিত করতে মনস্থ করেছিল। বিচারে ফিল্ড মার্শাল ওয়াল্টার ব্রাউখিটশ, এরিখ মানস্টাইন, অ্যালবার্ট কেসারলিং এবং অন্যান্য স্বাক্ষীরা যে মত পোষণ করেছিল তারা তা সমর্থন করেছিল। বিচার এড়িয়ে গিয়ে তারা ঘোষণা করেছিল যে হিটলার এক "বিচারাত্মক" যুদ্ধ চালিয়েছিল, তা কোনমতেই এক আগ্রাসনাত্মক যুদ্ধ ছিল না, জেনারেল স্টাফে এবং ওয়েরম্যাচট এর ভূমিকা ছিল "প্রযুক্তিগত" এবং তাছাড়া তারা হিটলারের নীতি ও সমর-কৌশলের তারা বিরোধিতা করেছিল। অতএব তারা কখনও আগ্রাসনাত্মক শক্তি ছিল না, তারা ছিল বিরোধী শক্তি।

যখন থেকে বিশ্বক্ষমতালোভী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মান সশস্ত্র বাহিনী পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছিল, কিছু প্রতিক্রিয়া-শীল মার্কিন ও বৃটিশ ঐতিহাসিক জার্মান জেনারেল স্টাফের অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে নতুন বিশ্বযুদ্ধে প্রয়োগ করা যায়, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল। প্রাক্তন হিটলারের প্রাক্তন জেনারেল, হাইনজ্ গুডেরিয়ান এই পুনর্গঠনের অন্যতম পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী *ইউ. এস. নিউজ য়্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে* লেখা হয়েছিল "গুডেরিয়ান পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে পেশাদারী সামরিক ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ রাষ্ট্রপতি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অসামরিক শাসনের কোন স্তর থাকবে না।"

প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন ও বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা দুটো জিনিসের উপর প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেছে প্রথমত তারা জার্মান সমরতন্ত্রকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে চায় এবং দ্বিতীয়তঃ এটা দেখাতে চায় যে জার্মান সেনা-পতিরা, বিশেষতঃ জার্মান জেনারেল স্টাফ, জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী নয়। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীতেও যুদ্ধাপরাধী-দের দোষস্খালন করার অপচেষ্টা অনেক দিন ধরে চালানো রয়েছে। কিছু মার্কিন ঐতিহাসিকেরা শুধু জার্মান সমরতন্ত্রীদের স্বয়ং হিটলারকে বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। ১৯৪৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে *নিউ ইয়র্ক টাইম পত্রিকা* ট্রেভর-রোপার নামক এক ইতিহাসের অধ্যাপক হিটলারের *মাইন কাম্প* মুসোলিনীর সংগে হিটলারের চিঠিপত্র, গোয়েবলসের রোজনামচা, হারমান রাউশনিঙ্গ-এর লেখা, প্রভৃতি ঐতিহাসিক উৎস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে এমন প্রশংসা করেছেন যা গোয়েবলসের নিকৃষ্ট প্রচারের সংগে তুলনীয়।

যখন যুদ্ধ পুরোদমে চলছিল, মার্কিন ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে জার্মান জেনারেল স্টাফ হচ্ছে উঁচু দরের বিশেষজ্ঞদের এক প্রতিষ্ঠান যাদের নাৎসী নীতি নিয়ে কম চিন্তা করতে হত না এবং এই জন্য তারা যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী নয়। এই যুক্তি প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য বই

ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর সেই একই প্রচেষ্টা চলেছে। বৃটিশ সামরিক ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক জে. এফ. সি. ফুলার তাঁর বই *দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ* ১৯৩৯-৪৫ বইয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, হিটলারের সামরিক পরিকল্পনার পিছনে ধারণাটি একদম ঠিক ছিল, তা কার্যকরী করার সময় একের পর এক ভুল করা হয়েছিল। হিটলারের "প্রসস্তি" এই উল্লেখ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণকে সমর্থন করা এবং নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রকে ভেঙে দেবার জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভূমিকাকে খর্ব করার অপচেষ্টা।

বি. এইচ লিডেল হার্ট একই পথে চিন্তা করেছেন। সোভিয়েত পাঠক তার বই *দি রিয়াল ওয়ার* ১৯১৪-১৯১৮ বইটির সংগে পরিচিত তার কারণ কিছু তর্কসাপেক্ষ মন্তব্য থাকলেও বইটি কৌতুহলোদ্দীপক। পুঁজিবাদী দেশে একজন তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিসেবে তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয় এবং এই জন্য এটা আরও অনুশোচনার বিষয় যে তিনিও তার *পাহাড়ের অপরদিকে* বইয়ে হিটলারের জেনারেলদের স্বপক্ষে লিখেছিলেন। তার বইটা হানশ ফন্ সিকট হবার্নার ফন ব্লোমবার্গ, ওয়ানার ফ্রিটশ, ওয়ালটার ফন ব্রাউখটিশ, ফ্রানজ হাল্ডার, গুনেথার ফন ক্লুজ, হাইনজ গুডেরিয়ান, গার্ড ফন রুণ্ডেস্ট, এরিক ফন মানস্টাইন এবং আরউইন রোমেল, প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া-জার্মান সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষমণ্ডলীর প্রথম সারির কয়েকজন যে একপেশে তথ্য প্রচার করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে লেখা।

লিডেল হার্টের মতে জার্মান জেনারেল স্টাফের ভূমিকা কাইজারের সময় থেকে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। তারা হিটলারের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং তার আগ্রাসনাত্মক পরিকল্পনাগুলিকে উৎসাহ দেবার বদলে বেশী বাধা দিয়ে এসেছে। জার্মান সমরতন্ত্রর দোষস্খালন করার জন্য তিনি বলেছেন যে, "যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান সেনাবাহিনী ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় অনেক ভালোভাবে যুদ্ধের নিয়মগুলি মেনে চলেছে" যেহেতু তাঁর দাবী সকলের জানা—এক সত্যের সংগে সামঞ্জস্যহীন, লিডেল হার্ট সতর্কভাবে বলেছেন "পশ্চিমী শত্রুর সংগে যুদ্ধ করার সময় তা পরিস্ফুট হয়েছিল।" নাৎসীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার জনতার বিরুদ্ধে যে সব ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছিল তা নিয়ে তিনি উচ্চবাচ্য করেন নি। তবুও তিনি বলেছেন যে, নাৎসী সেনাপতিদের সাংগঠনিক দক্ষতা এক মৌল ঐতিহাসিক উপাদান। তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধর সময় তারা "গাণিতিক পেশাদারীদের অভ্রান্ততা নিয়ে লড়াই করেছে এবং তারা ছিল তাদের পেশার শ্রেষ্ঠ ফসল।"

এটা শোনার পর যখন হিটলারের জার্মানী কিভাবে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে তা ভাবলে একটু বিস্মিত হতে হয়। সোভিয়েত জয়ের কারণ কি কি ছিল?

লিডেল হার্টের মতে "রাশিয়াকে তার প্রগতি নয় তার অনুন্নতি বাঁচিয়ে দিয়েছিল।" ক্লাইষ্ট স্কেমেনজিন ও অন্যান্য নাৎসী সেনাপতি যে সব সংবাদ প্রেরণ করেছিল তার উল্লেখ করে তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচিয়েছে তার ঠাণ্ডা ও অনতিক্রমণীয় রাস্তাগুলি। কিন্তু তাঁর মতে আসল কারণ ছিল "পাহাড়ের আর এক দিকের" মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি যার উদ্ভব হয়েছিল "হিটলারের সহোজাত সামরিক দক্ষতা" এবং জেনারেলদের সংঘর্ষের ফলে।

জার্মানরা অপরাজেয় ছিল এই ধারণায় পুনঃপ্রবর্তন করে লিডেল হার্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, যদি জার্মান সেনাপতিরা "গভীরতর বুদ্ধির" পরিচয় দেয় এবং যে শক্তিগুলি বিশ্বব্যাপী "যুদ্ধ নীতি" ও "মহান রণকৌশল" অনুসরণ করতে চায় এবং তাদের অনুসরণ করে নিজেদের আশু পেশাদারী কর্তব্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় তাহলে তারা অপরাজেয়। এই সিদ্ধান্তগুলি এক আশাবাদী রাজনৈতিক পরিকল্পনার ফসল যা করতে জার্মান সমরতন্ত্রর পুনরুজ্জীবন এবং আগ্রাসী আটলাণ্টিক জোটের স্বার্থে তার ব্যবহারের কথা ভেবে রেখেছে।

৫

এটা স্পষ্ট যে প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন ও বৃটিশ ইতিহাস রচনা পশ্চিম জার্মানীতে প্রতিশোধকারী সামরিক আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত হতে সাহায্য করছে। নাৎসীর পরাজয়ের পরেই একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও সামরিক বিভাগ ইঙ্গ-মার্কিন দখলকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজেদের অতীতকে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা শুরু করেছিল। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে এক অল্পসময়ের মধ্যে জার্মানী যে দু-দুবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল তার "পুনর্মূল্যায়ন" ও রোমন্থন দ্বারা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানীর স্বার্থান্বেষী মহল তাদের বৃটিশ ও মার্কিন পৃষ্ঠপোষকদের সংগে হাত মিলিয়ে বিস্মৃতি থেকে ইতিহাসের বিকৃত অধ্যায়গুলি খুঁজে বার করেছিল এবং সেগুলিকে তারা নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং তাদের নতুন প্রতিশোধলিপ্সু আগ্রাসনাত্মক উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংশোধিত করেছিল।

এই ব্যাপারে জার্মান ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাংকার ও পুঁজিবাদীরা কাউন্ট আর্নস্ট জু রেভেন্টলোর লেখা পড়ে খুশী হত। তিনি তাঁর লেখায় এটা জোর দিয়ে বলেছেন যে ***ওয়েল্টপলিটিক*** অধ্যায়ে উপনীত হয়ে জার্মানী তার নীতি রূপায়ণ করার জন্য বৃহৎ সেনাবাহিনী বা শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রভৃতি আরও

জোরদার ব্যবস্থা না করে অত্যন্ত ভুল করেছিল। তিনি কাইজারের থেকেও আরও আগ্রাসনাত্মক ওয়েল্টপলিটিক জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। রেভেণ্টলো যে নাৎসীদের দলে যোগদান করেছিলেন, এটাই স্বাভাবিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ঐতিহাসিকেরা প্রতিশোধ নেবার জন্য এবং আর নতুন যুদ্ধ বাধানোর জন্য অনেক উপকথা তৈরী করেছিল। তারপর সাম্রাজ্যবাদ এবং সমরবাদের পুনরুজ্জীবন এবং সামরিক, রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্য ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে ঐতিহাসিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সরকারেরা যুদ্ধ বাধানোর জন্য জার্মান সরকার অপেক্ষা কিছু কম দায়ী ছিল না। যেহেতু এই ব্যাখ্যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আড়াল পড়ে যায়, সেই-হেতু মার্কিন ঐতিহাসিকের এই ব্যাখ্যা আংশিকভাবে সমর্থন করে। "তারপর এই ব্যাখ্যার প্রবর্তন হয় যে "যুদ্ধোপরাধের" প্রশ্নে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ নির্দোষ ছিল। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল মহল জার্মাণ সমর তন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল এবং এইজন্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করার যে কোন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য ব্যগ্র ছিল। এই গল্পও পুনর্প্রচলিত হল যে "বেষ্টনীর" বিপজ্জনক নীতিকে রোধ করাব জন্য জার্মানী যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং এব জন্য আসলে দায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

বৃটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিকেরা এই সময় এই গল্প চালু করেছিল যে, এই দুই দেশের শাসকেরা জার্মানীর নামে বিবাদ ও পার্থক্য দূর করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। এটা ছিল জার্মানীর সংগে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য এবং তার আক্রমণকে পূর্বদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নেব বিরুদ্ধে ঠেলে দেবার জন্য ইংগ-মার্কিন পরিকল্পনাব অংগ। "যুদ্ধোপরাধ" নিয়ে বাদানুবাদ এমন এক অবস্থায এসে পৌঁছোছিল যে জার্মানী, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকেরা এক পারস্পরিক সমর্থনের জন্য এক সমঝোতায় এসে পৌঁছেছিল। সেই সময় এক নতুন ব্যাখ্যা চালু করা হয় এবং সেই ব্যাখ্যায় রাশিয়াকে বল্কান জাতিসমূহ ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শ্লাভদের সমেত, যারা জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিল তাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমর্থিত হয়েছিল।

১৯৩৯ সালে হিটলার পশ্চিমী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর জার্মান ইতিহাস রচনা তার মুখোস খুলে ফেলেছিল। সমস্ত পৃথিবীকে শুনিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি।

এক কথায় জার্মান ঐতিহাসিকদের জাতীয়তাবাদী দলটি প্রতিশোধ ও আগ্রাসনের নীতিগুলিকে পুষ্ট করেছিল। যখনই তা বৃটিশ ও মার্কিন

শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সংগে সুর মিলিয়েছিল তখনই তারা তাকে সমর্থন করতে এতটুকু দ্বিধা করে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও যখন পশ্চিম জার্মানী প্রথমে এক অধিকৃত অঞ্চল ও তারপর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক শরিক ছিল, জার্মানি একচেটিয়া পুঁজিবাদী এবং সমরতন্ত্রীদের আড়াল করে রাখার চেষ্টাকে আরও জোড়ালভাবে সমর্থন জানানো হয়েছিল। ইতিহাসের নতুন ও পুরাতন ধারণাগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ইউরোপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নতুন নতুন ব্যাখ্যা তৈরী করা হয়েছিল?

জার্মানীর যুদ্ধোপরাধ নিয়ে আলোচনা থেমে গেছিল। ১৯৪৯ সালে *অ্যানলাস অফ দি আমেরিকান অ্যাকাদেমী অফ পলিটিকাল এ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস* এ উইলিয়াম অ্যাবেনস্টাইন এই নিম্নলিখিত সরল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

"১৯৩৩-৪৫ সালে সংঘটিত অপরাধগুলোর জন্য জার্মান অপরাধের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও তাগিদ আর নেই। রুশরা আমাদের চিন্তায় এতটা জুড়ে আছে পুরোনো যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো আর এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে সেগুলো আমাদের মূল সমস্যা নিয়ে চিন্তা থেকে বিচ্যুত করবে।"

ঠাণ্ডা যুদ্ধের উত্তেজনায় মার্কিন শাসক শ্রেণী তাদের তীব্র প্রচারের দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাধের প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল এবং আপাতগ্রাহ্য কারণ দেখিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রের রাজনৈতিক ও নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করেছিল। পশ্চিম জার্মানীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক রচনাগুলো জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রের যুদ্ধোপরাধকে ছোট করে দেখাবার জন্য হিটলারের বর্বরতাকে নিন্দা করেছিল এবং তাদের হাততালি দেওয়া হয়েছিল।

"কাল ইয়াসপারস" তাঁর The Questions of German Guilt, এ বলেছিলেন যে মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে সে সব ব্যাপার খুব আনন্দদায়ক ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল জার্মান জাতির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের ঐতিহ্যের অভাব। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা জার্মান জনগণের প্রগতিশীল অংশ জার্মানীকে দ্বিখণ্ডিত করার নীতির বিরোধী। সেইজন্য ইয়াসপারের ধারণার সংগে একমত হয়ে *এ্যানালস অফ দি অ্যামেরিকান অ্যাকাদেমী অফ পলিটিক্যাল এ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স* নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে এসেছে:

"জার্মানী (জাপান ব্যতীত) একমাত্র বৃহৎ রাষ্ট্র যেখানে কখনও এক জনপ্রিয় সফল বিপ্লব সংঘটিত হয়নি।"

কিন্তু এটা এত সহজ নয়। নেপোলিয়নের যুগে মুক্তি সংগ্রাম, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব এবং তার গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য রুর অঞ্চলে পশ্চিমী

উপনিবেশের সময় জার্মান শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম। এগ্নলি কোথায় যাবে? এবং হিটলারের ক্ষমতায় আসার সময় জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশ জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিল তা কি ভোলা যায়?

মার্কিন অর্থ পুঁজি পশ্চিম জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল জোটের স্বার্থে এই সব তথ্য চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিল। এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় সে কার্ল ইয়াস্পারের বই ইংরাজীতে অনূদিত হলে তা প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন ও বৃটিশ প্রচারবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ফ্রেডারিক মাইনেকের "The German Catasrophe" বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এই বইটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন মার্কিন ঐতিহাসিক সিডনি ফে যিনি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির একজন অনুরাগী ছিলেন। যুদ্ধের ঠিক পরে মাইনেক পশ্চিম জার্মানীতে তাঁর বইটি প্রকাশ করেন এবং বিমর্ষভাবে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে "বিশ্বশক্তি হবার ইচ্ছে এক মিথ্যে আশায় পরিণত হয়েছিল।" তিনি স্বীকার করেছিলেন যে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় আনার জন্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং স্বীকার করেন যে, ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ক্ষমতার দৌড়ে এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি অবশ্য জার্মানীর উপর মার্কিন আধিপত্যে কিছু মনে করেন নি এবং এই মতবাদ প্রচার করে যে জার্মান জনগণ নয়, বিসমার্ক এক ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়তে চেয়েছিলেন. তিনি জার্মানীর ভবিষ্যকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রথের সংগে বেঁধে এর তথ্যকে বিকৃত করে নিজস্ব এক পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। তিনি এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে এক জার্মানী গড়ে তোলায় আপত্তি জানাল এবং "গ্যায়টের সময়ের" জার্মানী যে অবস্থায় ছিল সেখানে ফিরে যাবার উপর জোর দেন। তাঁর মতে সেই সময় দেশ অনেক টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত ছিল কিন্তু তখন মহান আত্মিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পশ্চিম ইউরোপীয় বিশ্বজনীনতা গড়ে উঠেছিল। তিনি তৎকালীন জার্মান সাংস্কৃতিক জীবনকে গৌরবান্বিত করে বলেছিলেন:

"আমাদের তাঁদের উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গঠিত এক সংঘর সভা হিসাবে আমরা আমাদের শক্তি ফিরে পেতে পারি।"

পশ্চিম ইউরোপীয় মহা সংঘর এই ধারণা প্রচার করে তিনি বিসমার্কের ঐতিহ্যকে এমন এক তত্ত্ব দ্বারা বিরোধিতা করার ভান করেছিলেন যা ছিল জার্মান জাতির প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের বিরোধী। এক "ইউরোপীয় জোটের" জন্য আহ্বান জানিয়ে মাইনেক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, জার্মান জনগণ তাদের জাতীয় স্বার্থের জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করে

এবং পশ্চিম ইউরোপীয় সংহতির প্রতি নতি স্বীকার করে আর এক সর্বনাশকে এড়িয়ে যেতে পারে।

তাঁর এই ধারণাকে প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন প্রেস স্বাগত জানিয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৯শে জানুয়ারী *দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রাইবুন* একে জার্মান ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নের এক সাধু প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে এবং এই আশা করে যে, ১৯৪৫ সালের থমথমে পরাজয়ের আবহাওয়ায় পুষ্ট জার্মান যুবকগণ; যে রকম মাইনেক আশা করেছেন, পুরোনো জার্মান ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগী হবে। এই বিশেষত্ববাদ ও গোপন পশ্চিম ইউরোপীয় বিশ্বজনীনতার সংগে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলির, যে গুলিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা বারবার দমিয়ে রাখতে চেয়েছে, কোন মিল নেই।

যুদ্ধের জন্য অপরাধবোধ নয়, যুদ্ধোপরাধগুলি জার্মান ইতিহাস রচনা কৌশলকে, শোচনীয় সামরিক পরাজয় ও নাৎসী রাষ্ট্রের দুর্যোগের দায়িত্বের প্রশ্নে বিব্রত করেছে। পশ্চিম জার্মানীর অনেক লেখক এই "দুর্যোগের" কারণগুলি নির্দিষ্ট করতে চেয়েছে। তাদের তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের মূল্য যাই হোক না কেন, তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রবণতাগুলি বেশ স্পষ্ট।

লুডউইগ হেইলব্রুনের *দি কাইজার এম্পায়ার দি রিপাবলিক অ্যাণ্ড নাজি রুল* বইটা ধরা যাক। এই বইয়ে পোটসড্যাম পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ঐক্যবদ্ধ, শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক জার্মানীর কথা ভাবা হয়েছে, তার বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি তার মত প্রমাণ করার জন্য বলেছিলেন যে, হিটলারের ফ্যাসিবাদী শাসন ছিল জার্মানীর দীর্ঘ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের পরিণতি। তার মতে এর জন্য "দায়ী অতীত, বিসমার্কের যুগ।"

এডুয়ার্ড হেমারেল আরও অপরিণত। তিনি "শুধুমাত্র সামরিক বা রাজনৈতিক নয়, আত্মিক সকটের" কারণ ও ফলাফল বোঝার জন্য "সাধারণ ঐতিহাসিক চিত্রটি" পুনরায় পর্যবেক্ষণ করার উপর জোর দিয়েছিলেন। জার্মান সমরতন্ত্রীদের অন্যান্য প্রবক্তাদের মত তিনি "বিপর্যয়" বা হিটলারের ভুলত্রুটির সমালোচনা করেন নি কিন্তু তখন জার্মান ধারণার উৎপত্তি থেকে জার্মানীর সাধারণ আত্মিক গঠনের সমালোচনা করেছিলেন।

এর ফলে জার্মান ইতিহাসে বিসমার্কের ভূমিকা নিয়ে এক আলোচনার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই লৌহশাসক জার্মানীকে "পরিপূর্ণ"ভাবে জার্মান বিজয় অভিযানের ক্ষতি না উপকার করেছিলেন। এই আলোচনার রাজনৈতিক রং সহজেই বোঝা যায়।

প্রথমতঃ হিটলারের রক্তাক্ত একনায়কতন্ত্র ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের শোষণীয় ফলাফল চেপে রেখে জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকেরা আসলে হিটলারকে সমর্থন করছে। দ্বিতীয়তঃ পুরানো ধাঁচের বুর্জোয়া ও জাঙ্কার প্রতিক্রিয়ার প্রতীক বিসমার্কের সমালোচনা করে জার্মান একতা ও জার্মান

রাষ্ট্রে ধারণাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য জার্মান রাষ্ট্রকে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ধাঁচে ফেলা এবং তার প্রতিশোধলিপ্সু ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য তাকে পশ্চিমী জোটে টেনে নিয়ে যাওয়া।

হেমারেলের ঐতিহাসিক ধারণা এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। বিসমার্ক-বিরোধিতার ছদ্মবেশে তিনি "পশ্চিমী সংস্কৃতির এক আন্ত-র্জাতিক কাঠামোর" কথা বলেছিলেন যার নীতিগুলি জার্মানীর মেনে চলা উচিত।" বস্তুতান্ত্রিকতা-বিরোধিতার ছদ্মবেশে তিনি প্রগতিশীল জার্মান, বিশেষত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তার তত্ত্বকে জোরদার করার জন্য তিনি রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এক প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার অবতারণা করেছিলেন যা ছিল সদ্যোজাত রাজনৈতিক গুরুবাদের স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক।

এইজন্য অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে- যিনি ১৯৪৪ সাল থেকে সামরিক গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং ১৯৩৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম শরিক ছিলেন এবং যার জন্য তার প্রাণদণ্ড হয়েছিল, "হিটলারের বিরুদ্ধে এক ধর্মাত্মা যোদ্ধা" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে একজন "বিশ্ব নাগরিক" বলা হয়েছে যিনি পশ্চিমীর শক্তির সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে জার্মানীর মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন।

যুদ্ধের ঠিক পরেই জেনারেল ও পুঁজিবাদীরা হঠাৎ ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল *ডেইলি মেল* অনুযায়ী তাদের রচনা ও স্মৃতিকথা গরম কেকের মত বিক্রী হয়েছিল। এটা ঠিক যে ঐ সব লেখা পাতে দেওয়ার অযোগ্য ঐতিহাসিক মালমশলা এবং প্রতিশোধ-লিপ্সু, আগ্রাসী এমন কি ফ্যাসিবাদী ধারণায় ভর্তি ছিল এবং এইজন্য বৃটিশ ও মার্কিন প্রেস তাদের এত প্রচার করেছিল।

এই সমস্ত নব-দীক্ষিত লেখকদের মধ্যে প্রথম দিকেব একজন ছিলেন হ্যালমার স্ক্যাশট। তিনি জার্মান ইতিহাসকে সংশোধিত করার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন হিটলার সরকারের একজন মন্ত্রী। "তৃতীয় রাইখের" বিশেষ এই অর্থনৈতিক প্রতিভার নুরেমবুর্গে বিচার হয়েছিল। দোষীদের সমর্থন করার জন্য অনেক লেখালেখি হয়েছে। তাদের মধ্যে স্ক্যাশটের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক রচনার কোন তুলনা নেই। তাঁর বই *সেটলিং স্কোরস উইথ হিটলার* শুধু আত্মসমর্পণ নয়: তা হচ্ছে জার্মানীর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে এক হাত দেখে নেবার এবং জার্মান পুঁজিবাদীদের বড় করে দেখানোর এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংগে তাদের যুদ্ধোত্তর মাখামাখিকে সমর্থন করার এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা।

আধুনিক জার্মান ইতিহাসকে সামনে রেখে যদি দাবী করা হয় যে হিটলারের ক্ষমতার অভ্যুত্থানের জন্য জার্মান জনগণ ছাড়া "আর কেউ দায়ী নয়"

এবং বলা হয় যে জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও ব্যবসায়ীরা দেশের গণতন্ত্রের একমাত্র বাহক, তাহলে তার থেকে অসৎ বক্তব্য আর কিছু হতে পারে না। যদি বলতে হয় যে জার্মান ব্যাংক ছিল জার্মানী গণতন্ত্রের দুর্গ তাহলে একজনকে সরাসরি মিথ্যা ক হতে হবে। যদি দাবী করা হয় যে হ্বলিসার স্যাশট ছিলেন গণতন্ত্রের এক পূজারী তাহলে তা হবে আর এক মিথ্যাভাষণ। স্যাশট নাৎসী সরকারের একজন প্রাক্তন সদস্য হিসাবে নুরেমবুর্গে বিচারাধীন ছিলেন এবং বলা হয় যে তিনি "ইচ্ছাকৃতভাবে একজন বিরোধী হিসাবে" কাজ করেছিলেন। এটা কত বড় ভাল যে হিটলারের অর্থ-দফতর পরিচালনা করে তিনি যাতে তা "আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়" তা নিশ্চিত করেছিলেন।

স্যাশট আমাদের যা বিশ্বাস করাতে চান তা হচ্ছে যে নাৎসীশক্তি সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও হিটলার-বিরোধী জোটের অবশিষ্টাংশের প্রচণ্ড চাপে ভেঙে পড়ে নি। তার পতনের কারণ হিটলারের "অবিচার ও হিংসার" প্রবণতাকে ব্যর্থ করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপরাধের কথা টেনে এনে স্যাশট বলেছেন: "অপরাধের প্রশ্ন এবার তোলা যাবে না। দুপক্ষকেই দায়ী না করে তা তোলা যাবে না।" তিনি এই আভাস দিয়েছেন যে যুদ্ধাপরাধ নিয়ে যে কোন নতুন আলোচনা জার্মান ও ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদের মধ্যে যে "যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা নষ্ট করে দেবে।" তিনি বলেছেন "আমি অন্তত: একবার পুনর্মিলন ঘটাতে সাহায্য করাতে চাই।"

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল প্রেস তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল। তারা স্যাশটকে জার্মান ট্যালেরাণ্ড বলে অভিহিত করেছিল। এটা করা হয়েছিল বোধ হয় তার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দক্ষতাকে সাধুবাদ জানানোর জন্য। জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে পশ্চিম যা লাভ করবে তাতে ঐতিহাসিক সত্যতা আরোপ করার জন্য স্যাশট "রোমের পতনের পর জার্মানী পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ" হয়ে উঠেছিল এই আন্তর্জার্মানী উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণার পুনরুজ্জীবিত করেছিল তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, "এই সংস্কৃতি হৃদয় ছাড়া বাঁচতে পারে?"

এরপর প্রাক্তন নাৎসী মন্ত্রী মহাশয় ও পশ্চিম জার্মানীর একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা যে ব্যগ্রতার সংগে মার্কিন শাসকদের সাহায্য ও বন্ধুত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছে, তা সমর্থন করার জন্য আর এক উপকথা তৈরী করেছেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্রমপরিণতি, এই জীর্ণ নাৎসী যুক্তি পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন "জার্মানী, আর একবার, তিরিশ বছরের যুদ্ধের সময়, এইরকম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। যখন ৩০০ বছর আগে কসাইগিরি শেষ হয়েছিল, জার্মানী ঠিক আজকের মত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর কোন

ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট না করে—কারণ তার কোন অস্তিত্ব নেই—তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন যে জার্মান জনগণ তিরিশ বছর যুদ্ধের পর আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল তার কারণ তারা "পুরোন পৃথিবীর বদলে নতুন পৃথিবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল।" স্ক্যাশট বলেছেন যে তারা এখনও সেই পথ অনুসরণ করে যাচ্ছে।

স্ক্যাশট জার্মান পুঁজিবাদীদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনা হিটলার কিভাবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার হিসেব করেছেন। পরাজয় সত্ত্বেও এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলো, তার মতে, বাস্তবায়িত হবে তার কারণ তাদের ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক শিকড় খুব গভীর। স্ক্যাশট তার পুরোনো আন্তর্জার্মান এর ফ্যাসিবাদী তত্ত্ব দ্বারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ইউরোপ জয়ের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন, "ইতিহাস অনুযায়ী জার্মানী যতখানি জায়গা পেয়েছে তা তার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

স্ক্যাশট স্বীকার করেছেন যে প্রতিশোধের জন্য তৃতীয় যুদ্ধের তাঁর যে ধারণা আছে, তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে নাৎসী ধারণার প্রয়োজন আছে। তিনি বলেছেন, "যদি ১৯১৪ সালের আগে জার্মানীদের তাদের নিজেদের জায়গার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল, আজকে তা আরও বেশী অসম্ভব।"

তিনি কোন কৃষিব্যবস্থার কোন রকম গণতান্ত্রিক সংশোধণের বিরোধী। তিনি মনে করেন যে বৃহদায়তন জমিদারীকে সমর্থন করা জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের কর্ত্তব্য, তাছাড়া পশ্চিমী শক্তিগুলোর সংগে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে *স্বাধীনতার* জন্য এবং নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি করা প্রয়োজন।

এর ফলে, আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে নবরূপে আবির্ভূত ট্যালেরাও হিটলার বিরোধী ঐতিহাসিকরা পোশাক পরে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী প্রতিশোধের ধারণাকে উস্কানি দিচ্ছে। হিটলারের হিসাব-নিকাস করতে গিয়ে স্ক্যাশট্ চাইছেন যে ঐতিহাসিকরা জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের পুনর্বাসিত করুক, তিনি ঘোষণা করেছেন যে "যাদের পেশা টাকা নিয়ে কারবার করা, তারা দীর্ঘদিন খুব জনপ্রিয় থাকবে না।" অতএব তিনি মনে করেন যে, জার্মান ঐতিহাসিক বইগুলোয় উচ্চস্থানীয় প্রুশ-জার্মান সমরতন্ত্রীদের পাশে জার্মান ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ডেভিড হান্সমান প্রভৃতি জার্মান আক্রমণের পৃষ্ঠ-পোষকদের নাম থাকা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক গবেষণা ও স্মৃতিকথার ক্ষেত্রে জার্মান সমরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা কিছু কম জোরদার ছিল না। এরমধ্যে সব থেকে বিশদ ছিল ওয়াল্টার গোরলিটদের "*জার্মান জেনারেল স্টাফ*।" এই বইটি হচ্ছে ঐ সংস্থার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস ১৬৫৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায়

৩০০ বছর ধরে প্রুশিয়া, প্রুশিয়ার প্রভাবাধীন জার্মানী ও হিটলারের জার্মানী, যে সব আগ্রাসনাত্মক যুদ্ধ করেছিল তার প্রস্তুতি ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যেখানে সেখানে গোরলিট-সঠিক তথা সন্নিবিষ্ট করেছেন। অবশ্য তিনি স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধকে এই বলে বর্ণনা করেছেন যে এই যুদ্ধ "ভ্রান্তি ও সম্মান বোধের ওপর ভিত্তি করা হিটলারের সমর কৌশলের দেউলিয়াপনা সূচিত করেছিল।'

কিন্তু জেনারেল স্টাফকে অনাবৃত করা মোটে তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ তিনি তার সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে হিটলারের জার্মানীর পরাজয় মানে কয়েক শতাব্দী ধরে আগ্রাসনাত্মক জামান সমরতন্ত্রের গড়েতোলা সামরিক তত্ত্বের পরাজয় নয়, তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে হিটলারের অভ্যুত্থানের পর জেনারেল স্টাফ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং হিটলারও তার সমরকৌশলের বিরোধিতা করেছিল। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নুরেমবুর্গ যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের রায়কে হেয় প্রতিপন্ন করা। "নৈর্ব্যক্তিকবাদের" নীতিগুলির দোহাই দিয়ে, ইতিহাসকে বিচারকের ভূমিকায় বসানোর প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে তিনি জার্মান জেনারেল স্টাফ, দি কোরপস অফ জেনারেল এর সামরিক ব্যবস্থার ওকালতি করেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে প্রথমে পশ্চিম জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অধিক প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে এই বই নিয়ে বেশী হৈ-চৈ হয় নি। তাদের কাছে এই কৈফিয়ৎ খুব দুর্বল ও প্রচ্ছন্ন মনে হয়েছিল এবং তাদের জার্মান সমরতন্ত্রীদের আড়াল করার উচ্চস্তরের পদ্ধতির সংগে এবং তাদের "ইউরোপীয় সংহতি" এবং আন্তর্জাতীয় অ্যাটলাণ্টিক সহযোগিতার ধারণার সংগে তার কোন মিল ছিল না। স্ক্যাশটের ধরনের লেখা তাদের বেশী প্রিয় ছিল, হিটলারের জেনারেল স্টাফের প্রধান কর্নেল জেনারেল ফ্রানজ হাল্ডার ছিলেন যুদ্ধকালীন সমরকৌশলবিদ হিসাবে ব্যর্থ। তিনিও ঐতিহাসিক হয়ে উঠলেন। *হিটলার য়্যাজ সোলজার* বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে তাঁর ঐতিহাসিক ধারণার উদ্দেশ্য সামরিক কৌশলবিদ হিসাবে হিটলারের সুনামের খর্ব করা। কিন্তু আসলে হাল্ডারের উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন তা হচ্ছে তাঁর এবং হিটলারের সময়ের জার্মান জেনারেলদের সুনাম বৃদ্ধি করা।"

হাল্ডার দেখিয়েছেন যে নাৎসী পরাজয়ের কারণ হিটলার ছিলেন অভিযানের নায়ক ফেল্ডার এই পদ তাঁর মতে ঐতিহাসিকভাবে অচল, অর্থহীন আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। হাল্ডার লিখেছেন "অভিযানের অধিনায়ক অর্থাৎ পুরোনো অর্থে অধিনায়কের আধুনিক যুদ্ধে আর কোন স্থান নেই।" তিনি তাঁর পুরাতন *ফ্যুয়েরারের* ভাবমূর্তির ওপর নানাভাবে আঘাত করেছেন।

তিনি তাঁর কাপুরুষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অক্ষমতা, তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও আড়ম্বরের মোহকে ব্যর্থ করেছেন। কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য হচ্ছে যে, হিটলারের সমর কৌশলের ব্যর্থতার অর্থ এই নয় যে তা জার্মান জেনারেল স্টাফের সমরকৌশলের ব্যর্থতা। তাঁর মতে পরাজয়ের একমাত্র কারণ হিটলার তার হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা জড় করেনি নিজেকে "সর্বোচ্চ রাজনৈতিক বিবেচনা"র দাবী করেছিলেন এবং "সামরিক বিশেষজ্ঞ"দের যুক্তির যেগুলোর মধ্যে জার্মান কোর অফ জেনারেলদের অভিজ্ঞতাও নিহিত, বিরোধিতা করেছিলেন।

তবু হাল্ডারের নিজস্ব বিবরণী থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁর যুক্তির সংগে হিটলারে নিজস্ব "উচ্চ রাজনীতিকতার" বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তিনি মনে করেন যে, হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে ঠিক করেছিলেন কিন্তু তিনি তা প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হবার জন্য হিটলারকে দায়ী করেছেন। তার মতে হিটলার ১৯৪১ সালে মস্কো এবং ১৯৪২ সালে স্তালিনগ্রাদ দখল করার চেষ্টা করে ঠিক করেছিলেন কিন্তু "সমস্ত সংরক্ষণ একত্রিত করার জন্য সেনাবাহিনীর ব্যাকুল আবেদনগুলি" অগ্রাহ্য করার জন্য হিটলারকে দায়ী করেছেন। তিনি নাৎসী আক্রমণ প্রস্তুতিতে জার্মান সমরতন্ত্রীরা যে ভূমিকা অবলম্বন করেছিল সে বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি এবং এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে হিটলারের পতনের মূল কারণ হচ্ছে জেনারেলদের সমরকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন হাত ছিল না। সোভিয়েত সশস্ত্র সেনাবাহিনীর আঘাতই যে জার্মান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ তা তিনি কখনোই বলেন নি। দুনৌকায় পা রেখে চলা অসম্ভব দেখে হিটলার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আশা করেছেন যে তিনি জার্মান সমাজতন্ত্রীদের দিকে ঝুকবেন। এইভাবে সমরতন্ত্রকে পুনর্বাসিত করার জন্য তিনি হিটলারের সংগে তাঁর "হিসেব চুকিয়েছেন।"

তিনি একমাত্র তিনিই নন। আন্তর্অ্যাটলান্টিক শক্তির-সমর্থন আঁচ করে জার্মান সমরতন্ত্রী আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পশ্চিম জার্মানী প্রতিশোধকামী নীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকরা এমন কি একথাও বলেছেন যে জার্মান সমরতন্ত্র হচ্ছে শান্তিবাদী। এই বিষয়টি এইচ ল্যাটার্নজার তার *জার্মান সৈন্যের প্রতিরোধ* বইয়ে এক অসম্ভব্যতায় নিয়ে গেছেন। "আপনি কি জার্মান সমরতন্ত্রর, যা নাকি হিটলারের আগ্রাসনাত্মক পরিকল্পনার স্রষ্টা ও পরিচালক ছিল, তার কোনও ছিটেফোঁটা দেখতে পাচ্ছেন? সেই দিনগুলোর অফিসাররা শান্তি ও মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং যদি শত্রু আক্রমণ করে এইজন্য প্রতিরক্ষা সদৃঢ় করেছিলেন…যদি সমস্ত সামরিক নেতাদের মধ্যে কোন মতৈক্য থাকত তা আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করার ব্যাপারে পরিকল্পিত

হয় নি···কিন্তু তা রাষ্ট্রপ্রধানের এই জাতীয় পরিকল্পনা নাকচের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল।"

জার্মান সমরতন্ত্রের সম্মান পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক ও স্মৃতিকথার রচয়িতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্বার্থের জন্য যে সব সামরিক ধারণা প্রচার করে থাকে, সেগুলোর ধ্বজাধারী হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম জার্মানীর সামরিক সাহিত্য বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

৬

যদি বলা হয় সে সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস রচনা বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদী, সমরতন্ত্রী এবং তাদের রাজনৈতিক উপগ্রহদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য কিছু তথ্য বিকৃত করছে তাহলে সব বলা হবে না। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত করার জন্য এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক ধারণার অংশ হিসাবে জার্মান ইতিহাসের সমস্যাকে দেখা হচ্ছে।

জর্জ কেনান চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে যা *আমেরিকান ডিপ্লোম্যাসি* ১৯০০-১৯৫০ নামে বই আকারে বেরোয় তা ধরা যাক। লেখক স্টেট ডিপার্টমেণ্টের সংগে ঘনিষ্ঠ এবং মার্কিন পুঁজি মহলের সংগে সংশ্লিষ্ট এক রাজনৈতিক মানুষ বস্তুবাদ তাঁর অবিষ্ট নয়। তিনি সোজাসুজি বলেছেন যে, তাঁর ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে "ইতিহাসের জন্য ইতিহাস এরকম কোন ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়। এটা উদ্ভূত হয়েছে আমাদের সামনে বৈদেশিক নীতির যে সব সমস্যা আছে সেগুলো থেকে।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে কেনান জার্মান ইতিহাসকে দেখেছেন—মার্কিন পশ্চিম ইউরোপীয় নীতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ইতিহাস হিসাবে। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই ক্ষেত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের (ল্যাটিন অ্যামেরিকান ও দূর প্রাচ্য) মার্কিন প্রভাবের কাছে অধীনতা স্বীকার মার্কিন বিশ্বনেতৃত্বের পক্ষে প্রধান সোপান হয়ে উঠেছে। তিনি জার্মানির সমস্যাকে ইউরোপের সমস্যার অংশ হিসাবে দেখেছেন এবং বলেছেন যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এই সমস্যার সমাধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

তাঁর ধারণা সহজ এবং সরল। এর ভিত্তি পুরোনো "শক্তির ভারসাম্য" নীতি। এই ধারণা এককালে উপনিবেশগুলিতে বৃটেনের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সংঘাত জিইয়ে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল।

"১৯১৪ সালের আগে এই শতাব্দীতে যুদ্ধ না হবার কারণ ছিল এক শক্তির ভারসাম্য যা ধরে নিয়েছিল সে ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী রাশিয়া এবং ইংল্যাণ্ড ছিল প্রধান প্রধান শক্তি এই জটিল বুনোনের মধ্যে শুধু ইউরোপের শান্তি নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তাও লুকিয়েছিল।"

তিনি নেপোলিয়নের পর ইউরোপে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি দেখেন নি এবং যে সমস্ত যুদ্ধের আগুনে জার্মানী এক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল সেগুলির উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি এবং এইজন্য জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হবার আগে "শক্তির ভারসাম্য" তাকে গণ্য করা যেত না। তাছাড়া আমরা ফেনানের ধারণা গ্রহণ করলেও এটা স্পষ্ট জার্মানীর গঠন নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর যে শক্তির ভারসাম্য ছিল তার পরিবর্তন করেছিল। তাছাড়া কেনানের "শক্তির ভারসাম্য" ধারণা উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশগুলোর বিভক্ত ও পুনর্বিভক্তি নিয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধগুলোকে অস্বীকরি করেছিল।

এটা মনে করা যেতে পারে কিউবা অধীনস্থ করার জন্য এবং ফিলিপাইনকে দখল করার জন্য স্পেনের বিরুদ্ধে মার্কিনরা যে যুদ্ধ চালিয়েছিল তা সাম্রাজ্যবাদের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু কেনান সেই শান্তি ও "শক্তির ভারসাম্যর" দোহাই দিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখলের ওকালতি করেছিলেন।

ফিলিপাইন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে "আমরা তা দখল না করলে তার বদলে এর অধিকার নিয়ে বোধহয় ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে কামড়াকামড়ি হত।" পুরোন বৃটিশ তত্ত্বটি পুনরায় চালু করে কেনান এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বিংশ শতাব্দী ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থায়িত্বের স্বার্থরক্ষা করেছিল।

তাঁর ধারণা জানা থাকলে এটা দেখে কেউ বিস্মিত হবেন না যে কেনানের মতে ১৯১৪ সালে যে "বিশ্বসংকটে"র সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা অদ্যাবধি চলে আসছে তার উৎস হচ্ছে ইউরোপ। তিনি মনে করেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ "পুরোন তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর অসমাধানিত সমস্যাগুলি" এবং "ডানুবিয়ান অঞ্চলের প্রজাদের অস্থিরতা" যা অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে "ক্ষতিগ্রস্ত" করেছিল। মোদ্দা কথা, কেনান অধীনস্থ দেশগুলির, বিশেষতঃ শ্লাভদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যুদ্ধের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন ইতিহাস রচনা পদ্ধতিতে এটা তেমন কিছু নতুনত্ব নয়। তিনি যুদ্ধের আর কতকগুলি কারণ দেখিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে সবশেষে "জার্মাণী ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার" উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধোপরাধের ব্যাপারে যারা দায়ী তাদের এক লম্বা তালিকা তৈরী করেছেন এবং তা এতই ভিত্তিহীন যে তিনি নিজে একে এক "অস্পষ্ট ফ্রেস্কো" বলে বর্ণনা করেছেন। এই তালিকা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "প্রথমেই নিঃসন্দেহে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া এরপর

জার্মানরা এবং তাদের অংশ অপেক্ষাকৃত কম হলেও অনেকখানি এবং অন্যান্যদের কোন দায়িত্ব ছিল না।" এই বাস্তবিকই অস্পষ্ট ফ্রোস একটা বিষয় খুব স্পষ্ট, লেখক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ইউরোপের এমন কি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং এটা দেখাতে চেয়েছেন যে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলির জন্য রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের দিকে না তাকিয়ে শুধু স্থানীয় সংঘর্ষগুলির উপর মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তার মতে এই সংঘর্ষেই ইউরোপীয় মহাদেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল।

এটাও কোন নতুন ধরণের চিন্তা নয়। বার্ড, ফে ও অন্যান্য মার্কিন ঐতিহাসিকেরা একই কথা বলেছেন। তাঁরা শুধু কূটনৈতিক ইতিহাসের উপরভাগ নিয়ে ঘেঁটেছেন, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও শ্রেণী উদ্দেশ্য প্রশ্নগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোন ভূমিকা ছিল না, বরঞ্চ তার জড়িয়ে পড়ার ফলে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কেনান একথা অস্বীকার করেন না যে যুদ্ধের সময় জার্মানী এক "সমরতান্ত্রিক ও গণতন্ত্র-বিরোধী দেশ" ছিল কিন্তু তিনি মনে করেন পরবর্তী ঘটনাগুলির আলোকে তা দোষের বদলে এক সুবিধা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রুশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি কেনান অন্ধভাবে বিষোদ্গার করেছেন। তিনি একথা কখনোই মেনে নেননি যে যখন ভার্সাইলের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই সময় যে সমস্ত অঞ্চলে পশ্চিমী শক্তিগুলি, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "পশ্চিমী সভ্যতার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শান্তি" ফিরিয়ে আনতে পারত, সেই সমস্ত অঞ্চলের সীমা খুব দুঃখজনকভাবে সংকুচিত করা হয়েছিল। অপরদিকে তিনি নাৎসী লেখকদের অনুসরণ করে বলেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি।

তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন : "এই সমস্ত যুদ্ধ করা হয়েছে······ মহাদেশে শক্তির ভারসাম্যর ধ্বংস হওয়ার ফলে—পশ্চিম ইউরোপকে বিপজ্জনকভাবে, বোধহয় চূড়ান্তভাবে, সোভিয়েত শক্তির সামনে ঠেলে দেবার জন্য।

অতএব তিনি শুধুমাত্র আগ্রাসী নাৎসী সাম্রাজ্যবাদের ওকালতি করেন নি "কমিউনিজম হঠাও" স্লোগানের মোড়কে বিভিন্ন জাতিকে জয় করার জন্য হিটলারের যে অভিপ্রায় ছিল তা তিনি সমর্থন করেছেন। তাছাড়া তিনি মার্কিন পুঁজিবাদীদের অজ্ঞান করার চেষ্টা করেছেন, যারা জার্মান পুঁজিবাদীদের ও হিটলারকে সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণকে ডেকে এনেছিল। কেনান দাবী

করেছেন যে "পশ্চিমী দেশগুলিতে যুদ্ধের—এমন কি জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যেও কোন যুদ্ধের—ইচ্ছাছিল না, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এমন কোন প্রমাণ পাননি।"

মনে হয় তিনি সহজভাবে মিউনিখ নীতির সেই সমস্ত তথ্যগুলি অস্বীকার করেছেন। যাতে তৎকালীন পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তির অর্থ ও উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়েছে। তিনি মিউনিখ যুগের মার্কিন নীতি, বিশেষতঃ প্রভাবশালী মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের নেপথ্য ভূমিকার, কোন বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেছেন। এটা মনে হয় যে কেনান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার বিপ্লবের পর সমস্ত ঘটনাকে মুছে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করতে চান। ইউরোপে বর্তমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ "এক শক্তিশালী জার্মানী"র পুনরাবির্ভাব "যে রুশ শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করতে সমর্থ।" এটা স্পষ্ট যে তাঁর অভিপ্রেত মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে এক সামরিক রাষ্ট্র।

যদিও তিনি জার্মান সমরতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখাতে ব্যাকুল, কেনান এই হুঁশিয়ারী জানানো উচিত মনে করেন "যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর তখনই এক সশস্ত্র প্রতিষ্ঠান তৈরী করে নিজেকে সুদৃঢ় করা উচিত ছিল যাতে আমাদের কথাবার্তায় একটা চাপ থাকত এবং শক্তিবর্গের সভায় তা মন দিয়ে শোনা হত।" তিনি বলতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র পশ্চিম জার্মানীতে ছাড়া অন্য জায়গায় মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটির প্রয়োজন। অতীত ইতিহাস ঘেঁটে কেনান এমন এক তত্ত্বের সৃষ্টি করেছিলেন যা মার্কিন শাসকদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাকে দৃঢ় করবে। এই পরিকল্পনাগুলোয় সমরতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবা হয়েছিল।

কেনানের তত্ত্ব হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ইতিহাস রচনাপদ্ধতির রাজনৈতিক গোঁড়ামীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের অন্যতম। ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে এই কৌশল তত্ত্বগতভাবে অনুর্বর এবং জীর্ণ তত্ত্ব, পরিকল্পনা ও ধারণাগুলিকে জড় করে আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সংগে খাপ খাইয়েছে। তাছাড়া এ আবর্তনবাদের পুরানো তত্ত্বকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করছে। আবর্তনবাদের এক আধুনিক ও সরলীকৃত সংস্করণ এখন প্রগতিশীল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিরোধ করার চেষ্টা করছে। জার্মানীতে সময় চল্লিশ বছর পেছানোর জন্য এবং এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পনার সাফাই গাইবার জন্য কেনানের প্রচেষ্টা এই আবর্তনবাদের এক নমুনা। আবর্তনগুলিকে বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অঞ্চলে প্রক্ষিপ্ত করা হচ্ছে কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা অমোঘভাবে হয় বিশ্বশক্তি অর্জন করার জন্য মার্কিন প্রচেষ্টা বা জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে পুনর্বহাল করায় শেষ হচ্ছে এবং এইভাবে তা ঠাণ্ডা যুদ্ধের তত্ত্বকে পুষ্ট করছে।

অতএব ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বগুলি তৈরী করেছে পুঁজিবাদী ও শিল্পপতি এবং তাদের তাত্ত্বিকরা অর্থাৎ সেই সব রাজনীতিবিদ যারা ইতিহাস নিয়ে ছেলেখেলা করছে এবং সেই সব ঐতিহাসিক যারা রাজনীতি নিয়ে খেলা করছে। মার্কিন ঐতিহাসিক ডোনাল্ড মিচেল *কারেন্ট হিস্ট্রিতে* অ্যাটলান্টিক চুক্তির সামরিক দিনগুলির উপর একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজেকে জাহির করেছেন সংবাদপত্রের যুদ্ধবিশেষজ্ঞ হ্যান্সন বল্ডউইন *অ্যাটলান্টিক মান্থলিতে* নিজেকে একজন সামরিক ঐতিহাসিক বলে দাবী করেছেন। কেনান যিনি সম্প্রতি একজন রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ, মার্কিন কূটনীতির ইতিহাস ছাড়া জার্মান ইতিহাস নিয়েও মাথা মাথা ঘামিয়েছেন এবং তাকে বিংশ শতাব্দীর আবর্তনবাদী তত্ত্বের সংগে মিলিয়ে নিয়েছেন।

অধ্যাপক ফ্রেডরিখ এইচ. ক্র্যামারও দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সংযোগসূত্র করার জন্য আবর্তনবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি অবশ্য আরও এগিয়ে গেছেন। তিনি পুরান পৃথিবী থেকে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত টেনেছেন। "দি ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব ওয়েষ্টার্ণ ইউরোপ" নামক এক প্রবন্ধে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময় থেকে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৃদ্ধির সংগে গ্রীকো-রোমান সভ্যতা বৃদ্ধির এক তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে উভয় ক্ষেত্রেই "গৃহযুদ্ধ" এবং "বডি পলিটিকের" বিলম্বিত ক্ষয় হচ্ছে পতনের কারণ। কিন্তু আজকের কথা বলতে গিয়ে তিনি জার্মানির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কেবল টেনে এনেছেন। তিনি বলেছেন যে, জার্মান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অন্যতম। তিনি বলেছেন যে অপর দিকে ইউরোপীয় জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ছিল "ক্যান্সারের" মত।

তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে "পশ্চিম ইউরোপীয় জোটের ধারণার" সংগে তুলনা করে বলেছেন যে, এই ধারণার অবলুপ্ত হলে তার ফল গ্রীকো-রোমান সভ্যতার পতনের মত হতে পারে। ক্র্যামারের মতে "পশ্চিম ইউরোপের পতনের" আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবস্থার ভাঙ্গন, যখন গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া, জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স পৃথিবীর সম্মিলিত শাসক ছিল। তার মতে অভূতপূর্ব ইউরোপীয় শক্তি ও সম্মানের যুগ শেষ হয়ে এসেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, "এই শতাব্দীর গত তিন দশকে মৃত পুরান ও শক্তিশালী ইউরোপের কবরে একটা ফলক জুড়ে দেবার" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশক্তি দখল করা নিয়ে উৎসব করার সময় এসেছে। যদিও তার ধারণা কিছু ব্যক্তির অদূরদর্শীতার নমুনা যাদের কাছে বাস্তবের উৎস হচ্ছে অক্ষম ইচ্ছা।

আধুনিক ইতিহাসে জার্মানির সমস্যা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তীব্র এবং জটিল। এর সংগে অন্যান্য জাতির ভাগ্য জড়িত এবং জার্মানি ইতিহাসের

নতুন যুগে এ হচ্ছে আগ্রাসনাত্মক শক্তি ও প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে এক তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের বিষয়বস্তু। এই অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাস রচনা-পদ্ধতি, যার উদ্দেশ্য জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রকে ঢেকে রাখা, তা হচ্ছে জার্মান সহ সমস্ত শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে প্রক্ষিপ্ত ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক উপাদান।

সমস্ত দেশে এবং জার্মানিতেও প্রগতিশীল ঐতিহাসিকেরা সামরিক ও প্রতিশোধলিপ্সু ধারণার যথার্থ চরিত্র উন্মোচনা করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ঐতিহাসিকদের মূল্যবান অবদান আছে। এ বিষয়ে কিছু পশ্চিম জার্মান ঐতিহাসিকদের নামও উল্লেখযোগ্য যাঁরা জার্মান সমরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও হিটলারের মতবাদের পুনরুজ্জীবনের বিরোধী।

কিন্তু ঐতিহাসিক না হয়েও যে কেউ দেখতে পারেন যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তত্ত্ব ও জার্মান সমরতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা জনগণের শান্তিকামী ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী। সর্বোপরি ইউরোপ ও অন্যান্য জায়গায় জনগণের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ইতিহাসে সমরতন্ত্রের ভূমিকা বোঝা এক জরুরী কর্তব্য। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রের মূল খুঁজে বার করার জন্য তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দরকার। আমরা মনে করি এই কর্তব্য শুধু বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক নয়; এটা নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদিত হলে ইউরোপের পতন ঘটবে না। তা শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং ইউরোপের পুনর্গঠন ত্বরান্বিত করবে।

১৯৫৩

ইউরোপের মধ্যস্থলে বিশৃঙ্খলা

১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মে কয়েক সপ্তাহ ধরে সাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল জেনেভা লেকের ধারে জাতিপুঞ্জের প্রাসাদে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বাসস্থানগুলিতে। যেখানে এমন সব সমস্যা নিয়ে জটিল আলোচনা হচ্ছিল যেগুলির সমাধান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামের শেষে ঘটবে। মূল বিষয় ছিল জার্মানির সংগে এক শান্তি চুক্তি এবং পশ্চিম জার্মানির পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণ।

হিটলার বিরোধী জোটের প্রধান সদস্য দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই বৈঠকে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী এবং জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কেউ অস্বীকার করবে না যে এ সময়ে শান্তিচুক্তি ও পশ্চিম বার্লিন গঠন এক ঐতিহাসিক বিশৃঙ্খলা। আধুনিক ইতিহাসে এমন আর কোন নজির নেই যেখানে যুদ্ধের এতদিন পর গৃহীত শান্তিচুক্তিতে যুদ্ধোত্তর পরিবর্তন লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাংক-প্রুশ যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে থেমে যাবার কয়েকমাস পর শেষ হয়েছিল। জার্মান সেনাবাহিনী দুবছরের বেশী ফরাসী ভূখণ্ড দখল করে রেখেছিল। এমন কি ভার্সাইলের সন্ধি যা জার্মানির উপর পশ্চিমীশক্তিগুলি চাপিয়ে দিয়েছিল, গোলাগুলি থেমে যাবার ছ' মাস পর হয়েছিল এবং পশ্চিমী সেনাবাহিনী যে রাইন অঞ্চল দখল করে তাও তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অভূতপূর্ব এবং বিস্ফোরকও বটে। এত বছর পরে জার্মানির সংগে কোন শান্তিচুক্তি না থাকা এবং পশ্চিম বার্লিনে দখলকারী শক্তির রাজত্ব কায়েম থাকা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল নয়। উপরন্তু, তা স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত করেছে এবং জার্মানিতে, ইউরোপে, এমন কি সারা বিশ্বে উত্তেজনার সঞ্চার করেছে— এমন অবস্থা শুধু ঠাণ্ডা যুদ্ধের কারিগরদের পক্ষে রমণীয়।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে: যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদয় হয়েছে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

ব্যবস্থা রয়েছে ; যেখানে পশ্চিম বার্লিনের অধিকৃত শহর জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সামনের সারির শহর হিসাবে গেঁথে বসে আছে। দুই জার্মান রাষ্ট্রের পৃথক ব্যবস্থা প্রচলিত। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পোটসডামের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয়েছে এবং সেখানে সমরতন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক স্তম্ভগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। যেহেতু সে পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছে, যে প্রত্যেক দিন পৃথিবীর পক্ষে এক বিপদ হয়ে উঠছে।

এই বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটানোর জন্য প্রথমে দুই জার্মান রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে হবে। তা শান্তি চুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তির খসড়া উপস্থাপিত করেছে তার বিভিন্ন যুক্তি নিয়ে কোন না কোনভাবে তর্ক করা যাবে এবং পশ্চিম বার্লিনে দখলদারী শক্তির রাজত্ব কতদিনে শেষ হবে তা নিয়েও তর্ক চলতে পারে। তবে একটা বিষয় নিযে কোন তর্ক করা যায় না, তা হচ্ছে সোভিয়েত প্রচেষ্টার গুরুত্ব। এই প্রচেষ্টা জার্মান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য করা হয়েছে। এটা পশ্চিমী শক্তিরাও স্বীকার করতে বাধ্য। তা না হলে তারা জেনেভা সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিল কেন?

ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বের জনমত সোভিযেত প্রচেষ্টা এবং যে সব সমস্যার কথা তোলা হযেছিল, সেগুলির বিষয়ে গভীর উৎসাহ দেখিয়েছিল। পশ্চিম জার্মান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীল প্রেস পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনের পরিকল্পনার ক্ষতি করার জন্য এবং বিবাদের বিষয়গুলির বোঝাপড়ার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার জন্য প্রচণ্ড অপপ্রচার চালিযেছিল এবং এই শান্তি প্রচেষ্টাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা "ভয়", "চরমপত্র" প্রভৃতি বলে প্রচার করেছিল।

তবুও পূর্ব-পশ্চিম বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত মহাদেশের জনমানসে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে এর বিরোধীরা একেও স্বীকার করেছিল। এর মধ্যে রাজনৈতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধ ধারণার দুর্বলতাগুলি এমন প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, এর মূল প্রবক্তা জনফস্টার ডালেস তার জীবনের শেষভাগে বুঝেছিলেন যে এর কিছু প্রধান বৈশিষ্ঠ্যের সংশোধন প্রয়োজন।

আমরা অতিরিক্ত আশাবাদে ভুগছি এই বলে অভিযুক্ত হব যদি আমরা বলি যে জেনেভার সংশোধন শুরু হয়েছিল এবং তা ফলপ্রসূও হয়েছিল। তবুও এটা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর ভারসাম্যের পরিবর্তন অনুযায়ী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছে এর জেনেভা সম্মেলন হচ্ছে এর অন্যতম সংকেত।

কিন্তু সমরতান্ত্রিক ও প্রতিশোধলিপ্সু নীতি অনুসরণকারী পশ্চিম জার্মানীর বন্ধুরা শক্তি বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত। ডালেসের প্রস্থানের পর চ্যান্সেলর এ্যাডেনহবার খোলাখুলি দাবী করেছেন যে উত্তর অ্যাটলাণ্টিক জোটের ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তা হিসাবে তিনি তার উত্তরসূরী। তার মতে কোন পশ্চিমী শক্তি যদি "শক্তির অবস্থা" থেকে "যুক্তির অবস্থায়" চলে আসে তাহলে তা হচ্ছে "স্বাধীন জগতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।"

যখন কিছু বিবাদের মীমাংসার জন্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বোঝাপড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন এ্যাডেনহবার খোলাখুলিভাবে বৃটিশ নীতির উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং তা দ্বিতীয় উইলিয়াম ও হিটলার "বিশ্বাসঘাতক অ্যালবিয়নের" উপর যে আক্রমণ করেছিলেন তার সংগে তুলনীয়।

এ্যাডেনহবার ও ফন ব্রেণ্টানোর বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনেভা সম্মেলনে কাজ-কর্ম কিছু এগিয়েছিল এবং তার জন্য বনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ঠি করেছিল।

বৃটিশ প্রেস বলতে বাধ্য হয়েছিল যে এ্যাডেনহবারের নেতৃত্বের দাবী তার পশ্চিমী দুনিয়ার এমন কি নিজের দেশে প্রকৃত অবস্থা ঢেকে রাখার এক কারণ মাত্র। ১৯৫৯ সালের ২৪শে জুনের *দি স্কটস্‌ম্যানে* বলা হয়েছিল তার নিজের দেশে, এমন কি তার নিজের দলেও, এ্যাডেনহবারের একগুঁয়ে মনোভাবের পিছনে সার্বজনীন সমর্থন ছিল না। যদিও কিছু পশ্চিমী দেশের নেতারা তাকে সমর্থন করেন, তারা জেনেভা সম্মেলনে তাদের সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে ঝগড়ার বিষয়গুলির মীমাংসা হবেএই ধারণার প্রথম জয় হয়েছিল।

কিন্তু তথ্য প্রমাণ করছে যে, ঠাণ্ডা যোদ্ধারা চুপচাপ বসে থাকবে না। প্রথমে তারা সম্মেলনে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল এই ভেবে যে এর ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন বিঘ্নিত হবে। যখন তারা দেখল যে জেনেভা সম্মেলন হবেই, তখন তারা প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করতে লাগল।

যেদিন সম্মেলন শুরু হল এই মিথ্যার কারখানা খবর রটালো যে মন্ত্রীরা সম্মেলন শুরু হবার আগেই বাড়ি চলে যাবে। তার কারণ সম্মেলনের কার্য-প্রণালী নিয়ে মতবিরোধ (দুই জার্মান প্রতিনিধির বসার ব্যবস্থা নিয়ে)। কিন্তু এই কৃত্রিম বাধা অপসারিত হতে বেশী সময় লাগে নি। যারা এই সম্মেলনকে বাগড়া দিতে চেয়েছিল তাদের কাঁচকলা দেখিয়ে সম্মেলন শুরু হয়েছিল।

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে কিছুকিছু লোক ছিল যারা বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের ঠিক সময়ে সভায় পৌঁছুতে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল এবং তা খুব ভব্যতায়

সংগে করেছিল। কিন্তু তারা একটা ব্যাপার জানত না ; আগেভাগেই চতুঃশক্তি ঠিক করেছিল যে দুই জার্মান রাষ্ট্র একই ব্যবস্থার ভিত্তিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। অতএব জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি না আসা পর্যন্ত সম্মেলন শুরু হয় নি।

আলোচনার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে সম্মেলনের কক্ষে বা বাইরে বিভিন্ন পক্ষকে মূল বিষয় থেকে সরিয়ে আনার জন্য, চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য, অন্ধ জোট তৈরী করার জন্য এবং বোঝাপড়ার ধারণাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। জেনেভা হয়েছিল এক আকর্ষণীয় স্থান, এক মেক্কা যেখানে জার্মান শান্তি-চুক্তি দ্রুত সম্পাদিত করার জন্য এবং পশ্চিম বার্লিন সমাধানের জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত আসছিল।

সম্মেলন চলাকালীন, যাবা সম্মেলনকে সফল করতে চেয়েছিল এবং একে ব্যর্থ করতে চেয়েছিল, জেনেভা তাদের মধ্যে এক যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমী শক্তি এবং প্রেস এই ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে কথাবার্তা ভেঙ্গে যাবে এবং সোভিয়েত ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ফারাক কখনো দূর করা যাবে না। এর জন্য সোভিয়েত "অনমনীয়তাকে" তারা দায়ী করেছিল।

যখন আলোচনা শুরু হয়েছিল, পশ্চিমী শক্তি মীমাংসার জন্য সোভিয়েত প্রস্তাবকে বাধা দেবার জন্য তড়িঘড়ি এক "প্যাকেজ ডিল" উপস্থাপিত করেছিল, যা জার্মানিতে দুটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতাকে অস্বীকার করেছিল এবং জার্মান জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে চতুঃশক্তির হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করেছিল। এই প্রস্তাব এতই অবাস্তব ছিল যে এর প্রবক্তারা পশ্চিম বার্লিন ছাড়া এই প্রস্তাবের অন্যান্য অংশ বিলুপ্ত করেছিল। পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত দখলকারী রাজত্ব স্থায়ী করার প্রস্তাবে পর্যবসিত হয়েছিল : এইভাবে আলোচনার প্রধান বিষয় সমস্যাগুলির সমাধানের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

এছাড়া পশ্চিমী শক্তিগুলি বারবার ঘোষণা করত যে সে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের কোন না কোন প্রস্তাব পরিহার করে তাহলে তারা আলোচনা ভেস্তে দেবে। বিদেশের সংবাদপত্রে বলা হল যে, পশ্চিম জার্মানি আলোচনা ভেস্তে দিতে উদগ্রীব। এতে আরও বলা হয়েছিল আলোচনার প্রথম দিকে স্টেট সচিব একটা বিমানকে তৈরী রেখে দিতেন কারণ যদি সোভিয়েত প্রতিনিধি তার প্রস্তাব পরিহার না করে তাহলে তিনি ফিরে যাবেন

কূটনীতির ইতিহাসে এরকম চাপের দৃষ্টান্ত নতুন নয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলী বর্ষীয়ান চ্যান্সেলর গোর্চাকভের ওপর এইরকম চাপ দিয়েছিলেন। ডিজরেইলী ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর রেল-

গাড়ির যন্ত্রপাতি আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারপর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন যা কার্যকরী ছিল এখন তা অচল হয়ে উঠেছে।

কিছু পশ্চিমী মহল এরকম অসুবিধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সোভিয়েত প্রতিনিধি জার্মান শান্তি চুক্তির ব্যাপারে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য এবং সময়সীমার মধ্যে পশ্চিম বার্লিনে দখলদারী রাজত্ব শেষ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছিলেন। এই প্রতিনিধি দল জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত পশ্চিম বার্লিনকে এক স্বাধীন শহরে পরিণত করার কথা সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশে বলা হয়েছিল যে চতুঃশক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন) তত্ত্বাবধানে পশ্চিম বার্লিনের সংগে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকের সম্পর্ক থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সকলের বিশেষতঃ জার্মান জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রগতির জন্য মধ্য ইউরোপের এই বিপজ্জনক ঐতিহাসিক বিশৃংখলতা দূর করতে উদগ্রীব।

যদিও পশ্চিমী শক্তিগুলি জার্মানীর সংগে চুক্তি করার সোভিয়েত প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। অবশেষে তারা বোঝাপড়ার সুবিধেগুলি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, অবশ্য তারা আর এগোয় নি। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী শক্তিগুলি বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য পরিশ্রম করতে বদ্ধপরিকর।

সোভিয়েত সরকার প্রমাণ করেছিলেন যদি জার্মানিকে পুনর্মিলিত না করা হয়, তাহলে দুই বর্তমান জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি সব থেকে বাস্তব-সম্মত পন্থা। শান্তিচুক্তি রচনার মূল উদ্দেশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেশ মুছে ফেলা, ইউরোপের মধ্যস্থলে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সব থেকে অনুভূতিপ্রবণ এক অঞ্চলের উত্তেজনা প্রশমিত করা।

সোভিয়েত প্রতিনিধি নানাভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁরা জেনেভায় উপস্থিত সমস্ত দলের কাছে গ্রহণীয় এরকম একটা সমাধান খুঁজে বার করতে উদগ্রীব। জট খোলার জন্য বৈঠক চলাকালীন তাঁরা নতুন নতুন গঠনমূলক প্রস্তাব করেছিলেন। মূল নীতিগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত যে কোন প্রস্তাব, তা যে মহল থেকেই আসুক না কেন, বিবেচনা করে দেখতে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন।

পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত সোভিয়েত প্রস্তাবের কথা ভাবুন। পশ্চিমী শক্তি পশ্চিম বার্লিনে দখলদারী রাজত্ব ছাড়তে প্রস্তুত নয় দেখে এবং তাদের ইচ্ছার প্রায় অর্ধেক বজায় রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্থায়ী ব্যবস্থা প্রস্তাব করেছিল। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রধান এ. এ. গ্রোমিকো প্রস্তাব করেছিলেন চুক্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকবে: পশ্চিম বার্লিনের সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কমাতে হবে। পশ্চিম বার্লিন থেকে

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে যে বিষাক্ত প্রচার ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালানো হয় তা বন্ধ করা এবং পশ্চিম বার্লিনে পারমাণবিক ও রকেট জাতীয় অস্ত্র জড় করা বন্ধ করা।

পশ্চিমী মুখপাত্ররা পশ্চিম বার্লিনের সংগে যোগাযোগ রাখা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রর অনুমতি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে অস্থায়ী চুক্তির সময় পশ্চিম বার্লিনের সংগে বহির্জগতের যোগাযোগ অপরিবর্তিত থাকবে।

এই অস্থায়ী ব্যবস্থা চিরদিনের জন্য থাকবে না। সোভিয়েত প্রস্তাব অনুযায়ী এর কার্যকারিতা এক নির্দিষ্ট ও গৃহীত সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

পশ্চিম বার্লিন সংক্রান্ত অস্থায়ী চুক্তি এবং দুই জার্মানীর বোঝাপড়ার মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এই চুক্তি সম্পাদিত হবার সময় এক সর্ব-জার্মান কমিটি বা কোন মিশ্র পরিষদ জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এবং জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির ব্যবস্থাগুলি করতে পারে এবং শান্তিচুক্তি ও জার্মানীর ঐক্য সাধন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সমীক্ষা করতে পারে। যদি সর্ব-জার্মান কমিটির প্রচেষ্টা অথবা দুই জার্মানির মধ্যে উভয়ের পক্ষে গ্রহণীয় এমন কোন বোঝাপড়া, জার্মানির সংগে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করার সুযোগ এনে দিত, তাহলে পশ্চিম বার্লিনের সমস্যার সহজেই সমাধান হয়ে যায়। যদি অপর দিকে পুনর্মিলনের প্রস্তাব নাকচ করায় দুই জার্মানিই যদি কোন সমঝোতায় না আসে জেনেভায় উপস্থিত জাতিসমূহ পশ্চিম বার্লিনকে নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।

মোটামুটি এই ছিল সোভিয়েত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সোভিয়েত পক্ষের সদিচ্ছা জেনেভা সম্মেলনকে ভেঙে পড়তে দেয় নি।

এটা সত্য যে পশ্চিম আলোচনাকে পশ্চিম বার্লিনের বিষয়ে এক অস্থায়ী চুক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল এবং দুই জার্মানির বোঝাপড়ার প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তবুও পরের বিষয়টি একেবারে নিষ্ফল থাকে নি। পশ্চিমী শক্তিগুলি স্বীকার করেছিল যে শান্তিচুক্তির প্রস্তুতি ও সম্পাদনের জন্য চুক্তির থেকে মেয়াদ বাড়ানোর জন্য এবং ঐক্যের দিকে আরও এগিয়ে যাবার জন্য দুই জার্মানির মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য যে এই ধরনের আলোচনা দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া উচিত এবং এ আলোচনায় চতুঃশক্তির হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

জেনেভা আলোচনার বিরতির সময় পশ্চিম শক্তির উস্কানীতে পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি এই বৈঠককে অর্থহীন ও ব্যর্থ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ২০শে জুন *ওয়াশিংটন পোস্ট* ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, "এর ফলাফল সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" ঠাণ্ডা যুদ্ধের অনুরাগী এক

নৈরাশ্যবাদী ছবি এঁকেছিল এবং তাদের গুপ্ত আশা বেরিয়ে পড়েছিল।

যদি পূর্ব-পশ্চিম বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতার এই আবহাওয়ায় যদি কয়েকদিন বা সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্ত তীব্র সমস্যার সমাধান হয় তাহলে তা হত এক অলৌকিক ঘটনা। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যাগুলি এত জটিল হয়ে উঠেছিল, এবং এত তলানি জমে উঠেছিল যে সেগুলি ইউরোপীয় সম্পর্কের এক শক্ত গিঁট হয়ে উঠেছিল। যদি পশ্চিমী শক্তিরা জার্মানির সংগে শান্তিচুক্তি করার সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করত তাহলে এই জট, যার মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর সমস্যা অন্তর্ভুক্ত, ছাড়ানো যেত।

১৯১৯ সালে পশ্চিমী শক্তিরা জার্মানির ওপর ভার্সাইলের চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিল। জার্মান সমরতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের এই মহৌষধের জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি রেখা টানার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত জনগণের সংগে জার্মানিতে এক সামরিক উন্নতির বদলে এক শান্তিপূর্ণ প্রগতির জন্য প্রস্তাব করেছিল। সোভিয়েত প্রস্তাবের মধ্যে কোন একগুঁয়েমী ছিল না এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা জেনেভায় আলোচনা করতে এসেছে, এই ব্যাপারটা হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ বিশেষ আন্তর্জাতিক সমস্যার গুলির ব্যাপারে এক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রর প্রতিনিধিদের উপস্থিতি, তারা স্বচ্ছন্দে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। তা বাস্তব সম্মতও ছিল। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তার পররাষ্ট্র মন্ত্রী লোথার বোলজমু, জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যখন ফন ব্রেনটানো নেপথ্যে কলকাঠি নাড়তে ব্যস্ত ছিলেন এবং যদিও একজন প্রাক্তন নাৎসী গ্রোয়ে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাতে কিছু এসে যায় নি। এটা ছিল আধা বিয়োগান্তক এবং মিলনান্তক। এর দ্বারা পশ্চিম জার্মানীর প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ও প্রমাণ করেছিল যে, বনই একমাত্র জার্মানির প্রতিনিধি, এই ধরনের এই দাবী ভিত্তিহীন।

এই সম্মেলন জার্মানদের সামনে জার্মানির সমস্ত সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানের সুযোগ এনে দিয়েছিল। যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা না হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য দায়ী জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের নেতারা, যারা পুনঃঐক্যসাধন ও শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে গিয়েছিল।

ঐ আলোচনা অনেক বিষয় প্রাঞ্জল করে তুলেছিল, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিষ্কার করেছিল এবং কিছু কিছু বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এটা অত্যন্ত মূল্যবান এবং তা আরও গবেষণা ও মীমাংসার

পথ পরিস্কার করে। সব মত পার্থক্য এখনও রয়েছে বিশেষতঃ শান্তিচুক্তি ও দুই জার্মানির মধ্যে বোঝাপড়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যেগুলি না দেখা বোকামো। এই পার্থক্যগুলি জেনেভায় উপস্থিত দেশ গুলিকে উভয় দেশের পক্ষে গ্রহণীয় মীমাংসার পথ খুঁজে বার করতে আরও সক্রিয় করবে।

সম্মেলনের শেষের দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জার্মান সমস্যার সমাধানের পথে কিছু পশ্চিমী শক্তি সবসময় বাধা সৃষ্টি করে যাবে। জার্মানির বিভক্তি স্থায়ী করার "দীর্ঘকালীন দায়িত্ব" হিসাবে তারা সবসময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোন না কোন দোষে অভিযুক্ত করে যাবে। কিন্তু রাজ্য সচিব হার্টারের ভাষায় এই অভিযোগ করার অর্থ ভেতরের ব্যাপার বাইরে টেনে আনা। "দীর্ঘকালীন দায়িত্বর" ব্যাপারে বলা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি চুক্তি ও সমনীত্বর ওপর ভিত্তি করা এক সর্ব-জার্মান কমিটি এক ঐক্যবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক জার্মানি গড়ে তোলার পক্ষে সব থেকে সহায়ক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময়ে জার্মানির বিভাগের বিরোধী। এখন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে তার মত হচ্ছে যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সমস্যা জার্মানির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ উনবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও বিংশ শতাব্দীতে পয়েনকারের প্রচেষ্টার কথা ভাবুন—পরিণাম খারাপ হবে।

এটা মনে রাখতে হবে যে, অতীতে জার্মানির ঐক্য বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে নির্মূল করে নি, বরঞ্চ কাইজারের জার্মানি ও হিটলারের জার্মানি, যারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল, ঐক্যবদ্ধ ছিল। তারা কোন ভাবেই বিভক্ত ছিল না। তারা অন্যান্য ভূখণ্ড জয় ও বিভক্ত করতে গিয়ে পৃথিবীতে অকথ্য দুঃখকষ্ট নিয়ে এসেছিল।

অতএব জার্মান ভূখণ্ডে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিশ্বশান্তির বিপদ ডেকে আনছে না। যা বিপজ্জনক তা হচ্ছে জার্মান সমরতন্ত্র যা পশ্চিম জার্মানীতে মাথাচাড়া দিচ্ছে।

তার মানে এই নয় যে বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ দুটো জার্মানি চিরদিন বেঁচে থাকবে। জার্মান জাতির মৌলিক স্বার্থের খাতিরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক পুনর্মিলন বা এক সর্ব জার্মান কমিটি বা ঐ জাতীয় পরিষদের কথা ভেবে এসেছে। তার মতে এ হবে জার্মানদের দ্বারা জার্মান ঐক্য সাধনের সমস্যা সমাধানের পথে প্রথম বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

পশ্চিমী শক্তি এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করে নি তার কারণ জার্মানির সংগে শান্তিচুক্তির আন্তর্জাতিক সমস্যা ও জার্মান ঐক্যসাধনের সমস্যাকে আক্রমণাত্মক ন্যাটো

রাজনৈতিক-সামরিক **ন্যাটো** পরিকল্পনার উপাদান হিসেবে দেখেছে। ***স্টকহোলমস টিডনিনগেনে*** বলা হয়েছে জেনেভা সম্মেলনের কোন সময়ে পশ্চিমীরা অ্যাটলান্টিক চুক্তি ও ওয়ারশ চুক্তি থেকে মুক্ত এক ঐক্যবদ্ধ জার্মানির কথা বলে নি তার কারণ তা তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিত। এতে লিখছে "কারণ পশ্চিমী জার্মানি হচ্ছে উত্তর অ্যাটলান্টিক জোট এবং ষষ্ঠ জাতির মৈত্রীর প্রধান অবলম্বন।

শান্তিচুক্তি ব্যর্থ করার জন্য সবথেকে সক্রিয় ছিল জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের সেইসব রাজনীতিক যারা সম্মেলনকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় অসমর্থ হয়েছিল। তারা মনে করত যে, সম্মেলনের সাফল্যকে ব্যর্থ করা এখনো সম্ভব। পশ্চিম বার্লিন ও পশ্চিম জার্মানির অন্যান্য শহরে অনেকগুলি প্রতিশোধকামী সভা হয়েছিল। ঐ সভাগুলিতে অ্যাডেনহওবার, স্ট্রাউস ও বন সরকারের অন্যান্য মুখপাত্র জেনেভা সম্মেলনের বিরুদ্ধে ফোঁসফোঁস করে-ছিলেন যে তাদের জার্মান-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে সামরিভাবে গ্রাস করা ছাড়া জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্ভব নয়। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছিল।

পশ্চিম বার্লিনের উইলি ব্রাণ্ডট্ও সম্মেলন বানচাল করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দাবী করেছিলেন যে পশ্চিম বার্লিনের দখলদারী রাজত্ব কায়েম থাকুক, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও অন্যানা সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বৃদ্ধি করা হোক এবং পশ্চিম বার্লিন ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যবর্তী জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা হোক।—যদি কেউ পশ্চিম বার্লিন থেকে উদ্ভূত বিপদের কোন প্রমাণ চান হের ব্রাণ্ডট-এর কথাবার্তা তার জোড়াল প্রমাণ।

অ্যাডেনহওবার ও অন্যান্য ঠাণ্ডা যোদ্ধারা বিশ্বের জনমত যারা চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা চালানোর স্বপক্ষে ছিল তাদের কোন আমল দেয় নি। কিছু বৃহত্তর বুর্জোয়া সংবাদপত্র কিন্তু জনগণের আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে তাদের পুরানো যুক্তি ত্যাগ করে বিভিন্ন সরকারকে অ্যাডেনহওবার মত ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তাদের ইচ্ছা পূরণ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী জানিয়েছেন। ১৯৫৯ সালের ২৫শে জুন নিউ ইয়র্ক পোস্ট লিখেছিল: "অ্যাডেনহওবারে সুপরিচিত বিরোধিতা তার নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত করতে পারে কিন্তু তা পশ্চিমের স্বার্থের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে।" ঐ পত্রিকায়, "যে জাতি বিংশ শতাব্দীর দুঃস্বপ্নের কারণ, তার প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধার" বিরোধিতা, করা হয়েছিল ও উপসংহারে বলা হয়েছিল:

"তার উপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত তা হচ্ছে প্রত্যেক স্তরে ইউরো-পীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক রাস্তায় আমাদের এগোনোর প্রচেষ্টা।"

জেনেভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রত্যেকে আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি অনুধাবন করে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন তাই প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক আবহাওয়া ছাড়া শক্তির ভারসাম্য এবং পরিস্থিতি এমন যে বিবদমান বিষয়গুলি নিয়ে মীমাংসা কেবল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব।

জেনেভা সম্মেলন প্রমাণ করেছে যে, শান্তিচুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি ও তার উপর ভিত্তি করে সমাধানের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিরেখা টানা যাবে। এটা আরও প্রমাণ করেছে যে ইচ্ছা থাকলে তা করা সম্ভব। এই ইচ্ছার অভাবের অর্থ পশ্চিম জার্মানী প্রতিশোধকামী সমরতন্ত্রীদের সমর্থন করা এবং হঠাৎ বিস্ফোরণের বিপদকে জিইয়ে রাখা।

এই বিপদের আশংকা করে এবং তা এড়াবার জন্য ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ওয়ারশ চুক্তি গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বার্লিনের সীমান্ত ও জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র বরাবর ভূখণ্ডে কিছু প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এটা সে করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি জেনেভা বৈঠকের পর পশ্চিম বার্লিনের সমস্যা সমান করে একটা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হত বা পশ্চিমী শক্তিরা, সর্বোপরি জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র ইউরোপের কেন্দ্রস্থল থেকে ঐতিহাসিক বিশৃংখলা দূর করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করত, তাহলে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হত না। শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা, কনফেডারেশন বা দুই রাষ্ট্রের ভিন্নধর্মী সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে গ্রহণীয় অন্য কোন উপায়ে দুই জার্মান রাষ্ট্রের পুনর্মিলন ঘটাত। কিন্তু এই সম্ভাবনা পশ্চিমে জার্মানীর সমর-তন্ত্রীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

জেনেভা সম্মেলন শেষ হলে তারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে তৎপর হয়েছিল। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সংগে সমঝোতা করার কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে সহায়ক এরকম গঠনমূলক প্রস্তাব আনা কিন্তু তাদের কর্তব্য ছিল।

উপরন্তু তারা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। এমন কি সেগুলি তারা দেখারও প্রয়োজন করে নি। ইউরোপে তাদের ঠাণ্ডা যুদ্ধ নীতি সমগ্র বিশ্বে উত্তেজনার সৃষ্টি করবে এই আশায় তারা সমরতন্ত্রের নতুন জোয়ার তৈরী করেছিল। সেইজন্য ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা তাদের পরি-কল্পনা বানচাল করে দিয়েছিল। এর আগে তারা এক স্মরণীয় দিনের স্বপ্ন দেখেছিল যেদিন এক তীব্র আন্তর্জাতিক উত্তেজনা পশ্চিমে বার্লিন সীমান্ত

দিয়ে সৈন্য পাঠাতে তাদের সমর্থ করবে এবং এই মওকায় তারা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে সামরিক শক্তি দিয়ে জয় করে নেবে। অনেক দিন ধরে তারা এই বিপজ্জনক পরিকল্পনা করে আসছিল কিন্তু তা রাতারাতি চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে আর কিছুই তা কার্যকারী করতে পারবে না।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রথমে বিমূঢ়তা ও পরে ভয়। বৃহত্তম পশ্চিম জার্মান পত্রিকা ডাই ওয়েল্টের প্রধান সম্পাদক হানস্ জেহরার লিখেছিলেন "প্রশ্ন হচ্ছে কি ঘটতে চলেছে?" Deutsche Soldatenzeitung ও *নেশান ইউরোপা* নয়া ফ্যাসিবাদী উপাদান চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিল। তারা চেঁচিয়ে বলেছিল, "১৩ই আগস্টের আগে বার্লিন চলো এবং পশ্চিম বার্লিনকে ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত কর।"

এই সমস্ত উস্কানীতে কান দিলে ইউরোপ আবার যুদ্ধের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে। যখন দেখা গেল যে বন কোনভাবেই জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে পারবে না তখন তারা সিদ্ধান্ত নেবার অক্ষমতার অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু তারা সব থেকে বেশী আক্রমণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোকে। প্রচারবিদ ও ঐতিহাসিক এবং এম. ফ্রিউণ্ড সত্য সত্যই দাঁতে দাঁত ঘষেছিলেন। তিনি কয়েকদিন পর লিখেছিলেন, "এখন কিছু করার পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে।" ১৩ই আগস্ট রবিবার সূর্যাস্তের পূর্বে ইহা সম্ভব ছিল। উহার মত কখনও পশ্চিমীরা আবার এ সুযোগ নষ্ট করবে না।" ইহা একটি ভয় দেখানোর মত শুনিয়েছিল। আরও উগ্রপন্থীরা আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন।

যদি পশ্চিম, বার্লিনের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে, জার্মানি পশ্চিমের দিকে আর তাকাতে নাও পারে।"

উগ্রপন্থীরা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও তার পশ্চিমী শরিকদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালিয়েছিল পশ্চিম জার্মানির শাসকরা তা বন্ধ করার জন্য কোন চেষ্টা করেনি, দুটো কারণে তারা এদের স্বাগত জানিয়েছিল। প্রথমতঃ তা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সংগে তাদের নীতির ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখবে। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে তারা পশ্চিমী শক্তির উপর পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রর জন্য আরও চাপ দিতে পারবে। তাদের কূটনীতিবিদরা পশ্চিম জার্মানির জন্য পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রকে অগ্রাধিকার দিতে কালক্ষেপ করেন না এই হচ্ছে পশ্চিম জার্মানির নীতি ও তত্ত্বর কেন্দ্রবিন্দু।

বার্লিন হচ্ছে তৃতীয় রাইখ পতনের পর হিটলার বিরোধী জোট যে দখলদারী রাজত্ব কায়েম করছিল তার নিদর্শন। বার্লিনের খোলা সীমান্ত অপসারিত করে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তার সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় করেছিল। যদি প্রতিশোধ কামীরা ব্রাণ্ডেনবুর্গ

দিয়ে ঢুকে পড়ে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাজধানীতে; ধরা যাক, ক্যারিবিয়ার সংকটের চরম মুহূর্তে, যুদ্ধ পৃথিবীর যুদ্ধের খুব কাছে এসে পড়েছিল, এক সশস্ত্র অভিযান উস্কে দিত, তাহলে তার ফল কি হত তা কেউ বলতে পারে না। এই দৃঢ় ব্যবস্থা এই ধরনের বিপদের সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়েছে যদিও জার্মান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান তা ছাড়া এর সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। যখন ক্যারিবিয়ার সংকট শেষ হয়েছিল, পশ্চিমী সংবাদপত্রে বলা হয়েছিল ক্যারিবিয়ার ঘটনাগুলো জার্মান সমস্যার সমাধান না হওয়ার জন্য এক চরম বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করবে।

১৩ই আগস্ট বার্লিনে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার পর পশ্চিমের কিছু রাজনৈতিক মহল থেকে বলা হয়েছিল এইভাবে শান্তিচুক্তির বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া হল, এইভাবে ইউরোপীয় সম্পর্কের প্রাক-যুদ্ধ এই সমস্যার সমাধানে তাদের অনিচ্ছাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিল। ১৩ই আগস্টের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটা পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু তা, ইউরোপীয় সম্পর্কের বিশৃঙ্খলাকে কমানোর জন্য বা বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা বিভিন্ন দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বিপন্ন করার জন্য, কখনোও করা হয় নি। দুই জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিচুক্তির জন্য এবং তার ভিত্তিতে পশ্চিম বার্লিনের সমস্যার সমাধানের জন্য সোভিয়েত খসড়া জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সীমান্ত সুদৃঢ় করার কোন কৌশল ছিল না। বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম স্নায়ুকেন্দ্র ইউরোপের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্যই এই খসড়া করা হয়েছিল।

এমনকি দ্বিতীয় এই শেষ মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কুড়ি বছর পরেও এক জার্মান শান্তিচুক্তি আন্তর্জাতিক এই আণবিক যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ভারসাম্য স্থায়িত্ব নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত এই সন্ধি এর স্বাক্ষরদাতাদের কোন ক্ষতি করবে না। উপরন্তু তার স্বাক্ষরদাতা ছাড়া সকলের জন্য অসংখ্য সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করবে। বহুদিনের সীমান্তকে স্বাভাবিক করে এর দ্বারা পশ্চিম জার্মানির প্রতিশোধকামীদের অন্যান্য ভণ্ডামো চূর্ণ হবে এবং তার ফলে ইউরোপের কেন্দ্রস্থল থেকে সমগ্র বিশ্বে পারমাণবিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, এরকম একটা শক্ত ঘাঁটি দৃঢ় হবে এবং দুই জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সংঘর্ষকেও এড়ানো যাবে।

তাছাড়া শান্তিচুক্তি হলে দুই জার্মান রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে গ্রহণ করবে যা তাদের সাধারণ জাতীয় স্বার্থে একত্রিকরণের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠবে। তাহলে পশ্চিম বার্লিন, যা, সমগ্র যুদ্ধোত্তর ইতিহাসে ন্যাটোর এক সামরিক ঘাঁটি হিসাবে, এক "সামনের সারির শহর" হিসাবে ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে দূষিত করে এসেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক

ক্ষেত্র হয়ে উঠে এক সুন্দরতর-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এছাড়া শান্তিচুক্তির ফলে অন্যান্য সুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে বাধ্য। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র, যে তার প্রতিশোধকামী নীতির দ্বারা অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, পারস্পরিক স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের সংগে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সংগে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে সুবিধাজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে ঐতিহাসিক অনিয়মিতা দূর হলে এক অচলাবস্থার অবসান ঘটে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হবে, এর ফলে দুই জার্মান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার পরিস্থিতি তৈরী হবে। তখন দুই জার্মানি তাদের নিজ নিজ সামরিক জোট থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে পারবে এবং তাদের ভূখণ্ডে পারমাণবিক প্রভাব মুক্ত অঞ্চল তৈরী করার কাজ ত্বরান্বিত হবে।

এই হবে বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তখনই তা হয়ে উঠবে এক শান্তিপূর্ণ অঞ্চল। মানবজাতি কি এই সম্ভাবনা ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করতে পারে?

আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জার্মানির শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিল।

যখন অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসনাত্মক পশ্চিমী শক্তির দ্বারা পুষ্ট ঠাণ্ডাযুদ্ধের নীতি ব্যর্থ হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি কেনেডি বুঝেছিলেন যে সমভিত্তিতে আলাপ-আলোচনাই কেবলমাত্র পারমাণবিক যুদ্ধের বিকল্প, শান্তিপূর্ণভাবে জার্মান সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি মার্কিন সোভিয়েত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা মস্কো, জেনিভা ও ওয়াশিংটনে চলেছিল। এই বৈঠকে শান্তিপূর্ণ সমাধানের মূলদিক নিয়ে অর্থাৎ পশ্চিম বার্লিনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা, জার্মান সীমান্তের অবস্থা স্বাভাবিক করা এবং এইভাবে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হয়। দুই জার্মান রাষ্ট্রের পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির সম্ভাব্যতা, প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এক কথায় বরফ গলে গিয়েছিল এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ দ্বারা বিষাক্ত আবহাওয়া ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

কিন্তু কথার বিচার কাজে এবং কাজের বিচার ফলাফলে। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে এবং এই পরিবর্তন আলাপ-আলোচনার প্রতি অনুকূল।

প্রেস জার্মান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় গঠনমূলক প্রস্তাব এনেছে। প্রত্যেকটাই বিশেষ গভীর চিন্তার দাবী করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশেষতঃ পশ্চিম জার্মানীর অনেক প্রভাবশালী গোষ্ঠী চেষ্টা করছিল যাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ গলে গিয়ে উষ্ণ বাতাসে না পরিণত হয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য Die Aussenpolitik নামে এক পশ্চিম জার্মান পত্রিকা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে এটা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক কৌশল।

যাইহোক পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশী মহলগুলি সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনা বিঘ্নিত এমন কি বানচাল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। এই আলোচনা কিন্তু অবশেষে ইউরোপের কেন্দ্রেই শান্তি ডেকে আনত। বিশেষ বিষয়গুলি ঐক্যমত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ১৯৬১ সালের নভেম্বরের শেষে রাষ্ট্রপতি কেনেডি যাঁর দূরদর্শিতা ও বাস্তববুদ্ধির কথা অস্বীকার করা যায় না, (যা আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় বিশেষ প্রয়োজন), এক আন্তর্জাতিক পরিষদের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। এ আন্তর্জাতিক পরিষদের পশ্চিম বার্লিনে অবাধ যাতায়াতের বন্দোবস্ত করার কথা ছিল। পশ্চিম জার্মানি এক গ্রহণীয় সমাধানের পক্ষে উপযোগী এমন যে কোন মার্কিন কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু যখনই গঠনমূলক ও উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণীয় এমন কোন প্রস্তাব মার্কিন পক্ষ থেকে এসেছে পূর্ব জার্মানি তা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে। বার্লিন ঘোষণা করেছিল যে যদি এমন কোন আন্তর্জাতিক পরিষদ গঠিত হয় যে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, তাহলে তাকে গ্রহণ করতে পূর্ব জার্মানী সম্মত আছে, এই শর্ত যা যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বর পক্ষে অপরিহার্য খুব বাস্তবসম্মত ছিল। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার প্রতি এই সম্মতি সদিচ্ছার নিদর্শন।

কিন্তু যখন দেখা গেল যে মার্কিন পক্ষ এই পরিষদকে এমন ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক যা পূর্ব জার্মানীর সার্বভৌমত্বব পক্ষে ক্ষতিকর তখন এই বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

এই সময়ে পশ্চিমী শক্তিরা পূর্ব জার্মানীর সার্বভৌমত্বর আরও ক্ষতি করার জন্য এই প্রস্তাব করেছিল যে গণতান্ত্রিক বার্লিন সহ সমস্ত বার্লিন শহরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স এই চতুঃশক্তির যুগ্ম কর্তৃত্বাধীন থাকবে। ১৯৪৮ সালে কমেণ্ডেটুরা নামক এক দখলদারী শাসনব্যবস্থাকে বিলোপ করা হয়েছিল, তাছাড়া ১৯৬২ সালের ২২শে আগস্ট বার্লিনে সোভিয়েত গারিসন 'কমেণ্ডেটুরা' বাতিল করে দেওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিয়ে পূর্ব-জার্মানীর, বিশেষতঃ তার রাজধানীর সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার পশ্চিমী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

সোভিয়েত মার্কিন আলোচনা অব্যাহত ছিল কিন্তু যখনই কোন বিষয় নিয়ে আশার আলো দেখা দিয়েছিল, আলোচনার বিরোধী শক্তি মার্কিন পক্ষের উপর চাপ দিয়েছিল. অবশ্য আলোচনা চলার সময় মার্কিন কূটনৈতিক মহল ন্যাটো পরিষদকে এর ওয়াশিংটনে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী ও পশ্চিম জার্মানি প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক পরিষদকে আলোচনার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত রাখত। বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই ভূমিকা ছিল। এদিকে বন-প্যারি জোট এই জটিল সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনা বানচাল করার জন্য উদগ্রীব ছিল। ১৯৬২ সালের ১৫ই মে ফরাসী রাষ্ট্রপতি, জেনারেল দাগল জার্মান সমস্যাকে খোলাখুলিভাবে এক "চৌকো গণ্ডী" হিসাবে বর্ণনা করেন এবং পশ্চিম বার্লিনকে অধিকৃত অঞ্চল বলে পুনর্ঘোষিত করা হোক বলে দাবী করেন। বন আরও বেশী উগ্র ছিল। পশ্চিম জার্মানির মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা চাপ সৃষ্টি করার জন্য এবং যদি সম্ভব হয়, মার্কিন সোভিয়েত যোগাযোগ ব্যর্থ করার জন্য ঘন ঘন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছুটে গিয়েছিল; এর ফলে ক্ষতি এড়ানো যায় নি। ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত গ্রিউয়ের প্রচেষ্টা এতই বিবেচনাহীন হয়েছিল যে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। অপরদিকে মস্কোয় বনের রাষ্ট্রদূত ক্রোলকেও ডেকে পাঠানো হয়। ক্রোল তাঁর সরকারের কাছে যে সব বিবরণী পাঠাতেন তা বেশ বাস্তবসম্মত ছিল এবং তাঁর দেশের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের উন্নতির জন্য চেষ্ঠা করেছিলেন।

চ্যান্সেলর অ্যাডেনহবার যিনি নিজেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের মূল প্রবক্তা বলে মনে করতেন, আবহাওয়াকে গরম করে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালের গোড়ায় তিনি সোভিয়েত মার্কিন বিনিময়ের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে প্রচার শুরু করেন। এইভাবে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে জার্মান সমস্যা সমাধান সম্পর্কে তার ধারণার কোন শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার বদলে সমরতন্ত্র ও প্রতিশোধের সংগে জড়িত। এপ্রিলে তিনি জনসাধারণের সামনে জার্মান সমস্যা সমাধানে জন্য এক মার্কিন পরিকল্পনা ফাঁস হতে সহায়ক হয়েছিলেন। এইসব বুর্জোয়া প্রেস তাঁর সমালোচনা করে এবং তাঁর "স্বাধীনতা" প্রদর্শনের এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সুবিধাবাদ ও শান্তিপূর্ণভাবে জার্মানির সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার সুযোগ নেওয়া হয়।

১৯৬২ সালের ৮ই মে জার্মান আত্মসমর্পণের সপ্তদশ বার্ষিকীতে বার্লিন অ্যাডেনহবার ঘোষণা করেছিলেন যে সোভিয়েত ও মার্কিন, উভয় প্রস্তাবেই তাঁর আপত্তি আছে। তাঁর যুক্তিগুলি ছিল কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও কোন চুক্তি নয়। এ ছাড়াও ১৯৬২ সালের ৯ই অক্টোবর যে সব সরকার বনের একগুঁয়েমীতে তিতিবিরক্ত হয়ে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সংগে চুক্তি করতে চেয়েছিল তাদেরকে বন ভয় দেখিয়েছিল।

এই সব ভীতি সম্বন্ধে একটা কথা, প্রতিক্রিয়াশীল জার্মানরা বলে যে "অ্যাডেনহবার যুগের" অমোঘ সমাপ্তি সত্ত্বেও তারা "রাইনের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে," বর্তমান পরিস্থিতিতে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও প্রতিশোধের নীতি অনুসরণ করে চলা। কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয় এর এইজন্য কোন ভবিষ্যৎও নেই।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, '৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে সেণ্টার ওয়াল্টার উলব্রিশট দুই জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে খসড়া করেছিলেন তা ভাল করে দেখা উচিত. এই খসড়ায় নিম্নলিখিত উপায়ে এক সমাধানের কথা ভাবা হয়েছিল।

১। অপর জার্মান রাষ্ট্র ও তার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। যে কোন ধরনের বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ না করার সংকল্প।

২। অপর জার্মান রাষ্ট্রর সীমান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। এই সব সীমান্ত লংঘন করার যে কোন প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা, জার্মানির বহিসীমান্ত চূড়ান্তভাবে স্থির করা।

৩। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বিরত থাকা, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র রাখা, তৈরী করা বা যোগাড় করা থেকে বিরত থাকা এবং পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখার যে কোন প্রস্তাব খারিজ করা।

৪। দুই জার্মান রাষ্ট্রের অস্ত্রসজ্জা বন্ধ করা এবং সামরিক খাতে ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করার বন্দোবস্ত এইভাবে দুই রাষ্ট্রেরই নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে এক সমঝোতা।

এই খসড়ায় দুই জার্মান রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বদেশে ও বিদেশে বৈষম্য-মূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ামূলক সম্পর্ক পুনপ্রবর্তন করা এবং দুই দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করার জন্য জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের সরকারের মধ্যে এক বাণিজ্যচুক্তির কথা বলা হয়েছিল।

যদি দুই জার্মানির মধ্যে কোন শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও দৃঢ় হবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রর সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় পশ্চিম জার্মানির কাছ থেকে পাল্টা প্রস্তাব আশা করছেন এবং তা হলে তাঁরা পশ্চিম জার্মানির সরকারের সংগে আলোচনা করতে প্রস্তুত। কিন্তু বন সরকার পূর্ব জার্মানির প্রস্তাব অস্বীকার করতে পছন্দ করেন। তাঁরা তাঁদের বিপজ্জনক প্রতিশোধলিপ্সু পথে চলছেন এবং বুনডেশওয়েরের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উপর জোর দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে আক্রমণ ও প্রতিশোধের নীতি পর্যুদস্ত হওয়ায় পশ্চিম জার্মানিতে নতুন নতুন চিন্তা দেখা দিচ্ছে। কিছু কিছু শক্তি যদিও তারা যেমন প্রাধান্য লাভ করেনি, দুই জার্মান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা এবং ঐ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করা এক যুক্তিসংগত বাস্তবসম্মত নীতির সমর্থন করছে। অপর কিছু শক্তি যদিও তারা প্রতিশোধলিপ্সার সমর্থক, বিশ্বাস করে যে কিছু পার্থক্য দূর করা এবং এইভাবে স্বাধীন অবস্থার সৃষ্টি করা অভিপ্রেত।

যদিও এই দুই প্রবণতার কোনটাই তেমন শক্তিশালী নয়। কিন্তু এই দুই প্রবণতায় ইউরোপের কেন্দ্রের এই বিশৃংখলার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে, দুই জার্মান রাষ্ট্র এক বাস্তব এবং পশ্চিম জার্মানীর অনেক মানুষ মনে করেন যে যুদ্ধেরদ্বারা এই বাস্তবকে দূর করা যাবে না। পশ্চিম জার্মানির একজন ঐতিহাসিক ও প্রচারবিদ গোলো মান বলছেন "এক যুদ্ধ আমাদের পুড়িয়ে দেবে।"

তবুও বনের শাসকরা তাদের প্রতিশোধলিপ্সু নীতি আঁকড়ে ধরে আছে এর পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতে চাইছে, কিন্তু যদি যুদ্ধ একটা অবাস্তব ব্যাপার হয় তাহলে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্মান প্রতিশোধলিপ্সুদের কৌশলগুলিও অবাস্তব।

জার্মানীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমস্যা এক সমাধানের দিকে এগুচ্ছে। এটা প্রয়োজনীয় এবং অমোঘ। ইতিহাসকে পাল্টানো যায় না তবে এর গতিপথ কিছুটা আঁকাবাঁকা, যারা নিজেদের সর্বশক্তিমান বলে মনে করে, তারা যে বাধার সৃষ্টি করেছে তা যত উঁচু হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা আজকের সময়ের পছন্দ সম্বন্ধে সচেতন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান না পারমাণবিক বিপর্যয়। এই জন্য ইউরোপের কেন্দ্রস্থলের বিশৃংখলা দূর করতে হবে। আমরা দেখছি যে, তা দেওয়ালে লেখা আছে এবং ভবিষ্যতে উত্তরসূরীদের প্রতি তা আমাদের দায়িত্ব।

১৯৫৯-৬৩

আগ্রাসনাত্মক জোট

এই শতাব্দীতে দুটো বিশ্বব্যাপী কঠোর অভিজ্ঞতা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিক্ষামূলক। তা জনগণকে শান্তি রক্ষা করতে শিখিয়েছে। জনগণ যুদ্ধ চান না. প্রত্যেক দেশই পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ শান্তির জন্য আন্দোলন জাগিয়ে তুলছে।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের আগ্রাসী জোটেরা এই আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করতে বা অন্তত: দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা জনগণের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শান্তিকামী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবধারিত। কাউন্ট: হেলমুথ ফন মেল্টকে সনাতনী প্রুশ জার্মান সমরতন্ত্রী ফ্রেডরিখ ফন বার্ণহার্ডি বা চার্চিলের (চার্চিল বলেছিলেন যে দুই যুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন "মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে যুদ্ধ।) ধরণে যুদ্ধের সাফাই গাওয়া নয়। আজকে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে এই অপপ্রচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যে, বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়।

বলাই বাহুল্য এই রাজনৈতিক ধারণা বুদ্ধিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। এমন কি যে সব দেশ আক্রমণাত্মক অতলান্তিক জোটের মধ্যে জড়িত হয়ে অপপ্রচারের ক্রীড়াভূমি হয়ে উঠেছিল। সেই সব দেশের জনগণেরও মধ্যে এই ধারণা তেমন বিস্তার লাভ করে নি।

আধুনিক ইতিহাসের এক অপরিহার্য অংগ হিসাবে সামরিক জোটের অপপ্রচার বিভিন্ন ছদ্মবেশে চালানো হচ্ছে। এই অপপ্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে "শক্তির অবস্থানের" উপর বলা হচ্ছে যে, জার্মান সমরতন্ত্রর পুনরুজ্জীবন এবং বর্তমান সামরিক জোটের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে এক নতুন যুদ্ধ থেকে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বেরিয়ে আসার একমাত্র বাস্তবসম্মত পন্থা।

তথাপি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে প্রচুর প্রমাণ আছে যে প্রথমত: সামরিক জোট তৈরী করার প্রাথমিক প্রস্তুতি আসে সেই সমস্ত রাষ্ট্র থেকে যেগুলি, আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত। দ্বিতীয়ত: সাম্রাজ্যবাদী

সামরিক জোটেরা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় করার বদলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং এক চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে যা কোন না কোন ভাবে ছোট, বড় সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলে।

সামরিক জোটগুলির অন্তর্নিহিত ভয়ংকর বিপদ ইউরোপীয় ইতিহাসের এমন সময় প্রকটিত হয়ে উঠে যখন পুরোনো "স্বাধীন" প্রাক একচেটিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে উপনীত হয়। গোড়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদের মূল মন্ত্র ছিল প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে যাওয়া। মূল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের মধ্যে শুধু বাজার ও কাঁচামালের উৎস ছাড়াও বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও নতুন নতুন উপনিবেশের জন্য কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যাচ্ছিল। পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজনসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন হয়নি। উপরন্তু পুঁজিবাদীর অসম উন্নতির ফলে পৃথিবীর পুনর্বিভাজনের জন্য এক তীব্রতর সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো ধাঁচের সামরিক জোটগুলি যাদের উদ্ভব হয়েছিল ফরাসী-প্রুশ যুদ্ধের পর, এক সাধারণ গতিশীল স্বার্থ ছিল এবং তারা এক সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে রূপান্তরিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে অন্তত: তিনটে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জার্মানী—বিশ্বশক্তির নতুন চেতনায় গা ঝাড়া দিয়েছিল। এটা সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক বা বক্তাদের কোন ধারণা মাত্র ছিল না। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন রূপে এটা ছিল এই শক্তিত্রয়ের শাসকদের ভণ্ডামীর উপায়। এটা ক্রমশ: রাজনৈতিক পরিকল্পনা হয়ে উঠেছিল এবং উগ্র আগ্রাসনাত্মক মতবাদ হিসাবে সংশ্লিষ্ট শক্তির রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড র‍্যাণ্ডলফ্ চার্চিল লণ্ডনস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বলেছিলেন যে, বৃটেন ও জার্মানী সমগ্র পৃথিবীকে যুগ্মভাবে শাসন করতে সক্ষম। বারবার এক জার্মান, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের শাসকদের বিশ্বক্ষমতা লোভের জন্য, এক রাজনৈতিক জোট, এমন কি সামরিক জোট তৈরী করার পরিকল্পনা করে এসেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দের উপস্থিতি, বিশেষত: একদিকে জার্মানী ও অপরদিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত, এই সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছে। ধ্বংসাবশেষ হিসাবে পড়ে রয়েছে অ্যাংলো-স্যাক্সন ও টিউটনিক জাতির সাধারণ ভাগ্য" বা "পশ্চিমী সভ্যতার" সাধারণ স্বার্থ প্রভৃতি কিছু বিক্ত শব্দরাশি। পশ্চিমী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় জার্মান সমরতন্ত্রকে জোরদার করার প্রচেষ্টাকে ঢাকার জন্য অ্যাটলান্টিক জোটের তাত্ত্বিকেরা একই ভাষার ব্যবহার করছে।

গত দুই বিশ্বযুদ্ধে জনগণ রক্তদিয়ে যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা প্রমাণ করেছে জার্মান সমরতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী জোটের ব্যবস্থায়, বেশী

আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে যে সব আগ্রাসী জোট তৈরী করা হয়েছিল তার সংগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের জোট বেশ পার্থক্য ছিল। একইভাবে অ্যাটল্যাণ্টিক জোটের (পশ্চিম জার্মানী যার সদস্য) নীতি যে পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়েছে তার সংগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের পরিস্থিতির তফাৎ আছে।

এই সময় জোট বাধার জন্য প্রস্তাব করেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদ। এখন এই প্রস্তাব এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উগ্র আগ্রাসী মহল থেকে। জার্মান সমরতন্ত্রকে ন্যাটো ব্যবস্থায় যুক্ত করে তারা সাম্রাজ্যবাদী জোটের আগ্রাসনাত্মক ইচ্ছা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

১

এইভাবে ফরাসী ফ্রাংকো প্রুশ যুদ্ধর পর জার্মানরাই ছিল প্রথম ইউরোপীয় শক্তি যে সামরিক জোট তৈরী করতে শুরু করে।

প্রথম রাইখ চ্যান্সেলর ও জোটগুলির নীতির চালিকাশক্তি বিসমার্ক স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি সব সময় "যুক্ত হওয়ার দুঃস্বপ্ন" দ্বারা পীড়িত হতেন, কিন্তু এটা মোটেই তার স্বীকারোক্তি ছিল না। আসলে জোট বাধার জন্য উদগ্রীব হয়ে বিসমার্ক জার্মানদের জোট বাধার ভয় বা যুদ্ধের বিপদ প্রচার করছিলেন যাতে সমরতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তার পরিকল্পনার কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। তার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল জারের রাশিয়ার সংগে এবং তারপর হাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের সংগে এক রাজনৈতিক-সামরিক জোট তৈরী করা। পূর্ব ইউরোপীয় শক্তির প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্ত্রিক স্বার্থে তিন সম্রাটের মধ্যে এক সামরিক ও রাজনৈতিক আঁতাত গড়ে উঠেছিল। রাশিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে এবং তারপর তিন সম্রাটের আঁতাতের সুযোগ নিয়ে বিসমার্ক ফ্রান্সের আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা করে ছিলেন। তারপর ১৮৭৯ সালে সমরতন্ত্রীরা আর এক জোটের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য "জোট বাঁধার দুঃস্বপ্নের ওজর তুলেছিল," তা ছিল অস্ট্রিয়া-জার্মানী আঁতাত যা ১৮৮২ সালে ইতালীর যোগদানের পর এক ত্রিপাক্ষিক জোট হয়ে হয়ে উঠেছিল। অস্ট্রিয়া জার্মানী জোট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব জুড়ে অর্থাৎ জার্মানীর সামরিক পরাজয় ও ১৯১৮ সালের জার্মান জোটের পতন পর্যন্ত জার্মানীর নীতির কেন্দ্র বিন্দু ছিল। বাস্তবিকই সেই সময় জোটের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল।

অস্ট্রিয়া-জার্মানী জোটের চুক্তির কাগজপত্র ভালো করে দেখা দরকার কেননা এই চুক্তির পর থেকে ইউরোপে বিভিন্ন সামরিক জোটের প্রাদুর্ভাব হয়, এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল চুক্তিকারী শক্তিগুলি যদি তাদের কেউ রাশি-

যার দ্বারা সমর্থিত বা "অন্য কোন শক্তি"র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সামরিক অভিযান চালাবে। চুক্তিতে এই জোটকে "শান্তি ও পারস্পরিক প্রতিরক্ষার এক জোট" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিসমার্ককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও এই জোটের এক "সামরিক উদ্দেশ্য ছিল।" এছাড়া বিসমার্ক ও জোটের অন্যান্য সংগঠকরা ভাল ভাল ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা কখনোও "কোন উদ্দেশ্যে তাদের বিশুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক চুক্তির মধ্যে কোন আক্রমণাত্মক প্রবণতা ঢোকাবে না।" মধ্য ইউরোপের শক্তির এই চুক্তির নির্মাতারা এই চুক্তিকে "সমস্ত ভুল ব্যাখ্যা" এড়িয়ে যাবার জন্য, গোপন রাখতে মনস্থ করেছিল।

যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য এই চুক্তি করা হয়েছিল সেই রাশিয়াকে ভুলপথে চালনা করার জন্য জার্মান-সরকার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে জানিয়েছিলেন যে বিশ্ব এক সার্বজনীন শান্তিরক্ষা করার জন্য জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এক চুক্তি সম্পাদিত করেছে। তদুপরি রাশিয়াকে এই চুক্তিতে যোগদান করতে বলা হয়েছিল এই হিসাব করে যে, বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া-জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সংঘাতের জন্য দ্বিতীয় আলেকজান্দার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবেন।

১৮৮২ সালের ২০শে মে জার্মানী ইতালী ও হাঙ্গেরীর মধ্যে উপনিবেশে অনুসন্ধানে নতুন করে মদত জুগিয়েছিল।[1]

যুগ্ম জোটের (অস্ট্রিয়া-জার্মানি) মত ত্রিপাক্ষিক জোটকেও (অস্ট্রিয়া-জার্মানী-ইতালী) "বিশ্বজনীন শান্তি দৃঢ় করার প্রচেষ্টা" প্রভৃতি বাক্যের নামাবলী দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল। তিন সম্রাটের জোটের মত এই জোট প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব দ্বারা চালিত ছিল। এতে "রাজনীতিক নীতি সুদৃঢ় করা এবং সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা" করার কথা বলা হয়েছিল। আসলে অস্ট্রিয়া-জার্মানী জোট ও সমান্তরাল ত্রিপাক্ষিক জোট ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধী এক সামরিক জোটকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। অস্ট্রিয়া-

১। সন্ধির ২নং ধারায় বলা হয়েছিল: যদি কোন ছুতোয় ইতালী ফ্রান্স দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তার তরফ থেকে যদি কোন চ্যালেঞ্জ জানানো না হয়, তাহলে অপর দুই চুক্তিবদ্ধ দেশ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রান্ত পক্ষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে।" তবুও সেই অবস্থায় শুধু উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার জোট বাধা সম্ভব ছিল। যদি এইরকম কোন ঔপনিবেশিক সংঘাত ফ্রান্স ও ইতালীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তাহলে ২নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, জার্মানি ছাড়া অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। যদি কোন উস্কানী" ছাড়া জার্মানী ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে ইতালীর উপরও একই দায়িত্ব এসে বর্তাবে। অপরদিকে ১৮৭৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী যদি ফ্রান্সের সংগে জার্মানীর যুদ্ধ বাধে তাহলে অস্ট্রিয়া-জার্মানীর পক্ষে ফ্রান্সকে সমর্থন করা সম্ভব নয়।

জার্মানি জোট চুক্তি হবার পর জার্মানি, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাটদের জোট আবার খাড়া করা হয়েছিল। ১৮৮০ সালের মাঝামাঝি বল্কান অঞ্চলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর মধ্যে সংঘাত এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তিন সম্রাটের জোট ভেঙে গিয়েছিল। জার্মানী রাশিয়ার সংগে গোপনে এক পূর্ণ আশ্বাস-এর "চুক্তি" করেছিল এবং অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বৃটেনের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় আঁতাতকে উৎসাহ দিয়েছিল।

বিসমার্কের জার্মানির কূটনীতি যেমন রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি দেখতে উদগ্রীব ছিল, জারের রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে এবং ফ্রান্স জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে উদগ্রীব ছিল। প্রত্যেকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র নিজ নিজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন কূটনৈতিক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক-সামরিক জোট তৈরী করেছিল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সামরিক জোট গঠন কবা থেকে বিরোধ করার জন্য সমস্ত জার্মান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অত্যন্ত জটিল কূটনৈতিক চাল চেলে বিসমার্ক যা করতে সক্ষম হয়েছিল তা হচ্ছে জারেব রাশিয়া ও ফ্রান্সের সামরিক শক্তি হিসাবে অভ্যুত্থানকে দেরী করিয়ে দেওয়া। এই শক্তির প্রত্যেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে মনোযোগী ছিল এবং জার্মান ও বৃটিশ স্বার্থের সংগে তার সংঘর্ষ হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকে ভয় করেছিল যে, বৃটেন কোন না কোন ভাবে ত্রিপাক্ষিক জোটের সংগে হাত মেলাবে। এর ওপর, ত্রিপাক্ষিক জোটের দুই সদস্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং ইতালী যথাক্রমে রাশিয়া ও ফ্রান্সের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল এবং বুর্জোয়াদের একাংশ ঔপনিবেশিক স্বার্থে বিসমার্কের সংগে মাখামাখি করছিল এবং তাদের একাংশ প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখতে দেখতে রাশিয়ার সংগে মাখামাখি করছিল এবং জার্মানির বিরুদ্ধে তার সমর্থন চেয়েছিল। আন্তর্জাতিক ইতিহাসের এই আঁকাবাঁকা গতি পুরোন পুঁজিবাদের নতুন স্তরে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হবার ফল এবং ঔপনিবেশিক পৃথিবীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করার ফলও বটে। এই সময় তিন সম্রাটের জোট ও রুশ-জার্মান জোট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল এবং ত্রিপাক্ষিক চুক্তি যা জার্মান রাইখের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল, শক্তিসঞ্চয় করেছিল এবং এক বিরোধী সামরিক জোটের জন্য জমি তৈরী করেছিল: জারের রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে এক আঁতাত।

বেশ তাড়াতাড়ি ঐ জোট তৈরী হয়েছিল কিন্তু তা তক্ষুনি হয় নি এবং তা মধ্য ইউরোপীয় জোট অনুযায়ী হয় নি। এই ধারণা কার্যকরী হয় যখন রাশিয়া ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে চিঠি বিনিময় হয়। এক

সামরিক সম্মেলনের মাধ্যমে এক গোপন চুক্তি হয়েছিল এবং ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তা লিখিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে জার্মানীকে "একই সময় পূর্ব ও পশ্চিমে লড়াই করতে হবে।"

জার্মানি যে সব চুক্তি করেছিল সেইরকম ফরাসী-রুশ চুক্তির দলিল লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধু ফরাসী আইনসভা ও তার বিভিন্ন পরিষদ নয়, এমন কি ফরাসী ও রুশ সরকারের অধিকাংশ সদস্যরা এই সামরিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু (যা জারের রাশিয়া ও ফ্রান্সের সরকারের ও জেনারেল স্টাফদের পরিচালনা করেছিল) সম্বন্ধে কিছু জানত না।

এই দলিলগুলির রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ইউরোপে এক জার্মান জোটের প্রাদুর্ভাব হবার পর রুশ-ফরাসী জোটের আবির্ভাবের অর্থ ছিল এক ইউরোপীয় দ্বিতীয় সামরিক জোটের আবির্ভাব। সেই অবস্থা, অর্থাৎ যখন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়নি, সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে লেনিন সামরিক জোটগুলির উদাহরণ দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে গভীর পরিবর্তন হচ্ছে তা প্রমাণ করেছিলেন। যখন ইউরোপ দুটো সামরিক জোটে বিভক্ত ছিল সেই সময়ের সংগে ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের তুলনা করে তিনি ইতিহাসসম্মতভাবেই পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন। "যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ চলাকালীন সমস্ত কিছু রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল।" লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন: "১৮৯১ সালের অ-সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সিজাররিসম্ ও রাশিয়ার জারিসম্—এই ছিল ১৮৯১ সালের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি।" যাই হোক, আবার রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখে লেনিন লিখেছিলেন: "১৮৯১ সালে ফ্রান্স ও জার্মানির ঔপনিবেশিক নীতি ছিল অকিঞ্চিৎকর। ইতালী, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন উপনিবেশ ছিল না……পশ্চিমী ইউরোপে এক নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে……এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যা সাংবিধানিক ও জাতীয়। এর পাশাপাশি ছিল শক্তিশালী, অবিচল, প্রাক-বৈপ্লবিক জারবাদ যা প্রত্যেকের ওপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালিয়েছে এবং ১৮৪৯ ও ১৮৬৩ সালের বিপ্লবকে ধ্বংস করেছে।

লেনিন অবশ্যই জানতেন যে বিসমার্কের জার্মানি এক সামরিক রাষ্ট্র। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিকভাবে এক স্বাভাবিক গতির দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের স্বার্থে বাস্তবের মূল্যায়ন করেছেন। সেইজন্য তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ১৮৯১ সালে যে কোন যুদ্ধ, *যখন ফরাসী-রুশ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল* কেবল প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ হত। লেনিন বলেছিলেন যে, ফরাসী যুদ্ধলিপ্সু তার প্রবক্তা সেনাপতি বোলাঞ্জার ও রুশ প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ তৃতীয় আলেকজান্দার যদি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু

করত তাহলে তা জার্মানির পক্ষে "জাতীয় যুদ্ধের এক বিশেষ রূপ" হয়ে উঠত। লেনিন মনে করেছিলেন যে তিনটে জিনিস নির্দিষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষ করে জার্মানিতে এক চূড়ান্ত রূপ ধারণ করতে পারে নি এবং এইজন্য জার্মানি এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু করতে পারে নি: দ্বিতীয়তঃ জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ছত্রছায়ায় ছিল: তৃতীয়তঃ "সেই সময় বৈপ্লবিক রাশিয়া ছিল না। সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, যখন সাম্রাজ্যবাদপূর্ণ রূপ পায় এর এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হয়, সাধারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। লেনিন লিখেছিলেন "১৯০৫ সালে জারবাদকে পর্যুদস্ত করা হয় যখন জার্মানি পৃথিবীকে পদানত করার জন্য যুদ্ধ করছে" এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন "১৮৯১ ও ১৯১৪ সালের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে এক করা বা এমন কি তুলনা করা হচ্ছে চূড়ান্ত অনৈতিহাসিকতা।"

যখন প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হল, ত্রিপাক্ষিক জোট ও রুশ-ফরাসী জোট সমপরিমাণে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জোটে পরিণত হয়। বিশেষতঃ বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার রাজনৈতিক-সামরিক জোট, তার বিপরীত, জার্মান সমরতন্ত্রের ছত্রছায়ার সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক জোটের মত, সাম্রাজ্যবাদের উৎস ও অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

বলাই বাহুল্য যে, ইউরোপ আস্তে আস্তে এই দুই শত্রুভাবাপন্ন শিবিরে বিভক্ত হবার ফলে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি ও সমগ্র পৃথিবী এক গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ এটা অস্ত্র প্রতিযোগিতা উস্কে দিয়েছিল যা বিভিন্ন দেশের বাজেটকে ভারাক্রান্ত করেছিল। ১৯০৫ সালের শেষে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বলেছিলেন: শক্তি আন্তজার্তিক বিভেদের একমাত্র না হোক শ্রেষ্ঠ সমাধান এই ধারণাকে, ভারী অস্ত্রসজ্জার নীতি জীবিত রেখেছিল ও পুষ্ট করেছিল। "নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান অস্ত্র প্রতিযোগিতার দ্যোতনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করবে, একদিকে আঁতাত শক্তি (রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন, বেলজিয়াম, সারবিয়া ও মণ্টেনেগ্রো) ও অপর দিকে অস্ট্রিয়া-জার্মানির জোটের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা ১৯১৪ সালের গোড়ায় ছিল চল্লিশ লক্ষ এবং সেই বছরের শেষে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দু কোটি দশ লক্ষে।

এইভাবে ইউরোপীয় মহাদেশ এক বিশাল সামরিক শিবির, এক বিশ্বজনীন কসাইখানা হয়ে উঠেছিল।

২

১৯০৮ সালের নভেম্বরে যখন সমরবাদী জার্মানি যখন ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল এবং কমপিন ফরেস্টে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তখন কেউ ভাবতে পারে নি যে মাত্র দুই দশকের মধ্যে সমরতন্ত্র আবার জার্মানিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সে আবার ইউরোপে নতুন যুদ্ধ শুরু করবে এবং সর্বোপরি সেই একই কমপিন ফরেস্টে সে ফ্রান্সকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। বিশ্বযুদ্ধের চার বছর পর, অসংখ্য জীবনহানির পর, ইউরোপীয় জাতি ভেবেছিল যে এবার শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে।

১৯১৪-১৮ সালের পর পরিস্থিতি যেমন অনুকূল ছিল ইতিহাসে তার আর কোন নজীর নেই। পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া যে আগে জারের রাজতন্ত্র ও রুশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার এক স্তম্ভ ছিল, এক নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। এক নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল যে বিশ্বজনীন শান্তির জন্য সংগ্রাম করার জন্য তার পররাষ্ট্র নীতিকে তৈরী করেছিল। শান্তির এক আশা জার্মানী সহ অন্যান্য দেশের জনগণকে উৎসাহিত করেছিল। বিভিন্ন জাতি জানত যে, জার্মান সমরতন্ত্রীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় তখন তাদের পক্ষে নতুন যুদ্ধের বিপদের সংগে লড়াই করা অনেক সহজ। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সংগে জনগণের এই প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে প্রশ্নাতীতভাবে সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যেত। সাধারণ ঐতিহাসিক কর্তব্য হচ্ছে জার্মান সমরতন্ত্র পুনরুজ্জীবন বন্ধ করা, যুদ্ধের প্রস্তুতির পথে এক ধাপস্বরূপ সামরিক জোট পত্তন বন্ধ করা এবং এক শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক স্থায়ী ব্যবস্থা চালু করা। যদি এই কর্তব্য শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য জার্মানির প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দোষারোপ করা উচিত।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এমন কি ফ্রান্সের শাসকেরা জার্মান সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড রক্ষা করতে চেয়েছিল যাতে ভবিষ্যতে জার্মানিতে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং ইউরোপে শান্তির অক্লান্ত ও রক্ষা কবচ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। ভার্সাইস চুক্তি জার্মান সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ১,০০,০০০-এ সীমিত করেছিল কিন্তু জার্মান সমরতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির কোন ক্ষতি করা হয় নি। এটাও এমন কিছু বিস্ময়কর নয় যে ভার্সাইলের চুক্তির যা নুরেমবার্গ ট্রাইবুন্যাল স্থির করেছিল কয়েক মাস পর, জার্মানির শাসকগোষ্ঠী হাজার রকমের সুচতুর কৌশলে চুক্তির সামরিক শর্তগুলি লঙ্ঘন করেছিল।

ভার্সাইলের পরবর্তী ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে করা হয়েছিল। এর ওপর তা ঐ দেশের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রথমতঃ এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে মাক্স-হফমান এবং এরিক গ্রুডেনডর্ফের মত সমরতন্ত্রের উগ্রতর প্রবক্তারা সমরতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবতে পারে। তারা এক গোপনে বা বোধহয় প্রকাশ্যে জার্মানির সংগে অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তির এক সামরিক জোটের কথা ভেবেছে যাতে জার্মানী আবার আঘাত হানতে পারে। যদিও এরকম কোন সামরিক জোট গড়ে ওঠে নি। পশ্চিমী শক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন জার্মানিতে আগ্রাসনাত্মক সমরতন্ত্রের দ্রুত পুনরুজ্জীবনের ঘটিয়েছে।

ত্রিপাক্ষিক জোটের ভাঙ্গন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৫ বছরের মধ্যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর প্রস্তুতি হিসাবে এক নতুন সামরিক জোট তৈরী করার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের সামরিক জোটগুলির সংগঠিত হতে অনেক বছর লাগিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর প্রস্তুতি কিন্তু দ্রুততর গতিতে এগিয়েছিল। ফ্যাসীবাদও প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। পশ্চিম নীতি ইউরোপে সম্মিলিত নিরাপত্তার চিন্তা খারিজ করে এই প্রস্তুতিকে মদত দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন শ্রান্তিহীনভাবে যে নিরাপত্তা ব্যাখ্যার কথা বলেছিল তা কার্যকরী করা হলে হিটলারের জার্মানি, ফ্যাসিবাদী ইতালী ও সমরতন্ত্রী জাপান তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারত না। তারা তাদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত না এবং এক সামরিক জোটও গড়তে পারত না ও ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের জনগণ বিপন্ন হতেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর আগে এক আগ্রাসনাত্মক সামরিক জোট তৈরীর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ২০-২৫ অক্টোবর, ব্রখিৎচেসগাডেনে সিয়ানো-হিটলারের আলাপ-আলোচনায়। কিন্তু সামরিক গঠনের সদস্য দেশগুলির রাজনৈতিক পরবর্তীকালে সামরিক কার্যকলাপ কিন্তু অনেক আগেই হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে যখন জাপান (২৭শে মার্চ) ও তারপর হিটলারের জার্মানি (১৯শে অক্টোবর) জাতিসংঘ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিল, তখন থেকেই এই দুই শক্তি এক নতুন জোটের জন্য রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। হিটলারের পরিকল্পনা ছিল "অসন্তুষ্ট শক্তিবর্গের এক জোট তৈরী করা।" তবুও এর বাস্তবায়নকে থেমে থাকতে হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত না হিটলার ভার্সাইলের সামরিক নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার করে জার্মানি দ্রুত সামরিকীকরণের কাজ শুরু করেছিল। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে জার্মানি ঘোষণা করেছিল, যে সে তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০০,০০০-এ করাবে। সে এক বিমান

বাহিনী গড়ে তুলতেও ব্যস্ত ছিল। ১৯৩৪ সালের শেষে হিটলার এক গোপনে সাবমেরিন বাহিনী গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। বৃটিশ সামরিক অ্যাটাচিকে এ বিষয়ে অবহিত করে তিনি ১৯৩৫ সালে ভার্সাইলের চুক্তি আইনানুগ বলে ঘোষণা করলেন এবং বৃটেনের সংগে নৌবাহিনী বিন্যাস নিয়ে এক চুক্তি সম্পাদিত করেছিলেন।

মুখোশ পড়ে নাৎসী সরকার ঘোষণা করেছিল যে সে "জার্মানি"র জাতীয় সশস্ত্রকরণকে এক যুদ্ধকালীন আক্রমণাত্মক নীতিতে পরিণত করবে না এবং এই যুদ্ধযন্ত্রকে শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে, অতএব শান্তিরক্ষার্থে ব্যবহার করবে। এই ঘোষণার ঠিক এক বছর পরে জার্মানি তার সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে করেছিল ৫০০,০০০। জার্মান সেনাবাহিনী রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছিল এবং এ অঞ্চল পূর্ণসামরিকীকবণ করে ফরাসী সীমান্ত চিহ্নিত করেছিল। লোকার্নোতে বৃটেন ফ্রান্সকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যেগুলোর অস্তিত্ব কাগজ কলম ছাড়া আর কোথাও রইল না।

সেই সময় নাৎসী কূটনীতি ইতালী-জার্মানি সামরিক জোট করার সমস্যা মোকাবিলা করেছিল। এমনকি ফ্যাসিবাদী ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গালি-আজো সিয়ানো বলেছিলেন যে, ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে হিটলার "কমিউনিজমের বিরুদ্ধে" যে প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন তা আক্রমণ ও প্রভাবান্বিত অঞ্চল তৈরীর উদ্দেশ্যর উপর ভিত্তি করে অধিকার এবং প্রথমতঃ বৃটেনের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক দাবী ইতালী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। এর আগে অবশ্য ইতালী ভূমধ্যসাগরকে "ইতালীয় হ্রদ" হিসাবে বিবেচনা করার জন্য এবং পূর্ব আফ্রিকাকে "ইতালীয় সাম্রাজ্য" হিসাবে স্বীকার জন্য হিটলারকে অনুরোধ করেছিল, পরে হিটলার দাবী করেছিল যে, মুসোলিনী, যিনি অস্ট্রিয়ায় তার স্বার্থ ত্যাগ করেছিলেন। আরও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সামরিক সহযোগিতায় সম্মত হওয়া উচিত। মুসোলিনীর ভাষায় এটা শুধু "রাজ্যগুলির দৃঢ় করার প্রশ্ন নয়, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরের প্রতি সাধারণ নীতিও বটে।

এটা ছিল হিটলারের কমিউনিজম-বিরোধী নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও সারবস্তু। ইথিওপিয়া বিজয় প্রমাণ করেছিল কমিউনিজম বিরোধী পোশাক এমনকি আফ্রিকায়ও আক্রমণকারীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতএব ইউ-রোপে আক্রমণের এই ছুতোর পিছনে সাফল্যের আশা আরও প্রবল ছিল। এই সূত্র কিছুটা অতি সরলীকৃত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীলদের আস্কারা, এমনকি অনুপ্রেরণা দেখে এক আগ্রাসনাত্মক সামরিক জোটের আকারে এক ঝটিতি বাহিনী গড়ে উঠেছিল যা একসংগে বিভিন্ন দিকে অভিযান চালাতে সক্ষম। জার্মান সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির সংগে সংগে কমিউনিজম বিরোধিতার আড়ালে আক্রমণের প্রস্তুতি হিটলারের

জার্মানিতে এসে সংহত হয়েছিল। এই প্রাথমিক প্রস্তুতির সুযোগ কব্জা করে হিটলার তা কখনো হাতছাড়া করেন নি। তিনি শুধু যে আরও অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন তা নয়. তিনি তার ইতালীয় শরিকের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। যখন সেয়ানো ব্ররারখটেসগাডেনে এসেছিলেন এক নতুন সামরিক জোটের ভিত্তি হিসাবে এক খসড়া তাঁর স্বাক্ষরের অপেক্ষা করছিল। তাছাড়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিও তৈরী করা হয়েছিল যাতে কমিউনিজম বিরোধী বাগাড়ম্বরের আড়ালে ইতালী-জার্মানি চুক্তির আগ্রাসী উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

চুক্তিতে ইতালীর ইথিওপিয়া দখলের জার্মান স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্ত প্রশ্নে, বিশেষতঃ স্পেনে যুগ্ম অভিযানের ক্ষেত্রে, কি করণীয় তা স্থির করা হয়েছিল। দুই আগ্রাসী শক্তি লণ্ডন অনধিকার হস্তক্ষেপ কমিটিতে তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সমঝোতায় এসেছিল এবং এর দ্বার তারা ফ্রাংকো ও তার বিদ্রোহী ফ্যাসীবাদী সেনাবাহিনীকে সমর্থন করা স্থির করেছিল। এর দ্বারা জার্মানি ও ইতালীর বিমান বাহিনীর গঠন স্থির হয়েছিল। সবশেষে তারা বল্কান ও ড্যানিয়ুব রাষ্ট্রগুলি তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট করেছিল। যদি জাতিসংঘ তাদের সামরিক অভিযানের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কিভাবে তাকে পর্যুদস্ত করতে হবে তার জটিল কৌশল ঠিক করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ইতালী সংঘের মধ্যে থেকে "যুগ্ম উদ্দেশ্যের পক্ষে সুবিধাজনক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ" চালাবে।

এই ছিল এক নতুন আগ্রাসনাত্মক সামরিক জোটের ভিত যার নাম মুসোলিনী রেখেছিলেন "বার্লিন-রোম" অক্ষশক্তি। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে মিলানে বক্তৃতা দেবার দেবার সময় ইতালীর একনায়ক এই নবগঠিত অক্ষশক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রথমতঃ সমস্ত ভ্রান্তিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা উচিত··· এর মধ্যে একটা ভ্রান্তিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—নিরস্ত্রীকরণের ভ্রান্তি ···আর এক ভ্রান্তি যা আমরা খারিজ করি তা হচ্ছে যা সম্মিলিত নিরাপত্তা নামে পরিচিত ··· আর একটা পরিচিত তথ্যকে খারিজ করতে হবে। তা হচ্ছে অবিভাজ্য শান্তি।"

অক্ষশক্তির, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনসমক্ষে স্বীকার করেছিলেন যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত জোট নিরস্ত্রীকরণ, সম্মিলিত নিরাপত্তার মূল নীতি এবং সার্বজনীন শান্তির বিরোধী। মুসোলিনী যা বলেন নি তা হচ্ছে যে ঐ চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা "বলশেভিকবাদ বিরোধিতার" আড়ালে পশ্চিমী শক্তির, ফ্রান্স ও বৃটেনকে "আক্রমণ করার" দিকে এগোচ্ছেন। হিটলার বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে বৃটিশ সাম্রাজ্য "অযোগ্য ব্যক্তিদের" দ্বারা শাসিত ছিল। জনসমক্ষে অবশ্য ফ্যাসীবাদী জোটের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের "কমিউনিজম বিরোধিতা"র কথাই জোর দিয়ে

বলত এবং অক্ষশক্তিকে "সহযোগিতা ও শান্তির এক মাধ্যম" বলে প্রচার করত।

বার্লিন-রোম জোট এক বৃহত্তর সামরিক জোটের সোপান ছিল। বারখটসগাডেনে জার্মান পক্ষ সিয়ানোচক "চূড়ান্ত গোপনীয়তার" সংগে জানিয়েছিল যে জাপান ও জার্মানী দুটো গুরুত্বপূর্ণ খসড়ায় স্বাক্ষর করবে—এদের মধ্যে একটা, যা জনসমক্ষে প্রচার করা হবে, এক "বলশেভিক বিরোধী জোট" হিসাবে এবং অপরটিতে যা হবে এক গোপন অস্ত্র, এক বিবরণী থাকবে। এ বিবরণীতে বলা হবে যে যদি কোন পক্ষ আক্রমণাত্মক অভিযান চালায় তাহলে অপরপক্ষ তার পক্ষে সুবিধাজনক নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরবর্তীকালের প্রিমিয়ার হিরোতা ঘোষণা করেছিলেন যে "ইউরোপ সংযত রাখতে দূরপ্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য এক শক্ত ভিত্তি" স্থাপন করার জন্য এই সামরিক জোট অপরিহার্য। বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগ্রাসনাত্মক কার্যকলাপের এই সমন্বয় থেকে প্রত্যেক পক্ষ অনেক সুবিধা আশা করেছিল।

১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বরে "কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের" বিরুদ্ধে এক প্রতিরক্ষামূলক অভিযানের" এক চুক্তির মাধ্যমে জাপান-জার্মানি জোট প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসমক্ষে এক চুক্তি তুলে ধরে দেখানো হল যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিষয়ে সংবাদ আদান প্রদান ও ঘনিষ্ঠসহযোগিতার জন্য কাজ করবে। ঐ চুক্তিতে তৃতীয় দেশগুলিকে জাপান জার্মান চুক্তির আদর্শ অনুযায়ী কমিণ্টার্ণের বিরুদ্ধে "প্রতিষেধক ব্যবস্থা" গ্রহণ করার জন্য অথবা ঐ চুক্তিতে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানান হয়েছিল। আর এক আনুষঙ্গিক খসড়া সাধারণের জন্য প্রচার করা হয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল "যে দক্ষ কর্তৃপক্ষ বর্তমান আইনের কাঠামো অনুযায়ী, যারা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জন্য কাজ করছে বা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।" "কোমিণ্টার্ণের বিরুদ্ধে" কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা ঠিক করার জন্য এক স্থায়ী জাপানী-জার্মান কমিটি তৈরী করা হয়েছিল।

এটা ছিল আর এক সামরিক জোটের বাইরের খোলোস। এই জোট বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তবুও পশ্চিমী শক্তির হাতে "কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী" চুক্তি অর্জন করে নাৎসী কূটনীতিবিদরা এই ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে এই চুক্তির উদ্দেশ্য "কোমিণ্টার্ণ অপপ্রচারের" মোকাবিলা করা। বার্লিনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম ই. ডডের সংগে আলোচনা করার সময় তা বারবার বলেছিলেন যে, "তারা অপপ্রচার বিশেষভাবে অপছন্দ করে।" সেই সময় ডড বলেছিলেন : "অবশ্য তার নিজেদের ছাড়া আর সবাইকে অপছন্দ করে।"

বিশ্বের জনমত এমন কি সেই সময়ও সচেতন ছিল যে প্রকাশিত চুক্তি ছিল এক গোপন চুক্তিকে ঢেকে রাখা এক প্রচার কৌশল। এখন এই চুক্তির কথা সকলেই জানে। তাতে বলা হয়েছিল যে, প্রথমতঃ যদি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কোন পক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহলে অপর-পক্ষ প্রথম পক্ষের অনুকূল কোন ভূমিকা নেবে এবং দুই পক্ষই "তাদের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষা করতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়" তা নিয়ে আলোচনা করবে। দ্বিতীয়তঃ এই স্বাক্ষরকারীরা এই গোপন চুক্তির পরিপন্থী এমন কোন রাজনৈতিক সমঝোতা সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে করবে না।

কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী পরিকল্পনা স্বাক্ষরিত হবার পর আগে জাপানী পত্রিকা বাসজি সানজু নেপথ্যে যে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছিল তার যবনিকা উত্তোলন করেছিল। এ পত্রিকায় বলা হুয়েছিল: "এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এর দ্বারা জাপান ও জার্মানি ··· এক বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়ে এক সামরিক জোট বাঁধতে সমর্থ হয়েছে, যদিও এর মূল লক্ষ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধেও একে ব্যবহার করা যাবে।"

বিদেশী কাগজপত্রগুলো, এসব এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল মহল এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তারা মনে করে যে কমিণ্টার্নবিরোধী চুক্তি হচ্ছে কিছু বৃহত্তর আগ্রসনাত্মক পরিকল্পনার খোলস মাত্র। উদাহরণস্বরূপ নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন মনে করেছিল যে, এই চুক্তির নির্মাতারা বিশ্ব জনমতের বিশ্বাস করার প্রবণতাকে একটু বেশী বলে মনে করেছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস মনে করেছিল যে জাপান ও জার্মানী পৃথিবীকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইছিল যে তারা সমস্ত দেশকে কমিণ্টার্নের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু অন্যান্য দেশ তা বিশ্বাস করে নি। ইকমনিস্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে জাপান ও জার্মানী কমিউনিজম মোকাবিলা করার নাম করে "কঠোর ব্যবস্থা" গ্রহণের অধিকার এবং অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কায়েম করেছিল। এ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "কঠোর ব্যবস্থা" অর্থ সামরিক কার্যকলাপ দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্তমান আইনসমূহের কাঠামো অনুযায়ী এই অভিযোগ আনা যায় যে সে কমিণ্টার্নের জন্য কাজ করেছে······বার বার এই খবর দেওয়া হচ্ছে যে অচিরেই চেকোস্লোভাকিয়ার সংগে জার্মানি স্পেনের মত ব্যবহার করবে।" লণ্ডনের টাইমস এবারে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল যে জার্মান জাপান চুক্তি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এক সাধারণ ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

বৃটিশ ও মার্কিন প্রেস এটা জানত যে, কমিউনিজমের মোকাবিলা করার স্লোগান সামরিক জোটের আগ্রাসনাত্মক কার্যকলাপ ঢেকে রাখবার এক কৌশল-মাত্র।

সমসাময়িক মার্কিন ঐতিহাসিকেরা একথা স্বীকার না করে পারে না যে কমিণ্টার্ন বিরোধী জোট বিশ্বশান্তি বিঘ্নকারী এক গুরুতর বিপদ ছিল। তারা একথা স্বীকার করে যে জার্মান সমরতন্ত্রের দ্রুত পুনরুত্থান নাৎসীদের সংগে যুক্ত অন্যান্য দেশেও অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া এত স্বল্প সময়ে জার্মানির পক্ষে তার ভারী শিল্পকে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। মার্কিন ব্যাংক ও ট্রাস্টগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লক্ষ লক্ষ ডলার জার্মান অর্থনীতিতে ঢেলে দিয়েছিল। বিশিষ্ট মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা জার্মান ভারী শিল্পের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং এর উদ্দেশ্য খানিকটা সামরিক ও খানিকটা ব্যবসা ভিত্তিক। হিটলারের আগ্রাসনের পক্ষে মার্কিন অর্থনৈতিক সমর্থন খুব সাহায্য করেছে।

প্রাক যুদ্ধ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জার্মান সমরতন্ত্রের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৩৩ সালে জার্মান ৩০০ কোটি মার্ক অস্ত্রসজ্জার জন্য ব্যয় করেছিল এবং যুদ্ধের আগে ১৯৩৮-এ সামরিক খাতে তার ব্যয়বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৭০০ কোটি মার্ক। এক বিশিষ্ট জার্মান অর্থনীতিবিদ যুর্গেন কুজিনস্কি লিখেছিলেন: "ফ্যাসীবাদের অধীনে যুদ্ধর প্রস্তুতির জন্য খরচের সংগে যুদ্ধ বাধানোর জন্য প্রচেষ্টার খরচের বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না।

কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করে জাপানেরও সামরিক খাতে ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩৬ সালে তা হয়ে উঠেছিল ১০৫ কোটি ৯০ লক্ষ ইয়েন এবং চুক্তি সম্পাদনের পর তা হয়ে উঠেছিল ১৫০ কোটি ইয়েন এবং তা বাজেটের ৬০ শতাংশেরও অধিক ছিল। ইতালীর সামরিক খাতে ব্যয় ১৯৩৪-৩৫ সালে ছিল ১০৫০ কোটি লিরাস এবং ১৯৩৯-৪০ সালে তা গিয়ে দাড়িয়েছিল ২৭.৭০ কোটি লিরাসে। কিন্তু কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তি আরও গুরুতর পরিণাম ডেকে এনেছিল। এই চুক্তি সম্পন্ন হবার কয়েক মাসের মধ্যেই জাপান চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল এবং তার কয়েক মাস পরেই হিটলারের জার্মানি অস্ট্রিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে সামরিক কূটনৈতিক ও প্রচারমূলক অভিযান শুরু করেছিল। এটাই ছিল কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তির আড়ালে বার্লিন, রোম, টোকিও জোটের প্রথম ফলাফল।

এরপর ইতালী কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করেছিল। এই ব্যাপারেও জার্মানি অগ্রণী হয়েছিল ১৯৩৭ সালের ২০শে অক্টোবর হিটলারের জার্মানী ইতালীকে এই জোটে যোগদান করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছিল এবং ইতালীর সরকারকে স্বাক্ষর করার জন্য বার্লিনে গৃহীত এক খসড়া দেওয়া হয়েছিল। তারপর রিবেনট্রপ রোমে এসেছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে বার্লিন রোম অক্ষশক্তির ইতালীয় শরিক এই খসড়ায় স্বাক্ষর করুক। মুসোলিনী ও সিয়ানো জাপান জার্মান চুক্তির গোপন শর্ত-

পুলি জানতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের বলা হয় যে, সেরকম কোন গোপন চুক্তি হয় নি। আমরা এখন জানি যে এটা একটা মিথ্যা ছিল। সিয়ানো তাঁর জার্মান মিত্রদের বিনাশ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

বাড়তি সুবিধা আদায়ের জন্য এবং কিছু রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য ইতালীর ফ্যাসীবাদী শাসকেরা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে অনেক চাপ প্রয়োগ ও বিভিন্ন ধরনের হুমকির পর জার্মানি ইতালীকে তার সামরিক জোটে টেনে আনে। তা কার্যকরী করার জন্য ১৯৩৭ সালের ৬ই নভেম্বর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এইভাবে জাপান, ইতালী ও জার্মানীর ত্রিপাক্ষিক সামরিক জোট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই নতুন সামরিক জোটের উদ্যোক্তারা বারবার বলেছিল যে এর উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সিয়ানো জাঁক করে বলেছিলেন যে এর ত্রিপাক্ষিক জোট "পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী" এবং কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তি হচ্ছে "এই জোটের বাহ্যিক সম্প্রসারণ ও আভ্যন্তরীণ শক্তিবৃদ্ধির দিকে এক ধাপ এগুনো।" বাস্তবিক বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষশক্তি সম্প্রসারণ ও বিশ্বব্যাপী ধ্বংসকাণ্ডের লালনভূমি হয়ে উঠেছিল।

জার্মান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অস্ট্রিয়া আক্রমণ পৃথিবীকে যুদ্ধের অনেক কাছে নিয়ে এসেছিল। পশ্চিমী শক্তিরা এই আগ্রাসনাত্মক কার্যে বাধা দেয় নি; তারা জার্মান সমরতন্ত্রকে এই কাজ করতে উস্কে দিয়েছিল। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করা হয়েছিল এবং এই দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বটে, হিটলারের সংগে এক বন্দোবস্ত করেছিল। পশ্চিমী নীতি ফ্যাসিবাদী জোটকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। ১৯৩৮ সালের ২২শে মে জার্মানি ও ইতালী আর এক নতুন রাজনৈতিক-সামরিক চুক্তি করেছিল। এই চুক্তিতে ঠিক করা হয়েছিল যে, যদি কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় তাহলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি "তাদের স্থল, জল ও বিমান শক্তি" নিয়ে একে অপরের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে।

কয়েক বছরের মধ্যে জার্মান সমরতন্ত্র পশ্চিমীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্য নিয়ে, তার বৃদ্ধির পথের সমস্ত বাধা অপসারিত করেছিল এবং এক ত্রিপাক্ষিক আগ্রাসনাত্মক জোট তৈরী করেছিল এবং এক নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই জোট এক সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল যা দিয়ে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল। প্রথমে যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় সে যেসব পশ্চিমী শক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। পশ্চিমী শক্তির এই শোচনীয় দুর্দশার থেকে বড় রাজনৈতিক পরাজয় ইতিহাসে আজ দেখা যায় না। জার্মান সমরতন্ত্রের কোমর ভেঙে দেবার কুড়ি বছর পরে, তারা জার্মান

সমরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে পূর্বদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে লেলিয়ে দেবার জন্য তারা যে নীতি অনুসরণ করেছিল, তার জন্য তাদের যথেষ্ট মাশুল দিতে হয়েছিল, এর ফলাফল সুবিদিত সমগ্র বিশ্বে আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং ইউরোপ রক্তে ডুবে গিয়েছিল।

৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সামরিক-রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছিল তার মত দ্রুত, অন্তর্নিহিত ও বিপজ্জনক চুক্তি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আর কখনও হয় নি। যখন নাৎসী সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য আক্রমণকারীরা যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার উপশম হয় নি, যখন যুদ্ধের ঐতিহাসিক ফলাফল কোন শান্তিচুক্তিতে লেখা হয় নি, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন হিটলার বিরোধী জোটকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক নতুন সামরিক রাজনৈতিক জোট তৈরী করতে শুরু করেছিল। এই জোট ছিল **ন্যাটো** ও তা গড়া হয়েছিল স্বাধীনতাপ্রেমী জাতিগুলির প্রধান সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

যেভাবে **ন্যাটো** সংগঠন গড়া হয়েছিল ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। এই ফ্যাসিবাদী সামরিক রাজনৈতিক জোট তৈরী করতে ত্রিপাক্ষিক জোটের পঁচিশ বছর লেগেছিল। **ন্যাটোর** পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন তিন বছরের মধ্যে করা হয়েছিল এবং এর সদস্যদের সরাসরি বৈঠক প্রায় এক বছর স্থায়ী হয়েছিল। **ন্যাটো** ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ কৌশলের তাত্ত্বিক ও মূল শক্তি জন ফস্টার ডালেস বলেছিলেন: "জার্মানিতে সময় বয়ে যাচ্ছে। যদি জার্মানিকে পশ্চিমের কাঠামোয় পশ্চিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আনা না হয় তাহলে জার্মানীর সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়।" **ন্যাটো** প্রসঙ্গে ফিল্ড মার্শাল বার্নার্ড মন্টোগোমারী বলেছিলেন যে "গতিরও প্রয়োজন কারণ রুশ কমিউনিজম পশ্চিমে বিস্তৃত হতে শুরু করেছে।"

তবে এর অর্থ এই নয় যে, **ন্যাটোর** সংগঠকরা যা চেয়েছিল তা করতে পেরেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুদ্ধের পর যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল, তাদের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ সামরিক-রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার জন্য এবং কমিউনিজম, জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন খর্ব করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলরা অনেকভাবে চেষ্টা করেছে এবং বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের পরিবর্তন ও প্রচেষ্টাগুলি, সমস্যার প্রমাণ যা তাদের বিচলিত করেছিল।

পশ্চিমী ইউরোপকে অর্থনৈতিক ও মানবিক সম্পদের এক বৃহৎ উৎস ও সমরকৌশলের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে ধরে নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

ন্যাটো জোট তৈরী করেছিল। তার আশা ছিল এর মাধ্যমে এমন ক্ষমতা সে অর্জন করবে যা অন্য কোন শক্তির পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। এই ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ আণবিক বোমা যার ভেল্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে দেখিয়েছিল। হিরোসিমা ও নাগাসাকির অর্থহীন, পাশব বিস্ফোরণ শুধু যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ও ফ্যাসীবাদী জোটের শেষ সদস্যর পতন সূচিত করেছিল তা নয়; এর দ্বারা বিশ্বশক্তির এক নতুন দাবীদারের জন্ম সূচিত হয়েছিল। সেনাপতি ম্যাক্সওয়েল ডি. টেলর পরে লিখেছিলেন: "আণবিক বোমা বিমান শক্তিকে এক ধ্বংসের মারাত্মক ক্ষমতা-সম্পন্ন এক নতুন অস্ত্র উপহার দিয়েছিল এবং এই বিশ্বাস আরও জোরদার করেছিল যে, আমাদের বিমানবাহিনীর হাতে এমন এক মহাস্ত্র আছে যা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীতে এক আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।" এই ধারণা কিন্তু এক অল্পস্থায়ী ভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের অক্টোবরে পৃথিবী জানতে পেরেছিল যে পশ্চিমী পুঁজিবাদী শক্তির ধারণা চূর্ণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন চিরদিনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর পারমাণবিক একাধিপত্য নষ্ট করে দিয়েছে। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মার্কিন পারমাণবিক একাধিপত্যর অর্থ হচ্ছে বিশ্বশক্তির জন্য মার্কিন লোভের সমাপ্তি।

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের এই পারমাণবিক যুগে শান্তিপূর্ণ প্রগতি সম্ভব হতে পারত। কিন্তু, এটা দুঃখের বিষয় যে সাম্রাজ্যবাদীরা, যারা তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং যারা তাদের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভ্রান্তিগুলিকে সযত্নে লালন পালন করে-ছিল, কোন দূরদর্শী সিদ্ধান্তে আসেনি যদিও তাদের মধ্যে যারা বেশী দূরদর্শী, তারা বুঝেছিল যে "পৃথিবীর শক্তির সম্পর্কর ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন এনেছে।"

এর উপর তারা দৃঢ়তা ও সংহতির সংগে, অথচ "সতর্কতার সংগে" আরও এগিয়ে যাবার জন্য স্থির করেছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধর দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া এবং পারমাণবিক ও অন্যান্য অস্ত্রসজ্জার এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করা, এটা ছিল রাজনৈতিক উন্মাদনা যাকে পুষ্ট করেছে এই আশা যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও "কমিউনিজমকে হটিয়ে দেবার নীতি সফল হবে।"

হানস জে মর্গ্যানথু লিখেছিলেন: "মার্কিন পুনরস্ত্রীকরণকে, অবিসং-বাদিতভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এর পরে আসা উচিত "পশ্চিম ইউ-রোপ ও পশ্চিম জার্মানির অস্ত্রসজ্জা" পারমাণবিক অস্ত্র, যা এখনও এক-চেটিয়া ভাবে মার্কিন ন্যাটোর কাঠামোর মধ্যে থাকবে, কথা ছিল এবং মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র সহ ন্যাটোর অন্যান্য সদস্যদের গতানুগতিক অস্ত্রসজ্জার বোঝা বহন করার কথা ছিল।

জার্মান সমরতন্ত্রর পুনরুজ্জীবনকরণ এবং তা ন্যাটো ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকরী করার জন্য যে ঘটনা প্রবাহ বইতে শুরু হয়েছিল তার ছন্দপতন ঘটে যখন জার্মানিকে ভাগ করা হয়। জার্মানির বিভক্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিগুলি এবং পশ্চিম জার্মানির প্রভাবশালী মহলগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনার এক নাটকীয় পরিণতি. সেই অর্থে মার্কিন পারমাণবিক একচেটিয়া আধিপত্য ছাড়া, একদিকে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র ও অপরদিকে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ঘটনা হয়ে উঠেছিল বা ১৯৪৯ থেকে অদ্যাবধি ইউরোপের পরবর্তী ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। সেই সময়ের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ন্যাটোর (নভেম্বর ১৯৪৯) গঠন এবং তা "ঢাল ও তলোয়ার" নীতির এক পরীক্ষামূলক বিকল্প হিসাবে করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, যখন ন্যাটোর সদস্যরা এই বিকল্পকে এক সাধারণ মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পশ্চিম ইউরোপের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী "ঢালের" কাজ করবে এবং পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত মার্কিন বোমারু বিমান বাহিনী "তলোয়ারের" কাজ করবে এর অর্থ পশ্চিমী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর সামরিক নির্ভরতার পথ গ্রহণ করেছিল এবং অস্ত্রপ্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল।

স্বভাবতঃ এর ফলে ন্যাটোর প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে, সদস্য রাষ্ট্রের সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর বিভেদ সৃষ্টি হতে বাধ্য ছিল। বন এই বিভেদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পুনরুজ্জীবিত জার্মান সমরতন্ত্রের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পুনরুজ্জীবিত জার্মান সমরতন্ত্র "ঢাল ও তলোয়ার" নীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে ন্যাটোর সদস্যরা এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রবণ ছিল। ১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে যখন ন্যাটো চুক্তির অনুমোদন নিয়ে তর্ক চলছিল ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট শুম্যান এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, জার্মানিকে এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না এবং জার্মানির কোন অস্ত্র নেই এবং কোন অস্ত্র সে পাবে না। যখন তৎকালীন রক্ষণশীল দলের নেতা উইনস্টন চার্চিল হাউস অব কমোনসে, ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে বলেছিলেন যে, পশ্চিম জার্মানিকে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের অস্ত্রসজ্জার সংগে যোগ করা উচিত, শ্রমিক দলের সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে "ভয়াবহ" বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ফ্রান্স এবং জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জার বিরোধী। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর মার্কিন হাই কমিশনার

জে. ম্যাকক্লয় বলেছিলেন: "জার্মানরা যদি নিজের দেশকে রক্ষা করতে চায়, তাহলে তাদের কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত। যদি এর মানে হয় পুনরস্ত্রসজ্জা, তাহলে তা "পুনরস্ত্রসজ্জা।"

এটা সত্য যে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার পশ্চিম জার্মানির পুনঃসামরিকীকরণে বাধা দিয়েছিল কিন্তু তাদের আপত্তি ছিল দুর্বল ও অসংলগ্ন। নেপথ্যে প্রভাবশালী মার্কিন মহলরা আড়ালে ব্যস্ত ছিল তারা বনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করেছিল। ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসের শেষে চ্যান্সেলর অ্যাডেনহবার ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি এক পশ্চিম ইউরোপীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তার জন্য এক সশস্ত্র বাহিনী সরবরাহ করতে পারবে। মার্কিন সরকার ও সেনাপতিরা পশ্চিম জার্মানীর পুনঃসামরিকীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন এবং এত চাপ দিয়েছিল যে বৃটেন ও ফ্রান্স নতি স্বীকার করেছিল। এর আরও কারণ এই কূটনৈতিক যুদ্ধ তাদের ভূমিকা প্রথম থেকে দৃঢ় বা নির্দিষ্ট ছিল না। ১৯৫১ সালে ওয়াশিংটন ও বনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এই দুই দেশ ইউরোপীয় সেনাবাহিনীতে পশ্চিম জার্মানীর এক সেনাবাহিনীর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল যারা জার্মান সমরতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিল তাদের পক্ষে এটা ছিল এক জয় কারণ এক বছর পর লিসবনে ন্যাটোর এক বৈঠকে এক ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা জোটের এক খসড়া করা হয়। তারা আরও কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা পশ্চিম ইউরোপে ন্যাটোর সামরিক ব্যবস্থাকে জোরদার করেছিল।

তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উন্নতির যে হার চাপিয়ে দিয়েছিল তা আর্থিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ ও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক মেজাজের বাইরে ছিল। এর ফলে এই হার হ্রাস পেয়েছিল; এই অবস্থায় বন সমরতন্ত্রীদের ইচ্ছা ও উৎসাহ ন্যাটোর নেতাদের ও পেন্টাগণের সমর্থন আদায় করেছিল। ১৯৫২ সালের ২৬শে মে, ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা জোট তৈরী হবার অল্প কিছুদিন আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র যুক্তভাবে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল: চুক্তিতে পশ্চিম জার্মানির দখলকারী রাজত্ব বাতিল করা হয়েছিল যদিও পশ্চিমী শক্তির ভূখণ্ডে নিজ নিজ সৈন্যদল মোতায়েন করে রাখার ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছিল। এটা সত্যি যে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা জোট (মার্কিন উস্কানীতে ধারণার উৎপত্তি হয় ফ্রান্সে) নিয়ে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত দেশের মধ্যে প্রবল বাদানুবাদ হয়। বৃটিশ সরকার এই যুক্তিতে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃত হয়েছিল যে বৃটেন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিম ইউরোপে যে তার মধ্যস্থতার ভূমিকা বহাল রাখতে ইচ্ছুক। ফরাসী সরকার যদিও এই ধারণার উদ্যোক্তা ছিল, তবুও তাকে জাতীয় পরিষদে শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বাহ্যিক ও আভ্যন্ত-

রীপ বিভেদের ফলে পশ্চিম জার্মানীর পুনর্সামরিকীকরণের বিলম্ব ঘটালেও এর ফলে বনের কার্য সিদ্ধির সুবিধা হয়েছিল।

১৯৫৩ সালের শেষে ও ১৯৫৪ সালের গোড়ায় কোরিয়ায় ও কিছু পরে ভিয়েতনামে যুদ্ধবিরতি হলে পৃথিবীতে খানিকটা স্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের আগস্টে, যখন সমগ্র পৃথিবী জানতে পারল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" ও 'ফিরিয়ে দেওয়া' সংক্রান্ত যে সমস্ত আগ্রসনাত্মক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও ন্যাটো করেছিল তা 'ঢাল ও তলোয়ার নীতির মত তত টলায়মান। ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ করার রাস্তা ও পদ্ধতি অনুসন্ধানের, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা উপশমের এবং এর আন্তর্জাতিক যৌথ নিরাপত্তা অনুযায়ী আক্রমনাত্মক ন্যাটোকে এক প্রতিরক্ষামূলক জোটে পরিণত করার শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের শেষে পাঁচ মাসে সোভিয়েত সরকার পাঁচবার নানা উপলক্ষে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা উপশমের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ও বিশেষতঃ জার্মানীর প্রশ্ন, যার সংগে ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, নিয়ে আলোচনা করার পররাষ্ট্রমন্ত্রীবর্গের এক বৈঠকের জন্য আহ্বান জানায়। ১৯৫৪ সালেব গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথ নিরাপত্তার জন্য এক চুক্তির খসড়া তৈরী করে কিন্তু এই প্রস্তাবও পশ্চিমী শক্তিবর্গ খারিজ করে দেয়।

ন্যাটো কর্তৃপক্ষ পশ্চিম জার্মানীর নবজীবনপ্রাপ্ত যুদ্ধবাজ শক্তিকে তাদের ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার ওজর হিসাবে যখন সব ঘন ঘন এই আশ্বাসবাণী দিতে লাগল যে এর দ্বারা জার্মানির কোন নতুন আক্রমণকে নিবারণ হবে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তা লক্ষ্য করে ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ ঘোষণা করেছিল যে সে ঐ জোটে তার অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কিন্তু প্রস্তাব নাকচ করেছিল যদিও তা ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে খুব সহায়ক হত। আসলে সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো "শক্তির অবস্থা" থেকে "বৃহদায়তন প্রতিশোধের" এক নতুন তত্ত্বে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ এ্যাটাল বিকিনি যে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল তার উপর তারা বেশী গুরুত্ব দিয়েছিল এবং "কমিউনিজমকে প্রতিহত করার" ধারণা নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এক পোলিশ প্রচারবিদ জুলিয়ানলিডার তাঁর ন্যাটোর ইতিহাসের উপর গবেষণায় বলেছিলেন যে, দুটো কারণে তা হয়েছিল পশ্চিমী সামরিক পরিকল্পনায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার কথা ভাবা উচিত এবং পশ্চিম জার্মানিকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

"বৃহদায়তন প্রতিশোধ" তত্ত্ব অনুযায়ী ন্যাটো মার্কিন সেনাবাহিনীকে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত করার কাজ আরম্ভ করেছিল। পরিস্থিতি

জটিল হয়ে উঠেছিল তার কারণ জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের সীমান্তের খুব নিকটে ন্যাটো সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অংশ মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ,পারমাণবিক একাধিপত্য বজায় রেখেছিল এবং এতে জোটের অন্যান্য সদস্য বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যদিও জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের জনগণ জানতেন যে, পারমাণবিক যুদ্ধ হলে জার্মানি ধ্বংস হয়ে যাবে। বন মার্কিন নীতির ফাঁদে পা দিয়েছিল। জার্মান আঘাত-কারী শক্তির প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা থেকে বোঝা যায় বন সমরতন্ত্রীদের দর করবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। বৃটিশ সামরিক মহল লক্ষ্য করেছিল যে পশ্চিম জার্মানির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের প্রতিশোধ-কামী ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে সমরতন্ত্রীরা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক দাবী উত্থাপনের উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

৪

সেই সময় খুব তাড়াতাড়ি এসেছিল। ১৯৫৪ সালের ২১শে অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রর পূর্ণসামরিকীকরণ (৫০০,০০০ সৈন্যর এক বাহিনী ১২টি মোটরচালিত ডিভিশন সহ) ও বনের ন্যাটোয় প্রবেশের রাস্তা পরিষ্কার করে প্যারিসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৫ সালের ৮ই মে অর্থাৎ হিটলারের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দশম বার্ষিকীতে পশ্চিমী জোট সম্পূর্ণ করে জার্মান সমরতন্ত্রীদের এই সামরিক শিবিরে প্রবেশ করানো হয়েছিল। যেদিন জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র ন্যাটোয় প্রবেশ করেছিল সেইদিন জার্মানির বিভাজন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সেই দিন থেকে জার্মান সমরতন্ত্র চারটে উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যকলাপ চালাচ্ছে।

প্রথমতঃ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ করা (১৯৬৫ সালের শেষে পশ্চিম জার্মানির ৬৭,০০০ সশস্ত্র সৈন্য ছিল এবং ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪০০,০০০ সৈন্য, ১২টি মোটরচালিত ডিভিশনকে সক্রিয় করা হয়েছিল এবং বিশ লক্ষ সৈন্য মজুত করার জমি তৈরী করা হয়েছিল)

দ্বিতীয়তঃ জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের অফিসারদের জন্য ন্যাটোয় উচ্চপদ নির্দিষ্ট করা যাতে তাদের রাজনৈতিক, সামরিক কৌশল ও সামরিক অভিযানের নীতি নির্দিষ্ট করার সময় তাদের বক্তব্য শোনা হয়। এই দিক থেকে জার্মান সমরতন্ত্র বিশেষতঃ শেষ কয়েক বছরে হৃতশক্তি অনেকটা ফিরে পেয়েছে।

তৃতীয়তঃ পুনরস্ত্রসজ্জার জন্য নিজের অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির

সদ্ব্যবহার করা এবং ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের উপর সামরিক-অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে জার্মান সমরতন্ত্রীরা যুদ্ধ প্রস্তুতির অর্থনৈতিক বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া পছন্দ করেছিল এবং নিজেদের জন্য অস্ত্রসজ্জার "সংহতিসাধনকারীর" ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছিল। ১৯৬৩ সালে বনের সামরিক খাতে ব্যয় ১৮০০ কোটি ডয়েল মার্ক ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে শতকরা হিসাবে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক খাতে ব্যয় থেকে অনেক কম ছিল। সামরিক চাহিদা বিদেশে প্রক্ষিপ্ত করে বন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মদত জুগিয়েছিল এবং চাপের এক নতুন অস্ত্র লাভ করেছিল। একই সময় সামরিক উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ নীতির চালু করে সমরতন্ত্রীদের সংগে গাঁটছড়া বাঁধা জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা বিমান নির্মান ও বিশেষ করে ক্ষেপনাস্ত্র নির্মাণে হাত লাগাতে চেষ্টা করেছে। এই ক্ষেত্রে তারা বৃহৎ মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ চালাচ্ছে।

চতুর্থতঃ ন্যাটোয় অন্তর্ভুক্তির পর থেকে জার্মান সমরতন্ত্র পারমাণবিক অস্ত্র পাবার চেষ্টা করছে। ন্যাটোয় প্রবেশ করার আগে বা প্রবেশ করার পর কয়েক বছর অবধি অ্যাডেনহ্বার, স্ট্রাউস ও বনের অন্যান্য নেতা বলেছিল যে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রর প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের এই প্রতিশ্রুতি পুণর্সামরিকীকরণ সম্বন্ধে তাদের পূর্বের প্রতিশ্রুতির মতই ভিত্তিহীন ছিল। তাদের কৌশল খুব নিপুণ ছিল। ১৯৫৭ সালের মে মাসের গোড়ায় ব্যাড গোডেসবার্গের ন্যাটোর সভায় অ্যাডেনহবার ডালেসকে সমর্থন করেছিলেন। ডালেস পারমাণবিক কৌশল ও পারমাণবিক "তলোয়ারের" এক খসড়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন পারমাণবিক "তলোয়ারে" "বিশ্বসৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে" ভয় পেয়ে ন্যাটোর কিছু সদস্য এক গতানুগতিক কিন্তু আরও শক্তিশালী "চালের" জন্য আহ্বান জানিয়েছিল তখন তাদের সবথেকে উৎসাহী সমর্থক ছিল পশ্চিম জার্মানির সমরতন্ত্রীরা। তারা জানত যে, এর অর্থ তাদের যুদ্ধযন্ত্রের আরও প্রসার ঘটবে এবং এর ফলে পরবর্তীকালে পারমাণবিক অস্ত্র দাবী করার আরও অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছিল (৪ই অক্টোবর, ১৯৫৭) তখন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সমরকৌশলের পক্ষে এক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কেবলমাত্র অ্যাডেনহবার ভান করেছিলেন যে কোন পরিবর্তন হয় নি। জার্মান সমরতন্ত্রীরা তাদের মূল নীতিকে প্রতিশোধলিপ্সু দাবী ও পারমাণবিক অস্ত্র পাবার প্রচেষ্টা— আঁকড়ে ধরেছিল। ওয়াশিংটন এই বিপর্যয় থেকে বেরুনোর রাস্তা খুঁজছিল, তখন বন ও ন্যাটোয় জার্মান সমরকৌশলবিদরা আগ্রাসনাত্মক রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দিয়েছিল। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা

বন্ধ করার জন্য এবং এক বিশ্বজনীন অনাক্রমণ চুক্তিসম্পন্ন করার সোভিয়েত প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। মধ্য ইউরোপে এক পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল তৈরী করার জন্য পোলিশ প্রস্তাবের (র‍্যাপাকী পরিকল্পনা) একই হাল হয়েছিল। এর মধ্যে বন ন্যাটো যে সব সমাধানের কথা বলছিল সেগুলো সমর্থন করছিল। লিডার বলেছেন যে, "সার্বিক পারমাণবিক যুদ্ধ তত্ত্বর সংগে সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধ তত্ত্ব যোগ করে" এই সমাধান আসলে 'ঢাল ও তলোয়ার তত্ত্বকে মদত যুগিয়েছিল।

১৯৫৮ সালে রচিত এম সি-৭০ পরিকল্পনায় 'ঢাল' বিভাগের পাঁচ বছরের মধ্যে বৃদ্ধি করা ঠিক হয়েছিল এবং এদের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রর কথাও ভাবা হয়েছিল। জার্মান সমরতন্ত্রী এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিল। জার্মান সমরবাদীদের পারমানবিক অস্ত্রসজ্জিত হবার আকাংখা, যা আগে জোরালোভাবে অস্বীকার করা হয়েছিল, যুদ্ধ মন্ত্রকের গোপনীয় নথিপত্র থেকে বার করা হয়েছিল এবং তা বুণ্ডেসওয়ের পেশ করা হয়েছিল এবং সেখানে তা স্বীকার করা হয়েছিল। জার্মান যুদ্ধযন্ত্রর পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার এক গোঁড়া সমর্থক প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্ট্রাউস নিশ্চিন্ত মনে কাজ করছিলেন, যদিও *স্পাইগালের কেচ্ছার* পর তিনি তাঁর পদ হারান তাঁর উত্তরসূরী হাসেল তার পদাংক অনুসরণ করেন। এম সি-৭র পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মান যুদ্ধযন্ত্র মার্কিন নিয়ন্ত্রিত ডিপো থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য পারমাণবিক অস্ত্র পাবে বলে ঠিক করা হয়।

কিন্তু জার্মান সমরতন্ত্রীরা আরও চায়। তারা জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের জন্য ন্যাটোর আক্রমণাত্মক সূত্রগুলিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাদের প্রতিশোধ-লিপ্সু উদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক এরকম কিছু সূত্র ন্যাটোর ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ঃ ১৯৬০ সালের আগস্টে জেনারেলদের এক স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে "সৈন্যদের জন্য সেনাপতিদের দায়িত্ব এই পরিস্থিতিতে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র দাবী করতে বাধ্য করছে।" এতে ন্যাটো ও জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রর কাছ থেকে আরও দাবী করা হয়েছে। জেনারেলরা চেয়েছিলেন এক শক্তিশালী ন্যাটো, এক শক্তিশালী "ঢাল" (জার্মান যুদ্ধযন্ত্রসহ পশ্চিম ইউরোপীয় বাহিনীর জন্য পারমাণবিক অস্ত্র) এবং জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে নাম লেখা।

যখন মার্কিন সমরতন্ত্রীরা "সীমিত যুদ্ধের" ধারণা উপস্থাপন করে ন্যাটোর সমরকৌশলগত নীতির বিপর্যয় রোধ করতে চেয়েছিল যেখানে বিশেষভাবে মনোনীত সৈন্যবাহিনী কাজ করবে "তলোয়ারের" মত এবং পারমাণবিক শক্তি হবে "ঢাল", জার্মান সমরতন্ত্রী চটপট তাদের সমর্থন জানিয়েছিল। "সীমিত যুদ্ধ" তত্ত্বের স্রষ্টারা জানত যে তাদের ধারণা অবাস্তব ও বিপজ্জনক।

১৯৫৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই হুঁসিয়ারী জানিয়েছিল জোরালো বাতাসে আগুনের মত সীমিত যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে পারে। "ছোট" বা "স্থানীয়" যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত কথা ছিল এক শিশুসুলভ ভ্রান্তি বা সামরিক অভিযান সীমিত রাখার সমস্ত ইচ্ছা হয় শঠতা বা আত্মপ্রবঞ্চনা। দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যসচেতন মানুষ কখনও অতীত ভুলতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিকারী ঘটনাপ্রবাহও কিন্তু "ছোট ও "স্থানীয় যুদ্ধ" এবং বিদেশী ভূখণ্ড দখল নিয়ে গড়ে উঠেছিল। জার্মানী সমরতন্ত্রীরা তাদের আগ্রাসনাত্মক উদ্দেশ্যের প্রতি অনুকূল এমন একদিকে মার্কিন ধারণাকে চালনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। তারা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে গ্রাস করার জন্য মধ্য ইউরোপে সীমিত যুদ্ধের জন্য সবুজ সংকেত চেয়েছিল।

দ্বিতয়তঃ তারা "ক্রমশঃ সন্ত্রাসের" সংশ্লিষ্ট ধারণায় মুগ্ধ হয়েছিল। **ন্যাটো** স্থল বাহিনীর অধিনায়ক প্রাক্তন নাৎসী সেনাপতি স্পাইডেল বলেছিলেন যে সরাসরি পারমাণবিক যুদ্ধের আশ্রয় না নিয়ে সাধারণ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা যায়। তৃতীয়তঃ জেনারেলদের স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে "সন্ত্রাসের" ধারণার অর্থ "সীমিত যুদ্ধে" অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর জন্য পারমাণবিক অস্ত্র।

একই সময় জার্মান সমরতন্ত্রীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার কোন সুযোগ ছাড়ে নি। কমন মার্কেটে এবং নয়া ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণে জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির সমর্থন পেয়ে তারা **ন্যাটোর** মধ্যে আরও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সূত্র ও প্রেসের মাধ্যমের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং ওয়াশিংটনকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর যুদ্ধোত্তর নির্ভরতার যুগ শেষ হয়েছে এবং আজকের আন্তর্জাতিক 'পরিস্থিতির সংকটময় মুহূর্তে' জার্মান যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের **ন্যাটোর** প্রতি অনেক "অবদান" থাকতে পারে। সেই-জন্য জার্মান সমরতন্ত্রীরা **ন্যাটোকে** "চতুর্থ পারমাণবিক শক্তি" করার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ডিসেম্বরে লরিস নর্স্টাড 'এই ধারণাকে রূপ দেন। তিনি বলেছিলেন যে **ন্যাটো** সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের কাছে ৩০০ আন্তমের্রু ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক সাজসরঞ্জাম জমা রাখা হোক। বন খুব আনন্দিত হয়েছিল। অ্যাডেনহুয়ার, স্ট্রাউস ও ব্রেনটেনো তাদের মনোভাব গোপন রাখেন নি; তারা এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন যে তার এই পরিকল্পনার পারমাণবিক অভিলাষ মিটতে বেশ কিছু সময় লাগবে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স নরস্টাড পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল।

বৃটেন ও ফ্রান্স মনে করেছিল যে এটা হচ্ছে তাদের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ

পারমাণবিক সামর্থ্যের পক্ষে এক বিপদ। তাছাড়া তারা এটা জানত যে এটা ন্যাটোর মধ্যে জার্মান সমরতন্ত্রকে দৃঢ় করবে। সুতরাং এটা ব্যর্থ হয়েছিল। এর বদলে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেনেডি-ম্যাকমিলান বৈঠকে এক বহুপাক্ষিক পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনা হয়েছিল।

এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র ও ফ্রান্স, (দুজনেই ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত) পশ্চিম জার্মানির একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও ফরাসী একচেটিয়া পুঁজিবাদের সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক নতুন সামরিক জোট করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কমন মার্কেটে প্রাধান্য নিয়ে তাদের স্বার্থ সংঘর্ষকে উপশম করা এবং নয়া উপনিবেশিককে সম্প্রসারণের জন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা। ১৯৬৩ সালের ২২শে জানুয়ারী এক আনুষ্ঠানিক চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বন-প্যারি এই অক্ষশক্তির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক গূঢ় অর্থ আছে এবং এর ফলে জার্মান সমস্যার সমাধান আরও জটিল হয়ে উঠেছে; এই পরিকল্পনা জার্মান শান্তি চুক্তি এবং তার ভিত্তিতে পশ্চিম বার্লিনের বিন্যাসকে ব্যাহত করার জন্য করা হয়েছিল। তাছাড়া এই জোট জার্মান সমরতন্ত্রীদের কাছে সহযোগিতার মাধ্যমে আর এক নতুন পারমাণবিক শক্তিধর ফ্রান্সের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র আদায়ের আশা দেখিয়েছিল। এ ছাড়া বন-প্যারি অক্ষশক্তি জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রকে ন্যাটো ও সাধারণ নীতির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়েছিল। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিশোধের অস্ত্র হিসাবে পারমাণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত প্রশ্নে ন্যাটোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

১৯৬৩ সালের শেষে জার্মান সমরতন্ত্রীরা এক "নতুন সামনের সারির প্রতিরক্ষা কৌশল" তৈরী করেছিল। এতে "সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রতি স্তরে" পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করার কথা ভাবা হয়েছিল এবং তা ছিল কোন ইউরোপীয় সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রথম ৩০ দিন সাধারণ অস্ত্রাদি ব্যবহার করার জন্য মার্কিন তত্ত্বের বিপরীত। "ডাই ওয়েল্টে" বলা হয়েছিল যে বিশ্বস্ত "ন্যাটো সূত্র" থেকে জানা গেছে যে "নতুন জার্মান ধারণায় পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করার কথা ভাবা হয়েছে। এর ভিত্তি দূরপাল্লায় পারমাণবিক অস্ত্রাদি ব্যবহার। পূর্ব আরোপিত শর্ত হচ্ছে যে সমস্ত ইউনিট যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের পূর্ব অঞ্চল থেকে কার্যকলাপ শুরু করবে।"

এই "সামনের সারির যুদ্ধ কৌশল"-এর আর অস্তিত্ব নেই। বন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফন হাসেল এক মার্কিন শ্রোতৃবর্গের সামনে বিশদভাবে বলতে গিয়ে ন্যাটোর বনিয়াদদের মধ্যে বহুপাক্ষিক পারমাণবিক শক্তির দাবী করেন এবং "বিস্ময়সৃষ্টিকারী তত্ত্বের" পুনরুল্লেখ করেন।

হাসেল বলেছিলেন: "যখন ন্যাটো বিপর্যয়গ্রস্ত হবে তখন নয়া সামরিক

ও রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য ন্যাটো নিশ্চয়ই সমর্থ হবে।"

ন্যাটোয় প্রবেশ করার কয়েক বছরের মধ্যে এই সংগঠনের উপর তাদের আগ্রাসনাত্মক পরিকল্পনা চাপিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছিল এবং জার্মানির পক্ষে এক সম্ভাব্য পারমাণবিক বিপদ ডেকে এনেছিল।

সুতরাং এক বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বার করা আজকের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। পারমাণবিক ভীতি বিনষ্ট করার অনেক রাস্তা আছে, শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে শান্তি চুক্তি করা, ইউরোপে পরিবর্তন সম্পন্ন করা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের ইতি ঘটনা। এই সংগে আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে এক কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন সার্বিক নিয়ন্ত্রীকরণ চুক্তি। অন্যান্য সহায়ক কার্যাবলীর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র ও আত্মরক্ষামূলক পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত করা, অন্ততঃ নিরস্ত্রীকরণের শেষ ধাপ পর্যন্ত যতক্ষণ অবধি না তাদের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটছে, বৈদেশিক ভূখণ্ড থেকে সেনাবাহিনী অপসারিত হচ্ছে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে, হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তিরগোষ্ঠীর মধ্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি হচ্ছে এবং সর্বোপরি মধ্য ইউরোপে এক পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল তৈরী হচ্ছে। মস্কোর আংশিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তির পর গণবিধ্বংশী পারমাণবিক মালমশলা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সোভিয়েত মার্কিন চুক্তি, পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা শুরু করার জন্য এক চুক্তি এবং তারপর মধ্য ইউরোপে এক পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি আন্তর্জাতিক উত্তেজনা উপশম করতে বিশেষ সহায়ক হবে।

যারা জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ করতে চায় তাদের মতে এক পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল জার্মান নিরাপত্তা দৃঢ় করবে না তার কারণ দুই জার্মান রাষ্ট্রের সীমান্ত বরাবর পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বিরাজ করছে। এই যুক্তি আক্রমণাত্মক সামরিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ধোপে টেকে না। জার্মান জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র যাতে জার্মানির মাটি থেকে আবার বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব না হয় তার জন্য তার কার্যকরী পরিকল্পনা করেছে। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র যে প্রস্তাব করেছে তা জার্মান শান্তিতত্ত্ব নামে পরিচিত এবং এর ভিত্তি বর্তমান পরিস্থিতির স্বীকৃতি এবং দুই জার্মান রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ। এতে দুই জার্মান রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ব্যবহার করা থেকে কোন তৃতীয় দেশ বা গোষ্ঠী থেকে তা জোগাড় করা থেকে বিরত হতে বলা হয়েছে। তা ছাড়া নিজ ভূখণ্ডে কোন পারমাণবিক ঘাঁটি স্থাপন করা বা অন্য কোন দেশ বা গোষ্ঠীকে জার্মানিতে এরকম কোন পারমাণবিক ঘাঁটি স্থাপন করা

থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এর সংগে সংগে সামরিক বাজেট হ্রাস ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এই প্রথম জার্মান সামরিক তত্ত্বর বিপক্ষে এক জার্মান শান্তি তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং তা কখনও কল্পনাবিলাসী নয়—এটা হচ্ছে পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্য ও পারমাণবিক বিপদ অনু-যায়ী এক বাস্তবসম্মত নীতি।

মধ্য ইউরোপে এক পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল বল্কান ও স্ক্যাণ্ডিনেভি-য়ায় অনুরূপ অঞ্চল তৈরী করতে সহায়ক হবে। অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ হওয়ায় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ইউরোপের উত্তরাংশ থেকে ভূমধ্য-সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এবং যেহেতু আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি তাদের মহাদেশকে এক পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার আগ্রহ দেখিয়েছে, এর ফলাফল বিশেষ উপকারী হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আসবে। আসলে পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল বর্তমান ইতিহাসের এক বিশেষ সম্ভাবনাময় দিক এবং তা বাস্তব-সম্মতার কারণ সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জনগণকে এক দ্রুত কিছু করার তাগিদে পেয়ে বসেছে। কেবলমাত্র মার্কিন ও পশ্চিম জার্মানির উগ্রপন্থীরা ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবর্তনের সমর্থক।

কিছু কিছু পশ্চিমী মহল থেকে বলা হচ্ছে যে উত্তেজনা উপশমের ধারণা প্রচার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ন্যাটোর আভ্যন্তরীণ পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে তাকে দুর্বল করতে চাইছে। তাদের পার্থক্যের উৎস সাম্রাজ্যবাদী সংকট। তাদের কম বা বেশী গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কোন আগ্রাসী জোটের মধ্যে ফাটল না ধরে থাকতে পারে না। তবুও জোটের অস্তিত্ব ছিল এবং সময় সময় তা বেশ কিছু দশক ধরে স্থায়ী ছিল। সুতরাং যদি ভাবা হয় যে ন্যাটোর আভ্যন্তরীণ মত পার্থক্যর ফলে এর পতন হবে, তাহলে ভুল করা হবে। আবার ন্যাটোর অস্তিত্ব যুদ্ধের বিপদ দূর করার রাস্তা খোঁজার পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়। জার্মান সমরতন্ত্রীরা ন্যাটো জোটে এক বড ভূমিকা গ্রহণ করতে চাইছে এবং যে কোন পরিকল্পনাকে বানচাল করতে চাইছে। আজকের দুনিয়ায় যেহেতু বিপরীত অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান, যেহেতু মধ্য ইউরোপে সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, তাহলে জার্মান সমরতন্ত্রীরা সামরিক জোটগুলিকে তাদের যুদ্ধাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না।

১৯৬৪

জার্মান সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব ও আজকের বাস্তব

আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগগুলি গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। বহুদিনের ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অবাস্তব চিন্তা টিকে থাকে না এবং যুক্তি প্রকৃতি ও সমাজের দ্বন্দ্ববাদের গভীরে প্রবেশ করে মানুষের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন ছাঁদে গড়ে। এই সত্য রেনাশাঁ যুগে—সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের সময়—প্রতিফলিত হয়েছিল যখন জ্ঞান, সাহস ও চরিত্র ও তিন অতিমানুষিক দৃষ্টান্ত নিকোলাস কোপার্নিকাস, জিবোর্দাভো ব্রুনো ও গ্যালিলিও গ্যালেলেই মহার্ঘ সৌরজগতের গোপন রহস্য ভেদ করেছিলেন এবং জোরালো অত্যাচার ও জীর্ণ ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাথলিকবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং আমাদের গ্রহের গতির আইন আবিষ্কার করেছিলেন। যখন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জনকদ্বয় মার্কস ও এংগেলস সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রমপঞ্জী দ্বারা শ্রেণী সংগ্রামের আইনগুলির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে, এক নতুন শ্রেণীহীন সমাজে অমোঘ বিবর্তনের কথা বলেছিলেন। তখন সেই তা পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদী দুর্গের উপর বিপ্লবী শ্রমিকদের আক্রমণে প্রতিফলিত সত্য হয়ে উঠেছিল। একথা আজকের যুগে সত্য। সে সময় লেনিনের আবিষ্কারে আলোকিত; লেনিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ও আইনগুলি স্বরূপ উদঘাটন করেছিলেন, কমিউনিস্ট তত্ত্বে এবং তার বাস্তব বিপ্লবী প্রয়োগে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম যা হচ্ছে সমস্ত মানুষের অভিজ্ঞতার এক সৃষ্টিশীল সামগ্রিক রূপ পৃথিবীর এক বৃহদাংশে বিস্তারিত। কমিউনিজম পুঁজিবাদী জগতে অধিকাংশ শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মন জয় করেছে। পুঁজিবাদী দেশে জনগণ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও তার আনুষঙ্গ অর্থাৎ সমরতন্ত্রের উপর ঔপনিবেশিকতাবাদ ও নতুন আক্রমণের বিপদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

সাম্রাজ্যবাদ আজও যুদ্ধ সৃষ্টি করতে পারে যা, আজকের পারমাণবিক যুগে ইতিহাসের সব থেকে বড় ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে যুদ্ধের বিপদকে দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ থামানো "শক্তির অবস্থার" নীতি পরিত্যাগ করে যুক্তির অবস্থার কথা ভাবা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা দেশের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মেনে নেওয়া। এমনকি যখন থেকে পৃথিবীর—সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে, লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই নীতির এক সার্বজনীন বাণী আছে।

তবুও জার্মানিতে এক বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যা জার্মানির জনগণের উপর বিশেষ জাতীয় কর্তব্য বর্তিয়েছে যার প্রভাব ইউরোপ, এমনকি পৃথিবীর ভাগ্যের উপর অনুভূত হবে। এই পরিস্থিতি দুই স্বাধীন জার্মান রাষ্ট্র এবং তাদের পৃথক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত। এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটিতে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও শান্তির জয় হয়েছে। অপরটিতে, অর্থাৎ জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে, সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্র জেঁকে বসেছে এবং এক প্রতিশোধের হিংসায় উন্মত্ত হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। সর্বত্র অপ্রচার চালাচ্ছে। ন্যাটো জোটের মধ্যে জার্মানির ভাগ্যকে ঢুকিয়ে দিয়ে, আগ্রাসী শক্তিগুলি ইউরোপের পক্ষে এক বিপদ সৃষ্টি করেছে। ১৯৩৭ বা ১৮৭১ সালের জার্মান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার স্বপ্ন যারা দেখে তারা বলপূর্বক জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দখল করার জন্য এবং পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য ফন্দী আঁটছে। তাদের আজও উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যাটোয় প্রাধান্য বিস্তার করা এবং পারমাণবিক অস্ত্র হাতে আনা। সেইজন্য ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান না পারমাণবিক যুদ্ধ, এই নিয়ে দুই ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার আজ সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যদি বলা হয় যে, জার্মান সমরতন্ত্র এই সমস্যা সমাধানে আদর্শের ভূমিকা ও স্তর অর্থ কি তা জানে না তাহলে সত্যের অপলাপ হবে। সেইজন্য তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা সমস্যাকে বিকৃত করেছে। এক পশ্চিম জার্মান-তাত্ত্বিক লিট বলেছেন যে, আজকের সমস্ত বিষয় "কিভাবে আমাদের যুগ নিজেকে বুঝবে" তার উপর নির্ভর করছে। তাদের নীতি ও জার্মান যুদ্ধ যন্ত্রকে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত করার উচ্চাশার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য বনের তাত্ত্বিকরা "পারমাণবিক যুগ ধারণায়" উত্তর খুব খুঁজছে। আজকে যেহেতু মানুষের ভাগ্য অনিশ্চিত পশ্চিম জার্মানীতে পুনরুজ্জীবিত সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ গতি প্রকৃতি বুঝতে হবে এবং এর সংগে সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন রূপ ও বিপজ্জনক ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলনা করে শুধু

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি নয়, সমগ্র জনগণকে বুঝতে হবে কারণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পারমাণবিক বিপর্যয় এড়ানোর সমগ্র পৃথিবীর দায়িত্ব।

১

যদি জার্মান সামরিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসের দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে এর প্রখ্যাত প্রবক্তারা 'জার্মান দায়িত্বের' ধারণার প্রচার করেছে। মানব সংস্কৃতির সম্পদ হিসাবে পরিগণিত জার্মান মানবতাবাদে বা জার্মান দার্শনিক, জোহান হেডার ও ইমানুয়েল কান্টের সাধনা নয়। 'জার্মান কর্তব্য' বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাষার অবতারণা করা হয়েছিল এবং তাদের এক অমোঘ বৈশিষ্ট্য ছিল—তাত্ত্বিকভাবে ও নৈতিকভাবে জার্মান সমরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও সম্প্রসারণবাদী উচ্চাশার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা।

এই ঐতিহ্যর উৎস ছিল লিওপোল্ড রাংকের "জার্মান ইতিহাসের মতবাদ," যদিও তাঁর ঐতিহাসিক সমালোচক পদ্ধতি ও নথিপত্রের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, তাঁর দার্শনিক ঐতিহাসিক ধারণা ও তার ঐতিহাসিকতা ও সভ্যতার ছল তাঁকে এই কথা বলিয়েছিল যে, প্রুশিয়-জার্মান রাষ্ট্র হচ্ছে, স্বর্গীয় চিন্তার এক মূর্তরূপ। রাষ্ট্রকে অস্বীকার করার তাঁর এই ধারণার খুঁটি ছিল এক সনাতনী ঐতিহ্য যা স্বয়ং মহান হেগেলও অস্বীকার করেছিলেন। রাংক প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাকে তিনি ঐতিহাসিক নিয়মের বাস্তবায়ন বলে বর্ণনা করে এর উপর তাঁর গবেষণার আলোচনা নিবদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, বস্তুনিষ্ঠভাবে এই নিয়ম তাঁর অপেক্ষাকৃত বেশী উদারনৈতিক শিষ্য ফ্রেডরিখ মাইনেকের ভাষায় যে দৃষ্টিভঙ্গীকে জোরদার করেছিল তা "শক্তির নীতি হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ।"

বিশেষতঃ প্রুশীয়-জার্মান রাষ্ট্রের প্রতি এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত একদিকে, সোজাসুজিভাবে জনতার সার্বভৌমত্বে গণতন্ত্র এবং এমন কি উদার নীতিকে অস্বীকারে প্রযুক্ত হয়েছিল এবং এদের "জার্মানীর অস্তিত্বর" পক্ষে বিপজ্জনক বলা হয়েছিল। অপর দিকে পররাষ্ট্র নীতির প্রাধান্যের উপর এর জোর দেওয়া হয়েছিল।

রাষ্ট্রকে ঐতিহাসিক নিয়মের এক সৃষ্টি বলে বর্ণনা করে রাংক তার উপর এক অতীন্দ্রিয় উপাদান আরোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে আদিম ও নির্দিষ্ট। তিনি বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে ঐতিহাসিক নিয়মের চাবিকাঠি। এই ধারণার উপর

প্রগতিশীল অর্থ আরোপ করলে তা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে। রাংক ও তাঁর শিষ্যরা কিন্তু এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল বিষ সংক্রামিত করেছিলেন এবং একে কেন্দ্র করে "বড় শক্তিদের" ভারসাম্যর ধারণার সৃষ্টি করেন। শুধু তাঁরা এর উপর এক ইউরোপ কেন্দ্রীক সংকীর্ণতা আরোপ করেছিলেন (এটা ১৯শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই আশা করা যায়) তা নয়, তাঁরা এমন ধারণারও সৃষ্টি করেছিলেন যা সমরতন্ত্রী প্রুশিয়ার সমগ্র জার্মানীর উপর আধিপত্য বিস্তারের এবং সমরতন্ত্রী জার্মানীর সমগ্র ইউরোপ দখল করার প্রচেষ্টার তাত্ত্বিক ভিতও ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৯শ শতাব্দীর শেষে রাংকের তত্ত্ব হাজনরিখ ফন ট্রাইটস্কের সবলীকৃত জাতীয়তাবাদে তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। ট্রাইটস্কেকে লেনিন এক পুলিশ-মনা সরকারী ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মগুলিকে উপহাস করে ট্রাইটস্কে তাঁর অগভীর ধারণাগুলির মধ্যে এক নগ্ন আগ্রাসনাত্মক উদ্দেশ্যর সঞ্চার করেন ও প্রতিক্রিয়াশীল ও "জার্মান ভূমিকার" প্রবক্তাদের খুশী করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল শিল্পপতি ও ঔপনিবেশিক কুবেরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্ত-জার্মান পরিষদ।

খুব শীঘ্রই অবশ্য 'জার্মান-ভূমিকা'কে এক ব্যাপকভাবে ভাবা হয়েছিল যে, এর পক্ষে ইউরোপীয় মহাদেশ খুব ছোট বলে মনে হয়েছিল। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনাত্মক উদ্দেশ্যর পক্ষে উপযোগী এক নতুন উপাদান পুরানো জাতীয়তাবাদী ধারণার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এই সব ধারণা আঁচ করে এবং নবগঠিত "জার্মান ধারণা"র অনুযায়ী তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য জার্মানীতে প্রচারবিদরা ঘোষণা করেছিল: "কিছু হবার জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর কিছু জায়গা জয় করা।"

এক বছর পরে ফ্রেডরিখ নাউমানের, 'ন্যাশনাল-সোশ্যাল ক্যাটেকিজ' বইয়ে নিম্নলিখিত আরও নির্দিষ্ট ও অর্থবহ শব্দগুলি ছাপা হয়েছিল। "জাতীয় বস্তুটা কি? তা হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দিকে প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে জার্মান জনগণের অভিপ্রায়।" "জার্মান ভূমিকার" এই নতুন ব্যাখ্যার লেখক পরবর্তীকালের মধ্য ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ধারণার লেখক হয়ে উঠেছিলেন।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে রাইখস্টাগ থেকে "আমরা সূর্যের একটা অংশ পেতে চাই" বলে যে ডাক উঠেছিল তা এক প্রতিধ্বনি মাত্র। যদিও তাঁর সম-সাময়িকেরা, নাউমানের কথায় এমনভাবে এর প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিল, যে তা ছিল "বিশ্ব ইতিহাসের উপর এক দারুণ আক্রমণ।" পরবর্তী গবেষণা দেখিয়েছে যে, যখন পুঁজিবাদী শিল্পসম্রাট ও ঔপনিবেশিকবাদীরা অ্যাডমিরাল ফন ট্রিপেজের সংগে নৌ-বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা চালিয়েছিল, তখন জনমত তৈরী করতে প্রচারবিদদের বড় বড় ভূমিকা ছিল। তারা আশা করেছিল যে নৌ-

বাহিনী তাদের ব্‌টেনের হাত থেকে নেপচ্‌নের ত্রিশ্‌ল কেড়ে নিতে সাহায্য করবে এবং ব্‌টেনের বিশ্ব শক্তিকে তেমন গ্‌র্‌ত্ব দেয় নি। নাউমান সময়ের মেজাজ ব্‌ঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি নতুন য্‌গে প্‌রোনো ধারণা খাপ খাওয়াতে পারতেন। তিনি ১৯০০ সালে লিখেছিলেন : "যদি প্‌থিবীর অসতাধীন বলে কিছ্‌ থাকে তা হচ্ছে ভবিষ্যতের বিশ্ব য্‌দ্ধ। যারা তাদেরকে ব্‌টেনের হাত থেকে উদ্ধার করতে চায় এই য্‌দ্ধ হবে তাদের য্‌দ্ধ।"

জার্মান ব্‌র্জোয়া ইতিহাস রচনা কৌশল ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ঐতিহাসিক গবেষণা অনেক বৈচিত্র্যময় দ্‌ষ্টিভঙ্গী ও সমস্যার স্‌ষ্টি করেছে। এদের মধ্যে রাঙ্কের দল প্রধান ধারা হিসাবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ব্‌দ্ধির বিভিন্ন স্তরের সমস্ত তাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে। যদিও রাঙ্কের অন্‌সারীরা পররাষ্ট্র নীতির প্রাধান্য এবং জার্মান ঐতিহাসিকতার প্রতি-ক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের জন্য একে অপরের সতীর্থ তব্‌ও তাদের প্রত্যেকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষি ও পদ্ধতি উদ্দেশ্যর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে নিজস্বতা বজায় রেখেছে এবং এইভাবে তারা ক্রমপরিবর্তনশীল "শক্তির ভারসাম্যতা" সত্ত্বেও "জার্মান ভ্‌মিকা" সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল। মাক্স লেনজ তাঁর রাজনৈতিক ঐতিহাসিক রচনা *দি গ্রেট পাওয়ারস* এর নাম রাঙ্কের কাছ থেকে ধার করেছিলেন; তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এই শতাব্দীর শেষে এই জার্মান ভ্‌মিকাকে 'মহাদেশীয়' সীমা ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত করে এবং প্‌থিবী বিভাজনে প্‌ঁজি সরবরাহ করা ছাড়াও সামরিকভাবে অংশ গ্রহণ করে, ভারসাম্যতাকে প্‌নর্‌দ্ধার করা যায়। লেনজ বলেছিলেন যে যে দেশের শক্তি ব্‌হৎ শক্তিবর্গের বির্‌দ্ধে প্রয্‌ক্ত হবে কেননা তারা ভারসাম্য নষ্ট করেছে "আমরা তাদের আদেশ করতে পারি : আমাদের হাতেই মাপকাঠি আছে।"

সমরতন্ত্রর প্রতি এই আবেদনকে সম্পন্ন করেছিলেন উইলহেবলমের য্‌গের আর একজন প্রভাবশালী ঐতিহাসিক ডেলব্র্‌ইক। তিনি নেইবাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন : ট্রিপটিজদের রাজনৈতিক সামরিক কৌশল অন্‌যায়ী মহাদেশীয় সেনাবাহিনী থেকে গভীর সম্‌দ্রে ড্রেডনট * প্‌থিবীর শক্তির ভারসাম্যতা ফিরিয়ে আনবে। ডেলব্র্‌ইক মনে করেছিলেন যে, ক্‌টনৈতিক স্‌ত্রর ব্যবহার যতদ্‌র সম্ভব করতে হবে। যখন "ঢেউয়ের শাসক" ব্‌টেন মনে করেছিল যে তাঁর নৌশক্তির নয়া প্রতিক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে অনিবারণাত্মক সংঘর্ষ করা বিপজ্জনক, তখন অটো হিনদে সমস্ত র্যাঙ্কপন্থী ঐতিহাসিকদের মত ক্ষমতালোভের আশায় কি করণীয় তা এইভাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন : "আমরা জমির উপর ভারসাম্যতার পরিপ্‌রক হিসাবে

* এক ধরনের আধ্‌নিক য্‌দ্ধজাহাজ।

সমুদ্রে ভারসাম্যতার অবতারণা করতে চাই," লুডউইগ ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন যে এটা ছিল "অক্ষরে অক্ষরে ট্রিপটিজের সূত্র।"

সাম্রাজ্যবাদী *ওয়েল্টপলিটিক* ধারণা প্রবল হয়ে ওঠায় এবং শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তন হওয়ায় রাংকপন্থী "শক্তির ভারসাম্যতা" নীতির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাইনেক "জার্মান ভূমিকার" উপর এক বিশ্বজনীন গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং জার্মান দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন (তিনি বলেছিলেন হেগেল, রাংক ও বিসমার্ক হচ্ছে "রাষ্ট্রের তিন মহান মুক্তিদাতা," আবার হারমান ভনসেনের মধ্যে আমরা দেখি জার্মান সমরতন্ত্রের, রাজনৈতিক সামরিক জোট ব্যবস্থার এবং পুরাতন ও নতুন মধ্য ইউরোপের ধারণার এক অপরিণত ওকালতি। কিছু বাহ্যিক দিক থাকা সত্ত্বেও কিছু নির্ধারণকারী বৈশিষ্ট্য এই নীতির মৌল চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছিল প্রথমতঃ ইতিহাস ও আধুনিকতায় প্রুশীয়-জার্মান রাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা ; দ্বিতীয়তঃ অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলি ও 'রুশ-মস্কোভাইটদের' সাংস্কৃতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে 'জার্মান ভূমিকা' প্রতিষ্ঠা করা, তৃতীয়তঃ প্রুশিয়ার জার্মান সাম্রাজ্যের সম্মান পাওয়া এবং পরে ইউরোপে 'বৃহৎ শক্তির' সম্মান পাবার উপায় স্বরূপ, সমরতন্ত্রের প্রতি আবেদন : চতুর্থতঃ শুধু ইউরোপে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে জার্মান আধিপত্যের ধারণা বিস্তার করা।

জার্মান ঐতিহাসিক ওয়াল্টার ভোগেল পরবর্তীকালে লিখেছিলেন : "১৯১৭ সালের আগে জার্মান তত্ত্ব নিম্নলিখিত ধারণায় পর্যবসিত হয়েছিল : জার্মানীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব হচ্ছে ইউরোপীয় ভারসাম্যকে পৃথিবীর ভারসাম্যে পরিণত করা।"

আসলে এর দ্বারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীতে আধিপত্যের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের কথা প্রচার করেছিল। ইতিহাসকে এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুলে পরিণত করা হয়েছিল ১৯১২ সালে রাংকপন্থীরা প্রায় সোজাসুজি আগ্রাসী আন্তর্জার্মানী শিবিরে মিশে গিয়েছিল ডেলব্রুইক বলেছিলেন, যে জার্মানীর "বিশ্ব ভূমিকার" জন্য তার "পৃথিবীর শাসনে অংশগ্রহণ" প্রয়োজনীয়, পল রোর যিনি তাঁর সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারবিদ ছিলেন, তার এই *"পৃথিবীতে জার্মান ধারণা"*-তে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে ঐতিহাসিক অর্থে এক জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তার করা এবং 'জার্মান ধারণা' কার্যকরী করতে হলে বন্দুকের গর্জন করতে হবে। জেনারেল বর্নহার্ডির *জার্মানি এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ*, বই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই বইয়ে 'জার্মান ঐতিহাসিকতার' সমরতন্ত্রী উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। জার্মান বুর্জোয়া ইতিহাস রচনাপদ্ধতির প্রধান কেন্দ্র রাংকপন্থীদের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এই

সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের তাত্ত্বিক প্রস্তুতি আগে থেকে করা হয়েছিল। এক জাতীয়তাবাদী রোগাক্রান্ত এই ঐতিহাসিকরা যুদ্ধকে এক 'জার্মান যুদ্ধ" বলে প্রশংসা করেছিলেন এবং বলা হয়েছিল যে যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা পুরানো শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করেছিল তা অপেক্ষা তা এই যুদ্ধকে উদ্দীপ্ত করে নি। উদ্দীপক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল নতুন জার্মান বীরত্ব যা নিস্তেজ বৃটিশ 'দোকানদার' ও অন্যান্য ঐতিহাসিক-ভাবে সহিষ্ণু শত্রুদের, যাদের কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বা ভবিষ্যৎ ছিল না, উপর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। ১৯১৩ সালে যে ধারণা চালু করা হয়েছিল সেই সব আগ্রাসনাত্মক ধারণা যুদ্ধ প্রতিরক্ষামূলক এই পুরোনো ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল এবং যুদ্ধকে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও ভাগ্য বলে অভিহিত করেছিল। শত্রু শিবিরের ক্ষমতা মোকাবিলা করার জন্য জার্মান জীবনীশক্তি, জার্মান সংস্কৃতি ও জার্মান রাষ্ট্রকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।

জার্মান ঐতিহাসিকরা সমরতন্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে অনায়াসে স্বীকার করেছিল (৯৩র বিবৃতিতে ৪,০০০ জার্মান বুদ্ধিজীবী সই করেছিল), কিন্তু আরও এগিয়েছিল। একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতি তার বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে যে পররাজ্য গ্রাসেও সুদৃঢ় প্রসারী পরিকল্পনা করেছিল। সরকারের যে সে পেশাদারী স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল তা ছিল এরকম অনেক দলিলের অন্যতম। তারা সবাই মধ্য ইউরোপের আশা করেছিল।

জার্মান ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক মূল্যায়ণে মতবিরোধ কিছু ছিল কেবল তাত্ত্বিক কৌশল নিয়ে। "আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি" বা "হিংসার মাধ্যমে শান্তি," এই নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল এবং দুটোই ছিল ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

কিন্তু বিশ্বশক্তির এই ধারণা তা সে যতই দার্শনিক-ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক-সামরিক তত্ত্বের দ্বারা, সমরতন্ত্র ও নিবারণাত্মক যুদ্ধের পুরোনো ধারণা বা ঔপনিবেশিকতাবাদ বা নৌবাদের দ্বারা পুষ্ট হোক না কেন, সদ্যোজাত ও অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বুর্জোয়া জার্মান ইতিহাস রচনা পদ্ধতি নিজেকে জাতীয় চেতনার শ্রেষ্ঠ উন্নতর বাহক বলে যতই জাহির করুক না কেন, নিজের দৌড় কতদূর তা প্রকাশ করেছিল। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন যুদ্ধের শেষভাগে তারা নিজেদের বিপর্যয় বুঝে উঠতে পারে নি, ১৯১৭ সালের বসন্তকালে, রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর এক উদারনৈতিক ঐতিহাসিক ফ্রেডরিখ মাইনকে বল্কান রাষ্ট্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক দরখাস্ত প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। তবুও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের মোকাবিলা করতে গিয়ে সে তার দেউলিয়াপণা প্রমাণ করেছিল।

২

নতুন যুগের ভোরে, যখন পৃথিবীর এক ইতিহাসের গতি বদলে গিয়েছিল তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল তা ভেঙে পড়েছিল। রুশ সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তারপর জার্মান সাম্রাজ্যের পতন হলে সে ভার্সাইলের চুক্তির শর্তগুলি গ্রহণ করে।

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক পথে সমাজকে নিয়ে যাবার জন্য অনেক অজানা সুযোগের সন্ধান এনে দেয় এবং পশ্চিম ইউরোপে শ্রমিকদের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। জার্মান সমরতন্ত্র, যা ঘরে বাইরে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি বলে মনে হয়েছিল, পরাজয় ও ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবে জোর ঘা খেয়েছিল। এটা শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক পরাজয় ছিল না; এটা ছিল জার্মানীর একাধিপত্য বিস্তারের আশার পরাজয়, তার ঐতিহাসিক ভ্রান্তির পরাজয় ও পুরোনো রাংকের অবাস্তব ধারণার পরাজয়, "শক্তির ভারসাম্যর" প্রবক্তারা, যারা প্রত্যেকে জার্মান অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল এরকম কোন শক্তির ভারসাম্যর পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসের গতিতে ভেসে গিয়েছিল। যখন বৈপ্লবিক মার্কসবাদী চিন্তা তার সময়কে বুঝবার ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ কবাব প্রচণ্ড ক্ষমতার নিদর্শন রেখেছিল তখন গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল।

যে সব জার্মান চিন্তাবিদ, যারা বুঝেছিল যে প্রুশীয়বাদ রাজতন্ত্র ও আন্তর্জার্মানবাদের তথা সদ্যোজাত, জানত না কি ভাবে এদের নতুন অবস্থায় খাপ খাওয়াতে হবে। হাইডেলবার্গ বিদ্যালয়ের প্রধান এবং রক্ষণশীল উদার-নৈতিকদের অন্যতম মাকস ওয়েবার ১৯১৮ সালের শীতকালে লিখেছিলেন, "বর্তমানে আমাদের ভাবমূর্তি যে রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্য কোন জাতির ভাবমূর্তি এই অবস্থায় ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।" ১৬৪৮ সালের পরে (যখন তিরিশ বছরের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং ওয়েস্ট ফালিয়ার চুক্তিসম্পন্ন হয়েছিল) বা ১৮০৭ সালের পরের মত (অস্টার নিজের পরাজয়ের পর এবং জার্মানীতে নেপোলিয়নের শাসনের প্রতিষ্ঠার পর) আমাদের আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। এইভাবে তথ্য জমে উঠেছে। স্বভাবতঃ আমাদের সত্যনিষ্ঠ হবার তাগিদে আমাদের বলতে হবে যে বিশ্ব রাজনীতির নির্ধারক হিসাবে জার্মানী তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।"

ভার্সাইলের চুক্তি হবার আগে এই লেখায় দুর্ভাগ্যবশতঃ জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অবিশ্বাস ফুটে উঠেছিল। জার্মান শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে জার্মানীর জাতীয় ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে, চেষ্টা করেছিল যদিও তাদের পদ্ধতি জার্মান সমরতন্ত্রীদের থেকে পৃথক ছিল। জার্মান

শ্রমিকরা সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিল এবং দেশকে গণতান্ত্রিক পথে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিল। যেহেতু 'ওয়েল্টপলিটিক' ছিল বিশ্বশক্তির তত্ত্বের প্রধান ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য, জার্মান সমরতন্ত্রীদের সামরিক-রাজনৈতিক পরাজয়কে ভাতা মনে করা হয়েছিল যে জার্মানী ওয়েস্ট-ফ্যালিয়ার শান্তির যুগে বা নেপোলিয়নের যুগে ফিরে গেছে। সেইজন্য আবার কেঁচে গণ্ডূষ করার" চিন্তা।

এইসব বৃহৎ ঘটনায় পীড়িত হয়ে, জার্মান ঐতিহাসিকেরা মাইনেকের ভাষায় যে "সরু বাঁধ আমাদের বলশেভিকবাদ থেকে পৃথক করেছিল তার ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর উপর মনোনিবেশ করেছিল। এই কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল জার্মানিতে বিপ্লব তরঙ্গ জোর করার জন্য বা তা বিলম্বিত করার জন্য। তবে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা যথেষ্ট হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল র‍্যাংকপন্থীদের সম্মান, জার্মান সমরতন্ত্রের মত টালমাটাল হয়ে উঠেছিল। জার্মান ইতিহাস নামক আলপাস পর্বতের দেবতারা অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল।

বর্জোয়া ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে তাদের দর্শন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই ধোঁয়াশার মধ্যেও এক দর্শনের আবির্ভাব হয়েছিল যা পুরানো উপাদানকে এক নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজিয়েছিল এবং তা আরও প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার সৃষ্টি করেছিল। "লিবেনস ফিনসকি"র (জর্জ সিমেল, গুডউইল ক্লাজেস, বারমান কাইজারলিং, রিচার্ড মুইলার ক্রিয়েনফেলস) সংগে যুক্ত হয়েছিল অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলারের নিৎশেধর্মী নৈরাশ্যবাদ এবং নিৎসের সুউচ্চ অথচ বিকৃত, নন্দনতাত্ত্বিক অথচ অনৈতিহাসিক "মহামানব" তত্ত্ব এবং তাঁর ইতিহাসের প্রকৃত রচয়িতা জনগণের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন ঘৃণা, এর ফলে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক ধারণা শক্ত হয়েছিল। স্পেঙ্গলার বলেছিলেন "প্রত্যেকে নিশ্চয়ই দাবী করবে," পৃথিবীর ইতিহাসকে জনগণের ইতিহাস হিসাবে না দেখে, স্পেঙ্গলার তাকে রাষ্ট্রের ইতিহাস ও যুদ্ধের ইতিহাস দেখে সোজাসুজি ভাবে ট্রাইটস্কে, বার্ণহার্ডি ও অন্যান্য প্রুশীয়-জার্মান সমরতন্ত্রের তাত্ত্বিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তার পূর্বসূরীদের মত স্পেঙ্গলার এই মত পোষণ করেছিলেন যে, যুদ্ধই হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের চিরন্তন রূপ ও সর্বোচ্চ মূল্যবোধ; তার মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ করা। "যেহেতু আমাদের কাছে জীবন বলতে বোঝায় এক বাহ্যিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, প্রত্যেককেই হয় আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনের সংগে খাপ খাওয়াতে হবে নয় তাদের ধ্বংস হতে হবে। এই ধারণা আজকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি আধুনিক সমাজতন্ত্রের কথা বলেছি তা শুধু আমাদের সম্পত্তি ও সনাতনী চৈনিক বা রুশ সাম্যাজতন্ত্র বলে কিছু নেই।" তিনি প্রুশীয় বা জাতীয় জার্মান সমরতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ ও বিশ্ব-শক্তির এক নতুন রূপ বলে দাবী করেছেন।

স্পেংগলারের রুশ সমাজতন্ত্রের ধারণা বিসমার্কের সময়ের প্রুশীয় জার্মান রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ধাঁচের নয়, তা ছিল ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের জার্মান রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের নকল, স্পেংগলার তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির আধা-বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পশ্চিমের 'পতন' দেখানোর যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পতনের ফলে তাঁর হতাশা সূচিত করে। তা ছাড়া এর দ্বারা পশ্চিমের "চিরন্তন ও অনির্বচনীয়" মূল্যবোধ গুলিকে প্রুশীয় সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের কমিউনিজমের ধ্বংসাত্মক শক্তি থেকে বাঁচবার প্রতি বিপ্লবী মনোভাবও সূচিত করে। এইভাবে, যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর, যে তাত্ত্বিক বিপর্যয় গ্রাস করেছিল, তার তীব্রতম মুহূর্তে স্পেংগলারের প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা এক সার্বজনীন প্রতিকার হয়ে উঠেছিল, তার কারণ, শুধু এর মধ্যে অবাস্তববাদ ও সন্দেহবাদের উপকরণ ছিল না. এই ধারণা পশ্চিমকে একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক অতি-ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পীঠস্থান হিসাবে দেখেছিল যে, "পূর্বাঞ্চলের কমিউনিজমের" বিরুদ্ধে লড়াই করছে। স্পেংগলারের ধারণা শাসকগোষ্ঠীরা অভিভূত হয়েছিল, তার কারণ তা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল, শ্রমিকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিল এবং প্রুশ সমাজতন্ত্রকে প্রুশ-জার্মান বাস্তবতার সংগে সংযুক্ত বলে তাকে পাল্টা চালু করার চেষ্টা করেছিল। অন্ধ কমিউনিজম-বিরোধিতার অস্ত্র হিসাবে স্পেংগলারের দর্শনকে ফ্যাসিবাদের আর এক সংস্করণ বলে অত্যুক্তি করা হবে না। এটা স্পেংগলারের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়, এটা হচ্ছে হিটলারের জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্যাঁচের অতি তীব্রতার সূচক।

কিন্তু যা লক্ষ্য করবার তা হচ্ছে স্পেংগলারের অনৈতিহাসিক ধারণার পাশাপাশি জার্মানীর শাসক শ্রেণীর রক্ষণশীল উদারনৈতিক ঐতিহাসিকতা স্পেংগলারের মতবাদের বিরোধিতা করেছিল। এর কারণ এই ছিল না যে স্পেংগলারের কমিউনিজম বিরোধিতা গ্রহণীয় নয়, এর কারণ একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক আর্নেষ্ট ট্রোয়েলটনের ভাষায়: "স্পেংগলারের ধারণা ছিল হিংসার উপর ভিত্তি করে এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।" এগুলি ছিল নতুন কথা এবং তা খোলাখুলি যুদ্ধবাদ ধারণাগুলির নিন্দে করে তার বদলে" স্বাভাবিক অধিকার ও মানবতার এক ধারণা প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। এই সময়ে জার্মানি এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা ভাবতে পারত ও শান্তির জন্য চেষ্টা করতে পারত। কারণ জার্মানি সমরতন্ত্র বিকল হয়ে পড়লে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ভার্সাইলের চুক্তির বোঝা ঘাড় থেকে নামাবার চেষ্টা করতে পারত।

নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র, যে শান্তির ঐতিহাসিক নির্দেশ জারি করেছিল। ভার্সাইল চুক্তির নিন্দে করেছিল, জার্মান শাসকদের পক্ষে একথা বুঝতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল যে এই অন্ধ গলি থেকে বেরোবার জন্য তাদের

চেষ্টা করতে হবে, রাপালোর চুক্তি, যাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, Weimar সাধারণতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল।

পৃথিবীর রাষ্ট্র ব্যবস্থার গভীর পরিবর্তনও এক শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রগতির প্রমাণস্বরূপ এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্মুখীন হয়ে জার্মান ঐতিহাসিকেরা তাদের প্রধান অস্ত্র—বর্তমানকে ঐতিহাসিকভাবে বোঝা—ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। রাপালো চুক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। অটো হোয়েটশ, যিনি রাংকপন্থী-দের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকলেও এইসব ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যতিক্রমের এক সুদৃষ্টান্ত দিলেন. তিনি ছিলেন রাপালো নীতির এক সক্রিয় পথ সমর্থক।[১] তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী। বিসমার্কের "পূর্বাঞ্চল" নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঐতিহাসিক ভাবে একে সমর্থন করেন।

এই লেখক সেই সময় অনেকবার Weimar সাধারণতন্ত্রে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ও তার ইতিহাস রচনা পদ্ধতি অনুধাবন করে বুঝেছিলেন যে তাদেরকে তাদের ধারণার পুনর্মাজন করতে হবে।

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতীতের সংগে সম্পর্ক ছেদ করার কোন উদ্দেশ্য এর পিছনে ছিল না। বরঞ্চ আসল উদ্দেশ্য ছিল মূল নীতি পদ্ধতি ও ধারণাগুলিকে জিইয়ে রেখে তাদের নতুন পরিস্থিতির সংগে খাপ খাওয়ানো। একজনের এই ধারণা হবে যে তারা আত্মসমালোচনা এড়িয়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যর্থতাকে অস্বীকার করেছিল। এমনকি জার্মানীর পরাজয় ও ভার্সাইলের চুক্তির জন্য তাদের দায়িত্বকে তারা অস্বীকার করেছিল একজনের এই ধারণা হতে হবে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল. তারা জার্মান জাতির সংগে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে এরকম ধারণার জনক হতে অসমর্থ ছিল। আসলে তা কখনোই এদের অভিপ্রায় ছিল না। হাইডেলবার্গ বিদ্যালয়ের প্রধান মার্কস ওয়েবার ইতিহাসের বিষয়গত আইনগুলি বদলে "আদর্শের" ধারণার প্রধান করেছিলেন। তিনি বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর প্রভাব বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের ছাড়াও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে প্রসারিত ছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা, তাঁর ধারণাকে মার্কসবাদকে উপযুক্ত বদলা জবাব বলে মনে করত। এডুয়ার্ড মেয়ার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তৃতাকালীন বারবার বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদ হচ্ছে চিরস্থায়ী এবং এর মূল বৈশিষ্ট্য পুনরাবির্ভাবধর্মী। হানস্ রথফেলস (যিনি হিটলারের জার্মানি ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলেন এবং বর্তমানে

১। ১৯৩৫ সালে নাৎসী কর্তৃপক্ষ তাঁকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করেন।

পশ্চিম জার্মান ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট নাম) যুদ্ধোপরাধের উপর এক লেখা পড়েছিলেন। এই বিষয়টি তখন শুধু জার্মানির ভিতর ছাড়া পশ্চিমী শক্তির সংগে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সংগ্রামের এক বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। র‍্যাংকের পুরোনো বিষয়বাদের উপর ভিত্তি করে রথফেলস্ বিভিন্ন আদর্শবাদী ধারণার আশ্রয় নিয়ে এই ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন যে ভার্সাইলের চুক্তিতে জার্মানির উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক। তিনি লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন এবং রোজা লুক্সেমবার্গের সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বযুদ্ধর জন্য সাম্রাজ্যবাদী দায়িত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করেছিলেন : যদিও তখন লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না।

যুদ্ধোপরাধের সমস্যাকে যুদ্ধর উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব সমস্যার সংগে যুক্ত করা হয়েছিল। যদিও দ্বিতীয় সমস্যাটিকে কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছিল। কূটনৈতিক প্রশ্নের উপর এই গুরুত্ব আরোপ ঐতিহাসিকদের "শক্তির ভারসাম্যতা" নীতির প্রতি ঝুঁকতে সমর্থ করেছিল। তাছাড়া "পৃথিবীর ভারসাম্যতা"র নীতির পতনের পর তারা আবার র‍্যাংকের ইউরোপীয় শক্তির ভারসাম্যতার নীতিতে ফিরে যেতে পেরেছিল। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা রুর আক্রমণ করে এবং সামরিক জোটের এক ব্যবস্থা খাড়া করে ইউরোপে তাদের প্রাধান্য দৃঢ় করার প্রচেষ্টা করার পর নেপোলিয়নের যুদ্ধ ও সমধর্মী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির চর্চা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল : জার্মান জাতীয়তাবাদের গতানুগতিক ধারণাকে এক নতুন অভ্যুত্থানের জন্য মদত দেওয়া হচ্ছিল। যাই হোক, ইউরোপে শক্তির ভারসাম্যতার স্মৃতি ঐতিহাসিকগণকে আধুনিক জার্মান ইতিহাসের প্রধান সমস্যা—সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রবাদ—থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। একজন ভাবতে পারে যে সমরতন্ত্রীরা পরাজিত হলে নৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হলে এবং ভার্সাইলের চুক্তির ফলে তাদের শক্তি ও সামর্থ সংকুচিত হলে, ঐতিহাসিকরা জাতির বৃহৎ গণতান্ত্রিক অংশের জন্য সমরতন্ত্রের এক যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করতে পারত। কিন্তু তা তারা করে নি।

ফ্রেডারিখ মাইনেকের *আধুনিক ইতিহাসের রাষ্ট্রীয়করণের ধারণা* বইটি Weimar জার্মানীর বিদগ্ধ ও রাজনৈতিক মহলে যে কিরূপ চাঞ্চল্য এনেছিল তা আজকের পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। এটাই ছিল প্রথম বই যা জার্মান ইতিহাস রচনাকে সমালোচনা করেছিল। মাইনেক লিখেছিলেন : জার্মান ইতিহাস শক্তির নীতিকে যে ভাবে এক তত্ত্বে মুড়ে ও তাকে এক উচ্চ নৈতিকতার তত্ত্ব বলে প্রচার করেছিল, তা ছিল তার এক চরম ত্রুটি।" কিন্তু মাইনেক জার্মানের ইতিহাসের উপর এই আক্রমণকে জার্মান্ সমরতন্ত্র প্রতি চালিত করেন নি। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর আত্মসমালো-

চনা ঐতিহাসিক চিন্তাকে জোরদার করবে এবং তা পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির ধাঁচে এসে পৌঁছবে।

তবুও মাইনেক পশ্চিমী "স্বাভাবিক আইন চিন্তার" সমস্ত দিক গ্রহণ করবেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে তা রাষ্ট্রের প্রকৃত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং জার্মান ঐতিহাসিকতার শিকড় "রাষ্ট্রের প্রজ্ঞার" সম্বন্ধে তার স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত। এইভাবে ইতিহাসের সনাতনী আদর্শবাদী মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জার্মান ইতিহাস ও পশ্চিমী ধারণার এক মিশ্রণের পথ প্রস্তুত হয়েছিল এবং মাইনেক ভেবেছিলেন যে, তা আরও ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেছিলেন যে এই দ্বৈত নীতি "পশ্চিমের সংগে এক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমঝোতার সুযোগ এনে দেবে।"

আমরা দেখেছি যে, জার্মান উদারতাবাদের পতাকার তলায় ও জার্মান মানবতাবাদের কৃত্রিম ঐতিহ্যের নাম করে দার্শনিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে ও সমাজতান্ত্রিকভাবে সমাজতন্ত্র বিরোধী ও কমিউনিজম বিরোধী এক তত্ত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও এর রূপ নগ্নভাবে আগ্রাসী ও পাশবিক ছিল না। অবশ্য খুব কম লোকই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বজনীন বা ইউরোপকেন্দ্রীক ধারণার উচ্চতায় নিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল।

যদিও মাইনেকের দার্শনিক ঐতিহাসিক ধারণা জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রকে সমালোচনা করে নি এবং যদিও তাঁর তত্ত্বে শাসকগোষ্ঠীর কোন কোন অংশের নতুন রাজনৈতিক প্রবণতার পদধ্বনি শোনা যায় (স্ট্রেসম্যানের লোকার্নো নীতি) অনেক উল্লেখযোগ্য বুর্জোয়া ঐতিহাসিক মাইনেকের তত্ত্বর সমালোচনা করেন। জার্মান ঐতিহাসিকতা পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থিতাবস্থার পরিবেশে তার হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করেছিল, কোন সমালোচনা সহ্য করতে রাজী ছিল না, এমন কি, তা নিজেদের মধ্যে থেকে কেউ করলেও। জেরহার্ড রিটার যাঁর রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ধারণার জন্ম র‍্যাংকের চিন্তাধারার মাটিতে, ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি "পশ্চিমের স্বাভাবিক আইন ও চিন্তার জার্মান আদর্শবাদী পদ্ধতির মধ্যে গভীর সংঘাত দেখেছিলেন" এবং এর ফলে "তাদের মিশ্রণের সম্ভাব্যতায়" তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

এর থেকে একজনের এই ধারণা জন্মাবে যে মাইনেকের অসংখ্য বিরোধী পুরোনো গর্তে তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে পছন্দ করেছিল তার কারণ ভার্সাইয়ের চুক্তি সংশোধন করার জন্য এবং তাঁদের প্রতিশোধ লিপ্সা মেটানোর জন্য তারা সমরতান্ত্রিক ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করার ওপর জোর দিয়েছিল। পশ্চিমের সংগে আত্মিক ঐক্য গড়ে তোলার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল পররাষ্ট্র নীতির প্রাধান্য সম্বন্ধে র‍্যাংকের ধারণার ওপর জোর দিয়ে ওয়েমারের

জার্মানির তাদের গবেষণা চিন্তা ও আলোচনা জার্মান সাম্রাজ্যের "পূর্ব" ও "পশ্চিমমুখী" প্রবণতার ওপর নিবদ্ধ করেছিল। একজন দর্শকের মনে হতে পারে জার্মান ঐতিহাসিকরা দুই শত্রুভাবাপন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তীব্র মত পার্থক্য সত্ত্বেও তারা তাদের আদর্শ-সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ও নীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, মাইনেক লিখেছিলেন, "তাদের গভীর আত্ম সচেতনতা ও বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব সম্পদের অংশের প্রতি আগ্রহের জন্য জার্মান জনগণ ও তাদের নেতাদের কে সংশোধিত করার সাহস করবে ?" পরাজয় এই আত্মসচেতনাকে মুছে ফেলতে পারে নি এবং এই আগ্রহ আজও বিদ্যমান যদিও এই সমস্ত আশা পূরণের জন্য পুরান ক্ষমতা রাজনীতির বদলে নতুন কোন কৌশলের প্রয়োজনীয়, অপরদিকে রিটার নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, "সক্রিয়তার জন্য জাতীয় ইচ্ছাকে ভাগ্যের সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বজায় রাখতে হবে" তাঁরও ঐতিহাসিক লক্ষ্য একই ছিল তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিশোধের নীতিই হচ্ছে লক্ষ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায়। এটা ছিল "১৯১৮ সালের গণতন্ত্রপন্থীদের" থেকে খাপছাড়া। "১৯১৮ সালের গণতন্ত্রীপন্থীরা" মনে করত যে "জার্মানি তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিত্যাগ করলে পৃথিবীর নৈতিক সহানুভূতি আদায় করতে পারবে।" এটা ছিল জার্মান শ্রমিকদের অগ্রণী অংশ ও যে সব জার্মান বুদ্ধিজীবী অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে সমরতন্ত্রীর অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক বিপদ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিল, তাদের উপর সোজাসুজি আক্রমণ।

জার্মান ঐতিহাসিকেরা "শক্তির নীতি" তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল। প্রকৃত "রাষ্ট্র যুক্তির" এক মূর্ত রূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা বিসমার্ককে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু শুধু বিসমার্ককেই বাছা হয় নি, রিটার লুথার কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে লুথার "জার্মানির আত্মিক অস্তিত্বের আত্মসচেতনতার উন্নতিসাধন করেছিলেন।" তিনি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও হিণ্ডেনবুর্গের কথাও উল্লেখ করেন।

মাইনেকের উদারনীতিবাদকে পশ্চিমী শক্তির সংগে রাজনৈতিক সমঝোতা ও আত্মিক মিলনের এক স্তম্ভ হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য ঐতিহ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা "দানববাদ" নীতির প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। অবাস্তববাদী এই শক্তি জীবনের এক অংশ হিসাবে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং "রাষ্ট্র যুক্তির" উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই ধারণার প্রতিক্রিয়াশীল রোমান্টিকতা থেকে উদ্ভূত এবং তা ফ্যাসীবাদকে বোঝাবার বিভিন্ন প্রচেষ্টার অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছিল।

ওয়েমারের যুগের ইতিহাস পুরানো ধারণার দিকে আবার ঝুঁকে ছিল। তবে নতুন ঐতিহাসিক পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে তাদের নতুন রূপ দেওয়া

হয়েছিল। এই ধারণার কোনটাই জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রকে কোনভাবেই আঘাত করে নি।

তবে অতীতের কিছু সমালোচনা করা হয়েছিল, তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই ধরনের সমস্ত সমালোচনা সমরতন্ত্রী মহল থেকে বা তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে করা হয়েছিল। জেনারেল হফম্যান বিগত যুদ্ধকে এক "হারানো সুযোগ সুবিধার যুদ্ধ" বলে অভিহিত করেছিলেন। কাউন্ট রেভেন্টলো বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও এই উদ্দেশ্য সাধনের সামরিক সামর্থের মধ্যে বিরাট ফাঁকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে অবধারিতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল যে সামরিক সামর্থ্য ছিল সীমিত এবং যদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রনীতির উপর কম গুরুত্ব ও সামরিক ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করত এবং সমস্ত অর্থনৈতিক ও আত্মিক বিষয়ের উপর স্বার্থকে স্থান দিত, তাহলে ফলাফল অন্য রকমের হত।

স্মৃতিকথা ও রাজনৈতিক রচনাবলী জার্মান সমরতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল ও "পূর্ণ" যুদ্ধের ধারণা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল। এটা প্রত্যক্ষ সমালোচনা ছিল না। এর অনেকগুলো মুখ ছিল। এর মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কূটনীতি ছিল না যদিও কূটনীতিকে জার্মান সমরতন্ত্রীদের পক্ষে অনুকূল এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারার জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল জার্মান জনগণ। জার্মান জনগণকে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও নিজ শক্তি সম্বন্ধে অতি সচেতনতার জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে এইজন্য জার্মান জনগণ "মহান জনগণ" ধারণার সার্থক মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। জার্মান জনগণকে চূড়ান্ত মুহূর্তে দুর্বলতা দেখানোর জন্য এবং গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক ধারণার প্রতি আকর্ষণ বোধ করার জন্য, সমালোচনা করা হয়েছিল। হান্স হেনটিগ বিশ্ব যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক কৌশল সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন যে, "এক সদ্য শক্তিমান জাতির আত্মসচেতনতা এক অন্ধ আত্মপ্রশস্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছিল এই দৃঢ় ধারণায় যে জার্মানির যত শত্রু বাড়বে, শত্রুর পক্ষে তা তত খারাপ হবে।"

শত্রুর সংখ্যা বাড়লে জয়লাভের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হবে, এই ধারণা জাতির বা জনগণের ধারণা ছিল না। "পিছনে ছুরিকাঘাতের" ধারণার সৃষ্টি করে সমরতন্ত্র এই ধারণা ছড়িয়েছিল যে যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হচ্ছে যে যুদ্ধ জয়ের মুহূর্তে পিছন থেকে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন গজিয়ে উঠেছিল। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্যে এই ধারণা চালু করা যে জার্মান জেনারেল স্টাফ হচ্ছে অপরাজেয় এবং তাদের যুদ্ধ কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ। সমরতন্ত্রকে তখনও পুনর্বাসিত করা হয় নি কিন্তু তার তত্ত্ব ও ঐতিহ্য পুনরায় ফিরে এসেছিল। বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি,

এমনকি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরাও তা দেখেও না দেখার ভান করেছিল। এর মধ্যে জেনারেল ভিনসেনজ মুলার বলেছিলেন যে, "ওয়েমার সাধারণতন্ত্রে এক প্রতিশোধাত্মক যুদ্ধের উন্নতি হিসাবে ঐতিহ্যকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে।"

এই বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা মনে করি যে সমরতন্ত্রী আন্তঃজার্মান তত্ত্বর এক মূল বৈশিষ্টাকে কিঞ্চিৎ সংশোধিত রূপে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সামরিক তত্ত্ব হিসাবে জেনারেল সিফট এক তত্ত্বর অবতারণা করেছেন। তিনি এক আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর কথা ভেবেছিলেন। তা হবে ভবিষ্যতের বিশাল বাহিনীর ভ্রূণ, দুই যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমর কৌশলের জনক শ্লাইফেনের মত (তিনি মৃত্যু-শয্যায় প্যারির এক তির্যক আঘাত সম্বন্ধে বলেছিলেন "ডানদিককে দুর্বল করো না") জেনারেল সিফট তার সমসাময়িকদের ও উত্তরসূরীদের তাঁর··· *"প্রাচ্য ও পাশ্চ্যতের মধ্যে জার্মানি"* বইয়ে, দুই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ এড়াতে এবং রাজনৈতিক সাহায্য পাওয়া গেলে অপরদিকে আক্রমণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পরিবেশে ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গকে জার্মান ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাকে "এক ঐতিহাসিক মূর্তি" হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল, সমরতন্ত্রী ঐতিহ্যর প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

এটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে কাইজারের সেনাবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল ওয়েমারের সময়ে জার্মান সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলের দক্ষিণপন্থী নেতারা যারা শ্রমিক শ্রেণীকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিল, সমরতন্ত্র, ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধর ক্রমবর্ধমান বিপদের দিকে পিঠ রেখেছিলেন। "অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের" অপপ্রচারে ব্যস্ত থেকে এবং "অপেক্ষাকৃত কম অন্যায়" তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে তারা হিণ্ডেনবুর্গকে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছিল এবং ঘনঘন এই আশ্বাস দিয়েছিল যে তিনি হচ্ছেন জার্মান সংস্কৃতির মানবতাবাদী ঐতিহ্যর মূর্ত প্রতীক। জেনারেল হিণ্ডেনবুর্গ নিজে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি সামরিক বিদ্যালয় ছাড়ার পর আর কিছু পড়াশুনা করেন নি। বিশদশকের মাঝামাঝি জার্মান শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিরাট প্রাচীরপত্রে হিণ্ডেনবুর্গকে "আমাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে অংকিত করা হয়েছিল। তখন কেউই জানত না যে, জার্মান সমরতন্ত্রীদের এই মূর্তি কাদের বাঁচিয়েছিল।

এইভাবে ওয়েমার সাধারণতন্ত্রের ওপর যবনিকা নেমে এসেছিল। এর সংবিধানের ৪৮ নং ধারা সমরতন্ত্রী ও নাৎসীদের একে ধ্বংস করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ইতিহাসের পরিহাস খুব মর্মান্তিক। ইতিহাসে ঘটনার যা যোচড় তা কেবল এমন এক মহান শিল্পীর পক্ষে যিনি গভীর ট্র্যাজিক সত্য উপস্থাপিত করতে পারেন, ওয়েমার মঞ্চে সমরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন শক্তি যে দৃশ্যের অবতারণা করেছিল তা বার্টোল্ট ব্রেখট তাঁর

"ক্যারিয়ার অফ মিস্টার আরটুরো উই" নাটকে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন। এই দৃশ্য জার্মানি ও সমগ্র বিশ্বের পক্ষে এমন এক বিয়োগান্তক নাটক রচনা করেছিল যার গভীরতা, আয়তন ও ক্ষতি আজও ঠিক মেপে ওঠা পুরো-পুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জার্মানির বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা আজও ফ্যাসীবাদের গোপনীয়তার অবগুণ্ঠন খুলে দেয় নি। তারা এরকম কোন চেষ্টাই করেনি। তার কারণ তারাও কোন না কোন রূপে জার্মান সমরতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের আদর্শকে মূর্ত করেছিল এবং এর মূল্য তাদের দিতে হয়েছিল। জার্মানিতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের নিজেদের ছোট করে ফ্যাসীবাদী আগ্রাসনের স্তাবকে পরিণত হয়ে হয়েছিল।

৩

ক্ষমতায় এসে হিটলার ও তাঁর নাৎসীচক্র ওয়েমারের সময়ের সরকারী বুর্জোয়া তত্ত্বকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং এই ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল যে প্রুশিয়ান জার্মান ঐতিহ্যর মূর্ত প্রতীক হচ্ছে দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ও হিণ্ডেনবুর্গ। তারা হচ্ছে সেই ঐতিহ্যর বাহক। এটাই ছিল পোটসডামে অনুষ্ঠিত জঘন্য নাটকের উদ্দেশ্য। সনাতনী প্রুশিয়ান ঐতিহ্যর পোটসডামে, প্রুশিয়ান নির্বাচক ও রাজাদের কবরের পাশে, বংশীর ধ্বনির মাঝে, হিটলার তাঁর বিশাল উৎসব করেছিলেন। সেখানে কালো স্বস্তিকাঙ্কিত লাল বস্ত্রের পাশাপাশি শত শত প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর নিশান সমরতন্ত্র ও নাৎসীবাদের ঘনিষ্ঠ আঁতাত এবং তাদের মূল, ঐতিহ্য, অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্যর একতার কথা ঘোষণা করেছিল। যদি আজকে হিটলারের জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের পর, কেউ একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সমাজতন্ত্র, রাজনীতি বা আদর্শের দিক থেকে এরকম কোন আঁতাতের অস্তিত্ব ছিল না, তাহলে আমি বলবো যে তার সমস্ত প্রচেষ্টা হচ্ছে চূড়ান্ত ভণ্ডামী। হিটলার সনাতনী প্রুশিয়ান জার্মান সমরতন্ত্রী ঐতিহ্যের মধ্যে বৃহত্তর অর্থ চুকিয়েছিলেন এবং তাকে তার আরম্বড়পূর্ণ বক্তৃতামালায় এবং জাতীয়-সমাজতন্ত্রের জলদস্যুসুলভ প্রয়োগে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি এই সমরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন যে যুদ্ধ সমাজের এক স্বাভাবিক অবস্থা, এক "শক্তিশালী রাষ্ট্রের" চিরস্থায়ী কার্যকলাপ। তিনি বলেছিলেন যে তা হচ্ছে "শক্তিশালী জনগণের বিপ্লব" এবং "জীবনের চিরন্তন এবং সবথেকে জোরালো অভিব্যক্তি,"

নাৎসী জেনারেল স্টাফদের মুখপত্র Deutsche Wehr ঘোষণা করেছিল যে প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যার ফলে জার্মানির জনগণ "যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার সাহস করবে না।" ঐ পত্রিকায় বলা হয়েছিল : যুদ্ধ তাদের প্রধান অনুভূতি, প্রধান আনন্দ

পাপ ও ক্রীড়া হওয়া উচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে, ফ্যাসীবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ গ্রহণ করে যারা পৃথিবী গ্রাস করতে মনস্থ করেছিল এবং বিভিন্ন দেশকে হয় জার্মানিকরণ করতে বা নিশ্চিহ্ন করতে স্থির করেছিল। হিটলার বলেছিলেন, "জাতীয় ও বর্ণবৈষম্যমূলক চিন্তা রক্তের মধ্যে প্রবাহিত এবং ক্ষমতায় আসার অনেক আগে তিনি আগ্রাসী পররাজ্যলোভী, ফ্যাসীবাদী পরিকল্পনার মানব-বিদ্বেষী উদ্দেশ্যগুলি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি Mein Kampf-এ লিখেছিলেন: "জার্মানিকরণ সম্ভব: কিন্তু জনগণকে তা করা যাবে না, অতীতে যে সব জায়গা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলপূর্বক অধিকার করেছিল, সেই সব স্থানকে জার্মানিকৃত করা গিয়েছিল।"

নাৎসীবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কমিউনিজম এর প্রতি ঘৃণা। স্বদেশে নাৎসীরা কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক ও সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে এক অশ্রুতপূর্ব ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছিল। ইহুদীদের সমূলে বিনাশ করার জন্য তাদের সামনে কমিউনিজম বিরোধী টোপ ফেলা হয়েছিল। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমী শক্তির তথাকথিত মিউনিখ চুক্তির উন্নতির জন্য এবং দুটো রণাঙ্গনে যুদ্ধ এড়াবার জন্য এবং শত্রুদের একের পর এক আঘাত হানার জন্য কমিউনিজম বিরোধিতা করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধের আবর্তনে জড়িয়ে ফেলে নাৎসীরা ইউরোপ বিজিত অঞ্চলে তাদের জার্মানিকরণ পরিকল্পনা নীতি বিস্তৃত করেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। বিশ্ব সংস্কৃতির সম্পত্তি ও সম্পদের উপর ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড চালিয়েছিল। বিজয়ের নীতিকে ধরা হয়েছিল জার্মান মিশনের একটা ঐশ্বরিক বস্তু-অন্ত্রকীকরণ, যা ঐতিহাসিকেরা ফুয়েরারকে "সব চেয়ে বুদ্ধিমান জেনারেল" বলে গৌরবোজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়ার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পেয়েছিল।

এটা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের যুক্তি, বর্ণশ্রেষ্ঠতা তত্ত্বের ধারণা ও ফুয়েরারের দর্শন। এর পিছনে ছিল জার্মান জনগণের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও অন্যান্য দেশের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার নীতি। বস্তুবাদী সত্যর প্রতি নির্বিকার এই নাৎসী সাম্রাজ্যবাদ এক পূর্ব পরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণাকে পদদলিত করেছিল এবং তার বদলে রোজেনবার্গের "বিংশ শতাব্দীর রূপকথা" প্রভৃতি অবাস্তব মতবাদের প্রবর্তন করেছিল কেননা সেগুলি তাদের দস্যুসুলভ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পক্ষে উপযোগী ছিল।

এই রকম পরিস্থিতিতে এটা অবধারিত যে নাৎসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অটো ওয়েস্টফাল, ওয়াল্টার ফ্রাঙ্ক ও ক্রিস্টোফ স্টেডিং-এর মত উগ্র মিথ্যা ভাষীরা প্রাধান্য লাভ করবে। তাঁরা হিটলার, গোয়েবলস ও রোজেনবার্গের

উগ্রতম চিন্তাধারার প্রবক্তা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সনাতনী জার্মান ঐতিহাসিকরা যুদ্ধ ও আক্রমণের ফ্যাসীবাদী নীতি প্রচার করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। ১৯৩৭ সালে রিটার লিখেছিলেন: যত বেশী রাষ্ট্র ও জাতি একত্রিত হতে পারবে যা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম লক্ষ্য, ততই ভবিষ্যতে জার্মানীর স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও সম্মান সুরক্ষিত করার আশা বৃদ্ধি পাবে।" তিনি তাঁর এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন যে ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র জার্মানীর পূর্ব নির্ধারিত ভূমিকা নির্দিষ্ট করবে এবং "রাইনে আর কখনোই জার্মানীর অক্ষমতা ও লজ্জার বিষণ্ণ চিত্র তুলে ধরা হবে না।" রিটার তৃতীয় বিশ্বের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসের ফলস্বরূপ যে অসম্মান, তার থেকে দ্রুত উত্থান এক আরও বেশী উজ্জ্বল ও মহৎ সময়ের সূচনা করছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রমাণ করেছে যে সে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ছিল ভ্রান্ত এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল অনুরূপ ভ্রান্ত।" এইবার জার্মান সমরতন্ত্র শুধু মাত্র রাইনেই পরাজয় স্বীকার করে নি। তাকে ভোলগা থেকে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

কাইজারের সময়ে বিশ্বশক্তির সাম্রাজ্যবাদী জার্মান ধারণা বস্তুবাদী ছিল এবং বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যর উপর তার ভিত্তি ছিল। হিটলারের ধারনা ছিল ব্যাপক এবং তাতে দস্যুসুলভ, লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধের এক যুগের কথা বলা হয়েছিল। হিটলার বলেছিলেন যে শুধু একটা বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। তার কারণ এক হাজার বছরের সাম্রাজ্যর একমাত্র বহিঃপ্রকাশ এক স্থায়ী যুদ্ধই জার্মান জনগণকে চূড়ান্ত প্রভুত্বে উন্নীত করতে পারে। "শ্রেষ্ঠতর জাতি" তখন তার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়ে—তা হবে জীবনের প্রকৃষ্ট রূপ যখন মানুষের সংগে গুহামানবের জীবনের মিল থাকলেও সে এক কঠোর- সংগে সভ্যতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে।

সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের স্বয়ংসৃষ্ট নীতির নৈরাশ্যমূলক ব্যবহারের নিদর্শন ইতিহাসে আর নেই, যদিও হিটলার ঢাক পিটিয়ে নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বর তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, যা ছিল পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার-বিদদের কিছু আধা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমষ্টি, তিনি নিজে তাতে বিশ্বাস করতেন না এবং একে এক সরকারী নীতিতে পরিণত করেন তিনি ভেবেছিলেন যে এতে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। তিনি একদিন স্বীকার করেছিলেন: "আমি ভালোভাবেই জানি যে বৈজ্ঞানিকভাবে জাতি বলে কিছু নেই···কিন্তু একজন রাজনৈতিক হিসাবে আমার এমন এক ধারণার প্রয়োজন যা আমাকে বর্তমান ঐতিহাসিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে এবং তার বদলে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভিত্তি

সমেত এক নতুন ইতিহাস বিরোধী ব্যবস্থা তৈরী করতে সমর্থ হবে।" কিন্তু ফ্যাসীবাদের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য ভিত্তি ছিল না এবং তার স্বভাব অনুযায়ী এ তা থাকতে পারে না। তার জন্য এর অনুগামীদের মধ্যে এই নীচতম প্রবৃত্তি জাগিয়েছিল। এক গণ-উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল এবং তা অত্যাচারের ভয়ের সংগে যুক্ত হয়ে "নেতার" অনুমানের প্রতি এক অন্ধ আনুগত্যর সৃষ্টি করেছিল।

অবাস্তববাদ, নীচতম প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি, জান্তব জাতিবাদ, যা আন্ত-জার্মান বাদীদের চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদকেও নিষ্প্রভ করে দেয়। নাৎসী রাষ্ট্র ও ফুয়েরার বাদের ধারণা ও "রক্ত ও মাটির" রহস্যময় ধারণা, প্রতিক্রিয়াশীল আপাত রোমাণ্টিক প্রতীকের ছদ্মবেশ নিল ও দাম্ভিক সাহসের সংগে যুক্ত হয়েছিল এবং তা এক ত্রাসের রাজত্ব ও বন্দী শিবিরের এক সুসংগঠিত ও ভয়াবহ ব্যবস্থাকে ঢেকে রেখেছিল। নিয়ন্ত্রিত জার্মান জাতীয় সমাজতন্ত্র ছিল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের একনায়কতন্ত্রর এক আবরণ এবং বিশাল সুবিন্যস্ত পার্টি ছিল ধনীদের শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইউরোপে এই নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ, ক্ষুদ্র, সমস্ত রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন। জাতির নিশ্চিহ্নকরণ ও পৃথিবীতে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করা। নাৎসীদের উগ্র কমিউনিজম বিরোধিতা তাদের অভূতপূর্ব সশস্ত্র আক্রমণ ও অন্তর্ঘাত মূলক কার্যকলাপকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল।

এই ছিল নাৎসীবাদের অবাস্তব, অপরিণত ও নৈরাশ্যমূলক প্রকৃতি। এর বিপদ ছিল এই যে, এই ব্যবস্থা সাড়া জাগাতে পেরেছিল। জনগণের নীচতম প্রবৃত্তিগুলিকে সুড়সুড়ি দিয়ে এবং ঐ প্রবৃত্তিগুলি উস্কে দিয়ে, এই ব্যবস্থা জাতির মানসিক প্রবণতা ও তার বিভিন্ন শ্রেণীর বাস্তব ও কল্পিত প্রয়োজন গুলির সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। আনুগত্যর পুরোনো অভ্যাস, "প্রকৃত জার্মান" জীবনযাত্রার প্রতি বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী ঔদ্ধত্য এবং "প্রকৃত জার্মান" ধারণার দ্বারা পুষ্ট হয়ে এই ব্যবস্থা, যুদ্ধ প্রস্তুতির অর্থনৈতিক সুবিধাগুলির দ্বারা, যুদ্ধের দ্বারা বিজয়াভিযানের নীতির প্রাথমিক সাফল্যে দ্বারা, বিজিত রাজ্যগুলির নগ্ন লুণ্ঠনের দ্বারা। এবং জার্মানীতে বিদেশী শ্রমিকদের যাদের কার্যতঃ ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল, আনয়নের দ্বারা লাভবান হয়েছিল।

তৃতীয় রাইখের ইতিহাস ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু তা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অধ্যায়। এক ভবিষ্যৎ দর্শন দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে এই ব্যবস্থা এক ক্ষমতার যুগের কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তার রাজত্বের পূর্ণতার ৯৮৮ বছর আগেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ইহা স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ১২ বছর যার মধ্যে প্রথম ৬ বছর ধরে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও মধ্য ইউরোপ দখল করা হয়েছিল এবং শেষ ছয় বছর ধরে

বিশ্বশক্তির জন্য ইতিহাসে অভূতপূর্ব বিশ্বযুদ্ধ চালানো হয়েছিল। ফ্যাসীবাদী আদর্শ এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের বিপজ্জনক ফলশ্রুতি এর আবির্ভাব ও ক্ষমতা লাভের এক সমাজতান্ত্রিক গবেষণার প্রয়োজন, কেন না এর পতন ঘটেছিল জার্মানিতে সামরিক শক্তিগুলির ভেঙে পড়া ও আত্মসমর্পণ করার পর।

৪

এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, পশ্চিম জার্মানিতে আজকের সমরবাদীরা হিটলার ফ্যাসিবাদ ও তার সমালোচিত তত্ত্বকে ধূলিসাৎ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আগে ১৯৪৫ সালের নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের পর, তারা ১৯১৮ সালের পরাজয়ের পরের থেকে আরও অনেক গভীরভাবে চিন্তা করছিল, কি ভাবে আবার তার "কেঁচে গণ্ডুষ" করতে পারে। তাদের "গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন" আসলে কোন পুনর্গঠনই ছিল না এবং তা কখনই গণতান্ত্রিক ছিল না। যখন নাৎসী যন্ত্রের "ছোট ছোট চাকাকে" নাৎসীবাদ "অবলুপ্তির" নামে আমলাতন্ত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হচ্ছিল, প্রকৃত শাসকরা—একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও সমরতন্ত্রীরা যারা একবার হিটলারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল এবং তাঁর সন্ত্রাসপূর্ণ রাজত্বকে সমর্থন করেছিল—এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা খাড়া করেছিল যা বলা হয়েছিল সংসদীয় কিন্তু তার ভিত্তি ছিল হিটলারী আমলাতন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা। অতীতের ফ্যাসিস্ত বিরোধের মত তাদের এক রাজনৈতিক ও আদর্শনৈতিক বাহনের প্রয়োজন ছিল যা নতুন পরিস্থিতিতে তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের পক্ষে সহায়ক হবে।

সুতরাং তারা রাজনৈতিক ধর্মবাদের উপর আবার জোর দিয়েছিল। তার সংগে নাৎসীবাদের কোন মিল নেই, না থাকায় যে খৃষ্টীয় শিক্ষার উপর ভিত্তি করা "গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের" প্রবক্তা হিসাবে পুনরাবির্ভূত হতে পেরেছিল। ধর্মবাদীরা "ব্যক্তির স্বাধীনতা" নিয়ে সোরগোল তুলেছিল এবং বলেছিল যে, তারা শ্রেণী আধিপত্য ও শ্রেণী সংগ্রামের বদলে "শ্রেণী শান্তি", "সামাজিক অংশীদারী" ও সমন্বয়ের এক ব্যবস্থা আনতে সক্ষম। কিন্তু তাদের "গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন" ছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের রাজনৈতিক ও আদর্শনৈতিক প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার এক ছুতোমাত্র। "সকলের জন্য পুঁজিবাদ" বা "জনগণের পুঁজিবাদ" প্রভৃতি নামের মোড়কে "স্বাধীন বাজারের অর্থনীতির" ধারণা ছিল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের পুনরুজ্জীবন, তাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যোগাযোগের পুনরুদ্ধার। এই সময়ের অনুকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার ও সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে নতুন চাল প্রবর্তন করার এক ছুতো মাত্র। জনগণের মধ্যে শ্রেণীচেতনার উন্মেষে বাধা সৃষ্টি করা, তাদের

স্বার্থকে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক চাহিদার মধ্যে আবদ্ধ রাখা ও পার্টি-বুর্জোয়া সমৃদ্ধির পেছনে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। "সামাজিক অংশীদারীর নীতি হচ্ছে নাৎসীদের" জনগণের "জোটের" এক আধুনিক সংস্করণ মাত্র। কিন্তু এই সামাজিক ধারণাগুলি হচ্ছে সমান-ভাবেই সমাজ বিরোধী। তবে একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে, ফ্যাসীবাদীরা বলপূর্বক তাদের চিন্তাগুলিকে জনগণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে এক বৃহত্তর আরও সুষ্ঠু কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বলেছিল যে "বিশ্বজনীন অসন্তোষের সময়ে প্রধান সমাজ ব্যবস্থার কোন তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন নেই" কেন না, এর অলৌকিক কার্যাবলীর কারণ হচ্ছে, "সামাজিক বাজার অর্থনীতি।" এটা অবশ্যই অতিরঞ্জিত কিন্তু এর মধ্যে একটু বাস্তববাদী উপাদান আছে। অপরদিকে রাজনৈতিক ধর্মবাদের প্রবক্তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ধারণা চালু করেছিল তা ছিল এক রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করার কৌশল। যে রাষ্ট্রযন্ত্রে নাৎসীরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে আছে। এরপরে সনাতনী সামরিক জোট এবং জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রকে আক্রমণাত্মক জার্মান সমরতন্ত্রের এক ঘাঁটি হিসাবে গঠন করার জন্য দ্রুত কাজ চালানো হয়েছিল।

এই ধর্মীয় সামরিক রাজত্ব দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়ে এর প্রকৃত রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এক ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। এইসব শক্তি প্রতিক্রিয়ার এই পুনরাবির্ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকৃত পুনর্গঠনের কথা বলেছিল। এইভাবে শুধু কমিউনিজম ধারণার বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত প্রগতিশীল ধারণার বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক আক্রমণ চালানো হয়েছিল। কমিউনিজমকে আইন ও সমাজ বহির্ভূত বলে বর্ণনা করে হয়েছিল। তাছাড়া সমস্ত সমরতন্ত্র বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালানো হয়েছিল। রাজনৈতিক ধর্মবাদ ও সমরতন্ত্র নিজেদের "শৃঙ্খলা" ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার রক্ষক হিসাবে জাহির করেছিল। "গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন" ক্রমশঃ একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সমরতন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত এক প্রায়-স্বৈরাচারী শাসন হয়ে উঠেছিল।

অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত নেতৃত্বের ধারণাকে মদত দেবার জন্য "মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর" ধারণাটির প্রচার চালানো হচ্ছে। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, বারবার সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিভিন্ন মোড়কে এই ধারণার প্রচলন আমরা দেখেছি। নিৎশের 'অতিমানব' তত্ত্ব বা স্পেংগলারের অতি-ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ যা নাকি পশ্চিমের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের সর্বোচ্চ প্রকাশ, এর উপর আছে উগ্রপন্থী ফ্যাসীবাদী তত্ত্ব যা *ফুয়েরারবাদকে* এক ধর্মীয় মতবাদে পরিণত করেছিল এবং জনগণকে এই বলে প্ররোচিত করেছিল

যে লৌহকঠিন সংকল্প ও ক্ষমতার দ্বারা সমৃদ্ধ নাৎসী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও সৈন্যসুলভ আনুগত্য জাতীয় জার্মান আদর্শের একমাত্র প্রকাশ।

তৃতীয় রাইখের পতনের পর ও ফ্যাসিবাদী আদর্শ ধূলিসাৎ হবার পর এই সমস্ত ধারণা বিশেষতঃ যেগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মূল নীতির পরিপন্থী ছিল সেগুলি নেপথ্যে প্রস্থান করেছিল। মোট কথা জার্মান সাম্রাজ্যবাদ "স্বাধীনতা," "গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন" প্রভৃতি শব্দের আড়ালে তাদের তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। সুতরাং সীমিত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার প্রবক্তারা প্রথমে সমাজতান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধাঁচের গবেষণা চালিয়েছিল ও পুরোনো ইতালীয় সীমিত শ্রেষ্ঠত্বর তাত্ত্বিকদের লেখা পুনঃপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু আবার যখন পশ্চিম জার্মানী এক ধর্মীয়-সমরতন্ত্রী দেশে পরিণত হচ্ছিল তখন সীমিত শ্রেষ্ঠত্বর ধারণার পুনরাবির্ভাব হয়েছিল যদিও তার রূপ ছিল অন্য-রকম এবং তা ছিল সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী ও সমরতন্ত্রী নীতির এক অংশ। বনের মন্ত্রীপরিষদের এক সদস্য জি. স্ক্রোডার বলেছিলেন যে "চারপাশের সামাজিক অসন্তোষ বা নাৎসী গোষ্ঠীর ভয়াবহ কার্যকলাপ আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সীমিত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অর্থহীন।"

সীমিত শ্রেষ্ঠত্ব ধারণার প্রবক্তাদের অনেকে বলে যে "সমষ্ঠিকৃত স্বৈরাচারী ব্যবস্থায়" "সীমিত শ্রেষ্ঠত্বর" ধারণার উপর "মিথ্যা ভাষণের" জবাবে তারা "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত" এক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবে। তারা আসলে কি বলতে চেয়েছিল?

জে. এইচ. নোল. উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন: "সীমিত শ্রেষ্ঠত্বর ধারণা হচ্ছে এক গতিশীল ধারণা যা প্রযুক্ত হয় এক সীমিত গোষ্ঠীর ওপর যাঁরা শৃঙ্খলা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত করতে সক্ষম।" ও. স্ট্যামার অপরদিকে বলেছিলেন যে, সীমিত গোষ্ঠী হচ্ছে সামাজিক ও শ্রেণীসুবিধার প্রকাশের থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সূচিত করে। ম্যাকস্ জু সোবশ্ বিশ্বাস করেছিলেন যে "প্রকৃত" গণতন্ত্রেও" সীমিত গোষ্ঠী হচ্ছে "গুণগতভাবে এক অভিজাত আদর্শ।" এম্ ক্রয়েড বলেছিলেন: "সীমিত গোষ্ঠী এমন কতকগুলি নিজস্ব গুণ দ্বারা চিহ্নিত সেগুলি চুম্বকের মত মানুষকে আকর্ষণ করে। এর অর্থ ভাগ্যবিধাতা দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি যাঁরা সমাজকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেন।"

এই মতবাদের কোরাসে দুটো প্রবণতা লক্ষিত হয় যা সীমিত শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্বর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে। প্রথমতঃ জনগণের সংগে সীমিত শ্রেষ্ঠদের সমীকরণ এবং জনগণ হচ্ছে "পেশা, সামাজিক মর্যাদা, আয় বা শিক্ষা দ্বারা চিহ্নিত জনগণ" নয় (ডবলিউ মার্টিন মনে করেন যে, এই কারণের জন্য

একজন শিল্পপতিকে জনতার মধ্যে এক অদক্ষ শ্রমিকের পাশে স্থান দেওয়া যায়); দ্বিতীয়তঃ সীমিত শ্রেষ্ঠদের সংজ্ঞা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে নিহিত কিন্তু তা এক অবোধ্য শক্তি দ্বারা চালিত। ক্রয়েন্ড বলেছিলেন: "এই শক্তি হচ্ছে এক দুর্ঘটনা, এক আশীর্বাদ, এক দৈব ঘটনা, মানবিক অসাম্য হচ্ছে এমন এক সত্য যা······যার কোন ব্যাখ্যা নেই।"

"গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের" সময়ে সমাজের গঠন পরীক্ষা করে এই সীমিত শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্বের প্রবক্তারা অবাস্তববাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এই তত্ত্ব হচ্ছে সামাজিক শাসক শ্রেণীর এক নতুন কৌশল যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদী শাসনের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সংঘাতকে ঢেকে রাখা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীর সংগে উদারনীতিবাদ ও গণতন্ত্রের কোন সংঘাত নেই এটা প্রমাণ করার প্রচেষ্টায় নোল বলেছিলেন যে, "শুধুমাত্র বৃহৎ কারিগররা" আধুনিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এরকম ধারণা করা হাস্যকর যে এই সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক ধারণার পরিকল্পনা করা হয়েছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য। প্রধান তাত্ত্বিক ধারা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা 'অর্থনৈতিক' বিস্ময়ের প্রধান কারিগর হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা নিতে চায় এবং দেখাতে চায় যে জনগণ ''জনগণের পুঁজিবাদ' গড়ে তোলার জন্য যে পরিশ্রম বিনিয়োগ করছে, অতএব এই ব্যবস্থায় তাদের উন্নতি সম্ভব। নতুন সামাজিক মতবাদের নামে জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা এক অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়েছে। বৃহৎ ব্যবসায়ের ইতিহাসের জন্য মার্কিন সখ নকল করে পশ্চিম জার্মানীর বইয়ের বাজার, ভোগলার, ক্রুপঃ থিশেন এবং অন্যান্য জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের প্রশংসা সম্বলিত জীবনী ও আখ্যানে ছেয়ে গেছে। এটা স্পষ্ট যে লেখকেরা, এই সমস্ত যোদ্ধা ''উজ্জ্বল অস্ত্রশাস্ত্রে" ভূষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রসার, আক্রমণ ও দুটো বিশ্বযুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে।

এর সংগে ধর্মীয়-রাজনীতির রাজনৈতিক তত্ত্বর অপরদিকের কিছু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে; প্রগতিশীল শক্তিগুলি অর্থাৎ কমিউজিম, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্র হিসাবে পবিত্র আঁতাতে পুনরুজ্জীবন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন ফ্রস্টার ডালেস ও পশ্চিম জার্মানীতে কনরাড এ্যাডেনহবার এই তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। এই তত্ত্ববাদ অবশ্য তার রাজতান্ত্রিক নীতির পুঁজিবাদের বৈধতা ও স্বাধীনতা প্রচার করে, এই তত্ত্ব "স্বাধীনতা" ও "গণতন্ত্র"র কথা ব্যবহার করেছে এবং "স্বৈরাচারিতা" ও "সমষ্টিবাদের" বিরোধিতা করেছে। পবিত্র আঁতাতের প্রবক্তারা খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টবিরোধীদের তুলনা দিয়ে "ক্রীশ্চান

পশ্চিমের" সংগে "কমিউনিস্ট পূর্বের" তুলনা করেছে এবং এটাকে ন্যাটো সংগঠনের আগ্রাসনাত্মক কার্যকলাপের এক ছুতো হিসাবে ব্যবহার করছে। পশ্চিম জার্মানী হচ্ছে ন্যাটো সংগঠনের এক কেন্দ্রভূমি ও ইউরোপের প্রধান ঝটিতি বাহিনী। সক্রিয় ও উগ্র কমিউনিজম-বিরোধিতা হচ্ছে ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির ধর্মীয় রাজনৈতিক ধারণার উৎস। ন্যাটোয় পশ্চিম জার্মানির স্থান যতই দৃঢ় হচ্ছে প্রতিশোধ লিপ্সা ততই প্রকট হয়ে উঠছে। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিশোধলিপ্স. তত্ত্বর বিবর্তনে বিশেষ বিশেষ ঘটনার আলোচনা প্রয়োজনীয়।

৫

১৯৪৫ সালে বিপর্যয়ের পর, জার্মানিতে ঐতিহাসিক-দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তা এক সময় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। নিও-র‍্যাংক উদারপন্থীদের অন্যতম মাইনেক ১৯৪৬ সালে লিখেছিলেন "জার্মান ইতিহাসে অনেক দুরূহ সমস্যা ও অপ্রিয় ঘটনা বিদ্যমান। কিন্তু যে সমস্যার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং যে বিপর্যয় আমাদের ওপর দিয়ে গেছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই।" মাইনেকের অনুগামী জেরহার্ড রিটার একই সুরে কথা বলেছেন: "আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমাদের রহস্যময় ইতিহাসের ওপর একখণ্ড মেঘ এসে পড়েছে। যখন ভবিষ্যৎ দেখা যাচ্ছে না তখন অতীতের কোন ব্যাখ্যা করা চলে না।" যাদের অতীতের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতের নতুন পথের সন্ধান দিতে বলা হয়েছিল তাদের আদর্শগত অবস্থাকে তিনি "অভূতপূর্ব জড়তা ও হতবুদ্ধিতা" বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তখনোও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের কয়েক বছরেই, যারা জার্মান উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও মানবতাবাদের ধারক বলে ভান করেছিল, তারা তাদের করণীয় কি তা বুঝতে পেরেছিল এবং পশ্চিম জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাদের সামনে কি কর্তব্য নির্দিষ্ট করেছে তা চট করে বুঝতে পেরে এমন সব দার্শনিক ঐতিহাসিক মতবাদ খাড়া করতে আরম্ভ করেছিল যা জার্মান সমরতন্ত্রীদের সম্মান এবং তাদের রাজনৈতিক নীতির আড়ম্বর পুনরুদ্ধার করবে, যা বজায় রাখার জন্য যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমে তারা হিটলারের জার্মানির সামরিক পরাজয় এবং তার ফলে যুদ্ধোত্তর শক্তির ভারসাম্যতা হিসাব করেছিল এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তাদের পূর্ব ধারণা সংশোধিত করেছিল। সমরতন্ত্রী ঐতিহ্য থেকে চলে আসার আদৌ কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না; তারা এক রাজনৈতিক মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছিল যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক কর্তব্যর পক্ষে সহায়ক ছিল।

জার্মানির বিভাজনের অল্পদিন আগে, প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান জাতীয়তা-

বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা আঁচ করে, রিটার ঘোষণা করেছিলেন যে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতেই "জার্মান ইতিহাসের ঐতিহ্যবাদী ধারণার সংশোধন এক অবশ্য করণীয় রাজনৈতিক কর্তব্য।" এটা ঠিক যে রিটার আধুনিকতার মূল বিষয় থেকে শুরু করেছিলেন "আমাদের কি হিটলারবাদকে প্রুশিয়ান-জার্মান রাজনৈতিক চিন্তার অমোঘ পরিণতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত? দিগ্বিজয় ও আক্রমণের যে অপরিণত নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল তা কি প্রুশিয়ান-জার্মান রাজনীতির বৈশিষ্ট্য? কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী এক যথার্থ সমাধানের রাস্তা বন্ধ করেছিল, এর কারণ রিটারের সমালোচক মার্কসবাদী ওয়ার্ণার বার্টহোল্ড ঠিক ভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে রিটারের দৃষ্টিভঙ্গী ফ্যাসিবাদের মূল সমস্যা এবং তার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূলগুলিকে এড়িয়ে গেছে। শুধু মাত্র আদর্শগত ঐতিহ্যর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে রিটার বুর্জোয়া ইতিহাস রচনা কৌশল ও পশ্চিম জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক লেখনীর গাড্ডায় পড়ে গিয়েছিলেন। মাইনেক ওয়েমারের যুগে লিখিত এক প্রবন্ধে জার্মান চিন্তার সংগে পশ্চিমের ধ্যান-ধারণার এক মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। রিটার পশ্চিমের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গীর সংশোধন করেছিলেন, মাইনেকের দৃষ্টিভঙ্গীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন এবং আধুনিক জার্মান ইতিহাসের মূল সমস্যা —সমরতন্ত্র নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

জন হুইলার বেনেটের *দি নেমেসিস অফ পাওয়ার* নামক বইটির জার্মান অনুবাদ বিভিন্ন বইয়ের দোকানে দেখা দেবার পর সমরতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে এক তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। এই বইয়ে বর্তমানকালের (১৯১৮-৪৫) রাজনৈতিক ঘটনায় জার্মান সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এটা সাধারণ অর্থে জার্মান সমরতন্ত্রের ইতিহাস ছিল না, এটা জার্মান সেনাবাহিনীর ইতিহাসও ছিল না। তথ্যের সাহায্যে এই বইয়ে দেখানো হয়েছিল কিভাবে জার্মান সেনাবাহিনী ১৯১৮ সালের পরাজয় থেকে সুবিধা আদায় করে কি করে তার শক্তি সঞ্চয় করেছিল এবং ওয়েমার সাধারণতন্ত্রে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক উপাদান হয়ে উঠেছিল। হুইলার বেনেট দেখিয়েছিলেন কি ভাবে জার্মান সেনাপতিরা রাজনৈতিক গণরাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তি ও প্রভাব সঞ্চয় করেছিল এবং তারপর কিভাবে নাৎসীদের ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল। "এটা হচ্ছে কিভাবে জার্মান সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল করে ছায়ার জন্য কায়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তার কাহিনী" এবং এই সব কার্য কলাপের নিয়তির শিকার হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ লেখক আরও লিখেছিলেন যে কিছু দিক থেকে এটা ছিল এক "নৈতিক শিক্ষামূলক গল্প" তিনি সেই সব দিনের কথা উল্লেখ করেন যখন সেনাবাহিনী "প্রুশিয়ার জাতীয়

শিল্প" ছিল এবং ভেবেছিলেন যে "জার্মানীর-রাজনৈতিক শরীর থেকে *ক্রুয়র টিউটনিকাসের* জীবাণু দূর করা" এক রাজনৈতিক কর্তব্য। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে এর অর্থ জার্মান সমরতন্ত্রকে পূর্ণ বিলোপ করার কথা বলা হবে যা হচ্ছে এক সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার একমাত্র উপায়। কিন্তু লেখকের চিন্তা অন্য রকম ছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে জার্মানিতে সামরিক পুনরভ্যুত্থানের বিপদকে রোধ করা যাবে যদি জার্মানি **ন্যাটোয়** যোগদান করে।

হুইলার বেনেটের বই-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কিছু তিনি বলেছিলেন যে তার জার্মান সেনাবাহিনীর জেনারেল সিকটের সময় যে রকম ছিল, সে রকম থাকা উচিত অর্থাৎ "অরাজনৈতিক উপাদান" হিসাবে বিদ্যমান থাকা উচিত এবং জেনারেল শ্লাইচারের এই অবস্থা ত্যাগ করার ফলে জার্মান সমরতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র সম্মিলিত হয়, তার ধারণাকে পশ্চিম জার্মানির ঐ ঐতিহাসিকরা সমালোচনা করেন। কেউ কেউ এই অভিযোগ করে যে, তিনি জার্মানির দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেনের দৃষ্টি-কোণ থেকে বিষয়টিকে দেখেছেন এবং তিনি জার্মান সেনাবাহিনী ও সেনাপতিদের, এমন কি নাৎসী একনায়কত্বের সময়েও, রাজনৈতিক-জাতীয় কীর্তিকলাপকে ছোট করে দেখিয়েছেন। পরে তারা বলেছেন বৃটিশ লেখক জার্মান সমরতন্ত্রের ভাগ্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন এবং তাকে "ক্ষমতার নিয়তি" বলে বর্ণনা করে তা নিয়ে নাটক করেছেন, তাদের মতে খুব তাড়াতাড়ি তা "অক্ষমতার নিয়তি" হয়ে উঠেছিল। তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে তার পুনরুজ্জীবনের পর জার্মান সমরতন্ত্র দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বর সংগে হাত ধরাধরি করে এগুবে।

এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবেত্তা জার্মানীর অতীত সম্পর্কে বিশেষ সমালোচক বলে যারা নিজেদের সম্পর্কে রটনা করে থাকেন এবং জার্মান জঙ্গীবাদের ভূমিকাকে বিজ্ঞানসম্মত ফর্মান রূপে যারা উপস্থিত করতে চান, তাদের অনেকেই নাৎসী পূর্বাভিযান সম্পর্কে বিবিধ *সোলডাটেনজেইটুনজেন* এবং বিস্তৃত *ক্রিয়েস্-স্ মেমোয়ারেন*-কে সমর্থন করেছেন। ঠিক জেরহার্ড রিটারের প্রচেষ্টার মতোই এই প্রচেষ্টা।

জার্মান বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও কারণসমূহ সম্বন্ধে মাইনেকের চিন্তা এবং গোথের সময়ের মানবতাবাদের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তার দাবীগুলি হিটলারের পতনের পরে জার্মান বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের হতবুদ্ধিতা প্রতিফলিত করেছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে রিটার সামরিক আদর্শের পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। শ্লিফেন পরিকল্পনা, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাইয়ে জেনারেল ষড়যন্ত্র ও জার্মান সমরতন্ত্রের মূল সমস্যা-গুলি সম্বন্ধে তার গবেষণা এর প্রমাণ। কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার

রচনাবলীর রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক উপাদান, এটা তা প্রমাণ করে যে রিটার সমরতন্ত্রের বিকাশ গতিপ্রকৃতি কি হবে তাও আঁচ করতে পেরেছিলেন। অপর একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লুডউইগ ডেহিওর মত তিনি *ওয়েস্টপলিটিক* ধারণাটিকে খারিজ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে রিটার বলেছিলেন যে পৃথিবীতে এক "সার্বিক পরিবর্তন এসেছে এবং ভবিষ্যৎ" দুটো বিশ্বশক্তি বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিগোষ্ঠীর" উপর নির্ভর করবে। তিনি একদিকে "অ্যাংলো স্যাক্সন নৌশক্তি" ও অপরদিকে "রুশ মহাদেশীয় ক্ষমতার" কথা বলেছিলেন।

এই ব্যবস্থায় জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীর পশ্চিমী অংশের কোথায় স্থান হবে তা নিয়ে রিটার বিব্রত ছিলেন। তিনি জার্মান সমরতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা জোর দিয়ে বলেন এবং স্থানান্তকরণের কৌশলের ব্যবহার করেন বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে এই বিকৃত তত্ত্বের অবতারণা করেন যে সমরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের "জনতার এক সামরিক রাষ্ট্রের" ধারণা হচ্ছে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি এবং "জাতীয় চেতনার অন্তর্নিহিত আক্রমণকারী রূপ" জনতার আন্দোলন থেকে উৎসারিত। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের মত তিনি মানবতাবাদকে এক "শিকড়হীন আন্তর্জাতিকতাবাদ" বলে অভিহিত করেন এবং হিটলারের "দানববাদ"কে "শুভ ও অশুভ উদ্দেশ্যের এক সংমিশ্রণ" বলে অভিহিত করেন। তিনি আগস্টে বেবেলকে "এক জাতিয়তাবাদী জার্মান" ও বিসমার্ক এক "যথার্থ ইউরোপীয়" বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে "দানবিক শক্তি"র উৎস হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ও আক্রমণাত্মক গণ উপাদানের অবাস্তব প্রভাব এবং তিনি বলেন, তাই নেতাদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছিল। হিটলারের অকস্মাৎ অভ্যুত্থানের গোপন রহস্য, তার মতে ছিল, হিটলারের "ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্যা সমাধানে" সামর্থ এবং জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ। মার্কসবাদ সম্বন্ধে রিটারের মত হয়ে শুরু থেকেই তা ছিল এক "আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী ও সমরতন্ত্রী শক্তি।"

জার্মান সমরতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বহাল করার এই অপপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের আর কি আলোচনা করা উচিত, একজন ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ব্যক্তি হিসাবে হিটলার এই পুনর্বাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। প্রুশ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি (১৯৪৭ সালে) তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "যিনি জার্মান ইতিহাসে ফ্রেডারিকের প্রতিফলন নিয়ে চিন্তা করবেন ...... বর্তমান ও ভবিষ্যতে পুরনো শক্তিশালী প্রুশ সামরিক শক্তির পশ্চিমের সব পূর্বতন সীমান্ত থেকে অন্তর্হিত হবার গুরুত্ব নিয়ে চিন্তা করার ভাল কারণ খুঁজে পাবেন।" রিটার নিম্নলিখিত পথে তার সাফাই গেয়েছিলেন। প্রথমতঃ তিনি দেখাতে চেষ্টা

করেছিলেন যে নাৎসী জেনারেল কোন সামরিক শ্রেণী নয় তার কারণ হিটলারের "দানবিক শক্তির" অধীনে থেকেও তারা কেবল এক রক্ষণাত্মক সেনাবাহিনী গড়তে ব্যস্ত ছিল ; দ্বিতীয়তঃ তিনি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে-ছিলেন যে প্রুশিয়ান ও পরবর্তী জার্মান জেনারেল স্টাফ এবং কোর অব দি জেনারেলস যারা তাদের কর্তব্য তাদের "ন্যায্য ক্ষমতার" মধ্যে সীমিত রেখেছিল, কখনও সামরিক প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় নি এবং সব সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করেছিল (প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় হিনডেনবুর্গ ও লুডেনড্রফ এই ঐতিহ্য লঙ্ঘন করলে তাদের গুরুতর পরিণামের সম্মুখীন হতে হয়) : তৃতীয়তঃ যদি সমস্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই-এ ষড়যন্ত্রকারীরা রাষ্ট্রের প্রধানের বিরুদ্ধে হাত তুলে থাকে, তারা তা করছিল কারণ তখন পরিস্থিতি ছিল "একান্ত নিজস্ব" কারণ জার্মানি ও একদল অপরাধীরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল যারা জার্মানিকে এক সামরিক বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, চতুর্থতঃ এর গুরুত্ব জার্মানি ছাড়িয়ে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল তার কারণ "তখন থেকে বলশেভিক বিশ্বশক্তির ছায়া পৃথিবীর উপর এসে পড়েছিল।"

রিটার যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হচ্ছে জার্মান সমরতন্ত্র "জার্মানির সম্মান" রক্ষা করেছিল এবং তাছাড়া তা "ইউরোপকে কমিউনিস্ট বিপদ থেকে মুক্ত করতে" সক্ষম। এটা স্পষ্ট যে এই রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ধারণা জার্মান সমরতন্ত্রকে কৃত্রিমভাবে নাৎসীবাদের সংগে তুলনা করে শুধু আড়াল করেই ক্ষান্ত নয়, এটা পশ্চিম জার্মানীর আগ্রাসী **ন্যাটো** জোটে অন্তর্ভুক্তির রাজনৈতিক পরিকল্পনার সংগে সংযুক্ত।

এগুলিই ছিল জার্মান ঐতিহ্যের এক গতানুগতিক ধারণা কোন একটির সংশোধনের উদ্দেশ্য ও ফলাফল। প্রুশ-জার্মান সমরতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট এই নীতি নতুন রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক কর্তব্যর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। এই নীতি তার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি পুনর্গঠিত করেছিল এবং তাদের প্রভাব সমগ্র "পশ্চিমে" ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণ রিটারের ধারণা জার্মান জাতীয়তাবাদ ও সমরতন্ত্রর এক সংশোধিত রূপ এবং এর পেছনে রয়েছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগের কমিউনিজম বিরোধিতা।

রিটারের মতবাদ সমালোচিত হয়েছিল এবং প্রথম এর সমালোচনা করে রাংকপন্থীরা কিন্তু তা এর সমরতান্ত্রিক প্রবণতার জন্য করা হয় নি। তাদের কাছে এটা অতিরিক্ত ঐতিহ্যবাদী বলে মনে হয়েছিল। লুডউইগ ডেহিও আর এক ধারণার প্রবর্তন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বিংশশতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে জার্মান ইতিহাসের বর্তমান সমস্যার মোকাবিলা করা। তিনি দুই বিশ্বযুদ্ধের এবং দুই পরাজয়ের শিক্ষার হিসাব করেন এবং পুরানো প্রুশিয়ান জার্মান সমরতন্ত্রকে সমালোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

মনে হয়েছিল যে এ এক গভীর আত্মসমালোচনার আবেদন। তিনি লিখেছিলেন "আমরা জার্মানরা এক খাঁটি প্রুশ পদ্ধতিতে—অর্থাৎ এক সুসংগঠিত অস্ত্র সজ্জার দ্বারা—ইউরোপীয় সীমার বাইরে পৃথিবীর ভারসাম্যতার অভিযান চালিয়েছিলাম যেমন আগে একবার প্রুশিয়া ইউরোপীয় ভারসাম্যতা ব্যবস্থায় হানা দিতে সাহস করেছিল······কিন্তু আমাদের এই অভিযানের অপরিবর্তনীয় ফলাফল আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছে? তারা আমাদের বিশ্বযুদ্ধের পথে নিয়ে এসেছিল; আমরা, শুধু আমরা বৃটেনের গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্রর বিপদ ডেকে এনেছিলাম।" রাঙ্কপন্থীদের আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণার মূর্ত ভিত্তি, পররাষ্ট্রনীতির প্রধান গুরুত্ব ও একক নেতৃত্বের জন্য যুদ্ধের নীতিকে আঁকড়ে ধরে ডেহিও বলেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে নিহিত রয়েছে যার বিজয়ীরা প্রতিক্রিয়াশীল পবিত্র আঁতাতের যেমন নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর ইউরোপে এক দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ যুগের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি ইউরোপীয় ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে নি। একক আধিপত্যের জন্য ইচ্ছার যা আগে জার্মানিকে গ্রাস করেছিল এবং এখন প্রতিশোধ প্রতিশোধ লিপ্সাব সংগে মিশে গেছে। এক বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল, ডেহিও বলেছিলেন যে জার্মানি দুবার "সম্প্রসারণের ধারণা জন্ম নিয়েছিল: পুনর্গঠন আন্দোলন ও মার্কসবাদ। সেইজন্য মার্কসবাদ ও বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তীক্ষ্ণতা আহরণ করে এবং শক্তির প্রুশিয়ান জার্মান ঐতিহ্যর অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে এক নিরবয়ব হিংসা বা একচেটিয়া একক আধিপত্যবাদ এক নতুন ফ্যাসীবাদী গতিশীলতায় পরিণত হয়েছিল।"

হিটলারকে "একক আধিপত্যের জন্য অত্যাধিক সংগ্রামের" এক প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। ডেহিও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "জার্মানি ঐ শয়তানী প্রতিভা ছাড়া কি ক্ষমতার প্রচণ্ড শিখরে আরোহণ করতে পারত।" কিন্তু উচ্চতা যত বাড়বে পতনের আঘাত ততই বাড়বে এবং যদিও ডেহিও তাকে "একক প্রাধান্যবাদী শক্তির" পতন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি এই বলে ওকালতি করেছিলেন যে,"একক প্রাধান্যের জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধের সারির শেষ যুদ্ধ হচ্ছে জার্মানির যুদ্ধ।" ১৯৪৫ সালে ডেহিও দাবী করেছিলেন: বিশ্বের এক নতুন ইতিহাসের জন্য রাস্তা খোলা ছিল এবং তা উজ্জ্বল করেছিল,' "বিশ্ব শক্তির জন্য রুশ-অ্যাংলো স্যাক্সন প্রতিযোগিতা এই ভাবে ডেহিও একক প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য এবং কমিউনিজমকে প্রতিহত করার নীতি অনুসরণ করার জন্য প্রচেষ্টাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যখন বিশ্বের দুই প্রধান ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম চলছিল জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র প্রথম থেকে তার ভূমিকা কি হওয়া উচিত এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল। জার্মান ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে সচেতন ছিল। এইচ. হাইম্পেলের কথায় ইতিহাসের ভূমিকা ও ইতিহাসের বিজ্ঞান প্রমাণ করার জন্য

অতীতের মধ্যে বাস করার প্রচেষ্টা, আসলে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শ ও প্রতিক্রিয়ার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র। বাস্তবে এই প্রচেষ্টা শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পুনর্গঠনকে আড়াল করে রেখেছিল এবং ঐতিহাসিক কূটকর্মের আড়ালে তাদের ধর্মীয় রাজনীতি ও পুনরুজ্জীবিত সমরতন্ত্রকে ঢেকে রেখেছিল। মধ্য যুগের জার্মানিকে এক আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে দেখানো হয়েছিল এবং "সাম্রাজ্যর ধারণাকে" এক অতি ঐতিহাসিক চরম সত্য বলে প্রচার করা হয়েছিল এবং এর ফলে "রোমানো-জার্মান পশ্চিম" ও মধ্যযুগীয় ধর্মের উৎস হিসাবে কারোলিঙ্গর সাম্রাজ্যের ওপর গৌরবারোপ করা হয়েছিল। এই সমস্ত করার মূলে ছিল জার্মান সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদী ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। অপরদিকে "বর্তমান ইতিহাসকে" "অতীতের ইতিহাস অনুধাবনে" এবং যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সংকটপূর্ণ যুগে বৃহৎ পরিবর্তন অনুধাবন করার চাবিকাটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

রোথফেল স্বীকার করেছেন যে· "বর্তমান ইতিহাসের" তাত্ত্বিক কর্তব্য হচ্ছে গভীরভাবে রাজনৈতিক শুধু "আপেক্ষিক সন্দেহবাদকে" জয় করলে চলবে না, "নৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে আত্মিক নিয়মানুবর্তিতাকে আত্ম-শিক্ষা ও জ্ঞানের এক সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।"

"বর্তমান ইতিহাসের" চর্চার বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপ আছে, এ বিষয়ে তাত্ত্বিক চর্চা সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত হয়েছে। ক্যাথলিক, ইভাঞ্জেলিক্যাল প্রতিষ্ঠানের এবং "প্রাচ্য চর্চা" কেন্দ্রের বিস্তৃত হয়েছে। এই সমস্ত যুদ্ধ মন্ত্রক ও তার "মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রতিনিধিদের" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জার্মানে চর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মান সমরতন্ত্রের সংগে জার্মান ফ্যাসীবাদের সংগে তুলনা করা হচ্ছে জার্মান সমরতন্ত্রের দোষস্খালন করা। "প্রাচ্য চর্চা কেন্দ্রের" উদ্দেশ্য হচ্ছে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশোধলিপ্সু মনোবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্বাঞ্চল গবেষণা কেন্দ্রের "বর্তমান ইতিহাসের" অনেক রূপ আছে তবে সবই অ্যাটলান্টিক জোটের উপযোগিতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত এবং সম্প্রতি প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া ঐতিহাসিকভাবে "পশ্চিমের" অন্তর্ভুক্ত।

অপরদিকে আমরা দেখেছি যে "ইউরোপীয় সংহতির" ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস রচনাকারীরা বিশেষ সমন্বয়কারী সম্মেলনের বিষয়ে গভীরভাবে মগ্ন ছিল; জার্মান সাম্রাজ্যবাদের চড়াসুরের জাতীয়তাবাদী ও সমরতান্ত্রিক ধারণাগুলিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তার জায়গায় আপাত-গণতান্ত্রিক ধারণার আমদানী করা হয়েছিল, সেগুলি বিভিন্ন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের

মধ্যে সংঘাত নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল, পশ্চিমী দুনিয়ার ভাগ্য এরকম দাবী করেছিল এবং প্রুশিয়া ও জার্মানীর ইতিহাসে সক্রিয় জার্মান সমরতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর উচ্চাশাসংক্রান্ত তথ্য ও সমস্যা আড়াল করে রেখেছিল। পশ্চিম জার্মানির ঐতিহাসিকদের মূল প্রচেষ্টা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে জার্মানি সবসময় "মুক্ত পৃথিবীর" অংশ, "পৃথিবী সংস্কৃতির" এক উপাদান এবং তাছাড়া ইউরোপে পূর্বের বিরুদ্ধে এক ঝটিতি শক্তি হিসাবে জার্মানির ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এইজন্য "মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ" বণিকেরা পশ্চিমে এবং ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের স্বাধীন ভূমিকা প্রমাণ করতে ব্যাকুল। হারমান আউবিন মনে করেন যে, পশ্চিম, সাম্রাজ্য, জার্মানি ও ইউরোপ হচ্ছে সংস্কৃতিগতভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধারণা এবং ইউরোপে পূর্বের হানা রোধ করার জন্য জার্মানির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। আউবিন জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা লুণ্ঠন প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন নি কিন্তু তাদের দোষ স্খালন করেন নি এবং ১৯৩৮ সালের জার্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া দখলকে পশ্চিম দ্বারা স্বীকৃত জার্মানীর ঐতিহাসিক অধিকারের এক বাস্তবায়ন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, যদি হিটলার গোষ্ঠী "পশ্চিমের স্বার্থে রাশিয়া ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে" তাহলে তাদের কৃতিত্বের তিনি প্রশংসা করতেন কিন্তু তিনি পশ্চিমে যুদ্ধ শুরু করার সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে হিটলার "পশ্চিমী জোটের ধারণার সংগে বোঝাপড়া করেছেন।" আউবিন বলেছেন যে আজকে "ইউরোপের" ধারণার এক নতুন বিষয়বস্তু আছে। ইউরোপীয় কোল এ্যাণ্ড স্টিল কমিউনিটি ও ইউরেটম প্রাধান্যের মাধ্যমে পশ্চিমের নাম মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে "নতুন ইউরোপ" ও রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের বিরোধী এবং এই সংঘাত মোচনে জার্মানির এক সক্রিয় ভূমিকা আছে।

অ্যাডেনহবার যুগের ধর্মীয় মতবাদের একটা অংশে বলা হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির মিশন হচ্ছে ইউরোপের নেতা হওয়া। আউবিন রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি দেখেছেন। অ্যাডেনহবার একজন তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ পি. ডবলিউ. ওয়েগনার তার '*হু উইল উইন জার্মানী*' বইয়ে বলেছিলেন যে সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুধাবন করা ও ইউরোপকে জয় করার জন্য বর্তমান সময় হচ্ছে বনের পক্ষে প্রকৃষ্ট। "জার্মানী বিভক্ত হয়ে যে ভুল করেছিল তা জনগণের প্রত্যেক স্তর দ্বারা গঠিত এক ক্রীশ্চান মহাজোট গঠনের দ্বারা খানিকটা সংশোধিত হয়েছে। এর কর্তব্য হবে ইউরোপের হৃদয়ে বিশ্বাসের বিভাজন। জাতীয় বিভেদ ও বস্তুবাদী নাস্তিকতাকে সংশোধিত করা। এইভাবেই পশ্চিম নিজেকে এক স্বাধীন ক্রীশ্চান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতিপুঞ্জ হিসাবে মার্কিন ও এশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে

বিশ্বজনীন শান্তির দূত হিসাবে এর ইউরোপে উদ্ভূত বিশ্বসমস্যার সমাধান করে পরিত্রাণ পাবে।”

এইগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক ধর্মবাদের আড়ালে পশ্চিম জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভণ্ডামী।

এটা সত্যি যে “মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের” কিছু বণিক ভেবে থাকে যে খোলাখুলিভাবে জাতীয়তাবাদী হওয়ার থেকে আধা গণতান্ত্রিক হওয়া ভালো এবং “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা”, “স্বাভাবিক অধিকার”, “জনগণ” “গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা” প্রভৃতি সূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভালো। এদের একজন এমনকি একথাও বলেছিল যে, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া ফরাসী বিপ্লবের নীতিগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে। জার্মান যুদ্ধমন্ত্রক অফিসারদের শিক্ষার জন্য যুদ্ধমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী লেখা এক বইয়ে জেরহার্ড নেইবলোজ্ স্বীকার করেছিলেন যে এই ব্যাখ্যায় তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে অ্যাটলাণ্টিক জোটের ক্ষমতার স্বার্থের সংগে একত্র করতে হবে।

উগ্রপন্থীরা বারবার “ইউরোপ ধারণার” ব্যবহার করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আন্তঃজার্মান পরিষদ এক মধ্য ইউরোপের কথা বলেছে আজকে সেই একই ধারণার একটু পরিমার্জিত হয়ে “মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের” বণিকগণ কর্তৃক তাদের প্রতিশোধলিপ্সু মনোবৃত্তি ও ইচ্ছার এক ঢাকনা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেইজন্য ক্যাথলিকপন্থী ***রাইনিস্কার মারকুর*** পত্রিকার সম্পাদক ওয়েগনার “এক ইউরোপে এক ধর্মকেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয়” নতুন ব্যবস্থার কথা বলেন। তিনি “রাষ্ট্রসমূহের এক জোটের” কথা ভেবেছিলেন। এইজন্য “ইউরোপীয় ধারণা” যারা রাজনৈতিক ধর্মবাদের রাজত্বকে সমর্থন ও প্রতিনিধিত্ব করে এবং গণতান্ত্রিক ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে তাদের এবং যারা হিটলারের অনুরাগী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করে না তাদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। পশ্চিম জার্মানীর নয়া ফ্যাসীবাদিরা আজকে এক ইউরোপীয় জাতির ধারণার পিছনে সমবেত হয়েছে।

এটা এক অবিশ্বাস্য আপাত বিরোধিতা যে অতি প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসনাত্মক যেসব শক্তি অসংখ্য জীবনহানি, অশ্রুতপূর্ব ধ্বংস ও অনেক মানবাত্মাকে নিপীড়িত করার জন্য দায়ী। তারাই বিভিন্ন মাত্রায় তাদের অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের সংগে “ইউরোপীয়” ধারণাগুলির সংমিশ্রণ করতে শিখেছে। অবশ্য আমরা পৃথিবীর সংস্কৃতি ও ইতিহাসে ইউরোপীয় জনগণের অসামান্য অবদানকে অস্বীকার করছি না। উপরন্তু কেউ যদি এক মহাদেশের সংগে আর এক মহাদেশের তুলনা করা যা আঞ্চলিক ধুয়ো তোলে এবং এক দেশের জনগণের সংগে অপর দেশের জনগণের ঐতিহাসিক ভাগ্যের বিভিন্নতা হেতু, তুলনা করে তাহলে তা হবে ইতিহাসের বলাৎকার ও তার মৌলিক প্রক্রিয়ার বিকৃতি। কিন্তু এটা অনুশোচনার বিষয় যে, আগ্রাসনাত্মক জাতীয়তাবাদ ও

একাধিপত্যের দুরাশা শুধু পশ্চিম জার্মানি পশ্চিম ইউরোপ বা পশ্চিমী দুনিয়া ছাড়া, অন্যান্য মহাদেশেও বিদ্যমান। মানবজাতি চীন, ভারত, মিশর ও যেগুলি সভ্যতার আদিভূমি, অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ইউরোপীয় মহাদেশের দেশগুলিরও কৃতিত্ব প্রাপ্য। সেখানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পসংস্কৃতির সুউচ্চ সৌধগুলি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের উদ্ভব হয়েছে। এই সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম পৃথিবীর ইতিহাসে অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করেছে, মানুষের প্রগতি ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির উচ্চতম বিকাশকে তার আত্মাকে প্রতিফলিত করেছে। এই অর্থে ইউরোপের ইতিহাস অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেনিন বর্ণিত বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়া কাঁপানো এশিয়ার অভ্যুত্থান ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা সামাজিক আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণাগুলি রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

"ইউরোপ-বিরোধী" মতবাদ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বভাবসুলভ "ইউরোপ-কেন্দ্রীক" তত্ত্বের মত বিপজ্জনক। "ইউরোপ" মতবাদের বিভিন্ন রূপ—মধ্য ইউরোপ," ইউরোপে নতুন শৃংখলা", ছোট ইউরোপ, নতুন ইউরোপ ও বর্তমানের জাতি ইউরোপ—হচ্ছে বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন পরিবেশে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর আদর্শের অংশ যা ছোট বড় সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। এই মতবাদ বর্তমান স্তরে জার্মান জনগণেরও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। তার কারণ এ হয়ে উঠেছে সমরতন্ত্রী শক্তিদের এক অস্ত্র। জার্মান সমরতন্ত্রীরা শান্তি সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শিবিরের বিরুদ্ধে "মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ" চালাতে ব্যস্ত। নতুন উদ্দীপরা জার্মান সমরতন্ত্রর কাছে জার্মান জনগণের জাতীয় স্বার্থ ও ইউরোপেব ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

৬

যখন জার্মান সাধারণতন্ত্রের প্রধান আদর্শের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং তার মৌলিক প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ধারণার প্রতিনিধিত্ব করা, পশ্চিম জার্মানির কায়েমী সাম্রাজ্যবাদী ধারণার নতুন অবস্থার সংগে খাপ খাওয়ানো সমরতন্ত্রী ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করছে। সেইজন্য সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে যুগ্ম যুদ্ধের সমস্যা, যুদ্ধকে চিরতরে মুছে ফেলার সমস্যার বদলে অতীত ও ভবিষ্যতের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে দার্শনিক ও ঐতিহাসিকভাবে দোষস্খালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই জন্য নুরেমবুর্গ বিচারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং

বলা হচ্ছে যে তা ছিল বিজয়ী পক্ষের রাজনীতি, কেন না তারা "ভার্সাইলের আইনে" ফিরে যেতে চেয়েছিল। প্রচারের দ্বারা জার্মান সমরতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বের বিশিষ্ট সদস্যদের ওপর গৌরব আরোপ করা হচ্ছে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে যুদ্ধ কোন অপরাধ নয়। কিছু তাত্ত্বিকেরা ফ্যাসীবাদের সামাজিক মূলের প্রশ্নটি দূরে সরিয়ে রেখে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে "সমষ্টিবাদ"-এর এক বৈশিষ্ট্য যা কমিউনিজমেরও বৈশিষ্ট্য বটে। এর মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত ওষুধের আশ্রয় নিতে হবে: জার্মান সমরতন্ত্রকে পারমাণবিক অস্ত্রসহ সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। হিটলারের কমিউনিজম বিরোধিতা সমর্থন করে বলা হয়েছে যে, হিটলার বিরোধী জোট, যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী শক্তিগুলি লড়াই করেছিল, এক অদ্ভুত আঁতাত।

এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে অন্ধ কমিউনিজম বিরোধিতার এই আবহাওয়ায় ফ্লেমিশ ও ওলন্দাজদের সংগে জার্মান সমন্বয়ের এবং ঘৃণা ও প্রতিশোধের বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে ডাক শোনা যাচ্ছে। এটাও বিস্ময়কর নয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধর পরে যেমন "যুদ্ধোপরাধের" "মিথ্যার" বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ডাক শোনা যাচ্ছে। এটাও বিস্ময়কর নয় যে স্পাইডেল বা হিউসিংগারের মত হিটলারের প্রাক্তন সেনাপতিদের যারা বর্তমানে ন্যাটো সেনাবাহিনী ও জার্মান যুদ্ধ যন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় আবক্ষ "যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ" বলে বর্ণিত হচ্ছে: কিছু যুদ্ধোপরাধী *"জাতীয় বীর"* বলে নিজেদের জাহির করছে এবং অন্যান্যরা, যেন ওবেরলাণ্ডার ও গ্লোবকের মত উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত: আগ্রাসনাত্মক জার্মানি জাতীয়তাবাদ ও প্রতিশোধলিপ্সাকে "ইউরোপীয় ধারণার" যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

ওয়েমার সাধারণতন্ত্রের সময় জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে ঢাকা দেবার জন্য, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা "যুদ্ধোপরাধের প্রশ্ন" নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল ও অ্যাডেনআওয়ারের যুগ হিটলারের ফ্যাসীবাদের হয়ে ওকালতি করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। নয়া ফ্যাসীবাদী Nation Europa দাবী করেছে যে "হিটলার যাঁর প্রতি অতিরঞ্জিত ও দায়িত্বহীন দাবী আরোপ করা হয়েছে, কখনও খুব সামান্যর বেশী কিছু দাবী করেন নি।"

ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়ায় কিছু পশ্চিমী প্রচারবিদদের আগ্রাসনাত্মক অভিপ্রায় হিটলার সাম্রাজ্যবাদীদের মূল ধারণাও ছাড়িয়ে নিয়েছিল। অ্যাডন-হবার যুগের শাসক গোষ্ঠী হিটলারের *'মাইন কামফে'* বিবৃত রাৎসী আদর্শ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জে. বার্নিকের *"জার্মান ট্রামপশ"* বইটির প্রশংসা করেছিল। এই বইয়ে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে হিটলারের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করতে বলা হয়েছিল। বার্ণিক বলেছিলেন যে, বনের আপাত-গণতান্ত্রিক পথ পরিত্যাগ করা উচিত

এবং এর জনগণকে আস্থায়া দেওয়া বন্ধ করা উচিত তার কারণ জনগণ হচ্ছে "বোকা" এবং কোন গুরুতর নীতির বাঁচার কোন আশা নেই যদি "জনগণকে কোন কথা বলতে দেওয়া হয়" বার্ণিক বলেছিলেন যে, "কেবলমাত্র জার্মান সমরতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি আছে" এবং আর কার্য সম্পাদন করার জন্য পুরোনো কর্মীদের উপর নির্ভর কবা যায় তার কারণ কেবলমাত্র "প্রাচীনেরা ধীরভাবে কাজ করতে পারে" তিনি এক স্বৈরতন্ত্রী রাজত্ব অর্থাৎ সামরিক একনায়ক-তন্ত্রের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এটা ছিল বিসমার্কের এক তুরুপ-আগ্রাসনাত্মক জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নীতিব তুরুপ। তুরুপ হচ্ছে এক নতুন যুদ্ধের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি। বার্ণিক ঘোষণা করেছেন যে, এমন কি ১৯৩৭ সালের সীমান্ত ইতিহাসসম্মত নয়। হিটলারের মত তিনি চেকোশ্লোভাকিযা, অস্ট্রিয়া ও পোল্যান্ড অধিকার করতে চান এবং জার্মানীর সংগে দক্ষিণ টাইবোলকে জুড়ে দেবার জন্য দাবী করেছেন। কিন্তু তা সব নয় তিনি মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউবোপের ভূখণ্ডসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডসমূহও চান হিটলাবের মত, বার্ণিক জানেন যে, তার পরিকল্পনার অর্থ এক নতুন যুদ্ধ। কিন্তু তা এড়িয়ে যাওয়া দূরেব কথা। তিনি বলেছেন যে তা বাঞ্ছনীয়, এমন কি প্রয়োজনীয়। তিনি লিখেছেন: "সমস্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে একমাত্র পন্থা।" একজন জুয়াড়ীর মত তিনি সমস্ত তুবুপ নিয়ে বাজী ধবেছেন যদিও তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, যুদ্ধ হলে সমস্ত শহর ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং অসংখ্য জীবনহানি হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিরত হন নি। তিনি অবশেষে তার মূল তুরুপ ব্যবহার করেছেন এবং এইজন্য তৃতীয় যুদ্ধেব অপরাধীদের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত—তা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক হঠাৎ বৃহদায়তন পারমাণবিক আক্রমণ চালানো, তাব স্মৃতি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। তিনি কিছুই ভোলেন নি। কিন্তু অতীতের সমস্ত শিক্ষা থেকে তিনি জ্ঞানলাভ করেন নি, আমরা এই সব ধারণার কথা মনে করছি কারণ বনের যুদ্ধমন্ত্রী স্ট্রাউস এই সব ধারণা খুব "কৌতূহলোদ্দীপক" ও "গঠনমূলক" বলে এই-জন্য পশ্চিম জার্মানীর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকৌশলের রাজনৈতিক অস্ত্রাগারে এদেব রেখে দিয়েছিলেন।

বার্ণিকের জার্মান তুরুপগুলি নতুন নয। তারা হচ্ছে পুরোনো পরাজিত জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের দুই যমজ তুরুপ এবং তাদের তখন খারিজ করার যথার্থ সময়। হিটলারের তুরুপ থেকে তাদের পার্থক্য হচ্ছে যে তাদের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের এক আবেদন আছে—আজকের জার্মান সাম্রাজ্য-বাদের পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত এক দানবিক আবেদন যা অস্তিত্ববাদ ও ধর্মবাদের প্রবক্তারা ব্যবহার করছে, অবাস্তববাদ বিশুদ্ধ-দর্শন থেকে

বিতাড়িত হবে তখন রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যকলাপে জেঁকে বসেছে। তা ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্ট শাখার মধ্যে ভালোমত ঢুকে পড়েছে—অন্তত: এই সব নেতাদের ধারণা অনুযায়ী যারা দাবী করে যে জনমত সংগঠনে তাদের একক ভূমিকা আছে। তারা সমস্ত বিরুদ্ধদের এমন কি গীর্জার আওতার মধ্যে, বিচার করেছে। ১৯৫৩ সালে প্রটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর এক প্রভাবশালী শক্তি টিলমনেস এক ধর্মীয় পত্রিকায় বলেছিলেন যে, মানুষের জ্ঞান বা রাজনৈতিক জ্ঞান সর্বোচ্চ মাপকাঠি নয়।" রাজনৈতিক ধর্মবাদের অবিচ্ছেদ্য অংগ রাজনৈতিক অ-বাস্তববাদ প্রথম থেকে নিজেকে এক আগ্রাসী যুদ্ধবাজ শক্তি বলে জাহির করেছিল এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম এবং জার্মান মানবতাবাদী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

৭

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ জর্জ মেণ্ডে প্রমাণ করেছিলেন যে ফ্যাসীবাদের উদ্ভবের জন্য অস্তিত্ববাদ বিশেষভাবে দায়ী। তিনি দেখিয়েছিলেন যে যুদ্ধোদয় অস্তিত্ববাদীরা শুধু গণতন্ত্র-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ও অবৈজ্ঞানিক ছিল না। তারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সংগে নিজেদের চিন্তাধারার খাপ খাইয়ে নেবার সামর্থকে লুকিয়ে রেখেছিল। হাইডেগার এই মত পোষণ করেছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধের "সর্বাধিক" প্রকৃতি সত্ত্বার একাকীত্বর মধ্যে নিহিত এবং যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে সীমারেখা ক্রমশ: অন্তর্হিত হচ্ছিল। এইভাবে তিনি "সর্বাধিক যুদ্ধর" পুরোনো নাৎসী আদর্শের সংগে বর্তমান জার্মান সাম্রাজ্যবাদী এবং পূর্বের বিরুদ্ধে তাদের "ঠাণ্ডা লড়াই"-এর সংগে এক সংযোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া হাইডেগারের যা ধারণা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোন যুদ্ধকালীন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি এবং তার পরের শান্তির যুগ মূলতঃ অর্থহীন—তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। "রাজনৈতিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে বা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য, যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হোক না কেন, তা অর্থহীন"—তার এই উক্তিকে আর কি অর্থ হতে পারে? পশ্চিম জার্মানীর অস্তিত্ববাদীরা ঠাণ্ডা যুদ্ধ নীতি ও জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের পারমাণবিক অস্ত্রসাহায্যে যৌক্তিকতা দার্শনিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। এটা সত্য যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকাশিত তা শুরু হওয়া ও প্রযুক্ত হওয়ার সময় থেকে করা হচ্ছে কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধের ওকালতি, পারমাণবিক অস্ত্র প্রযুক্ত হবার অনেক আগেই থাকতেই করা হচ্ছে। অতএব আমাদের স্বীকার করতে হবে, যে অস্তিত্ববাদীরা অনেক আগে থাকতেই তা আঁচ করতে পেরেছিল এবং দার্শনিকভাবে ও নৈতিকভাবে তা প্রতিষ্ঠার করতে চেষ্টা করেছিল।

এদের মধ্যে সবথেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম কাল ইয়েস্পার, "মানবিক ভাগ্যর" ধারণার আশ্রয় নিয়ে তিনি মৌলিকত্ব সমস্ত দাবীকে নাকচ করেছিলেন এবং সেই ধারণার মধ্যে, যুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানিতে ধর্মীয় রাজনীতিবিদরা ও ঐতিহাসিকরা যে ভাগ্যবাদী ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তা সংক্রামিত করেন।

ভাগ্যবাদ হচ্ছে একটা বোঝা, হতাশা ও অক্ষমতার এক বোঝা। যা ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ভাগ্যবাদ শুধু তার মৃত্যু সংক্রান্ত নয় যুদ্ধ সংক্রান্তও বটে। বন যুদ্ধ মন্ত্রকের পুস্তিকার নাম যে, "আমাদের সময়ের ভাগ্যর প্রশ্ন" হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যুদ্ধমন্ত্রী স্ট্রাউস বলেছিলেন: "আমাদের সময়ের ভাগ্যর প্রশ্ন গুলির যার উত্তর ভবিষ্যতের সংগে বিশেষ যুক্ত, সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অতীতের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়।"

ইতিহাসের প্রতি এই আবেদন এবং অতি প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকদের "আমাদের সময়ের ভাগ্যের" মূল প্রশ্ন হিসাবে জার্মান সমরতন্ত্রর পুনরুজ্জীবন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যুদ্ধের পরে মাইনকে দুঃখিতভাবে বলেন "আমাদের যা করতেই হবে অর্থাৎ আমাদের সমরতান্ত্রিক অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই প্রশ্ন তোলে যে আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যর কি হবে?" "পরবর্তীকালে বিটার.সামরিক আদর্শ পুনরুজ্জীবন করার জন্য চেষ্টা করেন বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তার ঐতিহ্যকে প্রমাণ করেন এবং পশ্চিম জার্মানীর সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকেরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। একদিকে ধর্মবাদ ও অপরদিকে অস্তিত্ববাদ আধুনিক যুদ্ধের পারমাণবিক আদর্শের মূল শ্রেণী বিভাগ তৈরী করতে ব্যস্ত হয়। পুনরায় অবাস্তব "ভাগ্য বাদ" দিয়ে ভিত গড়া হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলির, যা জার্মান জনগণ ও মানবজাতির এত দুঃখদুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছিল, মূল কোথায়? পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিকেরা সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের সংগে এর উত্তর ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যায় তার কারণ "এর বৈজ্ঞানিক উত্তর সাম্রাজ্যবাদ ও সমরতন্ত্রের তার গভীর গবেষণার থেকে বেরিয়ে আসবে। সেই অর্থে "মানবিক ভাগ্যর" ধারণা হচ্ছে যা অ-বাস্তববাদীদের কাছে এক মূল্যবান তত্ত্ব তার কারণ তা অতীতকে ব্যাখ্যা করে না এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বোঝার স্বাভাবিক আগ্রহকে দমন করে। তার বদলে এ মারাত্মক যুদ্ধকে অমোঘ নিয়তিবলে প্রচার করে। ইয়াস্পার বলেছেন: আমাদের সকলের মধ্যে হিংসা যেহেতু যার জন্য আমরা সকলেই যুদ্ধর ভীতির মুখোমুখি: এবং তাই হচ্ছে আমাদের মানবিক ভাগ্য।"

আমরা আরও জেনেছি যে শুধু যুদ্ধের ভয়ই নয়, যুদ্ধও অমোঘ কেন না তা মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত এবং তা পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভাবে ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির মধ্যে নিহিত নয়। হাইডিগারের বক্ত

ইয়াস্পার বিশ্বাস করেন যে, "যুদ্ধের উৎস মানব প্রকৃতির গভীরতায় এবং জনকে ব্যক্তি সমূহ ও ব্যক্তিগোষ্ঠীর সংঘাতের মধ্যে নিহিত যার বস্তুবাদী সমাধান অসম্ভব।"

যুদ্ধের প্রকৃতি ও উৎস এবং শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণায় কার্ল ইয়াস্পার একজন অতুলনীয় ব্যক্তি। ঠাণ্ডা যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন সে "মানবিক ভাগ্য" থেকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা পারমাণবিক ও অন্যান্য অস্ত্র প্রতিযোগিতার অমোঘ অদৃষ্টবাদিতা আহরণ করেছে। এই চলমান, লাগামছেঁড়া অস্ত্রসজ্জার এক বিশ্বজনীন সামরিক বিপর্যয়ে শেষ হতে বাধ্য। "শক্তির অবস্থার" ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল। তারা নিশ্চিন্তে ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে ফেলতে পারবে না। এ সত্ত্বেও বা হয়ত এই কারণের জন্য ইয়াস্পার ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন তার কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য তার অস্ত্রশস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতাকে বাড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু সমস্ত নতুন আবিষ্কারকে গোপন রাখার চেষ্টা করা হলেও তা সর্বজনবিদিত হয়ে উঠেছিল। তার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে পৃথিবী ছাইয়ে পরিণত হবার আগে পর্যন্ত অস্ত্রসজ্জাই একমাত্র পন্থা।

ইয়াস্পার পারমাণবিক সমরতন্ত্রের জন্য ওকালতি করে পশ্চিম জার্মানির পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরোধী গণ-আন্দোলনকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি একে এক "পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে এক মৃদু সমালোচনা" বলে অভিহিত করেন এবং তার দর্শনের ওলিমপাস যে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধগুলি অর্থহীন বলে অভিহিত করেন, তার ধারণা এক ভুল ধারণা যা আত্মপ্রবঞ্চনার উপর দাঁড়িয়েছিল, তা হচ্ছে পুঁজিবাদী বিজ্ঞান ও কারিগরীজ্ঞানে সমাজতন্ত্র থেকে উন্নততর।

এই ধারণা ধূলিসাৎ হয়েছিল। 'শক্তির অবস্থা' ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতি অর্থহীন হয়েছিল। কিন্তু জার্মান সমরতন্ত্র তার উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল এবং তার তত্ত্ব এর উদ্দেশ্যকে ঢেকে রেখেছিল। এর উপর তার নিজের স্থানকে আরও দৃঢ় করে এবং ন্যাটোয় তার প্রভাব বৃদ্ধি করে সে সক্রিয় পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা শুরু করেছিল। প্রগতিশীল জার্মান বুদ্ধিজীবীরা (বিশেষতঃ পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানীরা) ও শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী অংশ এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল।

জার্মান জানাল যে, সার্বিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল তার জন্য মূল অপরাধী জার্মান সমরতন্ত্র এখন "সার্বিক" পারমাণবিক নিশ্চিহ্নকরণের নির্মাতা।

কমিউনিজম বিরোধিতা, সোভিয়েত-বিরোধিতা ও প্রতিশোধলিপ্সার যুদ্ধোত্তর তত্ত্বের কিছু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আবার জার্মান সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের অনুর্বরতা প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর ধারণা সৃজনশীল হতে পারে না এবং ইয়াস্পারের অস্তিত্ববাদী দর্শনেরও একই হাল। আজকের রাজনৈতিক ঘটনার উপর চিন্তা করে ইয়াস্পার "মানবিক ভাগ্যকে" পৃথিবীর ইতিহাসের অবাস্তব সারাংশ হিসাবে ধরেন এবং পৃথিবীর মাঝখানে পশ্চিম জার্মানিকে স্থাপন করে তাকে সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও "স্বাধীনতা ও সত্তার" ধারণার একমাত্র পীঠস্থান হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি "সমষ্টিবাদ" ও কমিউনিজমকে এক করেন এবং বলেন যে কমিউনিজম হচ্ছে "স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করা পশ্চিমী দুনিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুরোপুরি বিরোধী। তিনি বলেছিলেন যে এই স্বাধীনতা "সার্বিক আধিপত্য" দ্বারা বিপন্ন এবং এই "সার্বিক প্রাধান্যের" ব্যবহারিক ভিত্তি হচ্ছে এক অভূতপূর্ব "কারিগরীকরণ" ও তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে "মার্কসবাদী কমিউনিজম তত্ত্ব"। এই সমস্ত, তার মতে, এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে মানুষ, "তার প্রকৃত, সংগকে হারিয়ে ফেলেছে।"

মার্কসবাদ ও কমিউনিজমকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারার অসামর্থ আঁচ করে ইয়াস্পার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা" পাবার জন্য তাড়াতাড়ি "লৌহ যবনিকা" টেনে নিয়েছেন। তার স্বাধীনতা হচ্ছে কমিউ-নিজম সম্বন্ধে সত্যিই অসাধারণ মিথ্যা ভাষণ। তিনি বলেছিলেন যে, কমিউ-নিজম "সমগ্র পৃথিবীতে সমষ্টিবাদী আধিপত্য" বিস্তার করতে চেয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে মানবজাতি, যার "আত্মপ্রতিষ্ঠা" কাম্য, সম্পূর্ণভাবে পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং পারমাণবিক বোমার মাত্রানুযায়ী ব্যবহার সমগ্র মানবজাতিকে বিনষ্ট না করে কিছু কিছু মানুষকে ধ্বংস করবে। এই সব নয়। তিনি আরও বলেছেন যে যা আশা করা যায় তা কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে কেন না তা অসম্ভবও অবাস্তব।

কিন্তু তার মস্তিষ্কপ্রসূত সন্তান এমন এক তাত্ত্বিক সক্রিয়তার অধিকারী যা অস্তিত্ববাদী দর্শনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ইয়াস্পার বলেছেন যে, পশ্চিমী সংহতিই একমাত্র পুঁজিবাদের আত্মিক সম্পদকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে। তিনি **ন্যাটোর** শক্তিবৃদ্ধির জন্য ওকালতি করেছেন। **ন্যাটোর** মধ্যে জার্মানি তার ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য হেতু, এক অগ্রণী ও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। তার মতে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা বন্ধ করলে তা যুদ্ধের বিপদ ঘনীভূত করবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, "শান্তি যুদ্ধ করার ক্ষমতার অনুপস্থিতি নয়।" তিনি ভেবেছিলেন যে, পার-মাণবিক যুগে মানুষকে তার সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে।

কারিগরী কারণে মানুষ তার নিজের সৃষ্ট বিপদে পড়েছে যা সে আগে দেখতে পায় নি।"

একজনের পক্ষে এটা ভাবা স্বাভাবিক যে এর থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন ও নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের আবেদন করা হবে এবং মহত্তম মানবিক আবিষ্কার পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজ ও কারিগরী উন্নতির কাজে ব্যবহার করার জন্য দাবী করা হবে। তিনি জার্মান অস্তিত্ববাদী তার অ-বাস্তবতাকে আকড়ে ধরেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আজকের জার্মানির কোন পছন্দ নেই এবং সুতরাং কোন ভবিষ্যৎ নেই, তা অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য সে আর ভগবানের আশীর্বাদের উপর নির্ভর করতে পারে না এবং তার ধ্বংসের উপায় পারমাণবিক বোমার সুযোগ তাকে নিতে হবে। এর থেকে এক নিবারণাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধের তত্ত্বে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং অস্তিত্ববাদ হচ্ছে এক জাতীয় হতাশা ও আত্মহত্যার দর্শন এক দানবিক দর্শন যা এমন কি ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফ্যাসীবাদ ধারণাকেও লজ্জা দেয়। পারমাণবিক বিপর্যয়ও পৃথিবীর মৃত্যুর এক দুর্নীতিপরায়ণ দর্শন।

তবে এটা শুধু জার্মান অস্তিত্ববাদীদের গঠিত নয়। বন শাসকরা সংবাদপত্র এমনকি গীর্জাও এই মত প্রচার করছে সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থা এই জার্মান যুদ্ধ-যন্ত্রের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যৌক্তিকতা প্রচার করছে এবং জনগণের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে পারমাণবিক যুদ্ধ প্রয়োজনীয় এবং অবধারিত। এ্যাডেন হয়ার যিনি সত্যকে গোপন করতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন যে জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক বিমান-বিধ্বংসী বাহিনীর এক অংশমাত্র। স্ট্রাউস এক পারমাণবিক "ঢাল ও তলোয়ার" এবং "অপেক্ষাকৃত কম যুদ্ধের" ঝুকির কথা বলেছিলেন। প্রভাবশালী ধর্মীয় মহল, প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক উভয়েই, পারমাণবিক যুদ্ধের ধর্মীয় ও ভূমি প্রস্তুত করতে ও তার নৈতিক যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে প্রস্তুত।

লেখক পশ্চিম বার্লিন এক বিশিষ্ট প্রোটেস্টাণ্ট নেতার সংগে পারমাণবিক ভীতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ নেতা এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পশ্চিম জার্মনীর পারমাণবিক তত্ত্ব হচ্ছে কিছু অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিদের দার্শনিক প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু দার্শনিকরা নয়, সমরতন্ত্রীরা যে গুরুতর বিষয়টির অবতারণা করেছে, তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ডিবেলিয়াস এবং থাইলিকের মত বিশিষ্ট প্রোটেস্টাণ্টরা খোলাখুলিভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকি স্বীকৃত প্রোটেস্টান্ট মহলে, স্থিতিস্থাপক ধর্মীয় সূত্র দ্বারা, পারমাণবিক -অস্ত্রের তত্ত্বর পিছনে জমায়েত হয়েছে এটাও সত্য যে নহিমোলার বা মোচালস্কির ধর্মযাজকরা পারমাণবিক অস্ত্রর বিরুদ্ধে সাহসভরে রুখে দাঁড়িয়েছেন এর কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে "পার-

আণবিক তত্ত্ব" জার্মান জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ও খৃস্টান নীতিবোধের বিরোধী, স্বভাবতঃ তারা সমরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন।

ক্যাথলিক গীর্জা, রাজনৈতিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে শাসকদলের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং প্রথম থেকে পারমাণবিক যুদ্ধের ধারণাকে উর্বর করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল এবং তবে এই অংশগ্রহণ ধর্মীয় নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ধর্মীয় তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে ক্যাথলিক গীর্জা খোলাখুলিভাবে পারমাণবিক যুদ্ধের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল এবং তাকে খৃস্টান নীতিবোধের এক সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করে। এটা ছিল এক চরম দৃষ্টান্ত. এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাভারিয়ার এক ক্যাথলিক আকাদেমীর বক্তৃতা মঞ্চ থেকে, ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজনীতিবিদ, জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের অফিসার, ধর্মজ্ঞ দার্শনিক জুরি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত এক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে প্রচার করা হয়েছিল।

ঐ সম্মেলনে যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল তার চরিত্র সুস্পষ্ট ছিল: "পারমাণবিক পদার্থ বিদ্যা ও পারমাণবিক বোমা", "রাজনৈতিক যন্ত্র হিসাবে পারমাণবিক অস্ত্র," ' পারমাণবিক যুদ্ধের নৈতিক সমস্যা" প্রভৃতি অর্থাৎ এতে জার্মান যুদ্ধযন্ত্রের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার জন্য এক তাত্ত্বিক প্রচার শুরু করায় ক্যাথলিক অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাইনিসচের মারকুর ক্যাথলিক তাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। "জার্মান সেনাবাহিনীর পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রসঙ্গটি এক রাজনৈতিক প্রশ্ন, কিন্তু এর সংগে নীতিবোধ যুক্ত। পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে এক চলমান কথোপকথন প্রয়োজনীয়।"

এই কথোপকথন চলমান এবং নৈরাজ্যবাদ ও গোঁড়ামী, মানবতাবাদ-বিরোধিতা ও ধ্বংসের ইচ্ছার এক সংমিশ্রণ হিসাবে তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। একে এক খৃস্টান পোশাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং "ঐশ্বরিক ব্যবস্থার" সংগে তাকে এক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, পারমাণবিক যুদ্ধকে ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই তার কারণ এর ভীতি মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে—এর প্রতিশোধ ও নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের আশা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দুরাশার পক্ষে তার নতুন সংকেত, এতে ভদ্রমহোদয়ের পক্ষে অস্বস্তিকর হচ্ছে মধ্যিখানে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব। এর অর্থ পূর্বমুখী অভিযান জার্মানের বিরুদ্ধে জার্মানকে ডেকে আনবে। ক্যাথলিক তাত্ত্বিকরা অবশ্য বলছে যে এটা কোন বাধা নয় তার কারণ খৃস্টান শিক্ষা অনুযায়ী "প্রত্যেক যুদ্ধ হচ্ছে ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে জাপানী শহরগুলির উপর যে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল তাতে বিশ্বের বিবেক বিচলিত হলেও পশ্চিম জার্মানির অনুশোচনা শুধু স্থান আর সময় নিয়ে: অন্য সময় অন্য জায়গায় তা ফেলা হলে নিশ্চয়ই যুক্তিসংগত হত।

এতদূর গিয়েও তারা ক্ষান্ত হয় নি, অধ্যাপক গুন্ডাভ, গাণ্ডলাচ, প্যাটার এবং জেসুইট ঘোষণা করেছিলেন যে কোন অস্ত্র কোন যুদ্ধ কৌশলই অনৈতিক নয়। এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করা উচিত নয় তার কারণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মানুষ গণহত্যা করেছিল এবং তারও ধর্মীয় নীতি ছিল। গুণ্ডলাক বলেছিলেন "মূল্যবোধের" নামে ক্রুশ দ্বারা চিহ্নিত যুদ্ধকে এমনকি তার সাথে যদি পারমাণবিক অস্ত্রও জড়িত থাকে, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র দ্বারা সমর্থন করা উচিত। এটা ছিল পারমাণবিক "ধর্মযুদ্ধের" সমর্থনে তাঁর ১নং যুক্তি।

তবে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে পারমাণবিক "ধর্মযুদ্ধ" জার্মানি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং জার্মানিতে এক মরুভূমিতে পরিণত করবে। গাণ্ডলাচ এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত যুক্তি খাড়া করেছিলেন। তিনি বলেছেন: "একটা জাতির বিলুপ্তির একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে, অবশ্য যদি তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হয়। এই সৌরজগৎ অনিত্য নয়। একে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। ঈশ্বর আমাদের এমন এক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন যেখানে আমাদের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে আমাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে হবে।" তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে "যুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠ বিশ্বব্যবস্থার মূল।"

বুন্দেসওয়েরের মুখপাত্র ফাদার গণ্ডলাচ সাধুবাদ শুনিয়েছিল। ক্যাথলিক ধর্মবাদ জার্মান সমরতন্ত্রর স্বার্থের সাথে মিশে গিয়েছিল। তাদের শব্দরাশিকে নতুন পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে উগ্রপন্থীরা তাদের পুরোনো সমরতন্ত্র ও সংশোধনবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে এবং কোন গঠনমূলক ধারণা দূরের কথা, কোন নতুন ধারণা প্রবর্তন করতে পারছে না।

জার্মানির জনগণ আগে কখনো এক বাস্তববাদী ঐতিহাসিক দার্শনিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ধারণার এমন যা অতীতের শিক্ষা মনে রেখে শান্তিপূর্ণ প্রগতির ব্যবস্থা করবো এমন প্রয়োজন হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিকরা তাদের বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক ধারণা যাদের অধিকাংশ অনৈতিহাসিক, অবাস্তব ও প্রতিক্রিয়াশীল, উৎপাদন করে, তারা যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ ও রক্ষা করছে, তাদের আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়কে সংগঠিত করছে বা নতুন করে সাজাচ্ছে।

তাদের ধারণা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পোশাক পরতে পারে, তা অস্তিত্ববাদী বস্তুনিরপেক্ষতা হতে পারে, আবার নয়া যৌনবাদী তত্ত্বও হতে পারে। অন্যান্য সময়ে তা জার্মান সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কূট-তর্ক হিসাবেও গঠিত হতে পারে যা এও প্রচার করতে পারে যে নাৎসীবাদ জার্মান একচেটিয়া পুঁজিবাদ কর্তৃক সৃষ্ট নয়, তা হচ্ছে এক বাহ্যিক "দানবিক" ঘটনা, অন্যত্র তারা নাৎসী আরও নৈরাজ্যবাদী, উদ্ধত ও সমালোচিত অংশ

বাদ দিয়ে নীৎশে ধারণাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে, তাছাড়া তারা রাস্তার ধারে বক্তৃতা, সকাল ও সান্ধ্য সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, বেতার অনুষ্ঠান, টেলিভিশনের বিকৃত তথ্যবহুল ছায়াচিত্র প্রভৃতির আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে ধারণা, তা সাধারণ, জটিল, সরলিকৃত বা কুরুচিপূর্ণ, যাই হোক না কেন, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পারমাণবিক যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শকে দৃঢ় করছে।

আমরা দেখেছি জার্মান ঐতিহাসিকরা এই আদর্শ তৈরী করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিল যে ভবিষ্যতের যথেষ্ট দায়িত্ব তার কাঁধে। ১৯৫৫ সালে ডেহিও লিখেছিলেন:

৫০ বছরে তৃতীয়বারের জন্য জার্মানি ছিল এক সন্ধিক্ষণে। দুবার সে ভুল পথ বেছেছিল। নিজের সামর্থ্যকে বেশী ভেবেছিল এবং পুরোনো ইউরোপ ও নিজেকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।”

তৃতীয়বার কিভাবে জার্মানির বাছা উচিত? যদি তাকে বিভক্ত না করা হত এবং যদি তার দক্ষিণ অংশে সমরতন্ত্রকে দমন করা যেত, তাহলে জনগণ শান্তিপূর্ণ প্রগতির কথা ভাবতে পারত। কিন্তু দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগে যুক্ত হয়ে পশ্চিমী শক্তিরা দেশকে দুই জার্মানিতে বিভক্ত করেছে। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এক নতুন পথ—সমাজতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ উন্নতি—বেছে নিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র পুঁজিবাদী থেকে গেছে· সে কিন্তু অস্ট্রিয়া বা ফিনল্যাণ্ডের মতন নিরপেক্ষতা বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ বেছে নিতে পারত কিন্তু তা করেনি। বরঞ্চ সে সমরতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের পথ বেছে নিয়েছিল। ন্যাটোয় যোগ দিয়েছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধ অনুসরণ করেছিল জার্মান ঐতিহাসিকরা এই বিশ্বাস করেছিল যে জার্মানীর বিভাজন ছিল “শাপে বর” এবং শক্তির ভারসাম্যতায়” নায়র‍্যাংকপন্থী ধারণায় বিশ্বাস করে তারা “পশ্চিমী সংহতির” নীতিকে সাধুবাদ জানিয়েছিল এবং “বলশেভিকবাদকে” প্রতিহত করার মার্কিন নীতির পিছনে সমবেত হয়েছিল।

অবশ্য জার্মান ঐতিহাসিকেরা ভালোভাবেই জানত যে তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুনসংযুক্তির, পথে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ডেহিও লিখেছেন: “এটাই হচ্ছে এক সন্ধিস্থলের চেতনা। এক রাস্তা সোজা জাতীয় লক্ষ্যে চলে গেছে। আর একটা রাস্তা অ্যাটলাণ্টিক সংহতি হয়ে লম্বা বাঁক নিয়েছে। সুতরাং ঝোঁক গতানুগতিক স্বাধীন সামরিক বাহিনীর ওপর নয়, “মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর। যা তার পরমাস্ত্রর ওপর নির্ভর করে” ঠিক সময়ে “এক নিবারণাত্মক যুদ্ধ” শুরু করতে পারত। কিন্তু ডিহয়ো বুঝতে পেরেছিল যে এতে বাস্তবতার অভাব ছিল এবং এর সংগে ভয়াবহ বিপদ জড়িত ছিল। সেই জন্য “বর্তমান ইতিহাসকে রক্ষার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পালনের” জন্য আবেদন জানিয়ে তিনি “জাতীয় উদ্দেশ্য শক্তিকে মহৎ করার জন্য পশ্চিমী অস্তিত্বের”

জন্য ওকালতি করেছিলেন। তিনি উপসংহারে বলেছিলেন "অধৈর্যতা ও ভুল বিচার শক্তি···দুর্দশার আমাদের ভুল পথে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের জন্য কোন তৃতীয় সময় নেই।"

ঐতিহাসিকদের জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের গভীরে যাওয়া উচিত, জার্মান ইতিহাস সম্বন্ধে তাকে গতানুগতিক ধারণা ত্যাগ করা উচিত, সমরতন্ত্রকে পুনর্বহাল করা বা পারমাণবিক অস্ত্র সহায়ক সমর্থন করা উচিত নয়, ঠিক মত তথ্য যোগাড় করা উচিত এবং ইউরোপের শান্তিপূর্ণ উন্নতির ধারা অনুযায়ী নতুন পথের সন্ধান করা উচিত।

৮

বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাবলম্বী দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতি যে রকম বাস্তববাদী, বিশ্বজনীন ও সর্বোপরি যুগোপযোগী, সে রকম অন্য কোন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধারণা হতে পারে না। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল তখন লেনিন প্রথম নীতি গঠন করেন এর পরে তা সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক শান্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এই নীতিকে দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত করা না গেলেও তা ছিল সমস্ত বড ছোট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার মূল নীতি। অবশেষে এক প্রচণ্ড প্রতিকূল সময়ের মধ্য দিয়ে যাবার সময়—অক্টোবর থেকে আজকের দিন—সেই সমস্ত মহাদেশের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ জনগণের মন জয় করে তাদের এমন এক শক্তিকে পরিণত করেছে যার শক্তি তার শত্রুরাও স্বীকার করে থাকে। সেই অর্থে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্য, যা হচ্ছে পারমাণবিক বিপর্যয়ের একমাত্র বিকল্প ; সমস্ত তুলনার উর্ধে এক সত্য।

কিন্তু এ সত্ত্বেও এই কারণের জন্য, সাম্রাজ্যবাদী ঠাণ্ডা যুদ্ধের স্রষ্টারা, যারা আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকে জিইয়ে রাখতে চায়, একে খারিজ করেছে। অল্পদিন আগে পর্যন্ত, দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধারা ছিল, যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী হলেও আসলে পরস্পরের পরিপূরক। একদিকে বলা হয়েছিল যে লেনিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে খারিজ করেছিলেন কিন্তু লেনিনের সময়ের পরে ইহা আবির্ভূত হলেও তার নাম এর সংগে উপস্থাপিত করার কারণ এর ওপর ঐতিহাসিক ও রাজনীতির নৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। অবশ্য আজকে এমন কি পশ্চিম জার্মানির ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তাদের মধ্যেও এই পথকে আর তেমন আমল দেওয়া হচ্ছে না। ডবলিউ. জি. গ্রেডই তাঁর বইয়ে স্বীকার করেছেন যে, লেনিন "বিভিন্ন শ্রেণী বনিয়াদের রাষ্ট্রের মধ্যে সমান্তরাল সহাবস্থানের" কথা লিখেছিলেন এবং এর থেকে এক সিদ্ধান্তে এসেছেন : তার পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার বর্তমান

কয়েক বছরে "লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর সংগে একমত।" তিনি আরও বলেছেন : "আমি এটা ভাবতে ইচ্ছুক যে তা সৎভাবেই বিবাদ মেটানোর পন্থা হিসাবে যুদ্ধকে বাদ দিয়েছে কিন্তু এটা ভাবি না যে সে যে ধরনের প্রতিযোগিতার কথা বলেছে তাকে "শান্তিপূর্ণ" বলা যায়।

এটাই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দ্বিতীয় ধারা যা বর্তমানে প্রচলিত। বান্দুং আফ্রো-এশীয় সম্মেলন ও জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের নির্মাতারা বলছে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, যাকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। ইহা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির এক তাত্ত্বিক কূটনৈতিক কৌশল। কিন্তু তা অসত্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি কৌশল বা ধোঁয়াটে নয়। তা হচ্ছে লেনিনের প্রতিভার মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তার ফল। যেহেতু লেনিন এই ধারণা প্রচার করার পর অনেক বছর কেটে গেছে, সমাজতন্ত্র ও শান্তির শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের শক্তির বাস্তবিক সম্পর্কের এত পরিবর্তন হয়েছে যে লেনিনের দল, নিজ অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর ও কমিউনিজম ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শিক্ষা লাভ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহূর্ণ ও প্রতিশ্রুতিময় বস্তু আবিষ্কার করেছে। অতীতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন অবিভক্ত থাকায় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য ছিল, এখন, যখন পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়ে মানুষের ঐতিহাসিক প্রগতিকে পালিত করছে, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব।

এইভাবে দুটো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধর পর নতুন বিপর্যয়, যা আগেকার সমস্ত যুদ্ধের সম্মিলিত ভয়াবহতা ও ধ্বংসের থেকে অনেক বেশী ভয়াবহ হবে, এড়ানোর এই প্রথম সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখন থেকে যুদ্ধ অনিবার্য নয়। এটা ভাবা মোটেই আত্মপ্রবঞ্চণা নয়। পারমাণবিক যুগে যুদ্ধ এড়ানো খুবই বাস্তবসম্মত। ধর্মযুদ্ধেয় সময় অনেকদিন আগে চলে গেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এখন প্রয়োজন এবং তা ক্রমশঃ বাস্তব হয়ে উঠছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে যে পারমাণবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিন্তা হচ্ছে যথার্থই প্রগতিশীল এবং তা সময়ের থেকে এগিয়ে থেকে ভবিষ্যতে আলোকপাত করছে। কমিউনিজম বিরোধিতার অস্ত্র দিয়ে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই হচ্ছে এক বস্তাপচা কৌশল।

"আইডেনহাব্বার যুগের" পশ্চিম জার্মান সমালোচকরা বলেছে যে সে "এক হাজার সংযোগসূত্র দ্বারা জার্মানির রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, সামরিক ও বুদ্ধিজীবি অতীতের সংগে যুক্ত।" জার্মানীর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইতিহাসের সংগে যুক্ত। তারা এটাও বলে থাকে যে জার্মানির

বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক আঁতাতের কিছু সংশোধিত, পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত রূপ সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিশিষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও এবং তার আধুনিকীকৃত রাজনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও "আইডেনহাওয়ার যুগের" মূল ধারণা একশ বছরেরও আগেকার "ঐতিহাসিক বাস্তবতার" সংগে জড়িত। সংক্ষেপে তাদের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সময় নিরূপম ভ্রম বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। এটা কমিউনিজম-বিরোধিতার মূল ধারণা সম্বন্ধে মোটামুটি ঠিক মূল্যায়ন। এর আদর্শ ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলনীয় যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রবর্তিত ন্যায্যবাদী ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পবিত্র জোটের আদর্শ ন্যায্যতাবাদের উদ্দেশ্য ছিল জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করা। যদিও তা খুব সীমিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং যে সব রাষ্ট্র স্বাধীন প্রগতিশীল উন্নতির জন্য চেষ্টা করছিল তাদেব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মূল প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপীয় শক্তির সক্রিয় হস্তক্ষেপ বা সমগ্র হস্ত-ক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রমাণ করাব জন্য তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্র সে নিজেই নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিল। তবে পবিত্র জোটের এই প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বকে অতীতের গর্ভ থেকে টেনে বার করে বর্তমান পরি-স্থিতি অনুযায়ী তার সংশোধন ও পরিমার্জন করে আজকের দিনের কমিউনিজম বিরোধিতার মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল। জার্মানিব একজন অন্যতম সৎ ও দূরদর্শী বুদ্ধিজীবী টমাস মান, তাকে বিংশ শতাব্দীব এক বৃহত্তম ভুল বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এর গঠনের বৈচিত্র্য হিটলারের আগ্রাসন থেকে বর্তমানের ঠাণ্ডা যুদ্ধের বৈচিত্র্য ও "মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ"—এই "তিরিশ বছরের যুদ্ধ" কি স্থানীয় বা বিচ্ছিন্ন ছিল না। পুরোনো পবিত্র আদর্শগত জোটকে পুনরুজ্জীবিত করে জন ফস্টার ডালেস সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদেব সম্প্রসারণের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক দেশকে "প্রতিহত করার" ধারণার অবতারণা করেছিলেন। এটাই ছিল "আইডেনহাওয়ার যুগের" সংশোধনবাদী আকাঙ্ক্ষার কারণ এবং এখনও এইসব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হয়েছে এরকম কোন চিহ্ন দেখা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ডালেস ও তাঁর মৃত্যুর অল্প আগে, বুঝতে শুরু করেছিলেন যে তার ঠাণ্ডা যুদ্ধের তত্ত্ব, যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তত্ত্বর মূলতঃ বিরোধ, কোন ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক মূল ছিল না এবং আটলাণ্টিক নীতিকে সংশোধিত করতে হবে। সীমান্তের সংশোধন, ঠাণ্ডা যুদ্ধ এবং সর্বোপরি "শক্তির অবস্থান" ও পারমাণবিক অস্ত্রের ধারণা এমনভাবে আইডেন-হাওয়ার যুগে গেঁথে গেছিল যা পশ্চিম জার্মানি দুই আনবিক শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার যে কোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য এইসব শব্দ ব্যবহার করেছিল।

এছাড়া ঠাণ্ডা যুদ্ধের ধারণাকে মদত দেবার জন্য আরও অনেক পুরোনো ও দেউলিয়া ধারণা পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। একটা ছিল "শক্তির ভারসাম্যতার নীতি," এই কৌশলের সাহায্যে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। আমরা আগে দেখিয়েছি যে নয়া-র‍্যাংকপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট এই ধারণা জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে তাদের একাধিপত্যের তত্ত্বের কাজে লাগিয়েছিল। এখন একে বন, ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রর যে দাবী জানিয়েছে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু শুধু পারমাণবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে না। উপরন্তু তা আরও জটিলতার সৃষ্টি করবে যদি জার্মান সমরতন্ত্রীরা কিছু অস্ত্র হাতে পেয়ে যায়। শান্তির একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে সর্বাধিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও এক কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ। নিরস্ত্রীকরণের সোভিয়েত প্রস্তাব নাকচ করে পশ্চিমী শক্তি এক সশস্ত্র শান্তির বিকল্প প্রস্তাব এনেছে। এটা এক পুরোনো ধারণাও যার আড়ালে ব্যাপক অস্ত্রসজ্জার নীতি লুকিয়ে আছে এবং এই নীতি অনুকরণের পরিণতি ছিল অনেক স্থানীয় ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ও সর্বোপরি দুটো বিশ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধোত্তর সাধারণ ও পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা ছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক অংশ এবং যারা বলছে যে কমিউনিজম বিরোধিতার পতাকার তলায় পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা হচ্ছে বিশ্বের এক নতুন বিপর্যয়ের একমাত্র বিকল্প, তারা নিজেদেরই ঠকাচ্ছে। "আইডেনহাব্বার যুগের" তাত্ত্বিকরা রাশি রাশি শব্দ দিয়ে বারবার ঘোষণা করেছে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ "সংবাদপত্রের আড়ম্বর" নয়। এটা হচ্ছে এক প্রকৃত যুদ্ধ বা তার একধরনের রাজনৈতিক আদর্শনৈতিক উপক্রমণিকা। এই উপক্রমণিকা প্রচণ্ড ক্ষতি করছে, "যুদ্ধবাজদের" সম্পদের ক্ষতি করছে এবং প্রচণ্ড নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সঞ্চার করেছে। সর্বোপরি এক এক পারমাণবিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বহন করছে যা গুরুত্ব পরিণামের কোন হিসাব করা যাবে না।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের উৎসাহীরা জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলপূর্বক অধিকার ও যুদ্ধোত্তর সীমান্তের সংশোধনের সমর্থকেরা কি বুঝতে পারছে যে, তাদের আক্রমণাত্মক কমিউনিজম বিরোধিতা ও "প্রতিহত করার" নীতি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একজন বিশিষ্ট পশ্চিম জার্মান প্রচারবিদ এই লেখকের সংগে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে কথাবার্তা বলার সময় স্ট্রাউসের নীতির নামে শপথ করেছিলেন কিন্তু স্বীকার করেছিলেন যে "পারমাণবিক পদ্ধতিতে জার্মানির ঐক্য সাধন করার অর্থ এক কবরখানাকে ঐক্যবদ্ধ করা।"

জার্মানির ঐক্যসাধন হচ্ছে জার্মানির আভ্যন্তরীণ সমস্যা, এর শান্তিপূর্ণ

ও বাস্তববাদী সমাধানে একমাত্র পথ হচ্ছে দুই জার্মান রাষ্ট্রের মধ্যে বোঝাপড়া — এইজন্য জার্মানের মাটিতেও শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের ধারণা—দুই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলম্বী রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—হচ্ছে সৃজনশীল ও বাস্তববাদী। এই হচ্ছে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, পুনর্মিলনের স্বার্থে ও জার্মানির মাটিতে যাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাব না হয় তার জন্য যে শান্তির তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছে তার ভিত্তি।

৯

জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান তত্ত্বর সংগে জার্মান জাতির শান্তিপূর্ণ প্রগতি ও ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। তাই তারা পুরানো ধারণাকে আঁকড়ে ধরে এবং সেগুলিকে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও আশু রাজনৈতিক কর্তব্যর সাথেখাপ খাইয়ে নেয়। জার্মান বুর্জোয়া চিন্তার গৌরবময় যুগ শেষ হয়ে গেছে। তা এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে চলে গেছে। বাস্তববাদ ও প্রগতির ধারণা থেকে অ-বাস্তববাদ ও প্রতিক্রিয়ায় তার বিবর্তন হয়েছে মানুষের জয়ের প্রতি বিশ্বাস থেকে চ্যুত হয়ে সে বিশ্বাস করেছে যে জনগণের মধ্যে অপপ্রচার ও মার্কিন বিজ্ঞাপনই সর্বশক্তিমান। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ ও ফুয়েরবাখের বস্তুবাদ থেকে। হার্দার, গোয়েথি ও শিলারের মহান মানবতাবাদ থেকে এবং চিরন্তন শান্তিব উপর কান্টের রচনা থেকে সে চলে গেছে অস্তিত্ববাদে, কমিউনিজম বিরোধিতা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধর আধুনিক পদ্ধতি ও পারমাণবিক যুদ্ধের অশুভ দর্শনে। আজকের দিনের সব থেকে বাস্তববাদী ধারণা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাকে অগ্রাহ্য করে সে গণতান্ত্রিক ভিত্তি জার্মানির জাতীয় ঐক্য দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। সমরতন্ত্র ও প্রতিশোধের মোড়লি করে সে পারমাণবিক যুগকে অগ্রাহ্য করেছে বা তার অত্যধিক অবাস্তববাদী ব্যাখ্যা করছে। এই অবস্থা নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ তার সব বড়াই সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানির তত্ত্ব আজ এক গভীর সংকটে পড়েছে যা তার পক্ষে কখনোই মোচন করা সম্ভব নয় কারণ জার্মান সমরতন্ত্রের যে কোন রকম পুনরুজ্জীবন হলে জার্মানির পুনরুজ্জীবনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সার্বিক হিংসার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের যে কোন প্রচেষ্টা আত্মহত্যার নামান্তর, সুতরাং জার্মান সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব শুধু অমানবিক নয়ঃ তা অবাস্তবও বটে। পারমাণবিক যুগে এ এক পারমাণবিক বিপর্যয়ে পরিণত হতে বাধ্য। এই ভাবেই সে শুধু জার্মানি বা ইউরোপ নয়, সমগ্র পৃথিবীকে বিপন্ন করছে। এটা হচ্ছে ঘটনার ক্রমবিবর্তনের বাস্তবকরণ এবং তা "ত্রাসের দ্বারা নিবারণের" দর্শনের দ্বারা বা জার্মানির পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা দ্বারা স্তব্ধ করা যায় না, তা করা সম্ভব যদি পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রকে খারিজ করা হয়। কড়া আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব-

জনীন নিরস্ত্রীকরণ করা হয়, এই উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করা উচিত কেননা এই অর্থ মানুষের বুদ্ধির তার এক বৃহত্তম ও ভয়াবহতম সৃষ্টিকে জয় করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যদি আধুনিক ইউরোপের সব থেকে আক্রমণাত্মক শক্তি জার্মান সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক সমরতন্ত্র ও প্রতিশোধের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র হাতে পায়, তাহলে এই প্রচেষ্টা পিছিয়ে যাবে বা ব্যর্থ হবে। শান্তি ও যুক্তির শক্তি এই সম্ভাবনার সংগে কখনোই খাপ খায় না। শান্তি ও যুক্তি দার্শনিক ও নীতিবাগীশদের কোন সূক্ষ্ম ধারণা নয়, কবিদের সৃষ্ট কোন ভাবমূর্তি নয় এবং অতীতের চশমা দিয়ে সবকিছু দেখতে অভ্যস্ত কোন ঐতিহাসিকের ভ্রান্তিও নয়। এই শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সময়ে অচঞ্চল ছিল।

পশ্চিম জার্মানিতে এই শক্তি এখনো বিচ্ছিন্ন, অন্যান্য আদর্শ দ্বারা পীড়িত এবং "অর্থনৈতিক বিপ্লবের" চোখ ধাঁধানো বাগাড়ম্বরের পাশে অবহেলিত অথবা সরাসরি অত্যাচারিত। তবু তারা নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তন করছে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক বাস্তববাদী বিকল্প খুঁজছে। "আইডেনহাওয়ার যুগের" মূল শ্লোগান—"স্থায়ীত্ব" ও "কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়" শ্লোগান—বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতির পক্ষে আর উপযোগী নয় এবং তা যার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকিত ও বর্তমানের প্রতি আরও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভংগি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তাদেবকে আরও বিচলিত করছে। একজন চিন্তাশীল ও দূরদর্শী দর্শক থিলো কোচ বলেছেন যে আইডেনহাওয়াব যুগের "ক্ষণস্থায়ী নিশ্চয়তার মূল্য হচ্ছে পররাষ্ট্র নীতির গতিহীনতা বিশেষতঃ পূর্বের সংগে, স্বেরাচার ও আভ্যন্তরীণ নীতির অতীতের অত্যাধিক চাপ।

কিন্তু এই প্রবণতা "আইডেনহবাব যুগ" শেষ হবার সংগে সংগে পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু যারা রাজনৈতিক-ধর্মবাদ থেকে পৃথক তাদের ঐতিহাসিক-দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কিছু নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় রাইখ ধূলিসাৎ হবার অল্প পরে কেউ কেউ ইচ্ছে করে ফ্যাসী-বাদের আদর্শ বিরোধিতা করে, তাকে নিন্দা করে, তার সমস্ত দিক খারিজ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক সমস্যা সমাধানেব চেষ্টা করে। কিন্তু তা করা হয়েছিল উপন্যাসের ক্ষেত্রে। কিন্তু ইতিহাস রচনার, ইতিহাস রচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। এটা সত্য যে যুদ্ধোত্তর উন্নতির প্রথম বছরে পশ্চিম জার্মানির প্রচারবিদ ও পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পরিষদের প্রথম সভাপতি হানস ওয়ার্নার রিচটার লিখে-ছিলেন: "জিরো বছর হচ্ছে জার্মানির ইতিহাসের ভার মুক্তির শুরুর বছর··· যে রকম জনগণ ভেবেছিল, জার্মানী তার ইতিহাসের সংকটময় সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তার অনেক সুযোগ ছিল। তাকে যা করতে হয়েছিল তা ছিল রাষ্ট্র ও জাতি হিসাবে এক অনস্তিত্ব থেকে এক নতুন অস্তিত্বে উপনীত হওয়া।

"কিন্তু জার্মানি এক ভিন্ন রাস্তা ধরেছিল। এর জন্য তার ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা দায়ী। তারা নতুন পরিস্থিতিতে পুরানো সাম্রাজ্যবাদী ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে অতীতের সংগে এক সার্বিক হিসাব নিকেশ কাজ বন্ধ রেখেছিল এবং এক "সম্পূর্ণ নতুন অস্তিত্ব"র পৌঁছানোয় বাধা দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যের আধুনীকিকরণ করা হলে তার মূল বিপদ তার বিভাজন বা জার্মানির মাটিতে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়—কেটে যাবে না। সুতরাং নতুন নতুন প্রবণতার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে বাস্তব ধারণার উপর আলোচনা করেছিল। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে ওদের উদ্ভব হয়েছিল এটা ভাবা ঠিক নয়। আদর্শের ক্ষেত্রে অন্যান্য দিকের মত, বাস্তববাদী ধারণা এক অন্তর্লীন যুক্তি আছে। কিছু কিছু হচ্ছে বন্ধ্যা ও বিপজ্জনক উগ্রপন্থী প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং অপরগুলি হচ্ছে এক আরও নির্ভরযোগ্য রাস্তা বার করার জন্য দুর্বল প্রচেষ্টা মাত্র। এই বাস্তববাদী ধারণার মৌলিকত্ব ছিল এবং এদের মধ্যে অনেক মৌল দ্বন্দ্ব ছিল। তবে প্রতিক্রিয়াশীলরা অন্যান্য আপোষহীন মতবাদের সংগে এদের বাধা দিয়েছিল তার কারণ তারা গতানুতিক ধারণা ও তত্ত্ব থেকে ভিন্নপথগামী যে কোন ধারণার মধ্যে বিপদ ও বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ খুঁজে পায়।

বাস্তববাদ :ঐতিহাসিকদের সত্যান্বেষণে উদ্বুদ্ধ করে এমন কি জার্মান ইতিহাস রচনা পদ্ধতি খারিজ করার মূলে৷ রাংকপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্ন রূপে—ঐতিহ্যবাদী জাতীয়তাবাদ থেকে ইউরোপীয় ও আটলান্তিক পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। ফ্রিটজ ফিচারের "ড্রাইভ ফর দি ওয়ার্ল্ড পাওয়ার" হচ্ছে এই রকম এক অনুসন্ধানের ফল। তিনি তথ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির পররাজ্যলোভী উদ্দেশ্যের এক গভীর ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেন। তার শিষ্য ইমানুয়েল গেইস। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পোলিশ জার্মান সীমান্তের সমস্যার উপর ও যুদ্ধের পূর্বাভাস স্বরূপ জুলাই সংকটের উপর যে লেখা লিখেছিলেন, তাতে তাঁর ঐতিহাসিকভাবে বাস্তব পদ্ধতির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। তার প্রথম লেখায় গেইস "পরাজয় ও হিংসা"কে আজকের যুগের পক্ষে অত্যধিক অপরিণত বলে নিন্দে করেন এবং দ্বিতীয় লেখায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের সংকটপূর্ণ দিনের জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা উপযুক্ত তথ্য সহকারে প্রমাণ করেন। যদিও ফিচার ও গেইসের বইগুলির কিছু দিক নিয়ে বাদানুবাদ চলতে পারে। তাদের সিদ্ধান্তগুলি শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফসল হিসাবে ছাড়াও সাহস ও বুদ্ধিজীবী স্পষ্টতার (যার ভিত্তি হচ্ছে এই জ্ঞান যে সব ঐতিহ্যবাদী ধারণা জার্মানীর ইতিহাসের পূর্ণ মূল্যায়নের পক্ষে বাধা স্বরূপ সেগুলির অপসারণ প্রয়োজন) দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রশংসাযোগ্য।

তার সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ফিচার লিখেছেন: "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী দুই বিশ্বযুদ্ধের যন্ত্রণার দ্বারা আরও তীক্ষ্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: আজকের দূরত্ব থেকে জার্মান ইতিহাসকে বলে কি আমরা শান্ত মেজাজের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতে সমর্থ? "এই শান্ত মেজাজের সিদ্ধান্ত" যা হচ্ছে বা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সমস্যার প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগীর প্রতি প্রবণতার জন্য তিনি বিভিন্ন আধুনিক ঐতিহাসিকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। রিটার ফিশার এক "নতুন যুদ্ধ অপরাধ" তত্ত্ব উৎপাদনের দোষে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু তার আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা ফিশার যা দুর্বলভাবে "ভ্রান্তির ধারাবাহিকতা" বলে অভিহিত করেছেন, তার সম্মুখীন হয়েছেন ঐতিহ্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী ধারণার প্রবক্তারা এতে ভীত হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগী "আমাদের সময়ের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য। রিটার এই ভয় দেখিয়েছিলেন যে ঐতিহাসিক বাস্তববাদ আজকের দিনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি রাজনৈতিক ভাবে বাস্তব দৃষ্টিভংগীর সংগে মিলিত হবে। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ ধারণার প্রতি চিরবিশ্বস্ত এই ভদ্রলোক ফিশারকে জাতীয় নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন এবং তাঁর চিন্তাধারার সংগে হানস রথফেলসের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক দার্শনিক ধারণাকে এক করেন।

আধুনিক পশ্চিম জার্মানীর আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনুপ্রেরণাদাতা রোথফেল, তত্ত্বকে আধুনিক ও সক্রিয় করার চেষ্টা করছেন এবং ন্যাটো আদর্শের সুবিধা অনুযায়ী অনেক ঐতিহ্য আশ্রিত জাতীয় শ্রেণীবিভাগকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত তাঁর অনুগামীরা তত্ত্ব ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় এবং তারা এক একদিকে উদারনৈতিক, এমন কি হিটলার বিরোধী ধারণা এবং অপরদিকে কমিউনিস্ট বিরোধী অস্ত্রাগার থেকে ধার করা কিছু ধারণার এক জগাখিচুড়ি তৈরী করেছে। বাস্তবে পরস্পর বিরোধী ধারণার এই সংমিশ্রণ এক দ্বন্দ্বমূলক ও পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক রাজনৈতিক তত্ত্ব। এক দিকে ফ্যাশিবাদ বিরোধী সংগ্রামে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বীকৃতি এবং অপরদিকে ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাইয়ের হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রর দক্ষিণপন্থীদের পুনরুদ্ধার করার জন্য এই তথ্যের অস্বীকার একদিকে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি না দেওয়াকে সমর্থন এবং অপরদিকে জার্মানিকে নিরপেক্ষ করার ধারণাকে "ভ্রান্ত" বলে খারিজ করা এবং সহাবস্থানের সমস্যাকে "আমাদের দেশে দুই সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এক সম্পর্ক ও প্রতিবেশী স্লাভ জনগণের সংগে এক সম্পর্ক হিসাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার।

পদ্ধতির ক্ষেত্রে রোথফেলের অনুগামীরা মাক্স ওয়েবারের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি যে, আডেনহাঁব্বারের যুগে এই তত্ত্বকে

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এক পরিস্ফীত পরীক্ষিত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ঐ তত্ত্ব ঐতিহাসিক দার্শনিক ক্ষেত্রে ইয়াস্পারের অস্তিত্ববাদের দিকে ঝুঁকেছিল। কট্টর ঐতিহ্যবাদীরা ও জাতীয়তাবাদীরা রথফেলসের অসংলগ্নতাকে এক বিপজ্জনক পরীক্ষা বলে অভিহিত করেছিল। তা করা হয়েছিল বিশেষতঃ যখন ইয়াস্পার যিনি এখন এক পারমাণবিক তাত্ত্বিক, তার দৃষ্টিভঙ্গী সংশোধিত করেছিলেন। তারা প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে কোন পরিবর্তন হৃষ্টচিত্তে মেনে নেবে না ; তাদের আদর্শ হচ্ছে কোন ধারণাকে জমিয়ে দেওয়া এবং এইভাবে ঐতিহাসিক উন্নতি ও প্রগতির সম্মুখে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তবুও উন্নত ধারণার উপর এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার উপর ছাপ রাখছে।

ইয়াস্পারস ধাপে ধাপে তাঁর পারমাণবিক মৃত্যুর গণ্ডীর দর্শনে উপনীত হয়েছেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে অর্থাৎ "শূন্য বছরে" যাহা শুরু হয়েছিল তৃতীয় রাইখের পতনের পর, তিনি জঘন্য নাৎসী ব্যবস্থার জন্য জার্মান জাতির দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা শুরু করেন এবং "অপরাধের প্রশ্ন" তোলেন—যা হচ্ছে এক তীব্র ও যুক্তিসঙ্গত রাজনৈতিক প্রশ্ন। নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করে হাইডেলবার্গের এই দার্শনিক তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের পতনের প্রথম সমাবেশে বলেছিলেন: "এক সম্পূর্ণ আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের অস্তিত্বর গভীর থেকে আমাদের নতুন জীবনকে নির্দিষ্ট করতে পারি" যদিও তিনি এই বিষয়কে এক সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখেন নি, বরঞ্চ এক ব্যক্তিগত ও জাতীয় নীতিবোধ ও মনস্তত্ত্বর সমস্যা হিসাবে দেখেছিলেন, তিনি যেভাবে হিসাব মেটানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তা যথেষ্ট সাহসী ছিল। তারপর বন রাষ্ট্রে (যা ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু করেছিল) তিনি তাঁর পারমাণবিক আদর্শের" নরকের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। কেবল এখন তাঁর পুরানো রাজনৈতিক-নৈতিক সমস্যার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বলতে তিনি যা বোঝেন, তা এখনো বাস্তবে প্রযুক্ত হয় নি, তাছাড়া বর্তমানের বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই তিনি তাঁর উপলব্ধির যন্ত্রপাতি বদলানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তিনি লিখেছেন : "বিপর্যয়ের অতীত অভিজ্ঞতা তার ফলাফলের মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক-নৈতিক সম্ভাবনার গতি পরিদর্শন নিহিত এবং তা এক আসন্ন বিশ্ববিপর্যয়ের ভয়ের মধ্যেও নিহিত, *এই দুই অভিজ্ঞতাই রাজনৈতিক চিন্তাকে পরিবর্তিত করতে পারে যদিও তা এখনো হয়ে ওঠে নি।*

এটা সত্যি যে এরকম কোন পরিবর্তন হয় নি যদিও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই দিকে অনুসন্ধান চলেছে—তা হচ্ছে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই প্রসঙ্গে আমাদের গোলো মানের বিবর্তনের দিকে তাকানো

উচিত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জার্মানির ইতিহাস অনুধাবনে তাঁর প্রচেস্টা ছিল র‍্যাংকপন্থী ইতিহাস রচনা পদ্ধতির প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের এক ব্যতিক্রম এবং এর প্রবণতা ছিল প্রায় প্রগতিশলি এক বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক লেখনী প্রমাণ করে যে, তিনি "আডেনহাবার যুগের" ঐতিহাসিক ধারাটি এক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবেক্ষণ করতে প্রস্তুত। মান এ বিষয়ে সচেতন যে পারমাণবিক যুগে প্রতিশোধের ধারণা সমাজতান্ত্রিক দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করার আশাব মত, অর্থহীন এবং তা হচ্ছে এক সংশোধনবাদী দুরাশা। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে ওডার-নাইসে সীমান্ত হচ্ছে পোল্যাণ্ড জয়ের ফল এখন তিনি এই সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এটা হচ্ছে হিটলারের যুদ্ধেব ফলশ্রুতি। "ক্ষমতাব বাজনীতি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ১৯৩৭ সালের সীমান্তব জার্মান অধিকারের উপর জোব দেওয়া খারাপ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও জাতির দ্বারা যদি ওডের-নাইসে সীমান্তকে স্বীকার কবা হয় তাহলে ভাল হবে। তিনি সেভাবে তাঁর দৃঢ় হিসাবে অনুযায়ী, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তাহলে এক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দিগন্তে উপনীত হবে কেন না ইউরোপ থেকে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার অপসারণ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিব প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী এক নতুন যুদ্ধের বিপদ দূর করবে। তিনি বাধাগুলি সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তাঁর এই ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে তাব চিন্তাধারা খানিকটা বাস্তববাদী "কেনেডি গতি প্রকৃতি" দ্বারা প্রভাবিত এবং তা "অ্যাডেনহাবার যুগের" অবাস্তব ধাবার বিরোধী। তিনি এই যুগের সাধারণ ফলাফল বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সংগে মূল যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নেই। তাদের অসংখ্য বাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ধরতে পেরেছিলেন। "যে নীতি জানে না যে সে কি চায়? যে নীতি অসম্ভবকে পেতে চায়, সেই নীতি যুদ্ধ বা কোন কিছু পেতে সক্ষম হবে না।" কিন্তু তার উপসংহারে তিনি বলেছেন : "আর কোন যুদ্ধ নিশ্চয়ই হবে না।"

যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী শান্তিবাদী নয়। এটা এমন কোন ভালো ধারণা নয় যা নরকের পথ প্রশস্ত করছে।

কিছু জার্মান বুদ্ধিজীবী ও প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক গীর্জাগুলিতে বিদ্যমান শান্তিবাদী ধারণাগুলি অর্থহীন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধ এড়ানোর পন্থা অনুসন্ধানের সংগে সময়ের বাস্তববাদী মূল্যায়নের অনুসন্ধান সংযুক্ত কেন না ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ধারণাগুলি "সময়ের মেজাজ" ও শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সংগে সংলগ্ন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জরাজীর্ণ

পদ্ধতির বদলে উন্নততর পদ্ধতিতে সমাধানের জন্য এর মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আজকের দিনে, যখন উন্নতির হার বেশ উঁচু, রাজনৈতিক চেতনার বিক্ষিপ্ত হওয়া চলবে না। বর্তমানের সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোন পরিকল্পনার সংগে বাস্তবের কোন ফারাক থাকলে তার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। তবুও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রর অর্থনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও এই ফারাক এর রাজনৈতিক উন্নতির উপর গভীর ছাপ বেখে গেছে। যখন থেকে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে "ক্যাঞ্জওলার গণতন্ত্রর" স্বৈরতন্ত্রী শাসন শিকড় গেড়ে বসেছে, বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা অ্যাডেনহাব্বারকে বর্ণের নীতি নির্দিষ্টকারী ধারণার এক মূর্ত প্রতীক হিসাবে দেখে আসছে। এটা শুধু চ্যান্সেলরের প্রাক্তন উকিলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কিন্তু, তাঁর সমালোচকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা পুরানো ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যর পেছনের কারণগুলি ধরতে চায় এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের স্বার্থে এই পার্থক্য দূর করার সম্ভাব্যতা নিয়ে চেষ্টা করছে। ফ্রি ডেমোক্র্যাটিক দলের এক প্রাক্তন নেতা কে. এইচ. ফ্ল্যাক লিখেছেন: "কনরাও অ্যাডেনহওয়ারের শিকড় উনবিংশ শতাব্দীতে পোঁতা। যখন হিরোসিমাকে ধ্বংস করা হয়েছিল তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে ক্ষতমাসীন হয়েছিলেন কিন্তু যখন এই অতি বোমার প্রভাব খতিয়ে দেখা হয় নি, তখন তিনি তার থেকে কোন শিক্ষাগ্রহণ করেন নি।"

ফ্ল্যাক যেভাবে দেখেছিলেন তার অর্থ হচ্ছে জার্মানীর বিভাজনের পর ও পশ্চিম জার্মানীর **ন্যাটোয়** অন্তর্ভুক্তি দ্বারা তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হবার পর অ্যাডেনহাব্বারের অধীনস্থ শাসকগোষ্ঠী পুরানো পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল অর্থাৎ সামরিক বাহিনী গঠন করেছিল ও ভূখণ্ড সম্বন্ধে দাবী করেছিল। ফ্ল্যাক স্বীকার করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র "যুদ্ধের ভীতি ছড়াচ্ছে।" তিনি অ্যাডেনহওয়ার ও তাঁর অনুগামীদের পশ্চিম জার্মানীর জনগণের মধ্যে ভ্রান্তি ও হতাশা ছড়াবার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, জনগণকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এবং সংশোধনবাদী পরিকল্পনা যে "যুদ্ধের মূল্যে সফল হতে পারে" তা সম্বন্ধে অবহিত করা উচিত। যেহেতু নতুন যুদ্ধর অর্থ এক অভূত পূর্ব বিপর্যয়, ফ্ল্যাক বলেছেন যে আসল ঐতিহাসিক কর্তব্য হচ্ছে" যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র ও তার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতিকে পারমাণবিক যুগের সংগে সমন্বিত করা।" এর অর্থ ঠাণ্ডা যুদ্ধর তত্ত্ব ও প্রয়োগকে পরিত্যাগ করা এবং আজকের যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক বাস্তবকে স্বীকার করা।

.বন সরকার যত পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার দিকে ঝুঁকেছিল সামরিক পুনরুজ্জীবনের প্রাথমিক স্তরে পশ্চিম জার্মানীতে অনুভূত ঐতিহাসিক ও

রাজনৈতিক বাস্তবতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু বাস্তববাদী ধারণার প্রকাশ ছিল খুব বিক্ষিপ্ত কারণ সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের চাপ খুব বেড়ে গিয়েছিল। কেবল কমিউনিস্ট পার্টির কণ্ঠস্বর বাচরায় ঠাণ্ডা যুদ্ধ, প্রতিশোধলিপ্সা, সামরিকীকরণ ও পারমাণবিক তত্ত্বের বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী জানিয়েছিল।

তখন "অ্যাডেনহাব্বার যুগ" শেষ হয়ে গেছে। এখন এর ঐতিহাসিক সারবস্তু ও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এর রাজনৈতিক বে-হিসাবের অনেক বেশী বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। সেইজন্য জনমত আজকের দিনের মূল সমস্যার—পারমাণবিক যুদ্ধ নিবারণের ধারণা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে যদিও এই ধারা খুব অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত। এর অনুগামীদের মধ্যে বৃহৎ নির্মাতা ও ব্যাংক মালিকদেরও দেখতে পাওয়া যাবে। হ্যারল্ড র‍্যাস্ক লিখেছিলেন: "বিশাল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোন দেশের অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমার মত গণবিধ্বংসী কোন শক্তির অধিকারী হওয়া উচিত কি না……তার এই প্রশ্ন মীমাংসা সামরিক বিশেষজ্ঞরা করতে পারে না। এটা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, যে একে সমর্থন করতে ইচ্ছুক……তার খোলাখুলিভাবে বলা উচিত যে সে এর পরিণামকে আমাদের জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত।"

জাতির সম্মুখে জার্মান সমরতন্ত্রীরা এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর এক গঠনমূলক সমাধানের প্রয়োজন যা সম্ভব ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক ইতিহাস আমাদের এক বিকল্পের সন্ধান দিয়েছে। তা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলম্বী দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। মানবজাতি কখনই সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বরদাস্ত করতে রারে না। অ্যাডেনহাব্বার যুগের রাজনৈতিক সময়ভ্রান্তি বন্ধ করতে হবে। নতুন যুগের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবকে গ্রহণ করতে হবে। ফ্র্যাংক ঠিকই বলেছিলেন: "ইতিহাসে সৌন্দর্যের যুগ চলে গেছে: এখন চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করার সময়।"

এমন কি হতে পারে যে, এই সময়ে জার্মান জাতি যা মানবিক সংস্কৃতির মহান মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছে। আজ যে নিজেকে দুদুবার জাতীয়তাবাদ, বর্ণ-বৈষম্যবাদ ও আক্রমণাত্মক সমরতন্ত্রের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল, এই সুস্থ সিদ্ধান্ত নেবার সাহস ও নৈতিক শক্তির অভাববোধ করছে। এমন কি হতে পারে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ও কমিউনিজম-বিরোধী নীতি জাতির যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধিকে হরণ করবে এবং তাকে আজকের দিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারমাণবিক বিপর্যয়ের এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা সে বেছে নেবে তা বুঝতে

দেবে না? জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তার রাস্তা বেছে নিয়েছে। এখানেই তার দুর্জ্জেয় নৈতিক শক্তি ও ইতিহাসের প্রতি তার অবদানের কারণ নিহিত।

ইতিহাস শুধু দূর ও অদূর অতীত ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টি নয়। এর সংগে বর্তমানের যোগ আছে। এ এক বিচারকও বটে এবং তার আইনগুলি একবার বোঝা গেলে সেগুলি জীবনের গোলকধাঁধার পথ দেখায় এবং তা হচ্ছে এক উৎস যার থেকে মানুষ তার নিজের প্রতি, তার মুক্তির প্রতি ও তার ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস খুঁজে পায়। সেইজন্য বিভিন্ন জাতির জার্মান সমরতন্ত্র, যা মানুষের চিন্তা ও বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে দমন করে রাখে, নিজে চিন্তা করে বিংশ শতাব্দীর জার্মানীর এক মহান চিন্তাবিদ বের্টোল্ড ব্রেখট অতীতের বিরাট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, এক ঐতিহাসিক আশাবাদ নিয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন। গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি তার বিশ্বাস ছিল এবং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি লিখেছিলেন:

"সেনাপতি তোমার দরকার এমন মানুষ
যারা উড়তে পারে এবং যারা হত্যা করতে পারে।
কিন্তু একটু খটকা থেকে যায়
তারা যে চিন্তা করতে পারে।"

১৯৫৯-৬৪